ভাগবত-কথা

স্বামী গীতানন্দ

সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থাবলী

লঘুবাক্যবৃত্তি	৩.৫০
উপনিষদের রূপরেখা	৪.০০
শ্রীমদ্‌ভাগবত-সার	৬.০০
শ্রীশ্রীগীতা (ছোট)	৭.০০
শরণাগতি	৮.০০
উপনিষদের শক্তি ও মনোহারিত্ব	৮.০০
ভক্ত্যা-মাম্ অভিজানাতি	৮.০০
শিব মহিম্নঃ স্তোত্র	৮.০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (ছোট)	৯.০০
বেদান্তসংজ্ঞা মালিকা	৯.৫০
গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা	১০.০০
উপনিষদ্ ও আজকের মানুষ	১০.০০
ঈশোপনিষৎ (শাঙ্কর ভাষ্য)	১০.০০
অপরোক্ষানুভূতি	১০.০০
বৈরাগ্যশতকম্	১২.০০
পাতঞ্জল যোগসূত্র	১৫.০০
যোগবাসিষ্ঠসাব	১৫.০০
পূজা-বিজ্ঞান	১৫.০০
সাংখ্যকারিকা	১৫.০০
ধর্ম-দর্শন ঃ তত্ত্বে ও জীবনে	১৫.০০
কেনোপনিষৎ (শাঙ্কর ভাষ্য)	১৫.০০
ভক্তিরত্নাবলী	১৫.০০
নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি	১৭.৫০
গীতাসার সংগ্রহ	১৮.০০
সনৎ-সুজাতীয়-সংবাদ	১৮.০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সাইজ)	২০.০০
শ্রীশ্রীগীতা (পকেট সাইজ)	২০.০০
বেদান্তসারঃ	২০.০০
ব্যাকরণ কণিকা	২০.০০
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার রূপরেখা	২০.০০
মুণ্ডকোপনিষৎ (শাঙ্কর ভাষ্য)	২০.০০

ভাগবত-কথা

ভাগবত-কথা

স্বামী গীতানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ সকল ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয়ে অশেষ শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভাগবত একাধারে ইতিহাস-পুরাণ-সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মতত্ত্বের এক অপূর্ব সম্মিলিত ভাবের প্রকাশ। সমগ্র বেদশাস্ত্র মন্থন করে এই অনবদ্য তত্ত্বময় 'পরমহংস সংহিতা' শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেব বিশ্বের চিন্তাশীল ও শ্রদ্ধালু পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। নানান প্রাচীন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুপম জীবন পরিক্রমার মাধ্যমে একটি অপার্থিব অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ দেবমানবের চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অপূর্ব ভাবময় এই মহাগ্রন্থ ভারতের মানুষের অমূল্য সম্পদ।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ভগবৎ কৃপায় এই অমূল্য গ্রন্থখানির সহজ সরল ভাষায় একটি সংস্করণ আমরা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। মূল গ্রন্থের বিখ্যাত কিছু আখ্যায়িকা ও নির্বাচিত শ্লোক এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান অংশগুলি সংকলন করে "ভাগবত-কথা" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলো।

এই গ্রন্থ পাঠে সকল শ্রেণীর পাঠকের মূল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি হলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

দ্বিতীয় সংস্করণে (চতুর্থ মুদ্রণ) প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীমদ্ভাগবতে 'কুন্তীর কৃষ্ণস্তুতি' ভক্তিভাবের এক অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীভগবানের কৃপায় ভাগবত-কথার এই সংস্করণে 'কুন্তীর কৃষ্ণস্তুতি' সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে। আশা করি পাঠকের ভক্তি-ভাবিত মন এই স্তবটি পাঠ করে আনন্দ লাভ করবে।

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনায় শ্রীমদ্‌ভাগবত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ-যুগের কর্মমুখর জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত অবকাশ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে এরই মধ্যে অনেকে সর্ববেদান্তসার ভাগবত সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আঠারো হাজার শ্লোকে সুবিন্যস্ত ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করা অথবা শোনা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদিও বিভিন্ন ভাষায় পুরাণশিরোমণি এই মহাগ্রন্থ অনূদিত হয়েছে, তবুও বিশাল অনুবাদ-গ্রন্থ পাঠ করাও সাধারণের পক্ষে কষ্টসাধ্য বলেই মনে হয়।

'ভাগবত-কথা'য় ৩৬টি অধ্যায়ে ভাগবতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; ফলে কিছু কিছু কাহিনী, চরিত্র ও দার্শনিক চিন্তা স্বভাবতই বাদ দিতে হয়েছে। তবে আশা করি এই গ্রন্থ পাঠে যাদের ভাগবত-রস আস্বাদনের ইচ্ছা বর্ধিত হবে, তারা ভাগবতের উপর আরও গভীর অনুধ্যান করে আনন্দ লাভ করবেন।

ভাগবতের সংস্কৃত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। যারা অন্তত কিছুটা সংস্কৃত জানেন তাদের জন্য ভাগবতের কিছু কিছু স্তবস্তুতি ও মনোমুগ্ধকর অংশ এই গ্রন্থে সংস্কৃত অনুবাদসহ সন্নিবেশিত হয়েছে। আর সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও অনুবাদের মাধ্যমে ভাগবতের রসাস্বাদনে তৃপ্ত হবেন মনে হয়।

মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, সপ্তদশ পুরাণ ইত্যাদি রচনা করার পর মহামুনি নারদের উপদেশে শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রণয়ন করেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, ব্যাসদেব তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও রচনাবলীর সার-নির্যাস একত্রিত করে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের অপূর্ব সমন্বয়ে ভাগবত-ধর্ম পরিবেশন করেছেন এই অমর গ্রন্থে। নির্গুণ, নিরাকার, বাক্যমনের অতীত অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বই সগুণ, সাকার ঈশ্বররূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে জগতের ও ভক্তদের অশেষ কল্যাণ ও আনন্দ বিধান করেন—এই মহাবাণী

ভাগবতমুখে উদ্‌ঘোষিত। অনেকে ভাগবতকে একটি অতি উপাদেয় পিষ্টকের সাথে তুলনা করেন যা জ্ঞানরূপ ঘৃতে সুপক্ক হয়ে ভক্তিরূপ মধুরসে সিক্ত হয়েছে। তাই ভাগবতের কথা *পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্*—ভাগবতরূপ পরম অমৃত নিরন্তর পান কর।

শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লীলাবর্ণন-প্রধান ভাগবতে অসংখ্যবার 'কৃষ্ণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। এই গ্রন্থে 'কৃষ্ণ' শব্দটি কখনও শ্রী-যুক্ত, কখনও বা বিশেষণহীন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষ্ণের ঐশী শক্তির কথা কিছু কিছু জেনেও যারা তাঁকে তাদেরই মতো মানুষ-জ্ঞান করতেন যেমন—ব্রজবাসীরা, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি তাদের ব্যবহারের সময় কেবল 'কৃষ্ণ' শব্দই উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণকে যেখানে ভগবান, পরমাত্মা ইত্যাদিরূপে দেখানো হয়েছে অথবা তাঁর সাথে সেইরকম ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্বে 'শ্রী' যোগ করা হয়েছে। এছাড়া যেখানে কৃষ্ণকে ভগবান এবং মানুষের মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় উপস্থাপিত করা হয়েছে সেখানে 'কৃষ্ণ' শব্দটি কখনও 'শ্রী' এবং কখনও 'শ্রী' ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে।

পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের অকুণ্ঠ সাহায্য এবং সহানুভূতির ফলেই 'ভাগবত-কথা'-র প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রবর্তী, স্বামী স্মরণানন্দ, প্রমেয়ানন্দ, প্রভানন্দ, জুষ্টানন্দ, তত্ত্ববিদানন্দ প্রভৃতিকে আমাদের যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কারাদি জানাই। তাঁরা নানাভাবে গ্রন্থ-প্রকাশনায় সাহায্য করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। স্বনামধন্য বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় মুখবন্ধ লিখে দিয়ে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। এঁরা ছাড়াও আরও অনেকে বিভিন্নভাবে গ্রন্থের প্রকাশনায় সাহায্য করেছেন; তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

মনের মানুষ সংসারে পাওয়া যায় না; তাই মানুষ নিঃসঙ্গ। বয়স যখন অল্প এবং শরীর সবল কর্মঠ থাকে, তখন নানা কাজে, খেলাধুলা ইত্যাদিতে সময় বেশ কেটে যায়। কিন্তু শরীর যখন বয়সের ভারে অপটু হয়ে পড়ে,

তখন ওসব আর যেন তেমন ভাল লাগে না। তখন প্রাণ চায় এমন কাউকে পেতে, এমন কারও চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকতে, যিনি একান্তভাবেই তার অন্তরঙ্গ; কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এমন 'অন্তরঙ্গে'-র সন্ধান? ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার নির্যাস শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে যে, ভগবৎ-প্রসঙ্গ সংসার-দুঃখ বিনাশক এবং শুনতে ও চিন্তা করতেও ভাল লাগে। ভাগবতের এই আশার বাণী নিজ নিজ জীবনে পরীক্ষা করার সুযোগ দিয়ে 'ভাগবত-কথা' সাধারণ মানুষের জীবনের বিরস নিঃসঙ্গতা কাটাতে সাহায্য করবে—এই আমাদের আশা।

বেলুড় মঠ
দেবীপক্ষ
৭-১০-১৯৯৭

বিনীত নিবেদক
গ্রন্থকার

মুখবন্ধ

শ্রীমদ্‌ভাগবত পরম রসের অসীম সাগর। সে-রস স্বয়ং তিনিই, যাঁর ইঙ্গিত আমরা পাই উপনিষদের সেই উদ্‌ঘোষণে—*রসো বৈ সঃ*—সেই রসকে লাভ করলেই মানুষ আনন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। *রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।*

শ্রীমদ্‌ভাগবত তাই ডাক দিয়েছেন—*এস না, পান কর এই অমৃত রস—পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্।* কিন্তু বর্তমান যুগে ভাগবতের সেই সব নিপুণ কথকবৃন্দও অন্তর্হিত, যাঁদের মুখ থেকে মানুষ শুনত এ-সব অমৃত কথা। তেমনি তিরোহিত বা বলা চলে নির্বাসিত সংস্কৃত ভাষা, যার চর্চা করে নিজেরাই ভাগবতের আস্বাদন করে কৃতার্থ হতে পারে মানুষ, আজ সে-পথও অবরুদ্ধ।

এমন সময়, জাতির ও সংস্কৃতির এই সংকট লগ্নে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণই যেন প্রেরণা দিয়েছেন শ্রীমৎ গীতানন্দজীকে এই ভাগবতের সমুদ্র-মন্থন করে তার অমৃত-নির্যাসটুকু পরিবেশন করতে, সকলের পক্ষে অনায়াসে বোধগম্য আপন মাতৃভাষায়। মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলিকেও চয়ন করে করে তিনি যেমন এতে সন্নিবিষ্ট করেছেন মূলের আস্বাদন এনে দেবার জন্য, তেমনি প্রাঞ্জল বাংলায় প্রত্যেকটির অনুবাদ করে দিয়ে তিনি সকলের পক্ষে অনায়াসে আস্বাদনীয় করে তুলেছেন মূল ভাগবতের রস।

এই গ্রন্থের চমৎকারিতা আরও এই কারণে যে যাঁকে কেন্দ্র করে এই শ্রীমদ্‌ভাগবত রচিত সেই *মূলং কৃষ্ণঃ*, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত প্রায় সমস্ত লীলাই তিনি এর মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন। সেই সঙ্গে ভাগবতের আরও যে-সব বিশিষ্ট অংশ আছে, যা মানুষের জীবন-পথে চলার পরম সম্বল, সেই 'নবযোগীন্দ্র সংবাদ' প্রভৃতিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, ভাগবতের সার-সর্বস্ব তিনি যেন মন্থন করে তুলে এনে দিয়েছেন এক অকল্পনীয় পরিকল্পনায়।

ভাষা সর্বত্র স্বচ্ছ ও সাবলীল, কাহিনীর মনোগ্রাহী প্রবাহ আপনিই টেনে নিয়ে যায় অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। সেই সঙ্গে বৈষ্ণব আচার্যগণের নানা টীকা-টিপ্পনীর বিচিত্র আস্বাদও তিনি এনে দিয়েছেন পাঠকদের জন্য, যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন। সব চেয়ে বৈশিষ্ট্য যেটি সকলকে আকৃষ্ট করবে, সেটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যজীবন থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মূল ভাগবতের বিষয়কে আলোকিত ও সুপরিচিত করা। এটি আরও বিস্তৃতভাবে করলে যেন আরও আস্বাদনীয় হয়ে উঠত এই মহাগ্রন্থ; অতৃপ্তি থেকে যায় সামান্য একটু আস্বাদন করিয়েই কেন তিনি নিবৃত্ত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকালে নারদীয় ভক্তিই সকলের একমাত্র অবলম্বনীয় বলে নির্দেশ করেছিলেন। ভক্তি-ভক্ত ও ভাগবতকেই চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন পরম আশ্রয় বলে। শ্রীমৎ গীতানন্দজী শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই অপরূপ সর্বজন-বোধ্য সংস্করণটি প্রকাশ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই দিব্য নির্দেশকেই যেন বাণীমূর্তি দান করলেন। এজন্য ভাগবতরসপিপাসু সকলেই তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকবেন কারণ সকলেই এই মহাগ্রন্থ থেকে 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

শ্রীমদ্‌ভাগবত কোন মুখবন্ধ বা ভূমিকা বা পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। এ হলো স্বতঃপ্রকাশ, স্বয়ম্প্রকাশ। তবু সাধুর স্বভাবই হলো গুণহীনকে গুণে মণ্ডিত করে তুলে ধরা, ভাগবতের সঙ্গে তাকে সম্বদ্ধ করে তার পাবনত্ব এনে দেওয়া। তাই তাঁর একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। নিজের অযোগ্যতা ও অনধিকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও 'অচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গে' নিজেকে যুক্ত করতে বাধ্য হলাম কারণ এটুকু অন্তত উপলব্ধি করেছি ঃ

তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্ ॥ ১২-১২-৪৯॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্ মনসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃ শ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ ১২-১২-৫০ ॥

তাই শ্রদ্ধেয় গীতানন্দজীর পিছন পিছন আমারও এই অনুগান, অনুকীর্তন এবং আশা করি পাঠক মাত্রেই তাতে যোগ দেবেন এবং ভাগবত-রস পানে কৃতার্থ ও ধন্য হবেন। এই মহাগ্রন্থের বহুল প্রচার শুধু কামনা করি না, প্রার্থনা করি। এটি মহাগ্রন্থ, শুধু বিষয়ের মহত্ত্বে নয়, ভাবের ও রসের মহত্ত্বেও। পাঠক মাত্রেই তা উপলব্ধি করবেন, সন্দেহ নেই।

বিনীত নিবেদক

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

১
প্রাক্‌কথন

বৈদিক যুগে, প্রথমত সংহিতা সাহিত্যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি করা হয়েছে; তবে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, এই সমস্ত দেবতারা যে একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ, (একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি) সে বোধও তখন ছিল। তারপর ব্রাহ্মণ সাহিত্যে যাগযজ্ঞরূপ ক্রিয়ার বা কর্মের অনুষ্ঠান শুরু হয়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যকে বেদের কর্মকাণ্ড বলা হয়। কিন্তু পরে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানকারিদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হয়, যারা অনুভব করলেন যে, এই সব যাগযজ্ঞাদি মানুষকে অনন্ত সুখ, অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তি দিতে পারে না—মানুষকে জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম নয়। কঠোপনিষদে রয়েছে— *জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ* (২-২-১০)—আমি জানি যে, ভোগৈশ্বর্যের একটা সীমা আছে—তারা অনন্ত নয়। আত্মা যিনি অনন্ত, তাঁকে কখনও সীমিত বস্তুর দ্বারা, যাগযজ্ঞের দ্বারা লাভ করা যায় না। এই ভাবে ভাবিত হয়ে কিছু লোক উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা, জ্ঞানমার্গের বিশেষ অনুশীলন করতে থাকেন। এ ছাড়াও আর এক শ্রেণীর লোক অদ্বৈত তত্ত্বকে পরম সত্য বলে হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে ভক্তি-মার্গে বিশ্বাসী হয়ে এক অনন্ত শক্তিশালী, অনন্ত গুণময়, অনন্ত করুণাসম্পন্ন ভগবানের উপর নির্ভরশীল হলেন। যদিও বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে যেসব স্তবস্তুতি রয়েছে, তার মধ্যেই ভক্তির বীজ নিহিত আছে, তবুও কেউ কেউ বলেন যে, বেদের পরম সত্যকেই ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

যাই হোক সংহিতায় দেবতাদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি এবং ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ-মূলক বৈদিক সাধনা এবং জ্ঞান-মুখর উপনিষদের চিন্তার সাথে সাথে প্রায় একই সময় আর একটি সাধনা—ভক্তি-প্রবণ সাধনার উদ্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন ভাব এবং অধিকারি ভেদে ভারতের আধ্যাত্মিক সাধকেরা নিজেদের রুচি অনুযায়ী সাধনাতে আত্মনিয়োগ করে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যে পৌঁছাতে

সচেষ্ট হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, মুখ্যত এই তিনটি সাধনার ধারাই খ্রীস্ট-জন্মের বহু শত বৎসর আগে থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল।

কিংবদন্তী আছে যে, মহামুনি ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র, বিশাল মহাভারত এবং পুরাণ রচনা করবার পর অনুভব করলেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী রচনার মধ্যে এমন কিছু মহান ভাব বা মহান আদর্শ প্রকাশ করতে পারেন নি, যাকে অবলম্বন করে মানুষ যুগ যুগ ধরে নিজেদের জীবনকে মহিমান্বিত করতে পারবে। এই চিন্তায় তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন এবং এই ধ্যানের মধ্যেই তাঁর হৃদয়াকাশে ভাগবতের রূপরেখা ফুটে ওঠে। সুতরাং ভাগবত হচ্ছে ধ্যান-প্রাপ্ত; অতএব এর বিষয় ধ্যান-যোগ্য। আর ধ্যানের দ্বারাই ভাগবত-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়; তাই ভাগবত হচ্ছে ধ্যান-গম্য।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত এবং পুরাণ রচনা করবার পরও এই যে ব্যাসদেবের মনে বিষাদ উপস্থিত হলো, এটা কি কেবল ভাগবতের মাহাত্ম্য প্রমাণ করবার জন্য লেখকের কল্পনা মাত্র, অথবা এর মধ্যে যথার্থই কোন সত্য আছে?

দেখা যায় যে, খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতাপ ছিল। তারপর আচার্য শঙ্কর তাঁর অলৌকিক বুদ্ধিমত্তা এবং অনুপম শাস্ত্র বিচারের দ্বারা ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেন। শঙ্করের দর্শন মানুষকে সমস্তরকম দুর্বলতাকে পরিহার করে, সাধককে সর্বস্ব ত্যাগ করে নির্গুণ, নিরাকার, পরব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য উৎসাহিত করে। বৌদ্ধদের সুপরিকল্পিত তর্কজ্ঞান ছিন্ন করবার জন্য এবং হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক শ্রেষ্ঠত্বকে খর্ব করবার জন্য শঙ্করাচার্য জ্ঞানমার্গের উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এর ফলে শঙ্কর-দর্শন সাধারণ মানুষের বুদ্ধির নাগালের বাইরে চলে যায়। এ ছাড়াও শঙ্করাচার্যের অনুগামীদের মধ্যে এই ভাবটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে যে, ধর্ম যতটা সূক্ষ্ম বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ততটা হৃদয়ের ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শঙ্করাচার্য যদিও নিজে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে ভক্তিপূর্ণ বহু সুললিত স্তবস্তুতি রচনা করেছেন, তবুও শঙ্কর-অনুগামীরা ভক্তিভাব ও হৃদয়াবেগকে অবজ্ঞা করতে থাকে। এর ফলে সাধারণ মানুষ এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়ে। তারা একদিকে যেমন শঙ্কর-দর্শনকে জীবনে গ্রহণ করতে সমর্থ হলো না,

তেমনি অপর দিকে ভক্তিভাব, যা সাধারণ লোকের ধর্মের বাহন, তাও নিতে পারল না। সাধারণ মানুষের এই অবস্থা, রূপক হিসেবে ব্যাসদেবের বিষাদরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের হতাশা এবং আকাঙ্ক্ষা, তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের হৃদয়ে যে আলোড়ন তুলেছিল, তারই ফলশ্রুতি হলো এই ভাগবত। ভাগবত রচনার পর ব্যাসদেবের মনে যে আনন্দ হয়েছিল, তা-ই রূপক হিসেবে ভাগবত-ধর্ম রূপে প্রচলিত—বলা যেতে পারে।

ভাগবত রচনা করে ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুকদেব, যিনি আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী এবং পরম ঈশ্বরপ্রেমী, তাঁকে ভাগবত শেখালেন। শুকদেব এই ভাগবত শোনালেন পরীক্ষিৎকে, যিনি মৃত্যু আসন্ন জেনে সংসার ত্যাগ করে একমাত্র শ্রীভগবানের স্মরণেই জীবন ধারণ করেছিলেন; আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন বহু সংসার-বিরাগী সর্বত্যাগী মুনিঋষিরা। এই থেকে মনে হয় যে, আগে ভাগবত ছিল মুখ্যত সাধু সন্ন্যাসীদেরই গ্রন্থ; কারণ একজন সন্ন্যাসীই এই গ্রন্থের বিষয় সমবেত সাধুদের বলছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে বৈষ্ণবেরা ভাগবতের ভক্তিভাবের উপর বিশেষ জোর দিতে থাকে, এবং ক্রমে ভাগবত গৃহস্থদের মূল ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়।

ভাগবতের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে—ইতি *শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং*—ব্যাসদেব-কৃত শ্রীমদ্ভাগবত, যাকে মহাপুরাণ বলা হয়, পরমহংসদের সেই আকর গ্রন্থের অধ্যায় এখানে শেষ হলো। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ভাগবত হচ্ছে সন্ন্যাসী, পরমহংসদেরই গ্রন্থ।

ভাগবতকে মহাপুরাণ বলা হয়েছে—*'শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে'*। পুরাণ-সমূহে ভারতের অতি প্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ছোট ছোট বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক রাজসভায় একজন মাগধ, State Historian থাকত। এরা রাজার বংশ পরিচয় এবং কীর্তিকলাপ কীর্তন করত। এ ছাড়া 'সূত' নামে এক শ্রেণীর শ্রুতিধর এবং সত্যপরায়ণ লোক ছিলেন; এঁরা কোন কিছু একবার শুনেই সেই সব মনে রাখতে পারতেন। সূতেরা বিভিন্ন মাগধের কাছ থেকে রাজা এবং রাজবংশের বিবরণ সংগ্রহ করে বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান ও পণ্ডিতদের সভায় সেই সব কথা ও কাহিনী শোনাতেন। এই সব সূতের কাহিনী একত্রিত করে পুরাণের সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং পুরাণ হচ্ছে অতি প্রাচীনকালের ভারতের ইতিহাস। পুরাণের বিষয়বস্তু কি?

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ (পুরাণ প্রবেশ - ২)

সর্গ অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি; প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়; বংশ শব্দে রাজা, ঋষি, প্রধান প্রধান ব্যক্তি, দেবতা, দৈত্য ইত্যাদির বংশের উৎপত্তি, স্থিতি, বিলোপ বোঝায়। মন্বন্তর অর্থে সময় নির্দেশ করা হয়েছে; এই সব অর্থাৎ কোন্ ঘটনা কোন্ সময়ে ঘটেছে। এখন যেমন আমরা খ্রীস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, শতাব্দী প্রভৃতির সাহায্যে সময় ঠিক করি, পুরাণকারেরা সেইরকম মনুকাল, যুগ ইত্যাদির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় নির্দেশ করেছেন। বংশানুচরিত অর্থে বিখ্যাত রাজা ও বিশেষ ব্যক্তিদের জীবন-চরিত বোঝায়। সুতরাং বোঝা গেল যে, পুরাণে সৃষ্টি, প্রলয়, রাজাদের বংশ ও জীবন-চরিত এবং কোন্ সময়ে ঐ সব ঘটনা ঘটেছে তার সময়-নির্দেশ থাকবে।

পুরাণকারেরা মনে করতেন যে, কোন দেশের পুরাণ অর্থাৎ পূর্ণ ইতিহাস লিখতে হলে সেই দেশের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন থেকে আরম্ভ করে, যতদিন না সেই দেশের ধ্বংস হয়, অর্থাৎ প্রলয় হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তার কালানুক্রমিক বিবরণ রাখতে হবে। সুতরাং পুরাণকারেরা চাইতেন যে তাদের লেখা পুরাবৃত্ত, নূতন নূতন ঘটনার দ্বারা যুগ যুগ ধরে পরিপুষ্ট হয়ে, প্রলয়কাল পর্যন্ত টিকে থাকুক। পুরাণকে অবিনাশী করবার জন্য পুরাণকারেরা ধর্মের আশ্রয় নিলেন; কারণ যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন সে কোন না কোন ধর্মকে আশ্রয় করেই থাকবে। ফলে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত হয়ে ধর্মশাস্ত্রে রূপান্তরিত হলো। বেদ, উপনিষদের আধ্যাত্মিক ভাবরাশি সাধারণের ভাষায়, গল্পের ছলে পুরাণে জুড়ে দেওয়া হলো। এইভাবে সাধারণ মানুষ পুরাণের মধ্য দিয়ে দেশের ইতিহাস এবং উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের সাথে পরিচিত হলো।

পুরাণের ৫টি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরে পরে পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণে সাধারণ মানুষের আচার, ব্যবহার, আশা, আকাঙ্ক্ষা, দেশের ঐতিহ্য, রাজ্যশাসন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ধর্ম-সাধনা প্রভৃতি বিষয়ও লেখা হতে থাকে। এইভাবে কোন কোন পুরাণ মহাপুরাণে রূপান্তরিত হয়।

পুরাণ মতে ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে আরম্ভ হয়েছিল। সুতরাং খ্রীস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দ থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরাণকাল বলা যেতে পারে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পুরাণকার ব্যাসদেব সমস্ত সূতের বিবরণ, রাজা ও ধর্মীয় নেতাদের কাহিনী এবং দেশের প্রচলিত কিংবদন্তী প্রভৃতি একত্রিত এবং সম্পাদিত করে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেছেন। অতএব ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতার ও রাজাদের কথা রয়েছে, তা ব্যাসদেবের নিজের কল্পিত কিছু নয়। ঐ সব ঘটনা ব্যাসদেবের আগে থেকেই কাহিনী ও কিংবদন্তীরূপে প্রচলিত ছিল। ব্যাসদেব সেইগুলিকে গভীর মননের দ্বারা সুসম্বদ্ধ করে মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য, এই অমূল্য রত্ন '*ভাগবত*' জগৎকে দিয়ে গেছেন; এই অমূল্য রত্ন লাভ করে জগতের মানুষ তার মনুষ্যত্বকে পূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ পেয়েছে। তাই ব্যাসদেবের কাছে সবাই চিরঋণী হয়ে আছে। সুতরাং মহামতি, বিশাল বুদ্ধি ব্যাসদেব সকলের প্রণম্য।

বেদান্তসূত্র এবং ভাগবত, দুই-ই ব্যাসদেবের রচনা। ভাগবত গ্রন্থ তিনি সকলের শেষে রচনা করেছিলেন। অনেকে বলেন যে, ভাগবত-ই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য—সর্ববেদান্তসার-ই হচ্ছে ভাগবত। ভাগবতে জ্ঞান এবং ভক্তি অতি সুন্দরভাবে মিলিত হয়েছে। ভাগবতের প্রতি শ্লোকেই ভক্তিভাব ছড়িয়ে রয়েছে; তাই সাধারণ মানুষ নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ রূপ এই ভাগবতের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায় যে শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় কোন দুঃখের ঘটনা সাক্ষাৎ কারণরূপে জড়িত থাকে। যেমন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটিকে বধ করবার জন্য বাল্মীকির মনে দুঃখ হয়েছিল এবং সেই দুঃখের আতিশয্যে অজান্তে তাঁর মুখ দিয়ে সুললিত ছন্দাকারে ব্যাধের প্রতি অভিশাপ-বাণী নির্গত হয়েছিল—এই তো রামায়ণের আরম্ভ। আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের দেখে অর্জুনের দুঃখ হলো— ভাবলেন 'এদের হত্যা করে সিংহাসন লাভ করতে হবে! এমন যুদ্ধ আমি করব না।' অর্জুনের এই বিষাদ-ই তো গীতার সূচনা। আবার সুরথ রাজাকে তাঁরই মন্ত্রীরা রাজ্যচ্যুত করে তাড়িয়ে দেয়। সমাধি নামে এক বৈশ্যও তার স্ত্রী পুত্রের তাড়নায় বনে চলে যেতে বাধ্য হয়। সুরথ

এবং সমাধি বনে গিয়ে মেধস মুনির সাথে কথাবার্তা বললেন—এইভাবেই চণ্ডীর আরম্ভ। সেইরকমভাবে বেদ বিভাগ করে, নানা শাস্ত্র রচনা করেও ব্যাসদেবের মনে শান্তি নেই। কলিকালে মানুষের আয়ু অত্যন্ত কম; যাগযজ্ঞ, অষ্টাঙ্গ সাধন, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি সবরকম সাধনেই সিদ্ধ হতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং বেদ বিভাগ করে, এত শাস্ত্র রচনা করে ফল কি হলো? জীবের প্রকৃত মঙ্গল তো কিছু হলো না। এই বিষাদ থেকেই ভাগবতের উৎপত্তি।

বেদব্যাস প্রথমে পদ্মপুরাণ রচনা করবার পর ক্রমে আরও ষোলটি পুরাণ রচনা করেন। সেই সব পুরাণ থেকে সার গ্রহণ করে সর্বশেষে তিনি ভাগবত প্রণয়ন করেন এবং তা নিজ পুত্র শুকদেবকে পাঠ করান। শ্রীহরির নাম ও যশ কীর্তনই ভাগবতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পদ্মপুরাণ যদি প্রথমে রচিত হয়ে থাকে এবং অন্যান্য পুরাণ যদি পরের রচনা হয়, তবে পদ্মপুরাণে ভাগবতের পরিচয় থাকা কি করে সম্ভব হয়? এর উত্তর হলো এই যে, ব্যাসদেব যে ক্রমে পুরাণ রচনা করেছেন, তা পুরাণ-বক্তা সূত উল্লেখ করেছেন। সূত যখন পুরাণ-কথা বলেছেন, তখন ব্যাসদেবের সমস্ত পুরাণই রচনা করা হয়ে গেছে।

জগতের জীব জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্তি পেতে চায়—এই তো সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের চরম তত্ত্ব। কিন্তু এর উপরেও ভক্তির স্থান—এই কথাই ভাগবতে বলা হয়েছে।

> সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
> দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ৩-২৯-১৩॥

ভগবানের সাথে সমলোকে বাস, সমান ঐশ্বর্য, সমীপে অবস্থান, সমান রূপ এবং ভগবানের সাথে একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য প্রদত্ত হলেও যাঁরা প্রকৃত ভক্ত, তাঁরা সে সব গ্রহণ করেন না; তাঁরা কেবল ভগবানের সেবা করতেই চান। এই অপূর্ব ভক্তিতত্ত্বই ভাগবতে সবিস্তারে বলা হয়েছে।

ভাগবতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভগবৎ উপাসনার রসস্বরূপতা। উপনিষদে রয়েছে 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'—অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই রস-স্বরূপ; রস-স্বরূপ তাঁকে লাভ করে জীবও আনন্দময় হয়ে যায়। ভাগবতে সেই আনন্দস্বরূপ ভগবানের কথাই বলা হয়েছে।

ভাগবতে অন্যান্য অবতারের কথা বলে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্* (ভাঃ ১-৩-২৮)। অবতারের মধ্যে কেউ কেউ বা ভগবানের অংশ, কেউ বা তাঁর কলা; একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। ভাগবতে কৃষ্ণ-তত্ত্বই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং কৃষ্ণ-তত্ত্বের সাথে শ্রুতির সিদ্ধান্তের যে অপূর্ব মিল রয়েছে, তাও বলা হয়েছে। ভাগবত একদিকে বেদান্ত সিদ্ধান্তের খনি, আবার এই বেদান্তবেদ্য তত্ত্বকে কিভাবে রসস্বরূপে আস্বাদন করা যায় তারও পথ প্রদর্শক। ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সিদ্ধান্ত, পরম মধুর কৃষ্ণ লীলায় স্ফুরিত হয়েছে।

মধুসূদন সরস্বতীর মতো অত বড় অদ্বৈতবাদী—তিনি তাঁর গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

বংশীবিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণ বিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদরবিন্দ নেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।।

যাঁর গায়ের রং নূতন মেঘের মতো নীল, যাঁর হাতে বাঁশী শোভা পাচ্ছে, যিনি পীতবস্ত্র পরিধান করেছেন, যাঁর অধর পক্ক বিম্ব ফলের মতো রক্তিমাভ, যাঁর মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো সুন্দর, যাঁর চোখ পদ্মের মতো মনোহর, সেই শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছু আছে বলে আমি জানি না।

শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করে বলেছেন—যাঁর চরণকমলের জ্ঞানময় মধু পরহংসগণের দ্বারা আস্বাদিত, যিনি ভক্ত-জন-মানসে অধিষ্ঠিত, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

২

প্রথম তিনটি শ্লোকের বৈশিষ্ট্য

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১-১-১॥

এই হচ্ছে ভাগবতের প্রথম শ্লোক; এই শ্লোক দিয়েই ব্যাসদেব ভাগবত রচনা আরম্ভ করেছেন। ভগবানের স্বরূপ ও তাঁর তটস্থ লক্ষণ বোঝাবার জন্য প্রথমে ভগবানের ধ্যান করে এই শ্লোকে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে।

যিনি বাক্যমনের অতীত, সেই ভগবানের স্বরূপ কিভাবে বোঝা যাবে? যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপে বিরাজমান, যিনি অনাদি, অনন্ত, যিনি নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকার, তাঁর স্বরূপ কিভাবে প্রকাশিত হবে? এই তো মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন। বেদান্তসূত্রে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণ আছে—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ বাক্যমনের অতীত, সন্দেহ নেই। তটস্থ লক্ষণ হলো—যে-আরোপিত ধর্মের দ্বারা বস্তু-জ্ঞান হয়, সেটাই তটস্থ লক্ষণ। যেমন একজন অনেক দূরে একটি উঁচু গাছ দেখিয়ে বলল 'ঐ দেখ নদী' অর্থাৎ গাছের নিচেই নদী রয়েছে। ঐ যে গাছ, ওটা নদীর তটস্থ—নদীর ধর্ম নয়; কিন্তু ঐ গাছকেই নদীর অসাধারণ ধর্ম আরোপ করে নদীকে জ্ঞাপন করা হলো। যতক্ষণ সৃষ্টি রয়েছে, ততক্ষণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তারূপ ধর্ম আরোপ করে, সেই আরোপিত ধর্মের দ্বারা আমরা তাঁকে জানতে পারি—অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপ জানা না গেলেও, তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

এই শ্লোকের অর্থ হলো—যাঁর থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হচ্ছে, যাঁর সত্তায় জগতের সকল বস্তু সত্তাবান আছে বলে মনে হয়, যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি দেবতাদেরও দুর্বোধ্য, বেদকে অন্তর্যামিরূপে আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে

সঞ্চার করেছেন, মরীচিকাদিতে জল ভ্রমের মতো যাতে অধিষ্ঠিত মায়িক সৃষ্টিও সত্য বলে বোধ হয়, সেই মায়া নিরসনকারী, সত্যস্বরূপ, পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। এই একটি শ্লোকে ব্যাসদেব সমস্ত উপনিষদের অর্থ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন।

এই শ্লোকের আসল কথা হলো *সত্যং পরং ধীমহি*—আমরা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। এখানে পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণের কথা বলা হলো—তিনি সত্যস্বরূপ। তাছাড়া পরমেশ্বরের আর যত সব লক্ষণের কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে—তাঁর থেকে বিশ্বের উৎপত্তি, তাঁতে বিশ্বের স্থিতি এবং তাঁতেই বিশ্বের লয় হয়, তাঁরই সত্তায় জগতের সব কিছু সত্তাবান, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদের জ্ঞান সঞ্চার করেছেন, মায়াদূরকারী প্রভৃতি সব কিছুই পরমেশ্বরের তটস্থ লক্ষণ। শ্রীধর স্বামী তাঁর ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করে অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন। আবার দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ অবলম্বন করেও এই শ্লোকের ব্যাখ্যা রয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবানের লীলা-বর্ণন তথা গুণ-বর্ণনময় শাস্ত্র। ভাগবতেই রয়েছে যে, ভাগবত শ্রবণে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ হয়, যার দ্বারা মানুষ শোক, মোহ, ভয়, অতিক্রম করতে পারে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ভাগবত হচ্ছে মুখ্যত ভক্তিশাস্ত্র।

ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই রয়েছে, *সত্যং পরং ধীমহি*—আমরা সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের, পরমেশ্বরের ধ্যান করি; আবার ভাগবতের অন্তিমে দ্বাদশ স্কন্ধে রয়েছে *তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমলং সত্যং পরং ধীমহি*। শ্রীধর স্বামী *পরং* শব্দের অর্থ করেছেন পরমেশ্বর, শ্রীনারায়ণ নামক তত্ত্ব। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাগবতে শ্রীভগবানের কথাই রয়েছে।

অজ্ঞানের জন্য অনেক জিনিসকেই তো আমরা সত্য বলে মনে করি ; কিন্তু যথার্থ সত্যটা কি ? শাস্ত্রে সত্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—যা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, ত্রিকালেই যা থাকে, নষ্ট হয় না, তা-ই সত্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র ভগবান ছাড়া জগতে আর কোন কিছুই সত্য নয়। আবার কর্তৃত্বের অভিমান, আমি কর্তা, এটা তো কম বেশি সবার মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কর্তা একমাত্র পরমেশ্বর ছাড়া আর কেউ নয়। মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, একমাত্র ভগবানই সত্য, তিনিই একমাত্র কর্তা, তখনই মানুষ পরম পুরুষার্থ লাভ করে ধন্য হয়। অসত্যকে

সত্য বলে জানা এবং কর্তৃত্বের মিথ্যা অভিমান করা নিয়েই তো এই সংসার। ভাগবতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল এই তত্ত্বই রয়েছে যে, ভগবানই সত্য, তিনিই কর্তা। তাঁরই আরাধনা করে অমৃতত্ব লাভ করে ধন্য হও।

ভাগবতের প্রথম শ্লোকের মধ্যেই সমস্ত ভাগবতের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের পণ্ডিতেরা যুক্তিতর্কের দ্বারা তাদের মতের অনুকূলে ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু যিনি যে-ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, সকল ব্যাখ্যার শেষ কথাই এই যে, পরতত্ত্বই হলো পরমেশ্বর; একমাত্র তিনিই সত্য, তিনিই কর্তা।

ভাগবতের প্রথম শ্লোক গায়ত্রী মন্ত্রের মতই পবিত্র এবং অর্থবহ। গায়ত্রী মন্ত্রে *তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি*, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিতা, রচয়িতার শক্তির ধ্যান করি—বলা হয়েছে। এখানেও বলা হয়েছে যে, যা থেকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়, যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদজ্ঞান সঞ্চার করেন, তাঁর ধ্যান করি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গায়ত্রী মন্ত্র এবং ভাগবতের প্রথম শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় একই।

ব্যাসদেব প্রথম শ্লোকে ভাগবতের মঙ্গলাচরণ করেছেন। ভাগবতের সবটাই মঙ্গলময়—মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কথাতেই পূর্ণ; সুতরাং আলাদা করে মঙ্গলাচরণের দরকার ছিল না। তবুও সাধারণ নিয়ম রক্ষার জন্য ব্যাসদেব এই শ্লোকে ভাগবতের মঙ্গলাচরণ করেছেন। এ ছাড়া এই শ্লোকে ব্যাসদেব সমস্ত ভাগবতের তাৎপর্য, ভগবৎতত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। শ্রুতিতে রয়েছে যে, ব্রহ্ম হচ্ছেন সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই শ্লোকে যাঁর ধ্যান করবার কথা বলা হয়েছে, তাঁর দুইটি রূপ—একটি মায়াতীত এবং অপরটি মায়িক। একটি অখণ্ড, অনন্ত, অচিন্ত্য, সত্য, জ্ঞান ইত্যাদি; অপরটি লীলাময়, রসময়, সর্বগুণাধার, বিশ্বের সৃষ্টিকারী, সকলের রক্ষক, কৃপাময়, বন্ধু, স্বামী, পিতা, একমাত্র শরণ্য। অধিকারিভেদে কেউ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জেনে জ্ঞানমার্গে তাঁকে লাভ করেন; আবার কেউ লীলাময়, রসময়, বন্ধু, স্বামী, পিতারূপে তাঁরই ভজনা করে ভক্তি পথে তাঁকেই লাভ করে থাকেন। শ্লোকের প্রথমে *জন্মাদ্যস্য* বলে যাঁকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তা বলা হয়েছে, শ্লোকের শেষে তাঁকেই *সত্যং পরং*, পরম সত্যরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। এতে ব্রহ্মের সগুণ এবং নির্গুণ—এই দুই ভাবেরই কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, জগতে তো বহু ধর্মশাস্ত্র রয়েছে, যাতে ধর্মের স্বরূপ, উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে রয়েছে। সুতরাং নতুন করে আবার ভাগবত রচনার দরকার কি ছিল? এই প্রশ্নের নিরসনের জন্য ব্যাসদেব ভাগবতের বৈশিষ্ট্য দেখাতে দ্বিতীয় শ্লোকের অবতারণা করেছেন।

ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্‌।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ১-১-২॥

ফলের আশা করে যে ধর্মের আচরণ করা হয়, তা কপট ধর্ম। ভাগবতে কপট ধর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিহার, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত, সর্বভূতে দয়াশীল সাধুদের অনুষ্ঠেয় ভগবৎ আরাধনা-রূপ পরম ধর্ম নিরূপিত হয়েছে। এতে তাপত্রয়— আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক দুঃখের উন্মূলনকারী পরম মঙ্গলপ্রদ পরমার্থতত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মহামুনি স্বয়ং নারায়ণ কর্তৃক রচিত এই পরম রমণীয় ভাগবতশাস্ত্র থাকতে অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? কেন না, ভাগবত শ্রবণেচ্ছু ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রবণ মাত্রই ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করতে সমর্থ হন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে অন্যান্য শাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ এটি জানতে পারলেই লোকের ভাগবত শোনার ইচ্ছা হবে; তাই ব্যাসদেব এই শ্লোকে ভাগবতের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন।

প্রথম—স্বয়ং নারায়ণ নিজমুখে ব্রহ্মাকে এই ভাগবত উপদেশ করেছিলেন; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে ভাগবতের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

দ্বিতীয়—সাধারণত দেখা যায় যে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠের লক্ষ্য হলো ভোগ্যবস্তু লাভ—পুত্রলাভ, বিত্তলাভ, যশোলাভ এবং পরলোকে স্বর্গবাস। কিন্তু ভাগবত এমনই একটি ধর্মগ্রন্থ, যাতে বাসনা কামনার কোন সম্পর্ক নেই। ভাগবত পাঠে এবং শ্রবণে মানুষ বাসনা পরিহার করে ভগবানে অনুরাগ লাভ করতে সমর্থ হয় এবং ভগবানের আরাধনাই যে পরম মঙ্গলপ্রদ, এটি অনুভব করতে পারে। প্রায় সকল শাস্ত্রোক্ত সাধনই সকাম, মাৎসর্য-যুক্ত এবং ভূতদ্রোহী ব্যক্তিদের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। কোন বিশেষ কামনা নিয়েই বিশেষ বিশেষ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়;

সুতরাং সকাম ব্যক্তিরাই কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। আবার সকাম কর্মের মধ্যে ফল প্রাপ্তির বৈষম্যের জন্য একে অপরের প্রতি হিংসা, মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে থাকে। যেমন পুরাণে আছে যে সগর রাজা শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন দেখে দেবরাজ ইন্দ্র মাৎসর্যবশত সেই যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। আবার দেখা যায় যে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে পশুবধ অবশ্যম্ভাবী—পশুবধ ছাড়া এই সব যজ্ঞ হবে-ই না। সুতরাং এই সব যজ্ঞকারী ভূতদ্রোহীও বটে। কিন্তু ভাগবত ধর্মের অনুশীলনকারীরা মাৎসর্য-গন্ধ লেশহীন এবং সর্বভূতে দয়াপরায়ণ। ভাগবত ধর্মে কামনা-বাসনার লেশ মাত্র নেই; এমন কি তাঁরা মুক্তি কামনা পর্যন্ত ত্যাগ করে একান্তভাবে ভগবৎ-ভজনে নিরত থাকেন। ভগবৎ-ভজনই তাঁদের কাছে পরম ধর্ম। মন থেকে বাসনা কামনা দূর হলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধচিত্তে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভগবানের আরাধনাই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ; মুক্তি অপেক্ষা নিত্যভক্তি বা নিত্যদাস্য শ্রেষ্ঠ ; কেন না, জীব তখনও ভগবানের উপাসনা দ্বারা তাঁর লীলামাধুরী উপভোগ করে থাকেন। বাসনা পরিহার, চিত্তশুদ্ধি, ভগবানে ভালবাসা এবং ভগবৎ-সর্বস্বতা লাভের পক্ষে ভগবানের লীলামাধুরী আস্বাদনই শ্রেষ্ঠ উপায় এবং ভাগবতেই ভগবানের লীলার বিশেষ বর্ণনা রয়েছে।

তৃতীয়—জীব সর্বদাই ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলছে। এই ত্রিতাপ হতে নিস্তার পেয়ে সুখের আশা সুদূরপরাহত। কামনা-বাসনা, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি মন থেকে দূর করে একান্তভাবে ভগবানের আরাধনা না করলে কিছুতেই প্রাণে শান্তি আসতে পারে না। ভাগবতে দেখানো হয়েছে যে, গোবিন্দের চরণসেবা করলেই তাঁর কৃপায় জীবের ত্রিতাপ জ্বালা দূর হয় এবং সে পরম আনন্দ লাভ করে। জীব ভগবানের মায়ায় আত্মবিস্মৃত হয়ে বারবার সংসারে আসে এবং দুঃখ পায়; আবার ভগবানেরই কৃপায় তাঁর চরণাশ্রয় লাভ করে সে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয় এবং ভগবানের সেবাধিকার লাভ করে ধন্য হয়। নানা লীলা-কথা এবং ভক্তচরিত্র আলোচনা করে ভাগবতে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে।

চতুর্থ—অন্যান্য শাস্ত্রের সাধনে ভগবানকে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না। জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির অভ্যাসে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হলে তখন হৃদয়ে ভগবৎ-তত্ত্বের উন্মেষ হয়। কিন্তু কারও যদি শ্রীভগবানের নাম ও লীলাবর্ণন-প্রধান

শ্রীমদ্ভাগবত শুনতে ইচ্ছা হয়, তখনই ভগবান তাঁর হৃদয়ে বাঁধা পড়েন—*সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে*—তখনই তাঁর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। ভাগবত শ্রবণে পরীক্ষিৎ সাত দিনে ভগবান-ময়, ভগবৎ-সর্বস্ব হয়েছিলেন।

এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্য ভাগবত অন্যান্য শাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ। আসল কথা হলো এই যে, ভাগবত শ্রবণে মন থেকে বাসনা দূর হবে, ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি হবে, সংসার-জ্বালা দূর হবে এবং অচিরেই ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হবেন—এই চতুর্বর্গ লাভ হবে। সুতরাং ভাগবত পাঠ অথবা শ্রবণ ভক্তের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
১-১-৩॥

ভগবৎ রসের ভাবনায় রসিক, হে ভক্তবৃন্দ! বেদরূপ কল্পবৃক্ষের যে পরমানন্দ-রসময় ফল, যার নাম শ্রীমদ্ভাগবত, তা শুকমুনির মুখ থেকে নির্গত হয়েছে। এই দিব্যামৃত ফল সাধনকাল থেকে সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত বারবার আস্বাদন কর।

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সকল শাস্ত্র থেকে ভাগবত শ্রেষ্ঠ। এখানে দেখানো হচ্ছে যে, বেদের নির্যাস, সার বস্তু থেকে ভাগবত তৈরি হয়েছে। সুতরাং ভাগবত হচ্ছে সর্ববেদময়, পরমানন্দময় এবং পরম রসময়। শুক পাখি যেমন মধুর ফল ছাড়া আর কিছু খায় না, সেইরকম পরমহংস-চূড়ামণি, আজন্ম সংসার ত্যাগী শুকদেবও পরম মধুর ভগবৎ-রস ছাড়া অন্য কোন রস আস্বাদন করেন না। সুতরাং শুকদেবের মুখ থেকে নির্গত এই রসময় ফল পরম মধুর। সাধারণত দেখা যায়, সাধক যখন সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তাঁর আর কিছুতেই আগ্রহ থাকে না। কিন্তু নারদ প্রভৃতি সিদ্ধ, মুক্ত, আত্মারাম মুনিরা সর্বস্ব ত্যাগ করেও শ্রীভগবানের লীলা-রসে সদাই আগ্রহান্বিত—তাঁরা সর্বদা ভগবানের নাম কীর্তনে রত থাকেন। তাই এখানে বলা হয়েছে, *'পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্'*, হে ভক্তবৃন্দ! সর্বদা এই ভগবৎ-রস পান কর।

এইভাবে প্রথম তিনটি শ্লোকে ভাগবতের মঙ্গলাচরণ এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে ভাগবতের মূল প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হয়েছে।

৩

ভাগবত প্রণয়ন ও শুকদেবকে শিক্ষাদান

পদ্ম পুরাণে রয়েছে যে, দ্বাপরের শেষে নানা অপসিদ্ধান্তের জন্য বেদের সারার্থ আচ্ছন্ন-প্রায় হয়ে গেলে, দেবতারা শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হন। বেদমূর্তি শ্রীনারায়ণ তখন ব্যাসরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে চতুর্বেদ বিভাগ করেন। বেদবিভাগ করে ব্যাসদেব ভাবলেন যে, যারা যাগ-যজ্ঞ, পঠন-পাঠনে রত থাকবে, যারা নিষ্ঠাবান এবং মেধাবী, তারাই বেদের অর্থ অনুধাবন করে, বেদোক্ত কর্ম করে মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু স্ত্রীলোক, শূদ্র ও পতিত অর্থাৎ যারা অল্পবুদ্ধি, যাদের পঠন পাঠন নিয়ে থাকার সময় ও যোগ্যতা নেই, বেদার্থ-জ্ঞান লাভের যারা উপযুক্ত হয়নি, তাদের উপায় কি হবে? তাই তিনি বেদের তত্ত্বসমূহকেই গল্প, উপদেশ, কাহিনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মহাভারত এবং পুরাণ রচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করলেন, যাতে পুরাণোক্ত তত্ত্বের উপলব্ধি করে সাধারণ মানুষও মায়ামোহ অতিক্রম করতে পারে।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চার ভাগে বেদ বিভক্ত হলো এবং মহাভারতাদি ইতিহাস এবং স্কন্দ, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণ পঞ্চম বেদ রূপে পরিগণিত হলো। উদ্দেশ্য এই যে, পুরাণ ও মহাভারতে যে সব গল্প, উপদেশ ও কাহিনী রয়েছে, তার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ বেদের তত্ত্বসমূহই উপলব্ধি করতে পারবে—মায়ামোহ অতিক্রম করে মানুষ মুক্তি লাভ করবে, ভক্তিলাভ করবে। তাছাড়া যারা বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী, তাদের পরতত্ত্ব বোঝাবার জন্য ব্যাসদেব যুক্তিতর্কের অবতারণা করে ব্রহ্মসূত্র রচনা করলেন। বেদ বিভাগ, পুরাণ, মহাভারত রচনা, ব্রহ্মসূত্রের প্রচার—এ সবেরই উদ্দেশ্য এক—বিষয়ে নিবৃত্তি, ভগবানে আসক্তি এবং মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা। কিন্তু এত করেও মানুষের বিষয় ভোগের বাসনা দূর হলো না—ভক্তি, মুক্তির জন্য মানুষ সচেষ্ট হলো না। বেদের কাম্য কর্মের কথায় রয়েছে যে, যাগ যজ্ঞাদি কর্মের ফলে মানুষ স্বর্গে গিয়ে সুখ ভোগ করতে পারবে। বেদের নিবৃত্তি-মূলক কথা ভুলে মানুষ সেই স্বর্গাদি ভোগের দিকেই ঝুঁকে পড়ল। *করিনু পিপ্‌পলীখণ্ড কফ নিবারিতে। দ্বিগুণ বাড়িল কফ দেখিতে দেখিতে।।* (চৈতন্য চরিতামৃত)

তাই ব্যাসদেব একদিন আপন মনে বসে ভাবছিলেন—বেদ বিভাগ, পুরাণ, মহাভারত এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা করেও তো জীবের যথার্থ মঙ্গল হলো না—মানুষের মন নিবৃত্তির দিকে গেল না। এখন উপায় কি হবে—জীবের কি গতি হবে? এই চিন্তায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে ব্যাসদেব যখন মনের দুঃখে সরস্বতী নদীর তীরে বসেছিলেন, সেই সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নারদকে দেখে ব্যাসদেব সসম্ভ্রমে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। দেবর্ষি নারদ ও ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেবের মিলন অতি অদ্ভুত এবং এর ফল হলো সুদূরপ্রসারী। একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং আর একজন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। ভক্ত-চূড়ামণি নারদ আসন গ্রহণ করলে পর জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব, অজ্ঞানীর মতো বিষণ্ণ বদনে নারদের সামনে বসলেন। ব্যাসদেবের মুখে বিষাদের ছায়া দেখে নারদ ভাবলেন—ভগবানের এ কি অদ্ভুত লীলা! যিনি স্বয়ং জ্ঞানময়, তিনিই ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হয়ে অজ্ঞানীর অভিনয় করে দেখাচ্ছেন যে, ভক্তিহীন জ্ঞানে পরাশান্তি লাভ হয় না। নারদ তখন ব্যাস-দেবকে বললেন—তোমাকে আর কুশল প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করব! তোমার আর অ-কুশল কি থাকতে পারে? ধর্মই জীবের একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং তা তুমি ভালভাবেই জান। তোমার রচিত মহাভারত-ই তার প্রমাণ। অতি দুর্বোধ্য বেদের তাৎপর্য যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে, তারই জন্য তুমি মহাভারত রচনা করেছ।

তুমি যখন সর্বার্থপূর্ণ সুবৃহৎ মহাভারত রচনা করেছ, তখন বোঝাই যাচ্ছে যে, ধর্মাদি বিষয়ে তোমার নতুন করে কিছু জানার অথবা অনুষ্ঠান করবার দরকার নেই। তাছাড়া তোমার বেদান্তসূত্র দেখলে বোঝা যায় যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও তোমার অজানা কিছু নেই; কারণ ব্রহ্মতত্ত্বের পূর্ণ অনুভূতি না হলে কেউ এমন যুক্তিতর্ক দিয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে পারে না। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এসব সত্ত্বেও তোমার মুখে আজ বিষাদের ছায়া!

তুমি সনাতন ব্রহ্মের স্বরূপ, বেদান্তসূত্রের বিচার করেছ এবং অনুভব করেছ। তবুও মায়ামুগ্ধ জীবের মতো তোমায় অপ্রসন্ন দেখছি কেন? তত্ত্বজ্ঞানহীন জীবের বিষাদ থাকতে পারে; কিন্তু সর্বতোভাবে পূর্ণ তোমার আবার বিষাদ কি? দেহাভিমানী, অজ্ঞানী জীব কিছুতেই শান্তি পায় না; কিন্তু তোমার মতো জ্ঞানসিন্ধুতে অশান্তির তরঙ্গ কি করে সম্ভব হতে পারে?

নারদের কথা শুনে ব্যাসদেব বললেন—আপনি যা বললেন তা সবই ঠিক; আমি নানা ধর্মের অনুষ্ঠান জগতে প্রচার করেছি, ব্রহ্ম-বিচার করে পরমতত্ত্বের অনুভব করেছি। কিন্তু তবু কেন জানি না, আমার মনে শান্তি হচ্ছে না। আপনি তো সর্বজ্ঞ; আপনিই আমার এই অশান্তির কারণ নির্দেশ করুন। যিনি সর্বকারণেরও কারণ, যাঁর ইচ্ছামাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়, আপনি সেই শ্রীভগবানের উপাসনা করেন। সুতরাং কোন বিষয় আপনার অজানা নেই। তাই আপনাকেই প্রশ্ন করছি—ব্রহ্মনিষ্ঠ ও বেদাধ্যয়নে রত থেকেও কিসের জন্য আমি শান্তি পাচ্ছি না—এইটি বলে আপনি আমায় কৃতার্থ করুন।

ব্যাসদেবের কথা শুনে নারদ বললেন ঃ

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥১-৫-৮॥

নারদ বললেন—হে ব্যাসদেব, তুমি তোমার কোন গ্রন্থেই, বলতে গেলে শ্রীভগবানের বিমল যশোকীর্তন করনি। শ্রীগোবিন্দ-গুণকীর্তন-শূন্য, শুষ্ক জ্ঞানে ভগবানের তৃপ্তি হয় না। সুতরাং তোমার সেই জ্ঞান অপূর্ণ হয়ে রয়েছে।

নারদ বললেন—তোমার কাজের অনুসন্ধান করলেই তুমি নিজের ভুল বুঝতে পারবে। তুমি যা করেছ, সেই সব কাজের একবার আলোচনা করে দেখ দেখি। তুমি বেদ বিভাগ করেছ, ব্রহ্ম-বিচার করেছ—ঠিকই। কিন্তু যাঁর নিঃশ্বাস থেকে বেদের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মেরও যিনি আশ্রয়, সেই পরব্রহ্ম, শ্রীগোবিন্দের গুণ-বর্ণনা করেছ কি? শ্রীভগবৎ-প্রীতির সাথে ব্রহ্মাণ্ডগত জীবের সুখ শান্তির নিত্য সম্বন্ধ। শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন করতে পারলেই চিত্তে শান্তি আসে। তুমি অনেক কাজ করেছ ঠিক, কিন্তু আসলই ভুলে গেছ; অনেক শাস্ত্র রচনা করেছ, তাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সবই আছে—নেই কেবল শ্রীগোবিন্দের গুণ-লীলা কীর্তন। তুমি বলবে—কেন, মহাভারত, বিষ্ণু পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ প্রভৃতিতে শ্রীগোবিন্দের গুণ-বর্ণনা তো রয়েছে। হ্যাঁ, তা রয়েছে বটে; কিন্তু একবার বিবেচনা করে দেখ এই সব গ্রন্থেও গোবিন্দ-গুণ-বর্ণন প্রাধান্য লাভ করেনি। ধর্ম প্রসঙ্গে কিংবা অন্য কথা প্রসঙ্গে গোবিন্দের

বিষয় কিছুটা বলেছ মাত্র; কিন্তু গোবিন্দ-গুণ-কীর্তনই যে পরম পুরুষার্থ, এভাবে তা তো বর্ণনা করনি। জীব অনাদি কাল থেকে ভগবানকে ভুলে মায়ার বশবর্তী হয়ে সংসারে যাতায়াত করছে। জীব মায়ামুক্ত হয়ে ভগবৎ-সেবার আনন্দলাভ করলেই ভগবানের সন্তোষ। ভক্তিশূন্য শুষ্ক জ্ঞানে কিংবা সাধারণ কর্মের দ্বারা সে সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। সুতরাং গোবিন্দ-গুণ-লীলা কীর্তনই জীবের সার-সর্বস্বরূপে গ্রহণ করা উচিত। তুমি বেদজ্ঞ; কিন্তু বেদবেদ্য পরমপুরুষের কথা কিছু বলনি; তাই তো তুমি অপূর্ণ, এই তোমার মহাত্রুটি; আর এরই জন্য তুমি মনে শান্তি পাচ্ছ না।

আরও দেখ—বিচিত্র রস, ভাব, অলংকার-যুক্ত বাক্যও যদি গোবিন্দ-গুণ-বর্ণন-হীন হয়, তবে তা সাধু ব্যক্তিরা পছন্দ করেন না। কিন্তু অপশব্দের দ্বারা রচিত গোবিন্দ-কথাও ভক্তেরা আনন্দের সঙ্গে শ্রবণ, বর্ণন ও কীর্তন করে থাকেন; আর তাতেই জীবের সমস্ত পাপ দূর হয়। তাই বলছি ঃ

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥

১-৫-১৩॥

হে মহাভাগ্যবান ব্যাসদেব, তুমি অমোঘদৃক্ অর্থাৎ অব্যর্থ দৃষ্টি, তোমার জ্ঞান যথার্থ; তুমি শুচিশ্রবা অর্থাৎ প্রথিতযশা। জগতের জীবের ভব-বন্ধন মোচনে যদি যথার্থই তোমার অভিলাষ হয়ে থাকে, তবে *সত্যরতো*—ভগবানে রত এবং *ধৃতব্রত*—দৃঢ়চিত্ত হয়ে, একাগ্রচিত্তে অচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীগোবিন্দের মধুর লীলাবলী বার বার স্মরণ কর। এইভাবে বার বার গোবিন্দলীলার ধ্যান করতে করতে তোমার মধ্যে গোবিন্দলীলার স্ফুরণ হবে; তখন তা বর্ণনা করলে জগতের কল্যাণ হবে। বহির্মুখ লোকেরা নানা কথা বলে, নানা কাজ করে; কিন্তু কিছুতেই চিত্তের স্থিরতা আনতে পারে না। সংসার-সমুদ্র পার হতে হলে, চিত্তের স্থিরতা লাভ করতে হলে শ্রীগোবিন্দ-কথার আশ্রয় ছাড়া তো আর কোন উপায় নেই। ব্যাসদেব, তুমি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তুমি তো জান যতদিন বিষয়-বাসনা থাকবে, ততদিন ভগবানের দিকে মন যাবে না। তাই বলছি, তুমি মধুর গোবিন্দ-লীলা বর্ণনা কর। গোবিন্দ-লীলা শ্রুতি-সুখকর এবং হৃদয়ে আনন্দ এনে দেয়—একাধারে ভোগ ও মোক্ষ—প্রবৃত্তির আবরণে নিবৃত্তি। গোবিন্দ-লীলার আশ্রয় নেওয়া মাত্র জীবের বিষয় বাসনা দূর হয়

এবং গোবিন্দ-সেবার লালসা জন্মে। পুত্রকামী ব্যক্তিকে পুত্রের আশা ছাড়তে বলার চেয়ে ভগবানকে পুত্ররূপে পাবার পথ দেখালেই তো ভাল ফল হবে। শ্রবণ-সুখলিপ্সু ব্যক্তিকে গোবিন্দ-গুণ কথা শোনালেই তার যথার্থ সুখ হবে এবং তার যথার্থ মঙ্গল করা হবে। তাই বলি, তুমি গোবিন্দ-লীলার ধ্যান কর এবং ধ্যান করতে করতে তোমার হৃদয়ে যে গোবিন্দ-লীলার স্ফূর্তি হবে, তাই বর্ণনা কর। সেই গোবিন্দ-লীলা পাঠ করে, সেই লীলা শ্রবণ করে লোকের যথার্থ কল্যাণ হবে, তাদের সর্বার্থ সিদ্ধ হবে।

দেবর্ষি নারদ চলে যাবার পর ব্যাসদেব, নারদের কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করে শ্রীগোবিন্দের ধ্যানে নিরত হলেন। ধ্যান-যোগে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অংশ—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতারের যে সব লীলা দর্শন করলেন, তা-ই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-রূপে জগতে প্রচার করলেন।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥ ১-৭-৬ ॥

ব্যাসদেব সমাধিতে সমস্ত অনর্থদূরকারী অর্থাৎ সংসার-বাসনা ক্ষয়কারী ভক্তিযোগের জ্ঞান লাভ করলেন। তখন বিষয়ান্ধ জীবের কল্যাণের জন্য *সাত্বত সংহিতাম্*—শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করলেন। কি রকম সেই ভাগবত সংহিতা?

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ১-৭-৭ ॥

ভাগবত কোন রকমে একটুমাত্র শ্রবণ করলেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ হয় এবং জীবের শোক, মোহ, ভয় অর্থাৎ ভব-ভয় দূর হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যাসদেবের হৃদয়াকাশে বিভাসিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানেরই অশেষ করুণার দান।

ভাগবত রচনা করে ব্যাসদেব ভাবলেন—এই অমৃত এখন কোন্ পাত্রে রাখা হবে—কার মাধ্যমেই বা এই অমৃত জগতে পরিবেশিত হবে? তখন অনেক ভেবে চিন্তে তিনি ঠিক করলেন যে, একমাত্র তাঁরই পুত্র শুকদেব,

যিনি আজন্ম সংসার-ত্যাগী, ব্রহ্মধ্যানে সদা নিরত, একমাত্র সেই শুকদেবই এই অমৃত ধারণ করতে সক্ষম—জগতে একমাত্র সে-ই যথার্থরূপে ভাগবতের প্রচার করতে পারবে। তাই তিনি শুকদেবকে আনিয়ে উপদেশ করলেন এই শ্রীমদ্ভাগবত।

ব্যাসদেব রোমহর্ষণ নামে সূতকে বিভিন্ন পুরাণ শিখিয়েছিলেন। দেখা যায় পুরাণ-বক্তা সূতেরা ছিলেন জাতিতে শূদ্র; তাঁরা বেদ পাঠ করেননি; কিন্তু তাঁরা ছিলেন যথার্থ ধর্মপরায়ণ এবং শ্রুতিধর—একবার শুনলেই সব মনে রাখতে পারতেন। ইতিহাসে এবং পুরাণে এঁরা ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। পুরাণ-বক্তা সূতেরা বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে গিয়ে পুরাণ-কথা বলতেন। তখনকার দিনে লোকেরা জ্ঞানের আদর করতেন। তাই দেখা যায় যে, মুনিঋষিদের যজ্ঞ-সভাতে পর্যন্ত সূতেরা উপস্থিত হয়েছেন এবং মুনিঋষিরা সাদরে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাঁদের পূজা করে তাঁদের কাছ থেকে পুরাণ-কথা শুনেছেন। সেখানে জাতি বিচারের কোন স্থান ছিল না।

প্রশ্ন করা যেতে পারে—ব্যাসদেব তো রোমহর্ষণকে অন্যান্য সব পুরাণ শিখিয়েছিলেন; ভাগবত-পুরাণও তো তাকেই শেখাতে পারতেন; তা না করে নিজেরই পুত্র শুকদেব, যিনি ধ্যানপরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সমাধি-মগ্ন, তাঁকে সমাধি থেকে নামিয়ে এনে কেন ভাগবত শেখাতে গেলেন? শুকদেবকে ভাগবত শেখাবার বিশেষ কারণ ছিল যা অন্য কাউকে দিয়ে সফল হতো না। *প্রথম* কারণ এই যে, তখনকার দিনে ব্রহ্মোপাসনাই ছিল মোক্ষ লাভের উপায়। বেদের যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল অস্থায়ী জেনে, মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্বস্ব ত্যাগ করে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে গিয়ে বেদান্ত (উপনিষদ্) শ্রবণ করতেন এবং পরে মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাঁরা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করতেন। এইভাবে তখনকার দিনের উচ্চবর্ণের লোকেরা সাধন করতেন। কিন্তু শূদ্রের তো বেদের অধিকার ছিল না; তাই এই সাধনার ধারা তারা জানতেন না। *দ্বিতীয়* কারণ এই যে, ব্যাসদেব বুঝেছিলেন যে, কালের প্রভাবে মানুষের আয়ু ও শক্তি কমে যাবে। তখন তাদের পক্ষে নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা অত্যন্ত কঠিন হবে। তাই তিনি ভাগবতের এই মতবাদ প্রচার করলেন ঃ

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ১-২-২৮/২৯ ॥

বেদ, যজ্ঞ, যোগ, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম এবং গতি—সমস্তই বাসুদেবপর অর্থাৎ বাসুদেবই সকলের লক্ষ্য, গোবিন্দই মোক্ষপ্রদ। সুতরাং সব কিছু ত্যাগ করে তাঁরই ভজনা করা উচিত। সকল কর্মের উদ্দেশ্য গোবিন্দ-ভজন; সকল উপাসনার উপাস্য দেবতা গোবিন্দ। যোগী যোগ সাধনার সিদ্ধিতে পরমাত্মারূপে গোবিন্দকেই লাভ করে; জ্ঞানী জ্ঞান-সাধনার সিদ্ধিতে ব্রহ্মরূপে গোবিন্দকেই প্রাপ্ত হয়; কর্মীরা কর্মফলের দ্বারা গোবিন্দেরই মায়িক বিভূতি স্বর্গাদি লাভ করে। সুতরাং সর্বকর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছেন শ্রীগোবিন্দ। তপস্যা, নির্গুণ উপাসনা, সবই বাসুদেবে সমর্পণ করেছেন। যোগ, ধ্যান, তপস্যা—সবারই লক্ষ্য গোবিন্দ; তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য, একমাত্র প্রাপ্তব্য। বাসুদেবই পরব্রহ্ম—সগুণ এবং নির্গুণ; তাঁকে ভক্তি করলেই নির্গুণ ব্রহ্মেরও জ্ঞানলাভ হবে।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ১-২-৭ ॥

একান্তভাবে ভগবান বাসুদেবকে ভজনা করলে, অচিরেই বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-রূপ জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু মুনিঋষিদের কাছে এই নতুন ভক্তিবাদ প্রচার করা তো সহজ নয়। এই মতবাদ প্রচার করতে গেলেই নানা প্রশ্ন, সংশয়, বিতর্ক, বিরক্তি আসবে এবং তার সমাধানের জন্য আবার ব্যাসদেবকেই তাদের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এই ভাগবতবাদ, ভক্তিবাদ যদি আজন্ম শুদ্ধ, সদামুক্ত, নির্গুণ-নিরাকার-ধ্যাননিষ্ঠ এবং ব্রহ্মর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুকদেবকে দিয়ে প্রচার করানো যায়, তাহলে আর কোন সংশয় থাকবে না ; কারও মনেই আর কোন প্রশ্ন উঠবে না। কারণ সকলেই দেখবে, যিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ, তিনিই ভগবানের তত্ত্ব এবং ভক্তিযোগের কথা বলছেন। আর যদি কোন সংশয় ওঠেও, তবে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বদ্রষ্টা শুকদেবই তার নিরসন করতে পারবেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, তখনকার সময়

ভাগবত-তত্ত্ব বলা এবং ভক্তিবাদের মহিমা প্রতিপাদন করার সামর্থ্য একমাত্র শুকদেব ছাড়া আর কারুর-ই ছিল না।

এ ছাড়াও আর একটি *তৃতীয়* কারণ ছিল। ভাগবতে মধুরভাবে ভগবানের আরাধনার কথা বলা হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাকে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট লীলা বলে প্রচার করা হয়েছে। সামান্যতম স্বার্থ ও ভোগ বাসনার গন্ধ থাকলে, এই মাধুর্যভাবের সাধনা সম্ভব নয়। মনে প্রাণে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে না পারলে রাসলীলার ভাব বোঝা যাবে না।

তাই সম্পূর্ণ নিষ্কাম, সর্ব বাসনা রহিত, নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আধার ছাড়া, ভগবানের কামগন্ধহীন অপ্রাকৃত প্রেমলীলা সাধু সমাজের সামনে কেউ বর্ণনা করতেই পারবেন না। সেই জন্য ব্যাসদেব ভাগবত প্রচারের জন্য শুকদেবকেই মনোনীত করলেন।

মনোনীত তো করলেন; কিন্তু শুকদেবকে পাবেন কোথায়? তিনি তো পূর্ণজ্ঞান নিয়েই জন্মেছেন; আজন্ম সন্ন্যাসী, তাই কোনরকম বিধি-নিষেধ, মায়ামোহের বশীভূত ছিলেন না। জন্মগ্রহণ করেই তিনি তত্ত্বধ্যানে রত হয়ে গভীর বনে চলে গেলেন। এদিকে পিতা ব্যাসদেব, পুত্রস্নেহে কাতর হয়ে 'হে পুত্র, হে পুত্র' বলে ডাকতে ডাকতে শুকদেবের পেছনে ছুটতে লাগলেন। সেই সময়—

দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং,
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি,
স্ত্রীপুংভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্ত দৃষ্টেঃ॥ ১-৪-৫ ॥

শুকদেবের পেছনে ছুটতে ছুটতে কিছু দূরে গিয়ে ব্যাসদেব দেখলেন যে, একটি জলাশয়ে অপ্সরারা স্নান করছেন। যুবাপুরুষের আকৃতি, উলঙ্গ শুকদেব সেখান দিয়ে চলে গেলেও অপ্সরারা তাঁকে দেখে কিছুমাত্র লজ্জিত বা সংকুচিত হলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা ব্যাসদেবকে দেখে লজ্জায় জড়সড় হলেন। এই দেখে ব্যাসদেব তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের ব্যবহার দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। উলঙ্গ যুবাপুরুষ আমার পুত্র শুকদেব এখান দিয়ে চলে গেল; তাতে তোমাদের কোনরকম লজ্জা

অথবা সংকোচ হলো না। আর আমি বৃদ্ধ, কাপড় পরে রয়েছি; তবুও দূর থেকে আমাকে দেখেই তোমরা লজ্জা পেলে; এর কারণ কি? অপ্সরারা বললেন—আগে যে মহাপুরুষ চলে গেলেন, তাঁর তো স্ত্রী পুরুষের জ্ঞান-ই নেই; সমস্ত ভেদ-জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাঁকে দেখে আমাদের সংকোচ হবার তো কোন কারণ নেই। কিন্তু আপনি তো ভেদ-জ্ঞান অতিক্রম করতে পারেন নি। আমাদের দেখে আপনার স্ত্রী বোধ হয়েছে—আর সেজন্যই তো আপনি আমাদের লজ্জা করা অথবা না করার প্রশ্ন করেছেন। অপ্সরাদের কথায় ব্যাসদেবের চমক ভাঙল—ভাবলেন—ঠিকই তো। আমি 'পুত্র' বলে ডেকে ডেকে কার পেছনে চলেছি? যে মায়ামোহের অতীত, তার কি পিতামাতার জ্ঞান থাকতে পারে? তখন ব্যাসদেব পুত্রের অনুগমনে বিরত হয়ে ফিরে এলেন।

এরপর বহু বছর কেটে গেছে। ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করে ভাবলেন যে, সদ্য ভক্তি-মুক্তি-প্রদ এই ভাগবত-ভাব জগতে প্রচার করা দরকার এবং তার একমাত্র সুযোগ্য অধিকারি হচ্ছে শুকদেব। কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কোথায়? সে তো ব্রহ্ম-ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে কোন গভীর অরণ্যে অথবা পর্বত-কন্দরে রয়েছে; আবার ভাবলেন যে, ভগবানের নামের তো এমনই মহিমা, এমন-ই আকর্ষণী শক্তি, যা ব্রহ্মজ্ঞানীর মনকে পর্যন্ত সমাধি থেকে নামিয়ে ভগবল্লীলার স্মরণে নিয়োজিত করে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১-৭-১০॥

প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যাঁরা আত্মারাম, ব্রহ্ম-মনন-শীল, তাঁরা তো সকল প্রকার বিধি নিষেধের অতীত; তাঁদের চাইবার কিংবা পাবার তো কিছু নেই; সুতরাং তাঁদের শাস্ত্রপাঠ করার কিংবা শোনাবার প্রবৃত্তি হয় না। তবুও শুকদেব কেন ভাগবত অধ্যয়ন করলেন এবং অপরকে তা শোনালেন? উত্তরে বলা হয়েছে, *ইত্থম্ভূত গুণো হরিঃ*—ভগবানের এমনই আকর্ষণ যে, নিবৃত্তি-নিষ্ঠ আত্মারামেরা পর্যন্ত ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন, ভগবল্লীলা শ্রবণে লালসা-যুক্ত হয়ে পড়েন।

ব্যাসদেব এক ফন্দি আঁটলেন। তিনি কাঠুরিয়াদের ডেকে বললেন—

তোরা তো কাঠ আনবার জন্য বহু দূরে দূরে পাহাড়ে জঙ্গলে যাস। তোরা একটা কাজ করবি? কাঠুরিয়ারা বললে—নিশ্চয়ই করব। ব্যাসদেব বললেন, আমি একটা গান তোদের শিখিয়ে দেব; তোরা যখন পাহাড়ে জঙ্গলে কাঠ আনতে যাবি, তখন উচ্চৈঃস্বরে এই গানটি গাইবি। এই গান শুনে যদি কেউ এসে তোদের জিজ্ঞাসা করে—এ গান তোমরা কোথায় শিখলে? তখন তোরা আমার নাম করবি না; শুধু বলবি—তুমি তাকে দেখবে? তখন সে যদি রাজি হয়, তবে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবি। ব্যাসদেব তখন ভাগবত থেকে শ্রীকৃষ্ণের কিশোর বয়সের একটি রূপ-বর্ণনা-সূচক শ্লোক গান করে কাঠুরিয়াদের শেখালেন ঃ

> **বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং**
> **বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্ ।**
> **রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-**
> **র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ ॥ ১০-২১-৫ ॥**

অতি সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ যাঁর শিরোভূষণ, নটশ্রেষ্ঠের মতো সুন্দর যাঁর শরীর, যাঁর কানে কর্ণিকা ফুলের কুণ্ডল শোভা পাচ্ছে, যিনি পীতবসন পরিধান করেছেন, গলায় বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করে তিনি অধর সুধায় বংশীধ্বনি করছেন। গোপবালকেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করছেন এবং তিনি নিজ পদাঙ্ক চিহ্নে পরিশোভিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন।

দূর থেকে এই পরম মনোহর গীতধ্বনি শুকদেবের কানে যেতেই ধীরে ধীরে তিনি সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি—জড় সমাধি। ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন—পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনাতে হবে। নারদ দেখলেন, জড়ের ন্যায় শুকদেব বাহ্যশূন্য—বসে আছেন। তখন বীণার সঙ্গে হরির রূপ চারশ্লোকে বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রথম শ্লোক বলতে বলতে শুকদেবের রোমাঞ্চ হল। ক্রমে অশ্রু; অন্তরে, হৃদয় মধ্যে, চিন্ময়রূপ দর্শন করতে লাগলেন। জড় সমাধির পর আবার রূপ দর্শনও হলো।" (কথামৃত—২ ভাগ, ২৩ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)

আমরা আবার প্রচলিত কাঠুরিয়াদের গানেই ফিরে যাই। কৃষ্ণ বিষয়ক গান শুনতেই শুকদেব সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে, মুগ্ধ হয়ে সেই গান শুনতে লাগলেন; ভাবলেন—কারা এই গান গাইছে? কাঠুরিয়াদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—এ গান তোমরা কোথায় শিখলে? কাঠুরিয়ারা বললে—তুমি তার কাছে যাবে? শুকদেব রাজি হতেই কাঠুরিয়ারা তাঁকে ব্যাসদেবের কাছে নিয়ে এলেন। শুকদেব জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, এই গানের বিষয় কে? ব্যাসদেব বললেন—তিনি হলেন পরব্রহ্মেরই এক পরম মাধুর্যমণ্ডিত মূর্তি; ইনি হলেন লীলাময় ব্রহ্ম, ভগবান শব্দ বাচ্য। যিনি জ্ঞানীদের ব্রহ্ম, তিনিই যোগীদের পরমাত্মা এবং তিনিই ভক্তদের ভগবান। আমি এই ভগবানের বিষয় নিয়ে একটি বেদতুল্য পুরাণ রচনা করেছি—তা হলো ভাগবত। তুমি এটা আমার কাছে শিখে নিয়ে, লোকের কল্যাণের জন্য জগতে প্রচার কর।

শুকদেব নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হলেও কৃষ্ণ-গুণ কথায় আকৃষ্ট হয়ে উত্তমশ্লোক শ্রীহরির লীলা বিষয়ক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করলেন। শুকদেব পরে ভক্তাগ্রণী, প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিত এবং উপস্থিত সাধু-মণ্ডলীর কাছে এই ভাগবত কীর্তন করেন। তারপর থেকেই *পারমহংস্যাং সংহিতায়াম্*—পরমহংসদের সংহিতারূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হতে থাকে।

এদিকে কলিকাল আরম্ভ হতে শৌনকাদি বহু ঋষিরা ভাবলেন—কলিকালে মানুষের মন স্বভাবতই ভগবানকে ভুলে বিষয়ে আসক্ত হবে। কিন্তু যারা সদা সর্বদা ভগবৎ আরাধনে থাকতে চায়, কলির প্রভাবে তাদেরও যদি ভগবৎ বিস্মরণ হয় তবে আমাদের উপায় কি হবে? কোথায় গেলে কলির প্রভাব থেকে রেহাই পাব? এইরূপ চিন্তা করে তাঁরা সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মার আরাধনা করতে আরম্ভ করলেন। ব্রহ্মা তাঁদের দর্শন দিয়ে বললেন—তোমরা নৈমিষারণ্যে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা কর। তাহলে কলির প্রভাবে তোমরা লিপ্ত হবে না। নৈমিষারণ্যকে অনিমিষক্ষেত্রও বলা হয়, কারণ শ্রীভগবানের দৃষ্টি কখনও এই স্থান থেকে লুপ্ত হয় না; তিনি সর্বদাই এই স্থানকে রক্ষা করেন। সেই অনিমিষক্ষেত্রে শৌনকাদি ঋষিরা ভগবৎ-প্রাপ্তির আশায় এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোন সদনুষ্ঠানের আয়োজন করলে সেখানে স্বভাবতই সাধু সন্তের সমাগম হবে এবং তখন সৎ প্রসঙ্গে, ভগবানের কথালাপে ভগবৎ-প্রাপ্তি ত্বরান্বিত হবে। এই আশায় ঋষিরা

একদিন প্রাতঃকালীন কর্তব্য শেষ করে বসে আছেন; এমন সময় দেখলেন যে, সূত উগ্রশ্রবা প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে উচ্চৈঃস্বরে হরি গুণগান করতে করতে সেখান দিয়ে যাচ্ছেন। ইনি ভগবানের কথা শোনবার জন্য সর্বদা উৎকর্ণ হয়ে থাকেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল—উগ্রশ্রবা। এর পিতা ছিলেন রোমহর্ষণ। এই রোমহর্ষণকেই ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণ শিখিয়েছিলেন। ইনিও সর্বদা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে রোমাঞ্চিত, পুলকাঙ্গী হয়ে থাকতেন—তাই লোকে তাঁকে রোমহর্ষণ বলত। যাই হোক, রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা গঙ্গাতীরে, পরীক্ষিতের সভায় শুকদেবের মুখেই ভাগবত-কথা শুনেছিলেন। শুকদেবের মুখ থেকে যাঁরা ভাগবত-কথা শুনেছেন, তাঁরাই জানেন সেই ভাগবত-কথার মহিমা; তাই ভাগবতেই রয়েছে যে, শুকদেবের মুখ থেকে ভাগবত-কথা শোনবার জন্য সেই সময় পরীক্ষিতের সভায় বহু ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি উপস্থিত হয়েছিলেন। সে যাই হোক, এই উগ্রশ্রবা শুকদেবের মুখ থেকে ভাগবত-কথা শুনে ভগবৎভাবে বিভোর হয়ে নৈমিষারণ্যের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শৌনকাদি ঋষিরা ভাবে বিভোর উগ্রশ্রবাকে ঐ পথে যেতে দেখে তাঁকে আদর করে ডেকে এনে যথাযোগ্য সম্মান করে বসিয়ে বললেন ঃ

ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ।
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্মশাস্ত্রাণি যান্যুত ॥ ১-১-৬ ॥

হে নিষ্পাপ উগ্রশ্রবা! তুমি পুরাণ, ইতিহাস এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ভাল ভাবেই পড়েছ এবং সে সকলের ব্যাখ্যাও করেছ। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান তোমার অধিগত। তত্ত্বজ্ঞানীদেরও যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই ব্যাসদেবের এবং অন্যান্য সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিরা যা জানেন, তাঁদেরই কৃপায় তুমিও সেই সব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েছ; ব্যাসদেব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদের জ্ঞানের তুলনা হয় না, ঠিক; কিন্তু গুরু এবং ভগবৎ-কৃপায় তুমিও সেই সব জ্ঞানের অধিকারি হয়েছ। তাছাড়া ভক্তের মুখে ভগবৎ-কথা অতি অপরূপ এবং তা শোনা মাত্র হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদয় হয়। তুমি পরম ভক্ত; তাই তোমায় বলছি ঃ

তত্র তত্রাঞ্জসায়ুষ্মন্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ১-১-৯ ॥

সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করে, কলিকালে জীবের পক্ষে একান্ত মঙ্গলপ্রদ এবং আশু-হিতকারী বলে তুমি যা স্থির করেছ, তা আমাদের বল। তুমি বহু শাস্ত্র পড়ে যা জেনেছ, যা বুঝেছ, তার সার আমাদের বল। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত এবং পথের কথা রয়েছে; সে সবের সাধন বহু সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া সাধনার সময় কোথায় যে কোন্ ত্রুটি হবে, তার তো ঠিক নেই। কলিকালে আবার মানুষের আয়ু অত্যন্ত কম। সুতরাং এমন যদি কোন সাধনার কথা তুমি জেনে থাক, যাতে অতি অল্প সময়ে বিনা বাধায় সিদ্ধ হয়ে মানুষ পরম পুরুষার্থ লাভ করতে পারবে, তবে তা আমাদের বল। তুমি তো সর্বশাস্ত্রবিৎ; সমস্ত শাস্ত্রের সাররূপে যা বুঝেছ তা আমাদের কাছে কীর্তন কর; এতে লোকের মঙ্গল হবে, মানুষ পরমার্থ লাভে সমর্থ হবে। ঋষিরা আরও বললেন—হে সূত! ভক্তপালক শ্রীভগবান যে জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা তো তুমি জান।

তন্নঃ শুশ্রূষুমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ১-১-১৩॥

যাঁর মৎস্য-কূর্মাদি অবতারগণ জীবের সংসার মোচন করে পরম সম্পদ দান করেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা শুনতে আমরা উৎসুক হয়েছি। শৌনকাদি ঋষিরা ভালভাবেই জানেন যে, ধর্মের গ্লানি দূর করতে এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন; তার জন্য তিনি যুগে যুগে মৎস্য-কূর্ম- বরাহ-নৃসিংহ-বামন প্রভৃতি বহুবিধরূপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভার দূর করে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে থাকেন। কিন্তু এবার ভগবান স্বয়ং বসুদেব-দেবকীর পুত্র হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন; সুতরাং এর নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে যা ভগবানের অংশাবতারে অর্থাৎ মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন প্রভৃতিরূপে সিদ্ধ হবার নয়। ভগবানের আবির্ভাবের দুইটি কারণ বলা হয়—বহিরঙ্গ কারণ এবং অন্তরঙ্গ কারণ। ভগবানের অসুর বধ, ধর্ম স্থাপন—এসব হলো তাঁর আবির্ভাবের বহিরঙ্গ কারণ। ভগবান, যিনি রসস্বরূপ, তিনি রসাস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ হন—এইটি হলো তাঁর আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ। এই কারণের সম্বন্ধে সকলে জানে না; কেবল মাত্র ভক্তেরা জানেন। শৌনকাদি ঋষিরা ভগবানের বহিরঙ্গ কারণ সম্বন্ধে জানতেন। ভগবানের অন্তরঙ্গ কারণ সম্বন্ধে জানবার জন্যই সূতকে তাঁরা

এই প্রশ্ন করলেন এবং উত্তরে সূতও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণনা আরম্ভ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথায় এসে ঋষিরা সূতকে আবার প্রশ্ন করেছেন ঃ

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ১-১-১৪ ॥

সংসার-প্রবাহে পতিত অর্থাৎ ঘোর বিষয়ী ব্যক্তি যদি বিবশ হয়েও ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তবে অজামিলের মতো সেও তখনই মুক্ত হয়ে যায়। জীব বহু জন্মের কর্মফলে সংসারে যাতায়াত করে; কিন্তু গোবিন্দ নামের এমনই মহিমা যে, অবশ অবস্থাতেও যদি তাঁর নাম একবার উচ্চারিত হয়, তবে তখনই সে মুক্ত হয়ে যায়; আর তা হবেই বা না কেন? স্বয়ং ভয়ই যাঁকে ভয় করে চলে, *যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্*—সেই গোবিন্দ নাম যার মুখে স্পন্দিত হয়, তার কি আর কোন ভয় থাকতে পারে? নরোত্তম দাস বলেছেন— *শুনিয়া গোবিন্দ রব / ভয়েতে পলাবে সব/ সিংহরবে যেন অরিকুল।*

ঋষিরা বলছেন—যাঁর নামেরই এমন শক্তি, তিনি স্বয়ং পৃথিবীতে এসে কি করলেন, তা তুমি আমাদের শোনাও।

যৎ পাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥ ১-১-১৫॥

হে সূত! যাঁর চরণ আশ্রয় করে মুনিগণ সর্ব বাসনা মুক্ত হয়ে শান্ত হয়ে যান, যাঁর চরণ-বিগলিত গঙ্গার স্পর্শে জীব পবিত্র হয়, তাঁরই কথা শুনতে আমরা উৎসুক হয়েছি। ভক্ত এবং গঙ্গা গোবিন্দ-চরণ সম্বন্ধের জন্যই জীবকুল পবিত্র করে থাকেন। ভক্ত কৃপা দৃষ্টির দ্বারা এবং গঙ্গা স্পর্শের দ্বারা অপরকে পবিত্র করেন। গোবিন্দ চরণ-সম্বন্ধ যার যত বেশি পাবনী শক্তিও তার তত বেশি। গঙ্গা শ্রীভগবানের চরণ থেকে উদ্ভূত হয়ে সাগরের দিকে ধেয়ে চলেন; আর ভক্ত সর্বদাই ভগবৎ চরণ হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, এইরূপ ভগবৎ-সম্বন্ধিত ভক্তের লোক-পাবনী শক্তিই বেশি। শৌনকাদি ঋষিরা বলছেন যে, ভক্তেরই যদি এত লোক-পাবনী শক্তি, তবে শ্রীভগবানের লীলা কাহিনীর মহিমা ও পাবনী শক্তির কথা আর কি বলব!

অশেষ জন্মের বাসনা-কামনা দূর করে হৃদয়কে পবিত্র করতে হলে শ্রীভগবল্লীলাকথার মতো আর কিছু নেই। পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিরা সর্বদা তাঁর লীলা কীর্তন করে থাকেন এবং ব্রহ্মা, নারদ প্রভৃতিও তাঁরই গুণগান করেন। অতএব গোবিন্দ-কথা শুনতে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়েছি। হে সূত! গোবিন্দ-কথা শুনিয়ে তুমি আমাদের কৃতার্থ কর।

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥ ১-১-১৮॥

হে ধীমান! হে পরম জ্ঞানী সূত! যিনি স্বেচ্ছায় নানা মূর্তিতে প্রকটিত হয়ে নানা লীলা করে থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পরম মঙ্গলপ্রদ মৎস্যাদি অবতার-কথা আমাদের বল।

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১-১-১৯॥

আমরা শ্রীভগবানের গুণকথা শ্রবণ করে তৃপ্তিলাভ করতে পারছি না; কারণ ভগবৎ-কথায় রসিক জনের প্রতি পদে মধু থেকে মধুরতর রসের আস্বাদন হয়। যোগ, জ্ঞান ইত্যাদিতে সিদ্ধিলাভ করলে মানুষ তৃপ্ত হয়। নির্বিকল্প সমাধি লাভের পর কেউ যম-নিয়ম-আসন ইত্যাদির অভ্যাস করে না। স্বর্গাদি লাভ করলে কেউ আর অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করে না; কারণ ফল লাভের জন্যই এই সব করা হয় এবং ফললাভ হলেই লোকে তৃপ্তি লাভ করে। ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে আর খাবার ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু ভগবানের কথার এমনই মহিমা যে, ভগবৎ-কথা শুনে কেউ-ই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে না—বরং ভগবৎ-কথা শুনবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে যায়। অতএব হে সূত—

কৃতবান্ কিল কর্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ১-১-২০॥

কপট মানুষ অর্থাৎ যিনি বাস্তবিক মানুষ নন, সেই ভগবান কেশব বলরামের সাথে অবতীর্ণ হয়ে যেসব অলৌকিক কর্ম করেছেন, তা আমাদের কাছে তুমি বল। শ্রীভগবানকে তো সকলে চিনতে পারে না; যারা মায়া-মোহে অন্ধ, তারা তাঁর লীলা দেখে তাঁকে সাধারণ মানুষ বলেই ভাবে। তিনি

যে নররূপী পরব্রহ্ম—এটা তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ-ই বুঝতে পারে না! ভক্তিহীনদের কাছে অপ্রকাশ্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা আমাদের কাছে তুমি কীর্তন কর।

শৌনকাদি ঋষিরা সূতকে আরও একটি প্রশ্ন করেছিলেনঃ

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ১-১-২৩॥

ব্রাহ্মণদের প্রতিপালক, ধর্মের রক্ষক, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হলে ধর্ম তখন কার শরণাপন্ন হলেন? কলিকালে তো অধর্মেরই প্রাধান্য হয়ে থাকে; তখন ধর্ম কাকে আশ্রয় করে টিকে থাকবে?

ঋষিরা সূতকে ছয়টি প্রশ্ন করেছেন, যা সর্বকালে সকল লোকের পক্ষেই মঙ্গলপ্রদ। প্রশ্নগুলো হচ্ছেঃ

(১) জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল কিসে হয়? (২) সর্বশাস্ত্রের সার কি? (৩) শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে কেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? (৪) তিনি কি কি লীলা করেছেন? (৫) তিনি কোন্ কোন্ অবতারে কি কি কর্ম করেছেন? এবং (৬) শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হলে ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়েছিল? ঋষিদের প্রশ্ন শুনে সূত পরম আনন্দে ধীরে ধীরে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন। বলতে আরম্ভ করার পর স্বাভাবিকভাবেই আবার আরও সব প্রশ্ন এবং উত্তরের অবতারণা করা হয়েছে; আর এই সব একত্রিত করেই শ্রীমদ্ভাবগত তৈরি হয়েছে।

শৌনকাদি ঋষিদের প্রশ্ন শুনে সূত উগ্রশ্রবা ভাবলেন—ঋষিদের এখন কি উত্তর দেব? সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র বিভিন্ন অধিকারির জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছে। একই উপদেশ সকল প্রকার লোকের পক্ষে সমান মঙ্গলপ্রদ হতে পারে না। *বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্*—(মহাভারত)। বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, যত মুনি তত মত। আবার জীবের পরম পুরুষার্থ লাভের উপায়ও এক রকম নয়। সুতরাং শৌনকাদি ঋষিদের এখন কি বলি? সূত ভাবলেন—ব্যাসদেব তো শ্রীনারায়ণেরই অবতার। তিনি সর্বশাস্ত্রপারদর্শী। তিনি জীবের কল্যাণের জন্য বেদ বিভাগ করলেন, মহাভারত, পুরাণ এবং বেদান্তসূত্র রচনা করলেন। কিন্তু তাতে জীবের যথার্থ কল্যাণ হলো না। পরিশেষে নারদের উপদেশে

তিনি গোবিন্দ-লীলা বর্ণনা করে কৃতকৃত্য হলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ কীর্তনের ফলে যে অনায়াসে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, এ তো কেবল কথার কথা নয়—সকলের সামনে পরীক্ষিত সত্য। যাঁরা আত্মারাম, তাঁরা সর্বদা নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হয়ে থাকেন; বাইরের দিকে তাঁদের কোনই দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু তাঁরাও ভগবানের লীলাকথায় পরম আনন্দ লাভ করেন। আর আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীশুকদেব এই গোবিন্দলীলা-কথা শুনিয়ে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে সাত দিনের মধ্যে পরম পুরুষার্থ প্রদান করেছিলেন। অতএব অনায়াসে পরম পুরুষার্থ প্রদানের শক্তি হরিকথার থেকে আর কোন কিছুতেই বেশি নেই। সুতরাং শৌনকাদি ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে আমি এখন গোবিন্দ-গুণ-লীলা বর্ণন-প্রধান শ্রীমদ্ভাগবত-কথা বলব। আর এই ভাগবত-কথা তো আমি গুরু শ্রীশুকদেবের মুখ থেকেই পরীক্ষিতের সভায় শুনে এসেছি। এই ভেবে সূত শৌনকাদি ঋষিদের বললেন ঃ

তত্র কীর্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ।
অহঞ্চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ।
সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ॥ ১-৩-৪৪॥

সূত বললেন—হে ঋষিগণ! মহাতেজস্বী শ্রীশুকদেব যখন গঙ্গার তীরে শ্রীমদ্ভাগবত কথা কীর্তন করেন, তখন আমি এক পাশে বসে তাঁরই কৃপায় কিছু শুনেছি। এখন আমার শ্রবণ ও ধারণা অনুসারে আপনাদের কাছে তা কীর্তন করব। এতেই আপনাদের সমস্ত সংশয়ের নিরসন হবে। তবে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম বটে; কিন্তু শুক-মুখ নির্গত শ্রীকৃষ্ণ-লীলারস কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছি জানি না। যার যেমন আধার সে তেমনই তো গ্রহণ করে থাকে; আমিও আমার মতোই গ্রহণ করেছি। তার মধ্যে আবার আমার যতটুকু বলবার শক্তি আছে ততটুকুই মাত্র বলতে পারব। আপনারা অবহিত চিত্তে শ্রীভাগবত-কথা শুনুন।

এইভাবে শুক বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবত সূত উগ্রশ্রবা কর্তৃক শৌনকাদি ঋষিদের কাছে বর্ণিত হয়েছিল।

৪
পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও শুকদেবের ভাগবত কথন

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মাস্টারমশায় যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে গিয়ে দেখেন যে, এক ঘর লোক নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর কথামৃত পান করছেন। ঠাকুর তক্তপোশে বসে সহাস্য বদনে হরিকথা বলছেন। ভক্তেরা মেঝেতে বসে আছেন। মাস্টারমশায় অবাক হয়ে দেখছেন। তাঁর মনে হলো যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা বলছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হয়েছে। ঠাকুর বলছিলেন, "যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয় তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হলো।" মাস্টারমশায় অবাক হয়ে দেখতে দেখতে ভাবছিলেন, "আহা কি সুন্দর স্থান। কি সুন্দর মানুষ। কি সুন্দর কথা!" মাস্টারমশায় এইভাবে বর্তমান যুগের যে ভগবৎ কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত —তা আরম্ভ করেছেন। মাস্টারমশায় সেদিন দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে এসেছিলেন দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে; আর শুকদেব-প্রতিম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি কথা শুনে ঐ যে তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তারই ফলশ্রুতিরূপে আমরা ধর্মজগতের অমূল্য গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত লাভ করেছি।

অনেকটা এই রকম পরিস্থিতিতে বহু শতাব্দী পূর্বে ভাগবত-কথা বলা হয়েছিল। সেদিনও গঙ্গাতীরে বহু সাধু সন্ন্যাসী পরিবৃত হয়ে শুকদেব ভাগবত-কথা বলছিলেন মহারাজ পরীক্ষিৎকে যিনি জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে, সর্বস্ব ত্যাগ করে, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রায়োপবেশন করছিলেন। এরই ফলশ্রুতিরূপে জগৎ লাভ করেছে শ্রীমদ্ভাগবত। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ই যুগোপযোগী করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে বলা হয়েছে। দুয়েরই সার কথা হলো—ভগবান লাভ, ঈশ্বরে তন্ময়তা প্রাপ্তি।

সেই সুদূর অতীতে যে পরিস্থিতিতে ভাগবত-কথা বলা হয়েছিল, তারই কিছুটা এখন আলোচনা করা যাক।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডব বংশ সমূলে ধ্বংস করবার জন্য অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের একমাত্র সন্তান পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। পরীক্ষিত তখন মাতৃগর্ভে। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তবংশকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সেই দুর্নিরোধ্য ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যর্থ করেছিলেন। সেই সময় মাতৃগর্ভেই পরীক্ষিতের কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল। তাই জন্মাবার পর সেই নবজাত শিশু কোন লোক দেখলেই তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পরীক্ষা করত আর মনে মনে ভাবত— 'এই কি সেই, যাকে মাতৃগর্ভে দেখেছিলাম'?

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ ॥ ১-১২-৩০॥

মানুষ দেখলেই অভিমন্যু-পুত্র 'এই কি সেই মাতৃগর্ভে-দৃষ্ট পুরুষ'— মনে করে পরীক্ষা করতেন বলে তিনি পরীক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পরীক্ষিতের জন্মের পর ব্রাহ্মণেরা বলেছিলেন যে, কালের প্রভাবে কুরুবংশ ধ্বংসোন্মুখ হলে তার রক্ষার জন্য ভগবান কৃপা করে এই বালককে দান করেছেন। অতএব

তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি।
ন সন্দেহো মহাভাগ মহাভাগবতো মহান্ ॥ ১-১২-১৭॥

ভগবানের অনুগ্রহের দান বলে এই বালকের নাম হবে বিষ্ণুরাত। আর ভগবানের দান তো কখনও খারাপ জিনিস হয় না—তিনি সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসই দান করে থাকেন। সুতরাং এই বালক যে অশেষ গুণসম্পন্ন এবং পরম ভাগবত মহাভক্ত হবে, এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সেই পরীক্ষিৎ সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বড় হবার পর তাঁরই উপর রাজ্যভার অর্পণ করে পাণ্ডবেরা যথাসময়ে মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেলেন। পরীক্ষিৎ রাজা হয়ে ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করতে লাগলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

ধৃত্যা বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদ্গ্রহঃ।
আহর্তৈষোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্যুপাসকঃ॥ ১-১২-২৫॥

পরীক্ষিৎ ছিলেন বলির মতো ধৈর্যশালী, প্রহ্লাদের মতো তাঁর ছিল কৃষ্ণ-ভক্তি। তিনি বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন এবং বৃদ্ধদের সম্মান করতেন।

তিনি ছিলেন জন্মেজয় প্রভৃতি রাজর্ষিদের জনক এবং ধর্ম-মর্যাদা লঙ্ঘনকারীদের শাসনকর্তা। তিনি পৃথিবী এবং ধর্মের রক্ষার জন্য কলিকে নিগ্রহ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বে কলির প্রভাবও খর্ব হয়েছিল।

এমন যে সর্বগুণান্বিত, সকলের মনোরঞ্জনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ, তিনিও জীবনে একটি ভুল করে বসলেন। আর সেই ভুলই হলো তাঁর জীবনের কাল। আবার এই ভুলের জন্যই জগৎ এমন এক মহারত্ন লাভ করল যা, অনন্তকাল ধরে মানুষকে ভগবান-লাভে অনুপ্রাণিত করবে। এই হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য-লীলা—অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে পরম মঙ্গলের অধিষ্ঠান।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ বনে মৃগয়া করতে গিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে শমীক মুনির আশ্রমে গিয়ে জল খেতে চাইলেন। শমীক মুনি তখন ধ্যানস্থ হয়েছিলেন, তাই মহারাজের আগমন বুঝতে পারেন নি। মহারাজ ভাবলেন যে, মুনি তাকে অবজ্ঞা করছে। সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর মহারাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একটি মৃত সর্প ধ্যানরত মুনির গলায় জড়িয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। শমীক মুনির পুত্র ক্রীড়ারত শৃঙ্গী বন্ধুদের কাছে পিতার এই অপমানের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে তখনই রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে, সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে মহারাজের প্রাণান্ত হবে। ধ্যানভঙ্গের পর শমীক মুনি যখন শুনলেন যে, তারই পুত্র শৃঙ্গী মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছে, তখন তিনি 'হায় হায়' করতে লাগলেন। বললেন—করেছ কি ? মহারাজ প্রজাপালক, ধর্মের রক্ষক, ভক্তচূড়ামণি এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়। মহারাজকে অভিশাপ দিয়ে তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছ। যাই হোক, ব্রহ্মশাপ তো আর ফেরানো যায় না; কি আর করা! মহারাজকে অভিশাপের সংবাদ পাঠানো হলো।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনির গলায় মৃত সর্প জড়িয়ে দিয়ে যখন রাজধানীতে ফিরছিলেন, তখন এই অন্যায় কাজের জন্য তাঁর খুব অনু-শোচনা হতে লাগল। ভাবলেন—আমি অতি নরাধম। প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সাথে আমি মূর্খের মতো অত্যন্ত পাপাচরণ করেছি; আমার পাপের যথোপযুক্ত শাস্তি হওয়াই উচিত; তাহলে আর কখনও আমি এমন অন্যায় কাজ করব না। মহারাজ এইভাবে চিন্তা করতে করতে রাজধানীতে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরে শমীক মুনির প্রেরিত শিষ্যের কাছ

থেকে শুনলেন যে, শমীক মুনির পুত্র মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছেন, সপ্তম দিবসে তক্ষকের দংশনে মহারাজের দেহান্ত হবে। অভিশাপের কথা শুনেই পরীক্ষিৎ ভাবলেন—ভালই হলো; এইভাবে শিগ্‌গিরই আমি বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তি লাভ করব।

এই যে একটা মস্ত বড় বিপর্যয় পরীক্ষিতের জীবনে ঘটে গেল, এ রকম হওয়ার তো কোন কারণ ছিল না, কোন সম্ভাবনাও ছিল না। পরীক্ষিৎ একে পরম ভক্ত, তার উপর সর্বগুণান্বিত এবং বৃদ্ধদের সম্মানকারী। মাতৃগর্ভেই পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হয়েছিল। সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ-বাসনা তাঁর কোন দিনই ছিল না; কর্তব্যবুদ্ধিতে পিতামহ পাণ্ডবদের প্রদত্ত রাজ্য গ্রহণ করে যথানিয়মে প্রজাপালন-ব্রত সম্পন্ন করছিলেন। সেই তিনি ব্রাহ্মণের অপমান করবেন—এ তো ভাবাই যায় না। সুতরাং বুঝতে হবে যে, ভগবানই তাঁর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরম ভক্ত পরীক্ষিৎকে দিয়ে এই অন্যায়ের অভিনয় করালেন এবং তার ফলস্বরূপ জগৎ এক অমূল্য সম্পদ লাভ করে ধন্য হলো। কোথা থেকে যেন পরীক্ষিতের কাল-পিপাসা এসে উপস্থিত হলো; তিনি ক্রোধে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঋষির মর্যাদা লঙ্ঘন করে বসলেন। বোঝাই যাচ্ছে যে, এই পিপাসা সাধারণ নয় এবং ঋষির মর্যাদা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও পরীক্ষিতের নিজের নয়; কারণ ব্রাহ্মণের গলায় মৃত সর্প দেবার পরই তাঁর পিপাসা আর ছিল না; বরং তিনি কৃত-কর্মের জন্য অনুতাপ করছিলেন আর ভাবছিলেন যে, ঐ পাপ কর্মের জন্য তাঁর শাস্তি হওয়াই উচিত। তাই অভিশাপের সংবাদ শুনে পরীক্ষিৎ ভাবলেন—বিষয়ে আসক্ত হয়ে আমি গোবিন্দ-চরণ ভুলে ছিলাম বলে ঋষি-বালক শাপানলে আমার বিষয়াসক্তি দগ্ধ করলেন; ঋষি-বালক আমার পরম উপকারই করেছেন।

পরীক্ষিৎ ভাবলেন বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা পতিতপাবনী গঙ্গা ছাড়া আমার মতো পাপীকে আর কে আশ্রয় দেবে? তাই তিনি গঙ্গার তীরে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আরও ভাবলেন যে, কাল-পিপাসার জন্যই তিনি ব্রাহ্মণের অপমান করেছেন। সুতরাং যে সাত দিন তিনি আর বেঁচে থাকবেন সেই কয়দিন তিনি আর জলগ্রহণ করবেন না। তখনই তিনি তাঁর পুত্র জন্মেজয়ের উপর রাজ্য ভার দিয়ে গঙ্গার তীরে গিয়ে, প্রায়োপবেশন করে গোবিন্দ-চরণ চিন্তা করতে লাগলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ হঠাৎ রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাওয়াতে স্বভাবতই তখন দেশে একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। যারাই শুনলেন, তারাই মহারাজকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন। চারিদিক থেকে মুনি ঋষিরা এসে পরীক্ষিতের কাছে উপস্থিত হলেন। সকলেই ভাবছেন যে, একটা অভূতপূর্ব বিরাট কিছু ঘটবে।

তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ ॥
১-১৯-৮॥

অসৎ লোকের জন্য তীর্থস্থানে যে মলিনতা জন্মে, তীর্থের সেই মলিনতা দূর করবার জন্য যেসব মহাপুরুষেরা তীর্থস্থানে গিয়ে তীর্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে থাকেন, সেই মহানুভব মুনি ঋষিরা সশিষ্য পরীক্ষিতের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। চারিদিক থেকে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি দলে দলে সেই গঙ্গার তীরে এসে উপস্থিত হলেন। ভাগবতে রয়েছে যে, সেই সময় অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, নারদ প্রভৃতিও এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। চারদিকে এত সাধু মহাত্মাদের দেখে পরীক্ষিৎ ভাবলেন, মুনি-বালকের কৃপায় আজ আমার এই সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। যখন রাজা ছিলাম, তখন তো মুনি ঋষিদের পদধূলি পাবার সৌভাগ্যই হতো না; আর আজ কত শত মুনি ঋষিরা অযাচিতভাবে এসে আমাকে পবিত্র করছেন, এই স্থানকে পবিত্র করছেন। আজ আমার মতো ভাগ্যবান জগতে আর কে আছে? মহানুভব লোকের স্বভাবই হলো এই যে, তাঁরা কখনও অপরের দোষ দেখেন না। মুনি-বালকের শাপে সাত দিনেই তাঁর মৃত্যু হবে জেনেও, তার প্রতি পরীক্ষিতের কোন রাগ নেই; বরং বলছেন, মুনি-বালকের কৃপাতেই আজ আমার এই সৌভাগ্য! পরীক্ষিৎ তখন মুনি ঋষিদের প্রণাম করে তাঁদের বসতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা সকলে আসন গ্রহণ করলে পরীক্ষিৎ তাঁদের বললেন ঃ

তস্যৈব মেঽঘস্য পরাবরেশো ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণম্।
নির্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে ॥
১-১৯-১৪॥

মহানুভব পাণ্ডব বংশে জন্মগ্রহণ করেও, ঋষির মর্যাদা লঙ্ঘনকারী,

বিষয়াসক্ত এই নরাধমের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মশাপ-রূপে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। তাঁর চরণে অনুরাগ হলে মানুষ জন্মমৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি লাভ করে। সুতরাং ব্রহ্মশাপ আমার পক্ষে পরম কল্যাণকর হয়েছে; কারণ ব্রহ্মশাপ না হলে আমার সংসারে বৈরাগ্য আসত না এবং আপনাদের শ্রীচরণ দর্শনও পেতাম না। এখন আর আমার কোন ভাবনা নেই। আপনারা আমাকে আপনাদের চরণাশ্রিত দাস বলে গ্রহণ করুন এবং সকলে ভুবনমঙ্গল শ্রীগোবিন্দ-গুণ-কীর্তন করুন; তক্ষক এসে স্বচ্ছন্দে আমাকে দংশন করে যাক।

পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।
মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং মৈত্র্যস্তু সর্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ॥
১-১৯-১৬॥

আপনাদের চরণে বারবার প্রণাম করে এই প্রার্থনা জানাই যে, যেখানেই আমার পুনরায় জন্ম হোক না কেন, আমার যেন গোবিন্দে রতি মতি থাকে, তাঁর ভক্তদের উপর প্রীতি হয় এবং সর্বজীবে যেন আমার মিত্রভাব হয়। কি সুন্দর কথা! গোবিন্দে রতি, ভক্তে প্রীতি আর সর্বজীবে মিত্রভাব।

পরীক্ষিতের কথা শুনে সেই সব লোক-পাবন ঋষিরা বললেন—হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তির আশায় অসংখ্য নৃপতি-বন্দিত রাজসিংহাসন অনায়াসে ত্যাগ করে মহাপ্রস্থান করেছিলেন, তুমি সেই পাণ্ডবদের বংশধর; সুতরাং তোমার পক্ষে কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশায় রাজ্য ত্যাগ করে প্রায়োপবেশন করা কিছু মাত্র আশ্চর্য নয়; এরকম ব্যবহার তোমার পক্ষেই সম্ভব। সমাগত ঋষিরা ভাবলেন যে, পরীক্ষিৎ হচ্ছেন কৃষ্ণ-ভক্ত-চূড়ামণি; ইনি কৃষ্ণের কৃপায় জন্মের সময় ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করেছিলেন; স্বীয় রাজত্বকালে কলির প্রভাব খর্ব করেছিলেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুকালে ইনি কি ব্রহ্মশাপ পুনরায় ব্যর্থ করবেন না? দেখাই যাক কি হয়। শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁর একান্ত-শরণ ভক্তকে ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য ভক্তের কাছে আসবেন না? আজীবন সাধনা করেও যে শ্রীচরণ দর্শন করা ভাগ্যে ঘটেনি, এখন মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে থেকে আমরাও অনায়াসে তাঁর দর্শন হয়ত পেতে পারব। এই তো ভক্ত-সঙ্গের মহিমা। এইভাবে চিন্তা করে উপস্থিত

মুনিঋষিরা ঠিক করলেন যে, পরীক্ষিৎ যতদিন প্রায়োপবেশন করে থাকবেন, তাঁরাও ততদিন পরীক্ষিতের সাথে গঙ্গাতীরে অবস্থান করবেন।

যাই হোক, ঋষিদের সহানুভূতিপূর্ণ কথা শুনে পরীক্ষিৎ তাঁদের বললেন—আপনারা কোন কিছু কামনা না করেই জীবের কল্যাণ করে থাকেন; এই তো আপনাদের স্বভাব; আর তারই জন্য আপনারা আমাকে কৃপা করতে আমার এই শেষ সময়ে এখানে এসেছেন। সুতরাং আপনারা আমায় উপদেশ করুন—আমার এখন কর্তব্য কি? আর সাত দিন মাত্র আমার আয়ু রয়েছে; এখনও যদি আপনারা আমার কর্তব্য ঠিক করে না দেন, তবে আমার কি গতি হবে? তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি ঃ

ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্।
সর্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ॥
১-১৯-২৪॥

পরীক্ষিৎ ঋষিদের আরও বললেন—সেইজন্য বিশ্বস্তভাবে আমার ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি; আপনারা কৃপা করে বিশদভাবে বিচার করে বলুন—ম্রিয়মাণ, আসন্ন-মৃত্যু জীবের কর্তব্য কি ?

মহারাজ পরীক্ষিতের সময়োচিত যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন শুনে সমাগত ঋষিরা ভাবলেন যে, জপ, ধ্যান, যজ্ঞ, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি বহু সাধনই তো রয়েছে এবং সেই সব সাধনার দ্বারা জীব যে কৃতকৃতার্থ হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এক সপ্তাহে সিদ্ধিলাভ তো কোন সাধনেই হয় না। সুতরাং তাঁরা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন যে, এই পরিস্থিতিতে তাঁরা আসন্ন-মৃত্যু পরীক্ষিৎকে কি বলবেন; পরীক্ষিৎ যে বহু আশা করে তাঁদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ঋষিরাও মহাবিপদে পড়লেন। কারণ পরীক্ষিৎকে যে যথাযথ উত্তর দিতে হবে এবং তা এখনই দিতে হবে—দেরি করলে চলবে না; সময় যে বয়ে যাচ্ছে।

এমন সময়ে পরীক্ষিতের ভাগ্যাকাশে যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো। সেই সময় আজন্ম সংসার-মুক্ত পরমহংসচূড়ামণি ব্যাসপুত্র শুকদেব নিজের ইচ্ছায় ঘুরতে ঘুরতে সেই গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। ভাগবতে অতি সুন্দরভাবে শুকদেবের আবির্ভাবের বর্ণনা রয়েছে ঃ

তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ॥
১-১৯-২৫॥

মুনি ঋষিরা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলেন যে, পরীক্ষিৎকে তাঁরা কি জবাব দেবেন, ঠিক সেই সময় দেখা গেল যে, নিজের ইচ্ছায় ভ্রমণ করতে করতে কোন কারণ ছাড়াই ব্যাসপুত্র শুকদেব, গৃহী অথবা সন্ন্যাসীর— উভয় প্রকার চিহ্ন বিরহিত অবস্থায়, স্বাত্মানন্দে বিভোর হয়ে, উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কতকগুলো বালক শুকদেবকে পাগল মনে করে তার দিকে ধুলো ছুঁড়ে হাততালি দিতে দিতে তাঁর পেছনে পেছনে আসছিল। শুকদেবের শরীর কিরকম ছিল? উত্তরে ভাগবতকার বলছেন ঃ

তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ-করোরুবাহ্বংস-সকপোলগাত্রম্।
চার্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ-সুভ্রাননং কম্বুসুজাতকণ্ঠম্ ॥
১-১৯-২৬ ॥

শুকদেবের আকৃতি ছিল ষোল বছরের যুবকের মতো। হাত, পা এবং শরীরের অন্যান্য অবয়ব ছিল অতি সুন্দর। আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, উন্নত নাসিকা, সুললিত কর্ণদ্বয়, মনোহর ভ্রূযুগল-শোভিত মুখ মণ্ডল এবং কণ্ঠদেশ শঙ্খের মতো ত্রিরেখান্বিত।

নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষ-সমাবর্তনাভিং বলিবল্গূদরঞ্চ।
দিগম্বরং বক্রবিকীর্ণকেশং প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভম্ ॥
১-১৯-২৭ ॥

শুকদেবের কণ্ঠের নিম্নভাগ ছিল স্থূল; বিশাল বক্ষ, গভীর নাভিদেশ, দিগম্বর; চুল সব এলোমেলো, আজানুলম্বিত বাহু এবং শ্রীকৃষ্ণের মতো সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট শরীর।

শ্যামং সদাপীব্যবয়োঽঙ্গলক্ষ্ম্যা স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন।
প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্যস্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গূঢ়বর্চসম্॥
১-১৯-২৮॥

শুকদেবের গায়ের রং ছিল শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্যামবর্ণ; নবযৌবনের মতো অঙ্গকান্তিতে যুবতীদের মনোমোহনকারী। ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মতো গুপ্ততেজসম্পন্ন শুকদেবকে অনন্যসাধারণ লক্ষণের দ্বারা চিনতে পেরে উপস্থিত মুনিঋষিরা সকলে নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁর অভ্যর্থনা করলেন।

স বিষ্ণুরাতোঽতিথয়ে আগতায় তস্মৈ সপর্যাং শিরসাজহার।
ততো নিবৃত্তা হ্যবুধাঃ স্ত্রিয়োঽর্ভকা মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ॥
১-১৯-২৯॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন নিজে মাথায় করে পূজার জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে নবাগত অতিথির পূজা করলেন। শুকদেবের এই মহাপ্রভাব দেখে, যেসব বালকেরা তাঁকে পাগল ভেবে এবং মেয়েরা কন্দর্প মনে করে তাঁর পেছনে পেছনে আসছিল, তারা সব ফিরে গেল। শুকদেব তখন পরীক্ষিতের দেওয়া আসনে উপবেশন করলেন।

স সংবৃতস্তত্র মহান্ মহীয়সাং ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিদেবর্ষিসঙ্ঘৈঃ।
ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দুর্গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ॥
১-১৯-৩০॥

মহৎ অপেক্ষাও সুমহৎ সেই ভগবান শুকদেব, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষিবৃন্দে পরিবৃত হয়ে, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো শোভা পেতে লাগলেন; এমনই ছিল তাঁর প্রভাব।

শুকদেবকে দেখে সাধারণ মানুষ তাঁকে উন্মত্ত, জড়, মূক বলে ভাবত। তিনি যে সর্বজ্ঞ-শিরোমণি তা কেউ বুঝত না। তাঁর উলঙ্গ এবং ধূলিধূসরিত মূর্তি দেখে লোকে তাঁকে পাগল মনে করত। কিন্তু কোন্ বিশেষ ভাবে তিনি পাগল, তা বোঝা সাধারণের পক্ষে অসাধ্য ছিল। তার উপর তিনি ছিলেন মৌন—কারও সাথেই কোন কথা বলতেন না। ভাগবতেই রয়েছে যে, শুকদেব গৃহস্থদের গৃহ পবিত্র করবার জন্য গোদোহন-কাল মাত্র সেখানে অপেক্ষা করে অন্যত্র চলে যেতেন—কোন গৃহে তিনি থাকতেন না। সেই শুকদেব বহুদেশ অতিক্রম করে আজ পরীক্ষিতের সামনে, মুনিঋষিদের সভায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। মুনিঋষিরা তাঁর অসাধারণ লক্ষণসমূহ দেখে, তাঁর মহত্ত্ব উপলব্ধি করে, পরম শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

প্রশান্তমাসীনমকুণ্ঠমেধসং মুনিং নৃপো ভাগবতোঽভ্যুপেত্য।
প্রণম্য মূর্দ্ধাবহিতঃ কৃতাঞ্জলির্নত্বা গিরা সূনৃতয়ান্বপৃচ্ছৎ॥
১-১৯-৩১॥

ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ তখন অচঞ্চল, শান্তভাবে উপবিষ্ট সর্বজ্ঞ শিরোমণি শুকদেবের কাছে এসে, চরণে প্রণাম করে, জোড় হাতে জিজ্ঞাসা করলেন। চারিদিকে মুনিঋষিরা রয়েছেন আর সামনে দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে; তার মাঝে শুকদেব অচঞ্চলভাবে স্বাত্মানন্দে বিভোর হয়ে বসে আছেন। এই অবস্থায় পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বললেন—আপনি দীন-বৎসল; তাই আমার প্রতি কৃপা করে অতিথিরূপে আমার কাছে এসেছেন। যাঁর কথা স্মরণ মাত্র গৃহস্থের কথা দূরে থাক, তাদের গৃহ পর্যন্ত তীর্থস্থানের মতো পবিত্রতা লাভ করে, আমি আজ তাঁর দর্শন এবং চরণস্পর্শ লাভ করেছি; সুতরাং ক্ষত্রিয়াধম হলেও আমি আজ তীর্থতুল্য পবিত্র হয়েছি। পাণ্ডবদের পরম বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডব বংশে জন্মেছি বলেই আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তারই জন্য, পাণ্ডব বংশে জাত বলেই এবারও শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিস্তার করবার জন্য আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তা না হলে যাঁর দর্শন কেউ কোন দিন পায় না, সেই আত্মারাম শিরোমণি নিজে এসে তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে ম্রিয়মাণ ব্যক্তিকে কি কৃতার্থ করেন? তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি ঃ

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎকার্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বথা ॥ ১-১৯-৩৭॥

যোগীদেরও পরম গুরু, সর্বসিদ্ধিদাতা আপনার যখন দর্শন লাভ করেছি, তখন—আসন্ন-মৃত্যু জীবের কর্তব্য কি তা জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারছি না। পরীক্ষিৎ আরও বললেন ঃ

যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎকর্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্যয়ম্ ॥ ১-১৯-৩৮॥

হে প্রভু ! জীবগণের যা শ্রবণ করা উচিত, যা জপ করা উচিত, যেসব নিয়ম পালন করা উচিত, যা স্মরণ করা উচিত, যাঁকে ভজনা করা উচিত এবং যাতে পরমার্থপ্রাপ্তির বাধা না হয়, তা কৃপা করে আমায় উপদেশ

করুন। আরও বললেন, আপনাকে তো গৃহস্থের গৃহে অতি অল্প সময়ও থাকতে দেখা যায় না; সুতরাং আপনার দর্শন বহু ভাগ্যের ফলে হয়। পরীক্ষিতের প্রশ্ন—এই আসন্ন-মৃত্যু সময়ে আমার কি কর্তব্য? আমি কি শ্রবণ করব, কোন্ নিয়ম পালন করব, কি মন্ত্র জপ করব, ভগবানের অনন্ত মূর্তির মধ্যে কোন্ মূর্তির চরণে আত্মসমর্পণ করব এবং কোন্ কাজ আমার পক্ষে অনিষ্টকর—তাও কৃপা করে বলুন, যাতে সাত দিনের মধ্যেই আমি পূর্ণতা লাভ করতে পারি, কৃতকৃত্য হতে পারি।

মহারাজ পরীক্ষিতের মধুর কথা এবং অতি সমীচীন প্রশ্ন শুনে সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন শুকদেব অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন—বাঃ, বড় সুন্দর প্রশ্ন করেছ তো!

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥ ২-১-১॥

শুকদেব বললেন—হে রাজন্! জীবের কি শ্রবণ করা উচিত—এই সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন করলে, তা অতি শ্রেষ্ঠ এবং এখানে যেসব আত্মবিদেরা এসেছেন, তাঁরা সকলেই এই প্রশ্নের অনুমোদন করবেন। এই প্রশ্নের দ্বারা জগতের পরম কল্যাণ হবে।

শুকদেব বলছেন যে, তোমার এই প্রশ্নে কারও কোন আপত্তি থাকতে পারে না। বদ্ধজীব থেকে মুক্ত আত্মারামদের পর্যন্ত এই-ই তো চিন্তার বিষয়; কারণ মৃত্যু তো সকলের পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে; সুতরাং জীব মাত্রই আসন্ন মৃত্যুপরায়ণ। তাই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করাই তো সকলের সর্বতোভাবে কর্তব্য।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলছেন—পাণ্ডবদের রক্ষাকর্তা শ্রীকৃষ্ণই আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন; নইলে আমার এমন কি পুণ্য আছে যাতে এই সময় আপনার দর্শন পাব? তারপরে প্রশ্ন করেছেন—আসন্ন-মৃত্যু জীবের কর্তব্য কি এবং তাদের কোন্ কথা শ্রবণ কীর্তন করা উচিত এবং কি ত্যাগ করা উচিত। প্রশ্ন থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, পরীক্ষিৎ জগৎ-সম্বন্ধ ত্যাগ করে জগৎ-পতির সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে শুকদেবকে তার উপায় জিজ্ঞাসা করছেন। পরীক্ষিতের মনের ভাব বুঝে শুকদেব বললেন—*বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ*—তোমার এই প্রশ্ন শ্রেষ্ঠতর। কার থেকে, কোন্ প্রশ্ন থেকে শ্রেষ্ঠতর? এতে শুকদেব বলছেন—তোমার পিতামহ

অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, তা থেকে তোমার এই প্রশ্ন শ্রেষ্ঠতর। কারণ অর্জুন ভেবেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর আত্মীয়, বান্ধব সবারই মৃত্যু হবে। সুতরাং শূন্যরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে লাভ কি ? তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন—আমি এখন কি করব? কিসে আমার ভাল হবে?—আমায় উপদেশ করুন। আর তুমি জীবন সংগ্রামের মধ্যে থেকে ভাবছ—আর তো বেশি দেরি নেই; এই বেলা পরপারে যাবার সম্বল করে নিতে হবে। তাই তো তুমি ভব-ভয়-হারী শ্রীহরির কথা শোনবার জন্য আমায় প্রশ্ন করেছ। অর্জুন জগতের বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন; আর তুমি প্রশ্ন করেছ—জগৎপতির সম্বন্ধে। তাই বলছি—তোমার প্রশ্নই শ্রেষ্ঠতর; এতে জগতের যথার্থ কল্যাণ হবে।

জগতের জীব সবাই যেন মোহান্ধকারে পড়ে রয়েছে। তাই আমি কে এবং আমি কার—এই প্রশ্ন কারুরই মনে আসে না। কিন্তু এই প্রশ্নই তো সকলের সর্ব প্রথম মনে হওয়া উচিত—আমি কে এবং যথার্থই কে আমার আপনার। এই প্রশ্ন ছাড়া আর কত কথাই না মনে ওঠে এবং তার জন্য কত বিচার কত সিদ্ধান্ত! দুর্লভ মানব-জীবন অর্থ-উপার্জন, বিষয়-ভোগ এবং দুঃখেই কেটে যায়। আসলের দিকে কারুরই দৃষ্টি থাকে না। শুকদেব প্রথমে একটি ছোট্ট শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ

তস্মাদ্ ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্ ॥ ২-১-৫॥

হে পরীক্ষিৎ! যারা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চায়, তাদের সর্বময় ভগবান শ্রীহরির কথাই শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করা উচিত—এই তো জীবের একান্ত কর্তব্য। মনে রাখতে হবে যে, পরীক্ষিতের প্রশ্ন থেকেই ভাগবত কথা আরম্ভ হলো। পরীক্ষিতের প্রশ্ন—মুমূর্ষু জীবের কর্তব্য কি ? প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যু অবধারিত এবং কার যে কখন মৃত্যু হবে, তা কেউ বলতে পারে না। সুতরাং মৃত্যু হচ্ছে জীবের চিরসাথী। তাছাড়া অনন্ত কালের পরিমাপে জীবনের কয়টা বছর তো অতি অল্প সময়। অতএব সবাই মৃত্যুপরায়ণ, সবাই মুমূর্ষু। জীবের কর্তব্য কি, যাতে সে সাত দিনের মধ্যে অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যে কৃতকৃত্য হতে পারবে? শুকদেব অতি অল্প কথায়, প্রথমে সূত্রাকারে মনুষ্য জীবনের এই চরম প্রশ্নের উত্তর দিলেন—সর্বময় ভগবান শ্রীহরির

কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করাই মনুষ্য জীবনের কর্তব্য। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, ভাগবতের মূল কথাই হলো—ভগবানের স্মরণ, মনন, কীর্তন করতে হবে—এটাই হচ্ছে সকলের সার কথা।

শুকদেব বললেন—জ্ঞান, কর্ম, যোগ প্রভৃতি সকল সাধনার সিদ্ধিই তো হলো, এই 'নারায়ণ স্মৃতি'—ভগবানের, গোবিন্দের স্মরণ মনন। বৈরাগ্যের অভ্যাস, বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন, সাংখ্য যোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতির অনুশীলন করেও জীব কৃতার্থ হতে পারে না, যদি না মৃত্যুর সময় ' নারায়ণ স্মৃতি', ভগবানের কথা মনে আসে। মৃত্যুর সময় ভগবানের কথা যদি মনে না আসে, তবে যোগই বল, জ্ঞানই বল, যাগ-যজ্ঞ—কিছুই কিছু নয়। তাই বলছি ঃ

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥ ২-১-৭॥

সনক, সনৎকুমার, নারদ প্রভৃতি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা সকলরকম বিধি নিষেধের পারে এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, নির্গুণ অবস্থা লাভ করেও গোবিন্দ গুণ কীর্তনেই পরম আনন্দ লাভ করে থাকেন। এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ব্রহ্ম-সাযুজ্য থেকেও ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্তনেই মাধুর্য বেশি; নইলে নারদাদি আত্মারামেরা নির্গুণ অবস্থা লাভ করেও গোবিন্দের গুণে এত আসক্ত হবেন কেন? নারদাদি আত্মারামেরা জানেন যে, নির্গুণ অদ্বয় তত্ত্বই মানুষের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবিধ দেহ ধারণ করে অপার্থিব লীলা করে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন—সমুদ্রের জল কোথাও কোথাও ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যায়; সেইরকম সচ্চিদানন্দ সাগরের জল ভক্তি-হিমে অবতার-রূপ পরিগ্রহ করেন—যাতে মানুষ সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অবতারের মধুর লীলার কথা স্মরণ-চিন্তন করে রসময়, কৃষ্ণময় হতে পারে। নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা অত্যন্ত কঠিন, সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সেই পরম অব্যয়-তত্ত্ব, কৃপায় দেহ ধারণ করেন; তখনই মানুষ তাঁকে চিন্তা করে আনন্দময় হয়ে যায়—এই তো তাঁর মহান কৃপা! অতএব, হে মহারাজ! আসন্ন-মৃত্যু জীবের আর কি কর্তব্য থাকতে

পারে? সকল সাধনার সিদ্ধি দশায় যে মহাসম্পদ লাভ হয়, সেই গোবিন্দ-গুণ শ্রবণ, কীর্তনে রত থাকাই তো সকলের একমাত্র কর্তব্য। এই আমার অবস্থাই দেখ!

শ্রীমদ্ভাগবত নামক সর্ববেদতুল্য পুরাণ দ্বাপরের শেষ ভাগে আমার পিতা ব্যাসদেবের কাছে আমি অধ্যয়ন করেছিলাম। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে নিমগ্ন থেকেও, শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে এই ভাগবত পুরাণ অধ্যয়ন করেছি। শুকদেব আরও বললেন—ভগবানের গুণ এবং লীলা শ্রবণে যে আনন্দ হয়, তা ব্রহ্মানন্দের চেয়েও বেশি। তিনি নিজে নির্গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েও ব্যাসদেবের কাছে গোবিন্দ-গুণ-লীলা-বর্ণন প্রধান ভাগবত শ্রবণ করেছেন। বলছেন, ভগবানের লীলা-কথার এমনই মহিমা এবং আকর্ষণ শক্তি যে, ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন আমাকেও জোর করে ভগবৎ-মাধুর্য আস্বাদন করিয়েছে এবং সেই মাধুর্য আরও আস্বাদনের জন্য আমাকে লোভী করে ছেড়েছে। আমি এত দিন মৌন ছিলাম; কারও সাথে কথা বলতাম না। কিন্তু আজ তোমাকে দেখে তোমার কাছে গোবিন্দলীলার কথা বলতে আমার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে।

হে পরীক্ষিৎ! তুমি মহাপৌরুষিক শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের পাত্র। সুতরাং এই ভাগবত পুরাণ আমি তোমায় বলব। এতে শ্রদ্ধা থাকলে গোবিন্দে নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয়। আরও বলেছেন ঃ

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥ ২-১-১১॥

হে মহারাজ! ভক্ত, স্বর্গ ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগী—সকলেই ভগবানের নাম কীর্তনকেই একমাত্র দুঃখহারী, সর্ব ভয়-হারক বলে স্থির করেছেন।

ভগবানের নাম কীর্তনকে 'অকুতোভয়' বলা হয়েছে অর্থাৎ নাম কীর্তনে কোনরকম পতনের আশঙ্কা নেই। যাগ, যজ্ঞ, জ্ঞানের সাধন ইত্যাদিতে পদে পদে পতনের আশঙ্কা। সেইজন্য সাধকেরা সব কিছু ত্যাগ করে সর্বফল-দাতা গোবিন্দের নাম কীর্তন করে থাকেন।

আসন্ন-মৃত্যু জীবের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শুকদেব শ্রবণ, কীর্তন

এবং স্মরণ—এই তিন রকম সাধনের কথা আগে বলেছেন। এই শ্লোকে তিনি অত্যন্ত সহজ, মহাশক্তিশালী এবং কলি-জীবের একমাত্র কর্তব্য নাম সংকীর্তনের প্রাধান্য দেখিয়েছেন। পদ্মপুরাণে রয়েছে—শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ এবং লীলাদির স্মৃতি জীবের অশেষ পাপ দূর করে ঠিকই ; কিন্তু তা বহু আয়াস-সাধ্য। কিন্তু নাম-কীর্তন কেবল মাত্র ওষ্ঠ স্পন্দনেই সাধিত হয়। সুতরাং নাম সংকীর্তনই সর্বাপেক্ষা সহজ এবং সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর শিক্ষাষ্টকম্ -এ বলেছেন ঃ *নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি। স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।* ভগবানের অনেক নাম—অনন্ত নাম এবং প্রত্যেক নামের মধ্যেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিহিত রয়েছে; তাছাড়া এই নাম করবার কোন সময়েরও নিয়ম নেই—যখন ইচ্ছা তখনই ভগবানের নাম-কীর্তন করা যায়।

শুকদেব বলছেন—হে মহারাজ! ভগবানের নাম কীর্তনই যোগী, জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত—সকলেরই সংসার ভয় দূর করে এবং নাম কীর্তনের দ্বারাই সাধক সকল প্রকার সাধনার ফললাভ করতে পারে। আমিই যে কেবল এই কথা বলছি, তা নয়; পূর্ব পূর্ব আচার্যেরা পরীক্ষা করে তবে এইটি ঠিক করেছেন। তাই বলছি মহারাজ! এই আসন্ন মৃত্যুকালে তুমি আর কি সাধনা করবে? পরম সাধন যে গোবিন্দনাম-কীর্তন—তাতেই তুমি রত হও, তাতেই তোমার সর্বার্থ সিদ্ধ হবে।

জীব ভগবানকে ভুলে বিষয় সুখের আশায় জীবনের বহু কালই তো কাটিয়ে দেয়; কিন্তু তাতে তো পরমার্থ পদ লাভ হয় না। শুধু বেঁচে থাকাতেই জীবনের যে উদ্দেশ্য—'ভগবান লাভ' তাতো সফল হয় না। কিন্তু যখনই জীব নিজের ভুল বুঝতে পারে, তখনই সে পরমার্থ লাভের পথ খুঁজে নেয়; আর তখনই তার জীবনের যথার্থ সুসময় উপস্থিত হয়।

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥ ২-১-১২ ॥

বিষয়ে মত্ত হয়ে মানুষ অজ্ঞাতে বহু বছর কাটিয়ে দেয়; কিন্তু তাতে কিছু ফল হয় না। বরং যে মুহূর্তে মানুষ জানতে পারে যে, 'জীবন বৃথা কেটে যাচ্ছে', সেই মুহূর্তকালই আগের বহু বছর থেকে শ্রেষ্ঠ; কারণ তখনই সে নিজের যথার্থ কল্যাণের জন্য সচেষ্ট হয়।

এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী রয়েছে। পূর্বকালে খট্টাঙ্গ নামে এক রাজা দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে অসুরদের যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে রাজা বললেন—বর তো দেবেন; কিন্তু আগে বলুন তো, আমার আর কত দিন আয়ু আছে? দেবতারা বললেন—হে রাজর্ষি! আর এক মুহূর্ত মাত্র তোমার পরমায়ু রয়েছে। এই কথা শুনে রাজা তাড়াতাড়ি দেবতাদের কাছ থেকে অতি দ্রুতগামী রথ চেয়ে নিয়ে পৃথিবীতে এসে শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হয়ে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন।

রাজর্ষি খট্টাঙ্গ নিজের পরমায়ু জানতে পেরে মুহূর্ত মধ্যে সব কিছু ত্যাগ করে সর্ব-ভয়-হর ভগবান শ্রীহরির চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। স্বর্গ হচ্ছে ভোগভূমি; তাই রাজর্ষি স্বর্গ ত্যাগ করে কর্মভূমি, সাধনভূমি, পৃথিবীতে সাধন করবার জন্য এসেছিলেন। শুকদেব বলছেন, হে মহারাজ! আর তো সময় নেই—এই বেলা ভবনদী পারের কড়ি যোগাড় করে নিতে হবে—এই জ্ঞান যার হয়, সে মুহূর্তমধ্যেই কৃতার্থ হতে পারে। পরীক্ষিৎকে উৎসাহ দিয়ে বলছেন—তোমার তো এখনও সাত দিন সময় রয়েছে; এই সাত দিনের মধ্যেই তুমি পরকালের সম্বল যোগাড় করে নাও। মৃত্যু আগত দেখে, 'দেহ গেহ' ছেড়ে কেমন করে কোথায় যাব—এই ভয়ে দিশেহারা না হয়ে দেহাদিতে অনাসক্ত হবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অনাসক্তি-রূপ মহাস্ত্রের দ্বারাই সমস্ত বন্ধন ছেদন করা যায়। আর মোহের আকর যে গৃহ, তা পরিত্যাগ করে পুণ্যতীর্থে গিয়ে ভগবানে মনঃসংযোগ করতে হয়। এ সবই তো তুমি করেছ। সর্বস্ব ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করে, তুমি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়েছ। সুতরাং তোমার আবার ভাবনা কি? তুমি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত। তাই আমি এখন তোমায় শ্রীকৃষ্ণ লীলা-বর্ণন প্রধান শ্রীমদ্ভাগবত-কথা বলব, যা আমি আমার পিতা ব্যাসদেবের কাছে শুনেছিলাম। এই ভাগবত-কথা শুনে, ভগবানের নাম কীর্তন করে, তাঁর লীলা স্মরণ করে তুমি ভগবানে নিবিষ্ট-চিত্ত হতে পারবে এবং তাতেই তুমি কৃতকৃত্য হবে।

পরীক্ষিৎকে উপলক্ষ করে শুকদেব যেন জগতের সমস্ত লোককেই বলছেন—জীবন তো ক্ষণস্থায়ী, পদ্মপত্রে জলের মতোই জীবন চঞ্চল; আবার অনন্ত কালের তুলনায় একশত বছরও অতি অল্প সময়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষই মুমূর্ষু, মরণোন্মুখ; সকলেরই পরীক্ষিতের মতো অবস্থা। তাহলে মানুষের কর্তব্য কি? শুকদেব বলছেন যে, সব কিছু ত্যাগ করে

ভগবানের চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করাই হচ্ছে সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

এইভাবে শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত-কথা বলতে আরম্ভ করে ক্রমে অষ্টাঙ্গ যোগ, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, বর্ণাশ্রম ধর্ম, দেবতা ও রাজাদের কীর্তি-কাহিনী, ভক্তদের অপূর্ব জীবন, বিভিন্ন অবতারের কথা, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের পরম মনোহর অপার্থিব লীলার কথা বিস্তৃতভাবে সাত দিন ধরে বললেন— যাতে ভগবানের কথা শুনতে শুনতে পরীক্ষিৎ ভগবানময়, কৃষ্ণময় হতে পারেন।

যদিও পরীক্ষিতের জন্যই শুকদেব ভাগবত-কথা বলেছিলেন, তবুও ভাগবত কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের পরম সম্পদ। কত লোক যে এই ভাগবত থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে জীবনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। যে এই ভাগবত-কথা শুনবে, ভগবানের নাম কীর্তন করবে, সে-ই কৃতার্থ হবে, মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হয়ে চিরশান্তি লাভ করবে।

৫
কুন্তির কৃষ্ণস্তুতি

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। যুদ্ধে পাণ্ডবেরা জয় লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের আপন বলতে আজ আর কেউ নেই। পাণ্ডববংশ সমূলে ধ্বংস করবার জন্য অশ্বত্থামা অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রদের ঘুমন্ত অবস্থায় বধ করেছে। পঞ্চপাণ্ডব এবং অন্তঃপুরবাসিনীদের হৃদয়-বিদারক অবস্থার কথা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থাতেও পাণ্ডবেরা কর্তব্যকর্মে অবিচল। তাঁরা পরলোকগত আত্মীয়স্বজন এবং জ্ঞাতিদের পারলৌকিক কর্ম করবার জন্য পুরবাসিনীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গঙ্গার তীরে গেলেন। সেখানে যথারীতি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করবার পর শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত মুনিঋষিরা পঞ্চপাণ্ডব, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি পুত্র-ভ্রাতা-আত্মীয়-বন্ধু ইত্যাদির বিয়োগকাতর ব্যক্তিদের যথাযোগ্য সান্ত্বনা দিলেন।

অসৎ, দুর্বৃত্ত ও ক্রূরকর্মকারী রাজাদের বিনাশ করে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করলেন এবং পাণ্ডবদের দিয়ে বহুবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়ে তাঁদের যশোরাশি চারিদিকে বিস্তার করালেন। এই ভাবে হস্তিনাপুরে কিছুটা শান্তি এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় যাবার জন্য রথে উঠতে যাচ্ছেন, সেই সময় অভিমন্যু-পত্নী উত্তরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের কাছেই ছুটে এসে ব্যাকুল হয়ে বললেন ঃ

পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে।
নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্ ।। ১-৮-৮ ।।

হে সর্বেশ্বর! হে জগৎপতি! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; আপনি ছাড়া আর কেউ-ই আমায় রক্ষা করতে পারবে না। জগতে সকলেই একে অপরের মৃত্যুর কারণ; কেউ কারুর মৃত্যু রোধ করতে পারে না।

উত্তরা হচ্ছেন কৃষ্ণ-ভগ্নী সুভদ্রার পুত্রবধূ। বিবাহের পর থেকেই উত্তরা

পাণ্ডব পুরনারীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের অতিমানুষী লীলার কথা শুনেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অর্জুন-সারথিরূপেও শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখেছেন। সুতরাং তিনি বুঝেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তাই তিনি বলছেন—ভীম, অর্জুন, প্রভৃতি মহাশক্তিধর হলেও আমি আপনারই শরণাপন্ন হয়েছি। অতি ভীষণ যে প্রজ্বলিত বাণ আমারই দিকে তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে, তাতে আমার মৃত্যু হলেও জগতের কোন ক্ষতি হবে না; কিন্তু আমার গর্ভস্থ সন্তান, যে পাণ্ডব বংশের একমাত্র সম্বল; তার কোন অনিষ্ট হলে পাণ্ডববংশ, আপনার ভক্তবংশই সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে; এতে জগতের মহা অকল্যাণ হবে। তাই আমার গর্ভস্থ সন্তানের জীবন রক্ষার জন্যই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি; আমার মৃত্যু হোক, ক্ষতি নেই; কিন্তু আপনি কৃপা করে এই সন্তানটিকে রক্ষা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ তখনই বুঝতে পারলেন যে, অশ্বত্থামা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পৃথিবী পাণ্ডব-শূন্য করবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ঠিক তখনই পাণ্ডবেরাও দেখলেন যে, তাদের দিকে পাঁচটি প্রজ্বলিত বাণ তীব্র বেগে ছুটে আসছে। তারা তখনই অস্ত্র ধারণ করে সেই বাণ প্রতিহত করতে সচেষ্ট হলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, কোন অস্ত্রই ব্রহ্মাস্ত্রকে নিবারণ করতে পারে না। তাই পাণ্ডবদের রক্ষার জন্য তিনি সুদর্শন চক্র ধারণ করে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, উত্তরার গর্ভে ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ রয়েছে এবং এই পরীক্ষিৎকে উপলক্ষ করেই শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রচারিত হবে; সুতরাং যেমন করেই হোক পরীক্ষিৎকে রক্ষা করতেই হবে; নইলে ভাগবত-কথা, ভক্ত-ভগবানের কথা জানতে না পেরে মানুষ যে অধোগতি প্রাপ্ত হবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি প্রত্যেক জীবদেহে অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করেন, তিনি তাঁর ঐশী শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যর্থ করে উত্তরা এবং তার গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করলেন।

পাণ্ডব-জননী কুন্তী জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নিয়েছে বলেই আজ পঞ্চপাণ্ডব এবং তাদের ভবিষ্য বংশধর, অশ্বত্থামার প্রলয়ান্তকর ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা পেল; তাই কুন্তী তখন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-রক্ষার অচিন্ত্য লীলা দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দ্বারকায় গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন।

এক অতি অদ্ভুত নাটকীয় পরিস্থিতিতে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের সেই স্তব করলেন। জাগতিক সম্পর্কে কুন্তী কৃষ্ণের পূজ্য হলেও, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের চিন্তায় মগ্ন কুন্তী তখন বলতে লাগলেন ঃ

নমস্যে পুরুষন্ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্ ।। ১-৮-১৭ ।।

হে আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সকলের নিয়ন্তা এবং প্রকৃতির নিয়ামক পরমাত্মা; তুমি সর্বজীবের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থিত থাকলেও কেউ তোমায় জানতে পারে না। সেই সর্ববুদ্ধির অগোচর তোমাকে আমি প্রণাম করি।

কুন্তী ছিলেন বসুদেবের ভগ্নী, কৃষ্ণের পিসিমা; কৃষ্ণ এই ভাবেই কুন্তীর সাথে ব্যবহার করতেন; কুন্তীও কৃষ্ণকে ভ্রাতুষ্পুত্রের মতই সস্নেহে আদরযত্ন করতেন। সেই কুন্তীই যখন কৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব দেখতেন, তখন সেই ঈশ্বরীয়ভাবে তন্ময় হয়ে, জাগতিক সম্পর্কের কথা সাময়িক বিস্মৃত হতেন। কুন্তী বলছেন—আমি তোমাকে প্রণাম করি, কারণ বাইরের দৃষ্টিতে তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হলেও স্বরূপত তুমি আদিপুরুষ নারায়ণ; জগৎকারণ, প্রকৃতির তুমিই নিয়ামক। তুমি কখন দ্বারকায় আবার কখন হস্তিনাপুরে অবস্থান কর; তুমি সর্বব্যাপী হয়েও অর্জুন-সখা। স্বরূপত কিন্তু তুমি সকলের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান কর; তোমার আপন পর বলে কিছু নেই; তুমি সর্বান্তর্যামী। তোমার মধ্যে এই যে সব বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ দেখছি, তার সামঞ্জস্য করা সাধারণ মনবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁর দর্শন হয়। শুদ্ধ মনে যা উঠবে, সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা, শুদ্ধ আত্মাও তা। কেন না তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই। তাহলে দাঁড়াল এই যে, জাগতিক মনবুদ্ধি যা, বিষয় বাসনা, আসক্তিতে পূর্ণ, সেই মনবুদ্ধির দ্বারা ভগবানের স্বরূপ বোঝা যায় না; কিন্তু তিনি শুদ্ধ মনবুদ্ধির গোচর।

মায়াযবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ।। ১-৮-১৮ ।।

যারা নাট্য রসিক নয় তারা যেমন নটের অভিনয় দেখেও তার ভিতরকার

ভাব, রস ইত্যাদি অনুভব করতে পারে না, সেই রকম মায়ারূপ যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখেও জ্ঞানহীন আমি তোমাকে বুঝতে পারি না; তাই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সত্যস্বরূপ তোমাকে কেবল প্রণামই করতে পারি; স্বরূপত তোমাকে জানতে পারি না।

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ॥ ১-৮-১৯ ॥

তোমার স্বরূপ অজ্ঞেয়; তবুও যাঁরা পরমহংস, যাঁরা আত্মা এবং অনাত্ম-বিষয়ের পার্থক্য বুঝেছেন এবং যাঁরা মননশীল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁদের ভগবৎ-ভক্তি শিক্ষা দেবার জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ; সুতরাং অল্পবুদ্ধি আমি কেমন করে তোমার স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হব?

তুমি মায়াতীত হয়েও নিত্যধামে অবস্থান করে নিত্যলীলা করে থাক। আমি এই মায়ার জগতে, মায়ার অধীন হয়ে প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা কেমন করে তোমার স্বরূপকে অনুভব করব? মায়ার অধীন হয়ে মায়াধীশকে জানা তো সম্ভব নয়; তাই তোমাকে দেখেও তোমার স্বরূপ অনুভব করতে পারি না; সুতরাং জানবার দুরাশা ত্যাগ করে তোমার চরণাশ্রয়কেই সম্বল করেছি।

ভগবানকে স্বরূপত জানা যায় না; কিন্তু ভগবৎ-ভাবের অন্তত কিছুটা অভিব্যক্তি না হলে ভক্তেরাই বা কি নিয়ে ভগবানে তন্ময় হয়ে থাকবেন? তাই কুন্তী বলছেন ঃ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১-৮-২০ ॥

এখানে কুন্তী ভগবানের পাঁচটি ভাবের অভিব্যক্তির কথা বলেছেন।

কৃষ্ণ—সকলের হৃদয়কে যিনি সর্বদা আকর্ষণ করেন তিনিই সর্বাকর্ষক পরমানন্দ কৃষ্ণ; **বাসুদেব**—ভগবান নিজেই বসুদেবের বাৎসল্যপ্রেমে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পুত্র, বাসুদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছেন; **দেবকীনন্দন**—ভগবান দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে তাঁকে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করেছেন; **নন্দগোপকুমার**—নন্দের পুত্ররূপে তিনি ব্রজবাসীদের ভগবৎ লীলারসে ভরপুর করেছেন বলে তিনি নন্দগোপকুমার; **গোবিন্দ**—গোপালনলীলায় সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে তিনি গোবিন্দ হয়েছেন। এই শ্লোকে কুন্তী বলতে চাইছেন

যে, সর্বাকর্ষক কৃষ্ণরূপে তুমি বসুদেব, দেবকী, যশোদা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের ভক্তদের আকর্ষণ করে তাঁদের পরম আনন্দ দান করেছ; কিন্তু আমি তো ভক্ত নই, আমার ভক্তিও নেই; তাই তুমি সর্বাকর্ষক হলেও, মায়াধীন আমি, সেই আকর্ষণ অনুভব করতে পারি না; সুতরাং সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবের সাধকেরা তোমাকে পেয়ে যে পরমানন্দের আস্বাদ অনুভব করে, আমার পক্ষে তা সুদূর পরাহত। অতএব তোমাকে বার বার প্রণাম করা ছাড়া আমার আর কি-ই বা করার আছে?

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ।। ১-৮-২১ ।।

কুন্তী বলছেন—তোমার নাভিপদ্ম থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি ; তাই তুমি পদ্মনাভ। তুমি পদ্মমালাধারী। হে পঙ্কজনয়ন! আমার স্বরূপের জ্ঞান নেই; আবার তোমার এত অপ্রাকৃতলীলা দেখেও আমার ভক্তি হলো না; সুতরাং তোমার সুন্দর পাদপদ্মই আমার একমাত্র আশ্রয়।

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদগণাৎ ।।
১-৮-২২ ।।

হে হৃষীকেশ! তুমি তো সর্বান্তর্যামী, সকলের মনের ভাবই জান; সুতরাং আমার মনের কথাও তোমার অজানা নয়; তবুও বলছি—অতি নিষ্ঠুর কংস দেবকীকে কারারুদ্ধ করে, তাঁর ছয়টি পুত্রকে বধ করার পর তুমি তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলে। আমিও তোমার কৃপায় বার বার পুত্রদের সাথে বহু বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি।

এখানে কুন্তী যেন বলছেন যে, দেবকী তোমার জননী হলেও আমার প্রতিই তুমি বেশি কৃপা প্রকাশ করেছ। দেবকীর কারাগার বাস, পুত্রদের মৃত্যু প্রভৃতি বহু দুঃখ ভোগ করার পর তাঁকে বিপন্মুক্ত করেছিলে; আমাকে এবং আমার পুত্রদের তুমি কিন্তু সর্বদাই রক্ষা করেছ।

বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদ্‌-দর্শনাদসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ।।
১-৮-২৩।।

এখানে কুন্তী তাঁদের কয়েকটি ভয়ঙ্কর বিপদের বিবরণ দিয়ে বলছেন— হে কৃষ্ণ! ভীমের বিষমিশ্রিত মোদক ভক্ষণ, জতুগৃহ দাহ, হিড়িম্ব প্রভৃতি রাক্ষসদের আক্রমণ, রাজসভায় অন্যায় পাশা খেলা, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরদের নানা প্রাণান্তকর অস্ত্র এবং অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে বার বার তোমারই কৃপায় আমরা রক্ষা পেয়েছি।

কুন্তী বলছেন—দেবকী মহাভাগ্যবতী কারণ তিনি তোমাকে পুত্ররূপে পেয়েছেন; তাছাড়া বিপদের সময় তাঁর পতি বসুদেব তাঁর কাছেই ছিলেন; কিন্তু আমার তো কেউ-ই ছিল না। কথায় বলে, যার কেউ নেই তাকে ভগবান রক্ষা করেন; একথার সার্থকতা তুমি আমার মাধ্যমে বার বার প্রমাণ করেছ। তাই বলেছি ঃ

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ।। ১-৮-২৪ ।।

হে জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ! আমাদের যেন সর্বদা এই রকম বিপদ হয় যাতে, ভবভয় মোচনকারী তোমার দর্শন লাভ করতে পারি।

এইরকম কথা বলার মত বুকের পাটা জগতে নেই বললেই চলে। মহাভারতে কুন্তী এক অননুকরণীয় মহান চরিত্র। ব্যাসদেব একদিকে কুন্তীর মধ্যে বহু গুণের সমাবেশ ঘটিয়ে, অপর দিকে তাঁর জীবনের সমস্ত সুখশান্তি ছিনিয়ে নিয়ে এই অনবদ্য চরিত্রটি সৃজন করেছেন। কুন্তী ছিলেন অসাধারণ রূপবতী; তাঁর পবিত্রতা, ধৈর্য্য, সেবাপরায়ণতা, সাহস, মহানুভবতা প্রভৃতি গুণ পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন লোকের আদর্শস্থানীয়। এত গুণ থাকা সত্বেও অবস্থার বিপর্যয়ে কুন্তী কখনও সুখী হতে পারেন নি।

কুন্তী বলছেন—আমরা বহুবার মরণান্তকর বিপদে পড়েছি এবং একান্ত সহায়-সম্বলহীন হওয়া সত্বেও তুমি সব সময় আমাদের রক্ষা করেছ, বার বার আমাদের দর্শন দিয়েছ। অতএব পদে পদেই আমাদের বিপদ হোক ; তাহলে আমরা দৃঢ়ভাবে তোমার পাদপদ্মের আশ্রয় নিতে পারব। বিপদ থেকে মুক্তি আমরা চাই না, বিপদই আমাদের কাম্য।

জন্মৈশ্বর্যশ্রুত শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ।। ১-৮-২৫ ।।

সৎকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যা এবং সৌভাগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অভিমানের বশে তোমাকে দীনজনের দয়াময় বলে ভাবতেও পারে না।

আমরা যদি ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হয়ে রাজসুখে থাকতাম, তাহলে দুর্যোধনের মতো আমরাও তোমাকে ভুলে যেতাম। ঐশ্বর্য, বিদ্যা, বংশগৌরব প্রভৃতি থাকলেই অহংকার, অভিমান আসে; আর অভিমান থাকলে তোমাকে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—অহংকার থাকলে ঈশ্বরলাভ হয় না। অহংকার যেন উঁচু ঢিপি, বৃষ্টির জল জমে না। ভক্তি বারি জমে না—গড়িয়ে যায়। নিচু জমিতে জল জমে আর অঙ্কুর হয়; তারপর গাছ হয়; তারপর ফল।

কুন্তী বলছেন—অভিমানশূন্য দীনজনেরই তুমি বন্ধু ; সুতরাং অভিমানশূন্য হবার জন্যই বিপদ আমাদের কাম্য; তবেই তোমাকে লাভ করতে পারব।

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ।। ১-৮-২৬ ।।

হে কৃষ্ণ! তুমি ভক্তের সর্বস্ব, চরণাশ্রিত জনের মায়ামোহ দূরকারী, আত্মারাম এবং আসক্তি রহিত; তুমিই মুক্তিদাতা। তোমাকে প্রণাম করি।

অকিঞ্চনবিত্ত—যারা নিঃস্ব, যাদের কোন কামনা-বাসনা নেই তারাই অকিঞ্চন; অকিঞ্চনের অন্য কোন বিত্ত, সম্পদ নেই ; কৃষ্ণই তাদের বিত্ত, সর্বস্ব। কৃষ্ণ যেমন অকিঞ্চনবিত্ত, ভক্ত ধনে ধনী তেমনি ভক্তও কৃষ্ণধনে ধনী। ভগবান দুর্বাসাকে বলেছিলেন—ভক্তেরা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তারাই আমার আত্মা। ভক্ত ছাড়া ভগবানের মহিমা জগতে কে প্রচার করত! আবার ভগবান হচ্ছেন, নিবৃত্ত গুণবৃত্ত—ভগবানকে যারা আশ্রয় করে তারা মায়ামোহ অতিক্রম করে যায়, তাদের আর বিষয়-বাসনা থাকে না। কৃষ্ণ হচ্ছেন আত্মারাম, সর্বদা স্বরূপানন্দেই থাকেন। অন্য সব বিষয়েই তিনি উদাসীন; তাই তিনি শান্ত, রাগদ্বেষরহিত; আবার তিনিই কৈবল্যপতি—মুক্তিদাতা। এমন সর্বগুণান্বিত কৃষ্ণকে কুন্তী বার বার প্রণাম করছেন।

মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভুম্।
সমং চরন্তং সর্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ।। ১-৮-২৭ ।।

কুন্তী বলছেন—তুমি সর্বান্তর্যামী, বহির্জগতের নিয়ন্তা; তোমার আদিও নেই অন্তও নেই এবং তুমি সর্বব্যাপী। সাধারণ মানুষ তোমার স্বরূপ নিরূপণে অসমর্থ হয়ে নানা পরস্পর বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি করে। আমার মনে হয় তুমি সর্ববিষয়ে সকলের প্রতি সমভাব পোষণ কর; তোমাতে অসামঞ্জস্য বলে কিছু নেই।

ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থিত থেকে জগতের সবকিছু পরিচালনা করেন; সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন প্রলয়ের পরেও তিনি থাকবেন; তিনি সবকিছু হয়ে রয়েছেন; তাঁর আপন পর বলে কিছু নেই; তাই তিনি সর্ব বিষয়ে আসক্তিশূন্য, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। তবুও সাধারণ মানুষ মনে করে যে, ভগবান কাউকে দুঃখ দেন, কাউকে সুখে রাখেন এবং এই নিয়ে নানা বাদবিতণ্ডা করে থাকে। কুন্তী বলছেন—আমি জানি তুমিই ভগবান এবং তোমার মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। তুমি দুর্যোধনকে রাজ্য দিয়ে পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েছ; তুমিই অশ্বত্থামাকে দিয়ে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে হত্যা করিয়েছ। তুমি সর্বান্তর্যামী; ব্রহ্ম রূপে সকলের হৃদয়ে এবং সর্বজগতে অবস্থান করে, যাতে সবারই কল্যাণ হয় তা-ই করে থাক। জগতে তুমি ছাড়া তো আর কিছু নেই ; সুতরাং কাকে তুমি অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ করবে?

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং
তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্
দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাম ।। ১-৮-২৮ ।।

হে কৃষ্ণ! তোমার প্রিয় এবং অপ্রিয় বলে কিছু নেই; কাউকে তুমি অনুগ্রহ কর আবার কাউকে নিগ্রহ কর, এরকম চিন্তা অমূলক; তবুও মানুষ মোহান্ধ হয়ে তোমাতে বৈষম্য দোষ আরোপ করে; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, তোমার নরলীলার তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—অবতার যখন আসেন, সাধারণ লোক জানতে পারে না—গোপনে আসেন। দুই চারি জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার। একথা বার জন ঋষি কেবল জানত।

কুন্তী বলছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি যাকে কৃপা করে জানাবে সে-ই কেবল

তোমার লীলার রহস্য জানতে পারবে। সাধারণ মানুষ তোমার ঈশ্বরীয় লীলার রহস্য না বুঝে তোমার সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষ আরোপ করে তর্ক বিতর্ক করে থাকে। আমি কিন্তু তোমার স্বরূপ জেনেছি; তাই তোমায় কেবল প্রণামই করছি।

জন্ম কর্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্তুরাত্মনঃ।
তির্যঙ্‌নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ।। ১-৮-২৯ ।।

হে বিশ্বাত্মন! তুমি জন্ম রহিত হয়েও কখন বরাহরূপে, কখন রাম রূপে, কখন নরনারায়ণাদি ঋষিরূপে আবার কখন মৎস্যাদিরূপে জন্ম পরিগ্রহ কর। তুমি সর্ব কর্মের অতীত হয়েও নানাবিধ কর্ম করে থাক এবং সেই সব কর্ম এমন নিখুঁত ভাবে কর যাতে কেউ বুঝতেও পারে না যে, কর্মে তোমার কোন স্পৃহা নেই।

ভগবান যখন দেহধারণ করে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি ঠিক ঠিক মানুষের মতোই ব্যবহার করেন; ফলে সাধারণ মানুষ তাঁর স্বরূপ জানতে না পেরে নানা বিপরীত ভাবের কথা বলে থাকে। পরের শ্লোকে একটি উপমা দিয়ে বোঝান হয়েছে যে, জাগতিক বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের স্বরূপ জানা সম্ভব নয়।

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ।।
১-৮-৩০ ।।

হে কৃষ্ণ! যার ভয়ে স্বয়ং ভয় পর্যন্ত ভীত হয়, সেই তুমি যখন দধি পাত্র ভাঙ্গার জন্য মা যশোদার সামান্য দড়ির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলে, তখন তুমি ভয়ে কজ্জল-মিশ্রিত অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে অধোবদনে মার কাছে দাঁড়িয়েছিলে। তখনকার কথা মনে হলে আমি এখনও বিহ্বল হয়ে পড়ি।

ঠিক এইরকম কথাই উদ্ধব বিদুরকে বলেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শত্রু ভয়ে ব্রজে বাস প্রভৃতি কথা যখন ভাবি তখন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ি। জন্মহীনের জন্ম, অভয়প্রদের ভীতিভাব কেমন করে সামঞ্জস্য করা সম্ভব!

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্ ।। ১-৮-৩২ ।।

জগতের সকলেই তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তোমার অবতরণের নানা ব্যাখ্যা করেন। কেউ বলেন যে পূর্ব জন্মে বসুদেব-দেবকী তোমাকে পুত্ররূপে পাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। সেইজন্য তুমি জগতের কল্যাণ এবং অসুরদের বধের জন্য জন্ম রহিত হয়েও জন্ম পরিগ্রহ করেছ। আবার কেউ কেউ বলেন যে অসংখ্য দৈত্যের ভার বহনে পৃথিবী অসমর্থ হলে ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি অবতীর্ণ হয়েছ।

এই ভাবে নানা লোকে ভগবানের আবির্ভাবের নানা কারণ বললেও কুন্তী জানেন যে, ভগবান অনন্ত, তাঁর লীলারও শেষ নেই। বিভিন্ন লোকে তাদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে নানা কারণ ঠিক করলেও ভগবানকে সীমিত করা যায় না; তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ভগবান যদি মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর হন, তবে তাঁকে জানবার উপায় কি?

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ।।
১-৮-৩৫ ।।

হে প্রভু! যে সব ভক্তেরা শ্রদ্ধার সাথে সদা সর্বদা তোমার লীলাকথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করেন, তারা তোমার পাদপদ্ম লাভ করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাম্ ।।
১-৮-৩৬ ।।

হে কৃষ্ণ! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে; তাই এখানে তোমার কর্তব্যও আর কিছু নেই। কিন্তু যুদ্ধে বহু আত্মীয় বন্ধু এবং রাজাদের মৃত্যুর জন্য সকলে আমার পুত্রদেরই দায়ী করছে। তাদের তো তুমি ছাড়া আর কেউ নেই; তোমার কৃপাতেই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তুমি চলে গেলে তারা নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়বে। তাই বলছি, তোমার অনুগত জনদের ছেড়ে আজই কি তুমি চলে যাবে?

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
ভবতোঽদর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ ।। ১-৮-৩৭ ।।

অন্তর্যামীর সাথে সম্পর্ক না থাকলে ইন্দ্রিয় সমূহ যেমন কিছুই করতে পারে না, সেইরকম তোমার অবর্তমানে কি যাদবগণ, কি পাণ্ডবগণ সকলেই অতি তুচ্ছ।

যাদবেরা এবং পাণ্ডবেরা কেউ দুর্বল নয়; তাদের সামর্থ্য এবং খ্যাতিও যথেষ্ট রয়েছে; তবুও তুমি না থাকলে যাদব ও পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি কিছুই থাকবে না।

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎ পদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ।। ১-৮-৩৮ ।।

ভক্ত কখন ভগবানকে ছেড়ে থাকতে চায় না; ভগবানের অদর্শনে জগৎ তার কাছে শূন্য বলে মনে হয়। তাই কুন্তী কাতরভাবে বলছেন—হে কৃষ্ণ! তোমার ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত শ্রীচরণের দ্বারা অঙ্কিত হস্তিনাপুরের যে শোভা হয়েছে, তুমি চলে গেলে সে শোভা তো আর থাকবে না।

বহু প্রকারের বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির দ্বারা পরিশোভিত হস্তিনাপুরের বন, পর্বত, জলাশয় প্রভৃতি তোমারই কৃপাদৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত আনন্দদায়ক হচ্ছে; সুতরাং তোমার অনুপস্থিতিতে হস্তিনাপুরের কি অবস্থাই না হবে!

হৃদয়ের আবেগে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে যেতে বারণ করে কত মনোমুগ্ধকর কথাই না বললেন; কিন্তু এরপরেই বলছেন ঃ

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্দি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ।। ১-৮-৪০ ।।

হে বিশ্বপতি! হে বিশ্বের প্রাণস্বরূপ। হে জগন্মূর্তি ! পাণ্ডবগণ এবং যাদবগণ উভয়েই আমার আত্মীয় এবং তাদের সকলের সাথেই আমি মমতার বন্ধনে আবদ্ধ। আমার এই সুদৃঢ় মমতার বন্ধন তুমি কৃপা করে দূর কর।

আগের শ্লোকের সাথে কুন্তীর এই শ্লোকটি যেন একটু খাপছাড়া মনে হয়; কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এই শ্লোকের সাথে পূর্বাপর সামঞ্জস্য ঠিকই আছে।

কুন্তী বলছেন—তুমি এখানে থাকলে পাণ্ডবদের মঙ্গল; কিন্তু দ্বারকায় তোমার অনুপস্থিতিতে যাদবদের দুঃখ। আবার তুমি দ্বারকায় চলে গেলে পাণ্ডবদের কাছে জগৎ শূন্য বলে মনে হবে কিন্তু যাদবদের সমৃদ্ধি অবধারিত। তুমি হস্তিনাপুরেই থাক অথবা দ্বারকাতেই থাক, পাণ্ডব এবং যাদবদের সাথে স্নেহের সম্পর্কের জন্য আমার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ সম্ভব নয়। তাই প্রার্থনা করি—পাণ্ডব এবং যাদবদের সাথে আমার যে মায়িক স্নেহের বন্ধন রয়েছে, তা ছেদন কর এবং যাতে আমি সদাসর্বদা তোমারই চিন্তাতে মগ্ন থাকতে পারি তার উপায় কর।

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ।। ১-৮-৪১ ।।

হে যদুনাথ! তোমার প্রতি আমার চিত্তের ভালবাসা, প্রেম-প্রবাহ যেন অবিচ্ছিন্ন ধারায় সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকে। একটি উপমা দেওয়া হয়েছে। গঙ্গা যেমন তার জলরাশি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সমুদ্রে মিলিয়ে দেয়, সেইরকম আমার ভগবৎ-প্রেমও যেন তোমার শ্রীচরণেই অনন্য আশ্রয় লাভ করে।

কুন্তীর মনে হয়ত এই রকম একটি চিন্তাও ছিল যে গঙ্গার স্রোতে যদি কোন জিনিষ পড়ে, তবে গঙ্গা সেই জিনিসকেও সমুদ্রে নিয়ে যায়। কুন্তী ভাবছেন—পুত্র এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে আমার যে সম্বন্ধ রয়েছে, তা তোমাতে পর্যবসিত হোক; আলাদা করে তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আর রাখতে চাই না; তোমার মাধ্যমে যেটুকু সম্বন্ধ থাকে, তাই-ই যথেষ্ট। অর্থাৎ অর্জুন আমার পুত্র, একথা ভুলে গিয়ে, তুমি অর্জুন-সখা বলেই যেন অর্জুনের সাথে আমার সম্বন্ধ সূচিত হয়। কী অপূর্ব কথা! ভগবান ছাড়া আমার আর কেউ নেই; তাঁর সাথে আমি সদাযুক্ত; তাই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক !

জগতে দেখা যায় পুত্র কন্যা অনেক সময় মাতা পিতাকে ত্যাগ করে ভগবানে তন্ময় হয়ে থাকে ; কিন্তু কোন মাতা নিজের সন্তানের প্রতি মমতার আকর্ষণ পর্যন্ত ত্যাগ করে একমাত্র ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হতে চান—এমন দৃষ্টান্ত অতি দুর্লভ। কুন্তীর এই দুর্লভ ভগবৎ-প্রীতিই এখানে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণও তা ঠিকই বুঝে নিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্তিহরাবতার
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ॥ ১-৮-৪২ ॥

হে কৃষ্ণ! হে অর্জুন-সখা! (বৃষ্ণি-ঋষভ-অবনিধ্রুগ-রাজন্যবংশ দহন-অনপবর্গ-বীর্য) হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, লোক-হিংসাপরায়ণ রাজাদের বংশ-বিনাশকারী অনন্তবীর্য! হে গোবিন্দ! তুমি গোব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের আর্তি দূর করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ। হে যোগেশ্বর! হে জগৎ গুরু, হে ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান! তোমাকে আমি বার বার প্রণাম করি।

এখানে কুন্তীর হৃদয়ের ভাব, শ্রীকৃষ্ণ যে পরমপুরুষ ভগবান, তা অতি সুন্দর ভাবে স্ফুরিত হয়েছে। একান্ত ভক্ত যখন ভগবানের মহিমা, গুণ-কীর্তন করেন, তখন তা এতই হৃদয়গ্রাহী হয় যে, ভক্ত-হৃদয়ের সেই গোপন কথা ভগবান পর্যন্ত শুনতে লালায়িত হন। তাই কুন্তীর প্রার্থনা মন দিয়ে শুনে এবং তাঁর মনোগত অভিপ্রায় জেনে, কৃষ্ণ মধুর হাসিতে সকলকে আনন্দে আপ্লুত করে রথ থেকে নেমে, অন্তঃপুরে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

সাধারণ মানুষ প্রথমে ঈশ্বরীয় মহিমা বুঝতে পারে না; কিন্তু ভগবানের বিভিন্ন অপার্থিব কার্যাবলী দেখে যখন সে তাঁকে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তখন সে অনুভব করে যে, ভগবানের স্বরূপ জানা যায় না; সুতরাং ভগবানের বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কাজের সামঞ্জস্য করাও সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবানের স্বরূপ জানা না গেলেও তার নিজের জীবনে ভগবৎ কৃপার কথা চিন্তা করে সে আনন্দে আপ্লুত হয় এবং অহংভাব ত্যাগ করে ভগবানের পাদপদ্মে একান্ত ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন সে বুঝতে পারে যে, জগতের নাম, যশ, প্রভাব, প্রতিপত্তি সবই অনিত্য, সবই মিথ্যা; একমাত্র ভগবানই সত্য এবং তাঁকে পাবার জন্য সে তখন সব রকম ঝুঁকি, বিপদ বরণ করতেও প্রস্তুত। তার মন তখন বৈরাগ্য-ভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে ভগবানের নাম-গুণ গানেই সর্বদা তন্ময় হয়ে থাকতে চায়। এই তো হচ্ছে ভগবৎ আরাধনার বিভিন্ন সোপান। কুন্তীর এই স্তবের মধ্যে সাধকের এই ক্রম-উত্তরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ রাজপ্রাসাদে গেলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তুমি কি যথার্থই আমাদের ছেড়ে আজ চলে যাবে? যদি একান্তই যাও, তবে আমাদের বধ করে যাও; কারণ তোমার অদর্শন এখন আমাদের পক্ষে অসহ্য। যুধিষ্ঠিরের মনে অশান্তির আগুন জ্বলছে; কেবলই ভাবছেন—আমারই জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এত লোকের মৃত্যু হল; সুতরাং অনন্তকাল ধরে আমায় নরক যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে। যুধিষ্ঠিরের এই করুণ অবস্থা দেখে কৃষ্ণ দ্বারকায় যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্তিহরাবতার
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ।। ১-৮-৪২ ।।

হে কৃষ্ণ! হে অর্জুন-সখা! (বৃষ্ণি-ঋষভ-অবনিধ্রুগ-রাজন্যবংশ দহন-অনপবর্গ-বীর্য) হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, লোক-হিংসাপরায়ণ রাজাদের বংশ-বিনাশকারী অনন্তবীর্য! হে গোবিন্দ! তুমি গোব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের আর্তি দূর করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ। হে যোগেশ্বর! হে জগৎ গুরু, হে ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান! তোমাকে আমি বার বার প্রণাম করি।

এখানে কুন্তীর হৃদয়ের ভাব, শ্রীকৃষ্ণ যে পরমপুরুষ ভগবান, তা অতি সুন্দর ভাবে স্ফুরিত হয়েছে। একান্ত ভক্ত যখন ভগবানের মহিমা, গুণ-কীর্তন করেন, তখন তা এতই হৃদয়গ্রাহী হয় যে, ভক্ত-হৃদয়ের সেই গোপন কথা ভগবান পর্যন্ত শুনতে লালায়িত হন। তাই কুন্তীর প্রার্থনা মন দিয়ে শুনে এবং তাঁর মনোগত অভিপ্রায় জেনে, কৃষ্ণ মধুর হাসিতে সকলকে আনন্দে আপ্লুত করে রথ থেকে নেমে, অন্তঃপুরে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

সাধারণ মানুষ প্রথমে ঈশ্বরীয় মহিমা বুঝতে পারে না; কিন্তু ভগবানের বিভিন্ন অপার্থিব কার্যাবলী দেখে যখন সে তাঁকে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তখন সে অনুভব করে যে, ভগবানের স্বরূপ জানা যায় না; সুতরাং ভগবানের বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কাজের সামঞ্জস্য করাও সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবানের স্বরূপ জানা না গেলেও তার নিজের জীবনে ভগবৎ কৃপার কথা চিন্তা করে সে আনন্দে আপ্লুত হয় এবং অহংভাব ত্যাগ করে ভগবানের পাদপদ্মে একান্ত ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন সে বুঝতে পারে যে, জগতের নাম, যশ, প্রভাব, প্রতিপত্তি সবই অনিত্য, সবই মিথ্যা; একমাত্র ভগবানই সত্য এবং তাঁকে পাবার জন্য সে তখন সব রকম ঝুঁকি, বিপদ বরণ করতেও প্রস্তুত। তার মন তখন বৈরাগ্য-ভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে ভগবানের নাম-গুণ গানেই সর্বদা তন্ময় হয়ে থাকতে চায়। এই তো হচ্ছে ভগবৎ আরাধনার বিভিন্ন সোপান। কুন্তীর এই স্তবের মধ্যে সাধকের এই ক্রম-উত্তরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ রাজপ্রাসাদে গেলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তুমি কি যথার্থই আমাদের ছেড়ে আজ চলে যাবে? যদি একান্তই যাও, তবে আমাদের বধ করে যাও; কারণ তোমার অদর্শন এখন আমাদের পক্ষে অসহ্য। যুধিষ্ঠিরের মনে অশান্তির আগুন জ্বলছে; কেবলই ভাবছেন—আমারই জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এত লোকের মৃত্যু হল; সুতরাং অনন্তকাল ধরে আমায় নরক যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে। যুধিষ্ঠিরের এই করুণ অবস্থা দেখে কৃষ্ণ দ্বারকায় যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন।

৬

ভীষ্মের কৃষ্ণ-স্তুতি

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের বলছিলেন—'ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝা যায় না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে; পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন; সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন ভীষ্মদেব কাঁদছেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ, কি আশ্চর্য! পিতামহ অষ্টবসুর একজন বসু; এঁর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাঁদছেন! কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম সেজন্য কাঁদছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝতে পারলাম না! আমি এই জন্য কাঁদছি যে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন, কিন্তু পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নাই! এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তাঁর কার্য বোঝবার যো নাই!"(কথামৃত—৩-৮-২)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে এই বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের মনে ভয়ানক দুঃখ, কিছুতেই তিনি শান্তি পাচ্ছেন না; কেবলই ভাবছেন, হায়! এ কি করলাম! নিজের ভোগসুখের জন্য, সামান্য রাজ্যের লোভে কত প্রাণী হত্যা করলাম, কত অক্ষৌহিণী সৈন্য ধ্বংস করলাম।

> বালদ্বিজসুহৃন্মিত্র-পিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রুহঃ।
> ন মে স্যান্নিরয়ান্মোক্ষো হ্যপি বর্ষাযুতাযুতৈঃ ॥ ১-৮-৪৯ ॥

কত বালক, ব্রাহ্মণ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভাই এমন কি গুরুদের পর্যন্ত এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বধ করেছি। অনন্তকাল ধরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করলেও আমার নিস্তার নেই। আমারই রাজ্যলোভের জন্য, আমারই অজ্ঞানতার জন্য এই মহা অনর্থ ঘটেছে।

যুধিষ্ঠিরের এই বিষাদ দেখে সবাই ব্যাকুল; শ্রীকৃষ্ণ এবং ত্রিকালদর্শী ঋষিরা পুরাতন ইতিহাস এবং ধর্মশাস্ত্র বিচার করে যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, ন্যায়যুদ্ধে শত্রুবধ করলে কোন পাপ হয় না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের

মন থেকে কোন রকমেই আত্মীয় বধের চিন্তা যাচ্ছে না। তিনি বললেন—আপনারা বলছেন বটে যে, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণীবধ দোষের নয়, রাজধর্মের বিরুদ্ধ নয়; কিন্তু এ কথায় তো আমার মন প্রবোধ মানছে না। রাজা যদি প্রজা-পালনের জন্য, শত্রুনাশের জন্য যুদ্ধ করেন এবং তাতে যদি প্রাণীবধ হয়, তা হলে অধর্ম হয় না বটে; কিন্তু আমার পক্ষে তো তা প্রযোজ্য নয়। আমি রাজ্যলোভে যুদ্ধ করে প্রাণীবধ করেছি; সুতরাং অনন্ত নরক ভোগ আমায় করতেই হবে। এখন আপনারা আমায় বৃথা আশ্বাস দিচ্ছেন—এতে লাভ কি হবে! যদি যুদ্ধের আগে আমায় বারণ করতেন, তবেই যথার্থ বন্ধুর কাজ হতো। যুধিষ্ঠিরকে কোন রকমেই শান্ত করা যাচ্ছে না দেখে ঠিক হলো যে সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ এবং তত্ত্ববিদ্ ভীষ্ম তো এখনও শরশয্যায় প্রাণ ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর কাছে গিয়ে ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব শুনলে সকলের সব সন্দেহ দূর হবে। শ্রীকৃষ্ণও এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে বললেন—চলুন, আমরা সকলে মিলেই তাঁর কাছে যাই।

ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্বধর্মবিবিৎসয়া।
ততো বিনশনং প্রাগাদ্ যত্র দেবব্রতোঽপতৎ ॥ ১-৯-১॥

সূত বললেন—এইভাবে সকলে আলোচনা করে, যুদ্ধে বহু লোকের মৃত্যুজনিত পাপের ভয়ে ভীত হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির সকল ধর্ম অর্থাৎ রাজধর্ম, দানধর্ম, মোক্ষধর্ম, স্ত্রীধর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্মের বিষয় জানবার জন্য ভীষ্ম যেখানে শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, সেই কুরুক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের মতো বাগ্মী, তাঁর মতো বুদ্ধিমান, তখনকার সময়ে তাঁর মতো ধর্মজ্ঞ দ্বিতীয় কেউ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ তখনই পুরুষোত্তম বলে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া যুধিষ্ঠিরাদি ভক্তেরা তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলেই জানতেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর নামে ভবভয় পর্যন্ত দূর হয়, সেই তিনি স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন; কিন্তু তবুও যুধিষ্ঠিরের নরক-ভয় দূর হলো না এবং তার জন্য সকলে মিলে ভীষ্মের কাছে গেলেন ধর্মের তত্ত্ব জানবার জন্য—এটা খুব আশ্চর্য বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের কথায় যার সংশয় দূর হয় না, তার সংশয় দূর হবে ভীষ্মের উপদেশে! আরও আশ্চর্য, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভীষ্মের কাছে যেতে চাইলেন। আসল কথা

হলো এই যে, আর কেউ জানুক আর না-ই জানুক, শ্রীকৃষ্ণ তো জানেন যে, ভীষ্ম হচ্ছেন তাঁর একান্ত ভক্ত। সেই ভীষ্ম শরশয্যায় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে উত্তরায়ণের অপেক্ষায় জীবন ধারণ করে রয়েছেন। একমাত্র আশা, একমাত্র প্রার্থনা তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন করে এই দেহভার হতে মুক্ত হবেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর একান্ত ভক্তকে দেখা দেবার জন্য এবং ভক্তের মান বাড়াবার জন্য যুধিষ্ঠিরের মনে এই সন্দেহের সৃষ্টি করেন। জগৎকে দেখালেন যে তাঁর নিজের উপদেশে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ মিটল না। কিন্তু তাঁর ভক্তের উপদেশে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ দূর হলো, যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি এল। এই হচ্ছে ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য! আর এরই জন্য ভগবানের কাজের অর্থ সাধারণের বোধগম্য হয় না।

দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবামরম্।
প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্মং সানুগাঃ সহ চক্রিণা ॥ ১-৯-৪ ॥

পাণ্ডবেরা অনুচরবৃন্দের সাথে শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে করে ভীষ্মের কাছে গেলেন। ভীষ্ম তখন স্বর্গচ্যুত দেবতার মতো শরশয্যায় শায়িত। তাঁরা তখন সকলে ভীষ্মকে প্রণাম করলেন। বাহ্য ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যুধিষ্ঠিরের পিসতুতো ভাই; তাই শ্রীকৃষ্ণ জগৎ-পূজ্য ও ভীষ্মের ইষ্টদেবতা হয়েও নরলীলার অনুকরণে ভীষ্মকে প্রণাম করলেন।

কৃষ্ণঞ্চ তৎ প্রভাবজ্ঞ আসীনং জগদীশ্বরম্।
হৃদিস্থং পূজয়ামাস মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্ ॥ ১-৯-১০॥

ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ভালভাবেই জানতেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে ভীষ্ম সদাসর্বদা হৃদয়ে চিন্তা করেন, সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে তাঁর কাছে এসেছেন দেখে, ভীষ্ম মনে মনে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীষ্মের আজ আনন্দের সীমা নেই; যাঁকে ধ্যান করেও দর্শন পাওয়া যায় না, সেই তিনি আজ পরম করুণাময় মূর্তিতে ভীষ্মের নয়ন-সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। যদিও বাহ্য ব্যবহারে, পারিবারিক সম্পর্কে ভীষ্মই বড়, প্রণম্য তবুও ভীষ্ম মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন।

বিনয় এবং শ্রদ্ধাবনত পাণ্ডবদের কাছে দেখে ভীষ্ম সাশ্রু নয়নে তাদের বললেন ঃ

অহো কষ্টমহোঽন্যায্যং যদ্যূয়ং ধর্মনন্দনাঃ।
জীবিতুং নার্হথ ক্লিষ্টং বিপ্রধর্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ ॥ ১-৯-১২ ॥

তোমরা ধর্মপুত্র; ব্রাহ্মণ, ধর্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের একান্ত আশ্রিত; তোমরা কখনই কষ্টময় জীবন যাপন করার যোগ্য নও, তবুও তাই করছ; হায়! এ বড়ই অন্যায়, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

পাণ্ডবেরা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বিষণ্ণ বদনে ভীষ্মের কাছে বসে রয়েছেন দেখে, ভীষ্ম মনে মনে ভাবলেন—শ্রীভগবানের এ কি অদ্ভুত লীলা! স্বয়ং ভগবান সর্বদা যাদের সঙ্গে রয়েছেন, তাদেরও আবার দুঃখ! ভগবানের নাম স্মরণ করলেই যেখানে সর্ব দুঃখের অবসান হয়, সেখানে শ্রীহরি নিজে উপস্থিত থেকেও তাদের দুঃখ নিবারণ করতে পারছেন না! ভগবানের এই লীলার অর্থ কে বুঝবে! তাই মহাজ্ঞানী ভীষ্ম, শ্রীহরির অচিন্ত্য লীলার মাহাত্ম্য বুঝতে অসমর্থ হয়ে চোখের জলে ভেসে বললেন—হে যুধিষ্ঠির! যাঁদের সামান্য কৃপা, সামান্য আশ্রয় পেলেও মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর হয়, সেই ব্রাহ্মণ, ধর্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের কাছে সর্বদাই রয়েছেন; তবুও কেন যে তোমাদের এত দুঃখ, তা কে বলবে? লোকে অধর্ম করলে দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু তোমরা তো ধর্মেরই প্রতিমূর্তি; সুতরাং তোমরা যে কেন দুঃখ ভোগ করছ, তা মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর।

যত্র ধর্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎকৃষ্ণস্ততো বিপৎ ॥ ১-৯-১৫ ॥

যেখানে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, গদাযুদ্ধনিপুণ ভীম, অস্ত্রবিদ্যা পারদর্শী গাণ্ডিবধারী অর্জুন এবং পরম বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বর্তমান, সেখানেও বিপদ আসে—এ বড়ই আশ্চর্য! সকলরকম সুখের কারণ একত্রিত হয়েও যে তোমাদের দুঃখের নিবৃত্তি হচ্ছে না, এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে? ধর্ম, শারীরিক শক্তি, বুদ্ধি, অস্ত্রকৌশল—এ সবই তো তোমাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে; তার উপর মুনিঋষিরা যাঁকে ধ্যান করেও পায় না, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমাদের বন্ধুর মতো সর্বদা সাহায্য করছেন। এতেও যখন তোমাদের দুঃখের নিবৃত্তি হচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে যে, এই দুঃখ অচিন্ত্য, মনুষ্য-বুদ্ধির দ্বারা এই দুঃখের মীমাংসা করা যাবে না।

ভীষ্ম আরও বললেন—হে যুধিষ্ঠির! কেউ কোন দিন কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানতে পারে না; এমন কি বিবেকী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এতে মোহগ্রস্ত হন; সুতরাং হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ! সুখ দুঃখ সবই ঈশ্বরাধীন জেনে, ভগবানের অনুগত হয়ে অনাথ প্রজাদের পালন কর।

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু ॥ ১-৯-১৮ ॥

এই কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান, আদিপুরুষ নারায়ণ; তথাপি ইনি কৃপা করে নিজের ভক্তদের আনন্দ দেবার জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তিহীনদের বুদ্ধির অগোচর নানা লীলা করে থাকেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজের সন্দেহ মেটাবার জন্য ভীষ্মের কাছে এসেছেন। ভীষ্ম তা বুঝতে পেরে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ দূর করতে আরম্ভ করলেন। ভীষ্ম পরম ভক্ত; তিনি জানেন যে, ভগবানের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে শত সহস্র যুক্তি তর্কের দ্বারাও কোন সন্দেহের নিরসন হবে না। তাই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে, তোমরা যাঁকে পরম বন্ধু বলে জেনেছ, সেই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি কি জন্য কখন কি করেন, তা মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর। সুতরাং তাঁর কোন্ অভিপ্রায়ের জন্য যে তোমরা এত কষ্ট পাচ্ছ, তা কে বলবে? জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে থাকে; কিন্তু কেন যে জীবের সুখ দুঃখ হচ্ছে তা বোঝবার কিংবা বিচার করবার ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং যখন যে অবস্থা আসবে, তা-ই ভগবানের কৃপা মনে করে যথাযথ কর্ত্তব্য পালন করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এখন তোমরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছ; সুতরাং তাঁর কথা স্মরণ করে তোমরা রাজার যে ধর্ম, সেই প্রজাপালন-রূপ ধর্মে রত হও। ইনি ভক্তদের আনন্দ দেবার জন্য যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে কত লীলাই না করছেন; কিন্তু ভক্তিহীন লোকেরা তো তাঁর এই লীলা-মাধুর্য আস্বাদন করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের প্রেমে একেবারে বশীভূত এবং তোমরাও তাঁর প্রেমে অন্ধ ; আর তারই জন্য, তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে বলেই, তোমাদের পিতামহ বলেই, তিনি আমার মৃত্যুর সময় কৃপা করে আমার সামনে এসেছেন; নইলে শ্রীভগবানের অতি দুর্লভ সাক্ষাৎ দর্শন আমার ভাগ্যে কিছুতেই হতো না।

যাঁর শ্রীচরণে মন রেখে ভক্তিযুক্ত হয়ে, হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! প্রভৃতি নাম কীর্তন করতে করতে দেহত্যাগ করলে মানুষের অশেষ জন্ম-সঞ্চিত সংসার-দুঃখ দূর হয়, সেই তিনি স্বয়ং আমার নয়ন সম্মুখে এসেছেন! তখন ভীষ্ম প্রার্থনা করলেন ঃ

স দেবদেবো ভগবান্ প্রতীক্ষতাং কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহম্।
প্রসন্নহাসারুণ-লোচনোল্লসন্মুখাম্বুজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ ॥
১-৯-২৪॥

আমার অন্তিমকালের প্রার্থনা এই যে, আমার চিরজীবনের ধ্যানধ্যেয় চতুর্ভুজ মূর্তিতে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী মূর্তিতে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বদনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমার দেহত্যাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। জীবনের এই শেষ সময়টুকু যেন এই ইষ্ট দর্শনে বঞ্চিত না হই। শ্লোকের *ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ* থেকে মনে হয় ভীষ্ম চতুর্ভুজ মূর্তির উপাসক ছিলেন।

এর পর যুধিষ্ঠির ধর্ম সম্বন্ধে ভীষ্মকে নানা প্রশ্ন করেন এবং ধর্মতত্ত্ববিদ্ ভীষ্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম, দানধর্ম, রাজধর্ম, স্ত্রীধর্ম, ভগবৎ-ধর্ম প্রভৃতি যথাযথভাবে বর্ণনা করলেন। ভীষ্মের ধর্ম ব্যাখ্যা শুনে যুধিষ্ঠিরের সকল সংশয় দূর হলো। এইভাবে ধর্ম প্রসঙ্গে কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর উত্তরায়ণ কাল উপস্থিত হলো। এই সময় দেহত্যাগ করবার জন্যই ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হয়েছে দেখে ভীষ্ম তখন অনিমিষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে তাঁতে চিত্ত সমর্পণ করে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। মন কৃষ্ণে সমর্পিত, নয়ন কৃষ্ণরূপ দর্শনে বিমোহিত, মুখ কৃষ্ণ-গুণগানে মুখরিত। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন ঃ

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥
১-৯-৩২॥

ভীষ্ম প্রথমেই তাঁর নিষ্কাম চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে বলছেন—যিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী, যিনি যদুকুল শ্রেষ্ঠ, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, যাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই এবং যিনি নিজের স্বরূপভূত আনন্দে সদাই অবস্থান করলেও

কখনও লীলা করবার জন্য, যে প্রকৃতি হতে এই সংসার-প্রবাহ চলছে সেই প্রকৃতিকে, মায়াকে আশ্রয় করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার তৃষ্ণারহিত, কামনাশূন্য চিত্তবৃত্তি অর্পিত হোক।

ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পরম তত্ত্ব, পরম পুরুষ বলেই জানেন; তাই তিনি বলছেন ব্রহ্মরূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী এবং সর্ববৃহত্তম। লীলা বিলাসের জন্য মায়াকে অবলম্বন করে দেহ ধারণ করলেও তিনি সাধারণ মানুষের মতো মায়ার অধীন নন, তিনি মায়াধীশ। সম্প্রতি তিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে যাদব ও পাণ্ডবদের সাথে বিহার করে নিজের স্বরূপ যে পরমানন্দ, সেই পরমানন্দ-রস আস্বাদন করছেন।

ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি কৃপা করে আজ আমার কাছে এসেছ; কিন্তু আমার তো কিছু নেই যা দিয়ে তোমার সৎকার করতে পারি। আমার একমাত্র চিত্তবৃত্তিই সম্বল। নানা ধর্মানুষ্ঠান এবং তপস্যার দ্বারা আমি চিত্তসংযম অভ্যাস করেছি; সেই চিত্তে আর কোন বাসনা কামনা নেই। সেই নিষ্কাম চিত্তবৃত্তিই তোমায় নিবেদন করছি; কৃপা করে গ্রহণ কর, যাতে আমার চিত্ত এখন থেকে একমাত্র তোমাতেই সংলগ্ন থাকে, যাতে আমার মনে তুমি ছাড়া আর কোন চিন্তাই না আসে।

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলক-কুলাবৃতাননাব্জং বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥
১-৯-৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করার পর ভীষ্মের মনে কৃষ্ণের অলোকসামান্য রূপের উদয় হলো। সেই ধ্যানগম্য কৃষ্ণ-রূপের বর্ণনা করে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি প্রার্থনা করছেন। বলছেন—ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র অভিলষিত, যিনি তমাল গাছের মতো নীলবর্ণ, যিনি সূর্যকিরণ সদৃশ উজ্জ্বল পীত বসন পরিধান করেন, যাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কুন্তলরাশিতে মুখপদ্ম অলংকৃত, সেই অর্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণে আমার অহৈতুকী ভক্তি-প্রীতি হোক।

ভীষ্মচরিত্র বহুগুণে ভূষিত; তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যব্রত, পরমজ্ঞানী এবং সর্বোপরি তিনি পরম যোদ্ধা; তাঁর মতো যোদ্ধা তখন আর কেউ-ই ছিল না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি নয় দিন ধরে কৌরব পক্ষের সেনাপতি ছিলেন।

সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশেষ বিশেষ ঘটনা, যা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই এই সময় তাঁর মনে হতে লাগল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হয়ে অর্জুনের রথের সারথি হয়ে অর্জুনের কথামত যত্রতত্র রথ চালনা করেছেন। ভগবানের এই অনুগ্রহলীলা দেখে ভীষ্ম মুগ্ধ হয়েছেন। তাই মৃত্যুর সময় ভগবান তাঁর পাশে থাকা সত্ত্বেও তিনি ভগবানের সেই পার্থসারথি-লীলা এবং ভক্ত-বাৎসল্যের কথা ভুলতে পারছেন না; বারবার সেই যুদ্ধকালীন পার্থসারথির কথাই মনে উঠছে। ত্রিলোক মনোহারী তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল পীত বসন পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে রক্ষা করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে, চঞ্চলভাবে রথ চালাচ্ছেন; এর ফলে শ্রীকৃষ্ণের মাথার চুল মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে এবং তিনি মাঝে মাঝে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে অর্জুনকে উপদেশ এবং উৎসাহ দিচ্ছেন। ভক্তবাৎসল্য এবং ভক্তরক্ষার এই প্রকটমূর্তি, ভীষ্ম কিছুতেই ভুলতে পারছেন না; তাই প্রার্থনা করছেন—সেই অর্জুনসখা পার্থসারথি মূর্তি সর্বদাই যেন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকে; তাতেই যেন আমার নিষ্কাম ভক্তি হয়।

যুধি তুরগরজো-বিধূম্রবিষ্বক্-কচলুলিত শ্রমবার্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈ-র্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥
১-৯-৩৪ ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার খুরে উৎক্ষিপ্ত ধুলায় শ্রীকৃষ্ণের কেশপাশ ধূসরিত হয়েছিল এবং শ্রমজনিত ঘর্মবিন্দুতে তাঁর মুখমণ্ডল অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়েছিল। অসংখ্য শাণিত বাণরাশি তাঁর সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করায় মনে হচ্ছিল যে তিনি যেন বাণ রচিত বর্ম পরে রয়েছেন। ভীষ্ম বলছেন, যে শ্রীমূর্তিকে ভক্তেরা চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যে সাজিয়ে রাখেন, যুদ্ধকালে সেই শ্রীমূর্তি ধুলায় ধূসরিত এবং আমার বাণে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে আত্মরক্ষা ও ভক্তরক্ষায় ব্যগ্র হয়ে ইতস্তত রথ পরিচালনা করছেন, সেই ভক্তানুগ্রহকারী যুদ্ধরসাবিষ্ট শ্রীমূর্তিকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ভগবানের সেই মূর্তিতে আমার মনপ্রাণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করুক—আমি আর কিছুই চাই না; *'অস্তু কৃষ্ণ আত্মা'* সেই কৃষ্ণে আমার মন স্থির হোক।

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজ পরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥
১-৯-৩৫ ॥

'উভয় সৈন্যের মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর'—অর্জুনের এই কথা শোনামাত্র যিনি কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করে অর্জুনের পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় থেকে কালদৃষ্টিতে কৌরব সৈন্যের পরমায়ু হরণ করেছিলেন, সেই পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হোক।

ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত! যিনি অন্তর্যামিরূপে সকলের নিয়ামক, সেই তিনি অর্জুনের কথা শুনে স্বহস্তে রথ পরিচালনা করলেন। *সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত/যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ (গীতা ১-২১/২২)*—হে কৃষ্ণ! উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন কর, যাতে আমি দেখতে পাই কারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে। অর্জুনের কথা শুনে, যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনে সমর্থ, সেই শ্রীকৃষ্ণ তখনই উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করলেন। বাঁ হাতে রথের লাগাম ধরে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—*পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্কুরূনিতি (গীতা ১-২৫)*—হে পার্থ! যুদ্ধে সমাগত কৌরবদের ঐ দেখ।

ভীষ্ম বলছেন—হে কৃষ্ণ! আমি তখন স্বচক্ষে দেখেছি যে, তুমি যখন অঙ্গুলি নির্দেশ করে অর্জুনকে বলছ—ঐ ভীষ্ম, ঐ কর্ণ, ঐ দ্রোণ ইত্যাদি তখন তুমি কালদৃষ্টিতে তাদের আয়ু হরণ করছ; আবার অর্জুনের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করছ। তোমার তখনকার সেই শত্রু-ধ্বংসী করাল রূপ এবং ভক্তপ্রতিপালকের সস্নেহ মূর্তি আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য গেঁথে রয়েছে। হে ভগবান! সেই পার্থসখার মোহনরূপই যেন আমি আমরণ দেখতে পাই—সেই পার্থসারথি মূর্তিতেই আমার চিত্ত নিবিষ্ট হোক।

ব্যবহিত-পৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া যশ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু ॥
১-৯-৩৬॥

দূরে অবস্থিত শত্রুসৈন্যদের মধ্যে আত্মীয়দের দেখে অর্জুন স্বজন বধ ভয়ে ভীত হয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলে যিনি অর্জুনের সাময়িক অজ্ঞান আত্মবিদ্যার উপদেশ দিয়ে দূর করেছিলেন, সেই পরম পুরুষের চরণে আমার পরমানুরক্তি হোক।

জীবনযুদ্ধে মোহগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মোহগ্রস্ত অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজন এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের দেখে অর্জুনের মনে হলো —এদের সব বধ করে যুদ্ধজয় এবং রাজ্যলাভ করতে হবে? এমন রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই। এইভাবে চিন্তা করে অর্জুন বিষাদাক্রান্ত এবং মোহগ্রস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—*ন যোৎস্য ইতি*—আমি যুদ্ধ করব না।

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে অর্জুনের মোহ দূর করেছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শেষ উপদেশে বলেছিলেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* (গীতা ১৮-৬৬)—সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। আজ অন্তিম সময়ে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেই উপদেশ স্মরণ করছেন—আমি যেন যথার্থই তোমার শরণ নিতে পারি; তোমাতেই যেন আমার রতিমতি থাকে।

স্বনিগমমপহায় মৎ-প্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥
১-৯-৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমি পাণ্ডবদের সাহায্য মাত্র করব, কিন্তু নিজে অস্ত্র ধারণ করব না। আবার ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—আমি এঁকে অস্ত্র ধারণ করাব। ভীষ্ম বলছেন—যিনি নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য অর্জুনের রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পদভরে ধরা কম্পিত করে, সিংহ যেমন হাতিকে বধ করবার জন্য এগিয়ে যায়, সেইরকম ভাবে আমাকে বধ করবার জন্য রথচক্র হস্তে, স্খলিত উত্তরীয় বসনে আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন, সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার অচলা ভক্তি হোক।

ভগবান এবং ভক্তের প্রতিজ্ঞার সংঘাত! ভগবান বললেন—আমি অস্ত্র

ধারণ করব না; আবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—আমি তোমাকে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করব। ভগবান যিনি ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কিছু করা তো সম্ভব নয়; কিন্তু ভগবানের ভক্ত-প্রীতির কি মহিমা! তিনি ভাবলেন—আমার কথা বৃথা হোক ক্ষতি নেই; কিন্তু আমার ভক্তের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হোক। তাই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এখন মৃত্যু শয্যায় ভীষ্মের মনে ভগবানের এই ভক্তবাৎসল্যের কথা মনে হতে তিনি ভগবৎ প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে বারবার প্রার্থনা করছেন—কৃষ্ণই আমার একমাত্র গতি; সেই ভক্ত-বৎসলেই আমার চিত্ত স্থির হোক।

শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ॥
১-৯-৩৮॥

ভীষ্ম বলছেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমি শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে ছিলাম; সুতরাং শত্রুভাবাপন্ন আমার তীক্ষ্ণ বাণে শ্রীভগবানের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন এবং সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত এবং রক্তাক্ত হয়ে গেলে, যিনি বলপূর্বক অর্জুনের বারণ সত্ত্বেও আমাকে বধ করবার জন্য আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন, সেই মুক্তিদাতা মুকুন্দ ভগবানই আমার একমাত্র গতি।

শ্রীভগবানের যখন যে রস আস্বাদন করবার ইচ্ছা হয়, তখন যথাযোগ্য ভক্তের মধ্যে, ভগবানকে সেই রস আস্বাদন করাবার উপযুক্ত আবেশ হয়। ভগবানের যখন যুদ্ধ-রস আস্বাদনের ইচ্ছা হয়, তখন তাঁরই কোন বিশেষ ভক্তের মধ্যে অসুর ভাবের আবেশ হয় এবং ঐ ভাবের মধ্য দিয়েই সেই ভক্ত তখন ভগবানকে যুদ্ধ-রস আস্বাদন করায়। যদিও ভীষ্ম ছিলেন পরম ভক্ত, তবুও যুদ্ধকালে ভগবৎ ইচ্ছায় তাঁর মধ্যে অসুর ভাবের আবেশ হয় এবং তিনি তাঁর ইষ্টমূর্তির প্রতি বাণ প্রহার করে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিলেন। ভীষ্ম বলছেন—যিনি নিজে আহত হয়েও অর্জুনকে আমার বাণ থেকে রক্ষা করবার জন্য আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন—আহা! তাঁর কি ভক্তানুগ্রহ। আমার এত অত্যাচার সহ্য করেও তিনি মৃত্যুর সময় আমায় দর্শন দিতে এসেছেন! তিনি মুক্তিদাতা; একমাত্র তাঁর পক্ষেই এ সম্ভব। ভীষ্ম বলছেন—অর্জুন বারণ করলেও তিনি জোর করে আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন।

বাইরে থেকে মনে হবে এটা যেন ভগবানের অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব—অর্জুনকে রক্ষা করবার জন্য তিনি আসছিলেন। কিন্তু এটা আসলে অর্জুনের প্রতি নয়, আমারই প্রতি ভগবানের পক্ষপাতিত্ব—'আমার ভক্তের প্রতিজ্ঞা আমি মিথ্যা হতে দেব না'। সেই মুক্তিদাতা মুকুন্দ আজ আমায় মুক্তি দিতে এসেছেন; কিন্তু আমি তো মুক্তি চাই না; আমি যেন চিরদিন ভগবানের এই করুণা-মূর্তিই দেখতে পাই।

বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্॥
১-৯-৩৯॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত সৈন্যরাও মুক্তি লাভ করেছিল। অর্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ অশ্ববল্গা ও চাবুক হাতে অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়েছিলেন। আমার আসন্ন মৃত্যুর সময় ভগবানের সেই মূর্তিতে যেন আমার মতি থাকে।

ভীষ্মের যখন ইচ্ছা তখনই তিনি প্রাণ ত্যাগ করতে পারেন—তাঁর ছিল ইচ্ছামৃত্যু বর। তাঁর শেষ ইচ্ছা যে, মৃত্যুর আগে একবার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবেন; তাই শরশয্যায় অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেও তিনি বেঁচে আছেন। যুদ্ধে যারা শ্রীকৃষ্ণকে একবারও দর্শন করেছিল, তারা অসুর-স্বভাব হলেও মুক্তিলাভ করেছিল। ভীষ্ম ভাবছেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁকে দর্শন করার ফলে মুক্তি তাঁর করতলগত; কিন্তু তাঁর প্রাণের ইচ্ছা যে, মৃত্যুর সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণভরে দর্শন করবেন। যে, যে-ভাবনা নিয়ে দেহত্যাগ করে পরে সে তা-ই লাভ করে। ভীষ্ম তা-ই বলছেন, যিনি ভক্তের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে অর্জুনের রথকেও পরম আত্মীয় বোধে রক্ষা করেছেন, যিনি রথ চালকের বেশে পরম শোভার আকর হয়েছিলেন, সেই পার্থসারথির রূপে আমার চিত্ত মগ্ন হোক। তা হলে মৃত্যুর পরে শ্রীভগবানকে এই মূর্তিতে লাভ করতে পারব। ভীষ্ম পার্থসারথির রূপে মগ্ন; তাই তিনি সাযুজ্য মুক্তিও চান না—অর্জুন-সারথির রূপেই বিভোর থাকতে চান।

ললিত-গতি-বিলাস বল্গুহাস-প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ প্রকৃতি-মগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ॥
১-৯-৪০॥

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মরবার সময় সৈন্যেরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে মুক্তিলাভ করেছিল। এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে সৈন্যেরাই যে কেবল মুক্তিলাভ করেছিল এমন নয়। তাঁকে ভালবেসে, তাঁর কাজের অনুকরণ করেও পরম গতি লাভ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর চলন-ভঙ্গি, মনোরম হাস্য পরিহাস এবং সপ্রেম দৃষ্টি-ভঙ্গির দ্বারা ব্রজরমণীদের মান অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই মদান্ধ মহাপ্রেম-বিকারগ্রস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনাদি লীলার অনুকরণ করেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ভীষ্ম বলছেন—আপনার বিশেষ বিশেষ ভক্তেরা কেউ আপনাকে সারথিরূপে, কেউ আপনাকে প্রাণ-প্রিয়রূপে গ্রহণ করেছেন এবং আপনিও তাঁদের সাথে সেই সেই ভাবেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমার তো সেই ভক্তি সেই প্রেম নেই; কিন্তু তাই বলে কি আমি আপনার এই সব মনোরম লীলা দেখতেও পাব না? অসুরেরা বহির্মুখ, ভক্তিহীন; তবুও আপনার কৃপায় আপনাকে দর্শন করে তারা মৃত্যুর পরে মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমি তো অসুর নই; তাই মৃত্যুর পরে সাযুজ্য মুক্তিতে আমার তৃপ্তি হবে না; আমি আপনার লীলাময় রূপই অনন্তকাল ধরে দর্শন করতে চাই।

মুনিগণ নৃপবর্য সঙ্কুলেঽন্তঃসদসি যুধিষ্ঠির-রাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো মম দৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা॥
১-৯-৪১॥

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কত মুনিঋষি এবং প্রবল পরাক্রান্ত রাজারা এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মূর্তি দেখে, 'আহা, কি অপরূপ রূপ'—বলে আশ্চর্য হয়ে তাঁকে দর্শন করেছেন, তাঁর পূজা করেছেন। তিনিও তাঁদের সেই পূজা গ্রহণ করেছেন। সেই পরমাত্মা আজ আমার নয়ন সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন—আমি কৃতকৃতার্থ হলাম।

ভীষ্ম বলছেন—শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র দর্শনীয় এবং জগৎপূজ্য তা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেই সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়েছে। আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নেই। আমি চলচ্ছক্তিহীন, তাই ভগবান নিজে এসে আমায় দর্শন দিয়েছেন। তিনি সর্বজীবের হৃদয়ে আত্মারূপে অবস্থান করলেও, কেউ তাঁকে

জানতে পারে না; কিন্তু সেই পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হয়ে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

> তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি-হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
> প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥
> ১-৯-৪২॥

এই জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম নেই—ইনি অজ, জন্মরহিত; প্রতি জীবের হৃদয়েই ইনি অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। স্থানকাল ভেদে একই সূর্য যেমন বিভিন্ন লোকের কাছে নানাভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরকম এই শ্রীকৃষ্ণই নানারূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। আজ আমার সমস্ত ভেদজ্ঞান, সমস্ত মোহ দূর হয়েছে। আমি সম্যক্‌রূপে অনুভব করেছি যে, জন্মরহিত পরমাত্মাই হচ্ছেন এই শ্রীকৃষ্ণ। ইনি-ই সকল জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত।

প্রয়াণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখে কৃতকৃত্য হয়ে ভীষ্ম বলছেন যে, আজ আমি সর্বমূল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নয়ন সম্মুখে পেয়েছি। একই সূর্যকে নানা জায়গার লোক নানাভাবে দেখে; সূর্যকে কেউ গাছের উপর কেউ মাথার উপর নির্দেশ করে। কিন্তু সূর্য তাতে অনেক হয়ে যায় না। সেইরকম শ্রীকৃষ্ণকে কেউ অন্তর্যামিরূপে, কেউ পরব্রহ্মরূপে, কেউ লীলাময়রূপে দেখে থাকেন; কিন্তু ভগবান তাতে বহু হন না, তিনি একই থাকেন। তিনি অন্তর্যামী, তিনি পরব্রহ্ম আবার তিনিই লীলাময়। কেবল মাত্র বিভিন্ন সাধকের ভাব ও সাধনার জন্য পৃথক পৃথক বলে মনে হয়।

ভীষ্ম বলছেন—হে ভগবান! আপনার কৃপায় আজ আমি মোহমুক্ত অর্থাৎ আপনার অনন্ত প্রকাশ ও অনন্ত মূর্তিতে যে কোন-ই ভেদ নেই, এবং আপনিই যে অচিন্ত্য মহাশক্তির বলে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তা বুঝতে পেরেছি। আপনি মূল স্বরূপে আমার কাছে রয়েছেন এবং আপনিই অনন্তরূপে অনন্ত জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে রয়েছেন। ভীষ্ম দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই 'অজ' বলছেন; তাঁর প্রাকৃত জন্ম না হলেও তিনি ভক্তের জন্য জন্মগ্রহণ করার মতো আবির্ভূত হন—'জাত ইব' যেন জন্মগ্রহণ করেছেন। ভীষ্ম অর্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বমূলাধার জেনে তাঁরই শ্রীচরণে রতি প্রার্থনা করছেন।

এইভাবে হৃদয়ে কৃষ্ণধ্যান, মুখে কৃষ্ণগুণ বর্ণন এবং নয়নে কৃষ্ণরূপ দর্শন করতে করতে ইচ্ছামৃত্যু-বরপ্রাপ্ত ভীষ্ম এই মরজগৎ ত্যাগ করে লীলাময় পার্থসারথির সাথে মিলিত হলেন। পার্থসারথিই ভীষ্মের ইষ্টমূর্তি; তাই তিনি বার বার পার্থসারথির চরণেই রতি প্রার্থনা করেছেন এবং অন্তে তিনি পার্থসারথির সাথেই মিলিত হলেন।

সূর্যাস্ত হলে পৃথিবীর এই অংশের দিন শেষ হয়; কিন্তু পৃথিবীর অপরাংশ এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানে তখনও দিন থাকে। সেইরকম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের পার্থসারথি-লীলা শেষ হয়েছে ঠিক ; কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড থেকে ভগবানের এই লীলা তো একেবারে লোপ পেয়ে যাবে না—কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের পার্থসারথি-লীলা চলবে। সুতরাং ভীষ্ম এই জগৎ ছেড়ে যেখানে ভগবানের পার্থসারথি-লীলা চলছে, সেখানে গিয়ে তাঁর অভীষ্ট পার্থসারথির সাথে মিলিত হলেন।

ভক্তের ইচ্ছা, ভীষ্মের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। যুধিষ্ঠিরের মনে আত্মীয় স্বজন বধের জন্য যে মহাদুঃখ উপস্থিত হয়েছিল তা ভীষ্মের উপদেশে দূর হলো। মহাজ্ঞানী, অষ্টবসুর অন্যতম হয়েও মৃত্যুর সময় ভীষ্ম কেন কেঁদেছিলেন তা ভীষ্মের কৃষ্ণ-স্তুতি থেকে বোঝা গেল। সেই মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই আমাদের একমাত্র গতি হোক।

৭

বিদুর-উদ্ধব সংবাদ (ক)

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত আসন্ন-মৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, মুমূর্ষু-জীব যার কয়েকদিন পরেই মৃত্যু হবে, এমন মানুষের আশু কর্তব্য কি? অনন্তকালের তুলনায় মানুষের জীবন তো ক্ষণস্থায়ী—তা দশ বছরই হোক আর একশ বছরই হোক। সুতরাং সকলেই মুমূর্ষু, সকলেই মৃত্যুর দিকে ধাবমান। এই অবস্থায় মানুষের একান্ত কর্তব্য কি, মানুষের সর্ব প্রথম কি করা উচিত—এই হচ্ছে সর্বকালের, সকল মানুষের, সবচেয়ে বড়, সব চেয়ে জরুরী প্রশ্ন। এই প্রশ্ন দিয়েই ভাগবত-কথা আরম্ভ হয়েছে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ব্রহ্মর্ষি শুকদেব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টিতত্ত্ব, যোগ-সিদ্ধির উপায়, অবতার তত্ত্ব, অবতারের লীলাকথা, বিশেষ বিশেষ ভক্তের উপাখ্যান—ইত্যাদি বিষয় বলতে আরম্ভ করলেন। শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপলক্ষ করে সর্বকালের মানুষের কল্যাণের জন্য ভাগবত-কথা বলে যাচ্ছেন আর অসংখ্য মুনিঋষি পরিবৃত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই অমৃতময়ী কথা শুনছেন। ভাগবত-কথা শুনতে শুনতে যখনই পরীক্ষিতের মনে কোন প্রশ্ন উঠেছে, তখনই তিনি তা শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং শুকদেবও তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরীক্ষিতের মনের সংশয় দূর করেছেন।

ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে কয়েকটির উত্তর দিয়ে শুকদেব বলেছিলেন—তুমি আরও যেসব প্রশ্ন করেছ, তা পূর্বে কোন এক সময় মহামতি বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে করেছিলেন। পরীক্ষিতের প্রশ্নের সাথে বিদুর ও মৈত্রেয় মুনির নাম উল্লেখ করে শুকদেব যেন পরীক্ষিতের প্রশংসা করে ইঙ্গিতে বললেন যে, তোমার প্রশ্নগুলো অত্যন্ত সমীচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ; নইলে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর কখনও ঐ সব প্রশ্ন মহামুনি মৈত্রেয়কে করতেন না; আর মৈত্রেয় মুনিও প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝেই সেই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে

এইভাবে হৃদয়ে কৃষ্ণধ্যান, মুখে কৃষ্ণগুণ বর্ণন এবং নয়নে কৃষ্ণরূপ দর্শন করতে করতে ইচ্ছামৃত্যু-বরপ্রাপ্ত ভীষ্ম এই মরজগৎ ত্যাগ করে লীলাময় পার্থসারথির সাথে মিলিত হলেন। পার্থসারথিই ভীষ্মের ইষ্টমূর্তি; তাই তিনি বার বার পার্থসারথির চরণেই রতি প্রার্থনা করেছেন এবং অন্তে তিনি পার্থসারথির সাথেই মিলিত হলেন।

সূর্যাস্ত হলে পৃথিবীর এই অংশের দিন শেষ হয়; কিন্তু পৃথিবীর অপরাংশ এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানে তখনও দিন থাকে। সেইরকম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের পার্থসারথি-লীলা শেষ হয়েছে ঠিক; কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড থেকে ভগবানের এই লীলা তো একেবারে লোপ পেয়ে যাবে না—কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের পার্থসারথি-লীলা চলবে। সুতরাং ভীষ্ম এই জগৎ ছেড়ে যেখানে ভগবানের পার্থসারথি-লীলা চলছে, সেখানে গিয়ে তাঁর অভীষ্ট পার্থসারথির সাথে মিলিত হলেন।

ভক্তের ইচ্ছা, ভীষ্মের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। যুধিষ্ঠিরের মনে আত্মীয় স্বজন বধের জন্য যে মহাদুঃখ উপস্থিত হয়েছিল তা ভীষ্মের উপদেশে দূর হলো। মহাজ্ঞানী, অষ্টবসুর অন্যতম হয়েও মৃত্যুর সময় ভীষ্ম কেন কেঁদেছিলেন তা ভীষ্মের কৃষ্ণ-স্তুতি থেকে বোঝা গেল। সেই মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই আমাদের একমাত্র গতি হোক।

৭

বিদুর-উদ্ধব সংবাদ (ক)

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত আসন্ন-মৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, মুমূর্ষু-জীব যার কয়েকদিন পরেই মৃত্যু হবে, এমন মানুষের আশু কর্তব্য কি? অনন্তকালের তুলনায় মানুষের জীবন তো ক্ষণস্থায়ী—তা দশ বছরই হোক আর একশ বছরই হোক। সুতরাং সকলেই মুমূর্ষু, সকলেই মৃত্যুর দিকে ধাবমান। এই অবস্থায় মানুষের একান্ত কর্তব্য কি, মানুষের সর্ব প্রথম কি করা উচিত—এই হচ্ছে সর্বকালের, সকল মানুষের, সবচেয়ে বড়, সব চেয়ে জরুরী প্রশ্ন। এই প্রশ্ন দিয়েই ভাগবত-কথা আরম্ভ হয়েছে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ব্রহ্মর্ষি শুকদেব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টিতত্ত্ব, যোগ-সিদ্ধির উপায়, অবতার তত্ত্ব, অবতারের লীলাকথা, বিশেষ বিশেষ ভক্তের উপাখ্যান—ইত্যাদি বিষয় বলতে আরম্ভ করলেন। শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপলক্ষ করে সর্বকালের মানুষের কল্যাণের জন্য ভাগবত-কথা বলে যাচ্ছেন আর অসংখ্য মুনিঋষি পরিবৃত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই অমৃতময়ী কথা শুনছেন। ভাগবত-কথা শুনতে শুনতে যখনই পরীক্ষিতের মনে কোন প্রশ্ন উঠেছে, তখনই তিনি তা শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং শুকদেবও তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরীক্ষিতের মনের সংশয় দূর করেছেন।

ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে কয়েকটির উত্তর দিয়ে শুকদেব বলেছিলেন—তুমি আরও যেসব প্রশ্ন করেছ, তা পূর্বে কোন এক সময় মহামতি বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে করেছিলেন। পরীক্ষিতের প্রশ্নের সাথে বিদুর ও মৈত্রেয় মুনির নাম উল্লেখ করে শুকদেব যেন পরীক্ষিতের প্রশংসা করে ইঙ্গিতে বললেন যে, তোমার প্রশ্নগুলো অত্যন্ত সমীচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ; নইলে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর কখনও ঐ সব প্রশ্ন মহামুনি মৈত্রেয়কে করতেন না; আর মৈত্রেয় মুনিও প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝেই সেই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে

ত্রুটি করেননি। যেখানে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা দুজনেই মহাপুরুষ এবং মহাপণ্ডিত, সেখানে বুঝতে হবে যে, বিচারের বিষয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—তাঁরা কখনও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করেন না। এদিকে বিদুরের নাম শুনেই মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে উঠলেন—বিদুর যে তাঁরই প্রপিতামহ মহামতি পাণ্ডুর বৈমাত্রেয় ভাই।

এবমেতৎ পুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল।
ক্ষত্রা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ ॥ ৩-১-১ ॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কোন এক সময় বিদুর তাঁর সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়ে—তুমি আজ যেসব প্রশ্ন করলে, সেই সব প্রশ্নই মহামুনি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

বিদুর তো সাধারণ লোক নন—তিনি রাজমন্ত্রী, মহাপ্রাজ্ঞ এবং মূর্তিমান ধর্ম। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে যখন কৌরব সভায় এসেছিলেন, তখন তিনি দুর্যোধনের গৃহে না গিয়ে অনাহূতভাবে আপন-জ্ঞানে বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। শুকদেবের কাছে বিদুরের কথা শুনে পরীক্ষিৎ অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে বললেন—হে প্রভু! ভগবান মৈত্রেয় মুনির সাথে কখন, কোথায়, কি পরিস্থিতিতে বিদুরের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তা আমাদের সবিস্তারে বলুন। কারণ তাঁরা তো সামান্য বিষয় নিয়ে আলাপ করেন নি! যাতে মানুষের কল্যাণ হয়, সেই সব বিষয় নিয়েই তাঁরা আলাপ করে থাকবেন। সুতরাং তাঁদের কথা শুনতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়েছি। মহারাজ পরীক্ষিৎ আরও বললেন—আপনি এইমাত্র বললেন যে, বিদুর তাঁর সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ বাসগৃহ ছেড়ে বনে চলে যান—এর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ ছিল। বিদুর কেন গৃহত্যাগ করে বনে গেলেন, সেই কথাই আপনি প্রথমে বলুন—কারণ বুঝতেই পারছেন বিদুরের সম্বন্ধে জানবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি।

পরীক্ষিতের কথা শুনে শুকদেব তখন বললেন যে, পূর্বজন্মের কোন পাপের ফলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। এই জন্মেও তিনি পাপমতি পুত্রদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের প্রতি অকথ্য অন্যায়

আচরণ করতে লাগলেন। পাণ্ডুপুত্রদের প্রতি ঐ সব অন্যায় আচরণ সহ্য করতে না পেরে বিদুর মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর শুকদেব একে একে সেই সব অন্যায় আচরণের কথা বলতে লাগলেন ঃ

যদা তু রাজা স্বসুতানসাধূন্ পুষ্ণন্নধর্মেণ বিনষ্টদৃষ্টিঃ।
ভ্রাতুর্যবিষ্ঠস্য সুতান্ বিবন্ধূন্ প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ ॥
৩-১-৬ ॥

শুকদেব বললেন—যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেরই ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের জতুগৃহে বধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন মনের দুঃখে বিদুর নিজগৃহ ত্যাগ করে বনে যেতে মনস্থ করলেন। যদিও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মহামন্ত্রী, তবুও বিদুরের পক্ষে এই অধর্মাচরণ, এই অন্যায় সহ্য করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। তা ছাড়া যাদের উপর অত্যাচার করা হলো তারাও যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।

যদা সভায়াং কুরুদেবদেব্যাঃ কেশাভিমর্ষং সুতকর্ম গর্হ্যম্।
ন বারয়ামাস নৃপঃ স্নুষায়াঃ স্বাস্রৈর্হরন্ত্যাঃ কুচকুঙ্কুমানি॥
৩-১-৭॥

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ-স্বরূপা দ্রৌপদীকে যখন দুঃশাসন সভামধ্যে কেশাকর্ষণ করেছিল, তখন দুঃখে, অপমানে, চোখের জলে দ্রৌপদীর বুক ভেসে যেতে লাগল। শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই এই জঘন্য ঘটনা ঘটে গেল; অথচ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের এই নিন্দনীয় কাজে কোনরকম বাধা দিলেন না। বিদুর বুঝলেন যে, এর পরিণাম হবে অতি ভয়ঙ্কর; কৌরব বংশ সমূলে ধ্বংস হবে। তাই তিনি মনের দুঃখে গৃহ ছেড়ে বনে যাওয়াই ঠিক করলেন।

মহাভারতে রয়েছে যে, দুঃশাসন যখন কেশাকর্ষণ করে দ্রৌপদীকে রাজ-সভায় নিয়ে এল, তখন কুরুবৃদ্ধেরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন বটে, কিন্তু প্রতিবাদ কেউই করলেন না। তখন সেই সভায় দ্রৌপদী বলেছিলেন—অন্যায়, জঘন্য কাজের নিন্দা নেই, প্রতিবাদ নেই; ভারতবর্ষ থেকে ধর্ম কি লোপ পেয়ে গেছে? ক্ষত্রিয় কি তার আদর্শ ভুলে গেছে? তা না হলে ধর্মের মর্যাদা পদদলিত হচ্ছে দেখেও কুরু-প্রধানরা এই সভায় চুপ করে বসে আছেন কেন? ভীষ্ম দ্রৌপদীর প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন—ধর্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিস;

তাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। সেই রাজসভায় যখন সবাই নীরব, তখন বিদুর নির্ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

ততো বাহূ সমুৎক্ষিপ্য নিবার্য চ সভাসদঃ।
বিদুরঃ সর্ব-ধর্মজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥

(মহাভারত-সভাপর্ব-৬৫-৫২)

বিদুর তখন দুই হাত তুলে সভাসদদের ভর্ৎসনা করে বললেন—রাজনন্দিনী রাজপুত্র-বধূ দ্রৌপদী অনাথের মতো কেঁদে কেঁদে এই সভায় প্রশ্ন করছেন—আর তোমরা সভাসদেরা তার কোন উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করছ না—বুঝতে পারছ না যে, এতে ধর্ম পীড়িত হচ্ছে। আর্ত যখন সুবিচারের আশায় রাজদ্বারে আসে তখন সে আর্ত নয়—সাক্ষাৎ প্রজ্বলিত অগ্নি; এবং সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে শান্ত করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ধর্মবারি সিঞ্চন। সুবিচারের জন্য আগত আর্তরূপী অগ্নিকে সত্য এবং ধর্মের দ্বারা প্রশমিত করতে হয়। আজকের এই অধর্ম আচরণে যারা প্রতিবাদ করবে না, তারাও এই অধর্মের ফলভাগী হবে।

কয়েক হাজার বছর আগে বিদুর যে ধর্ম এবং সুবিচারের কথা বলেছেন, তা আজও পৃথিবীর সব দেশে, সকল সমাজে প্রযোজ্য। মানুষের শাশ্বত নীতিবোধ এবং সুবিচার যে দেশে, যে সমাজে বারবার উপেক্ষিত হয়, সে দেশ, সে সমাজ বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না। কৌরব সভায় সে দিন বিদুরই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নির্ভীকভাবে অন্যায়কে অন্যায় বলতে পেরেছিলেন। বিদুর অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই সেদিন বুঝেছিলেন যে, এরা ভাল কথা শুনবে না; সুতরাং কুরুবংশও বাঁচবে না। তাই তিনি বনে যাওয়াই স্থির করলেন।

দ্যূতে ত্বধর্মেণ জিতস্য সাধোঃ সত্যাবলম্বস্য বনাগতস্য।
ন যাচতোঽদাৎ সময়েন দায়ং তমো জুষাণো যদজাতশত্রোঃ॥

৩-১-৮॥

সত্যাশ্রয়ী অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় অন্যায়ভাবে পরাজিত হলেন, তবুও তিনি সত্যরক্ষার জন্য বনগমন করেছিলেন; কিন্তু বনবাসের সময় উত্তীর্ণ হলেও পূর্বশর্তানুযায়ী ধৃতরাষ্ট্র মোহের বশে যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য

রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিলেন না। বিদুর তখন ঠিক করলেন যে, এই অন্যায়কারীদের সংশ্রবে আর থাকা উচিত নয়।

যদা চ পার্থপ্রহিতঃ সভায়াং জগদ্‌গুরুর্যানি জগাদ কৃষ্ণঃ।
ন তানি পুংসামমৃতায়নানি রাজোরু মেনে ক্ষতপুণ্যলেশঃ॥

৩-১-৯॥

যখন সর্বজনপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কর্তৃক প্রেরিত হয়ে কুরুরাজসভায় এসেছিলেন, তখন তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজসভায় যে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, তা বিদুর, ভীষ্ম প্রভৃতি সভাসদদের কাছে পরম সুখকর এবং অমৃত তুল্য হিত-কারী বলে মনে হলেও, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যাঁর পুণ্যফল প্রায় শেষ হয়ে এসে-ছিল, সেই তিনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশও গ্রহণ করলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পুণ্যফল প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল—বলার উদ্দেশ্য এই যে, তার আর সমস্ত পুণ্যফল শেষ হয়েই ছিল; কেবল আরও কিছুদিন রাজ্যভোগের পুণ্যফল অবশিষ্ট ছিল। বিদুর ভাবলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাও যারা মানে না, তাদের ধ্বংসের আর দেরি কি ? সুতরাং গৃহত্যাগ করে বনে যাওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করলেন।

কুরুরাজসভায় সেদিন শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে ভরতনন্দন! যাতে কুরু-পাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনাদের বংশ সকল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ; এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোন অন্যায় কর্ম হওয়া উচিত নয়। দুর্যোধনাদি আপনার পুত্রগণ অশিষ্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভী; এরা ধর্মাদি পরিহার করে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে। কৌরবগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে আর আপনিও যদি উপেক্ষা করেন, তবে পৃথিবী ধ্বংস হবে। আপনি ইচ্ছা করলেই এই বিপদ নিবারিত হতে পারে। মহারাজ! যদি পুত্রদের শাসন করেন এবং সন্ধির জন্য যত্নবান হন, তবে দুই পক্ষেরই মঙ্গল হবে। পাণ্ডবগণ যদি আপনার রক্ষক হন, তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবে না। যে পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি আছেন, সেই পক্ষে যদি পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি যোগ দেন, তবে কোন্ দুর্বুদ্ধি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে? কৌরব ও পাণ্ডবগণ মিলিত

হলে আপনি অজেয় ও পৃথিবীর অধিপতি হবেন; প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন। পাণ্ডবগণ অথবা আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হলে আপনার কি সুখ হবে বলুন? পৃথিবীর সকল রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন; তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধ্বংস করবেন। মহারাজ, এই প্রজাবর্গকে আপনি ত্রাণ করুন, আপনি প্রকৃতিস্থ হলে এরা জীবিত থাকবে। এরা নিরপরাধ, দাতা, লজ্জাশীল, সজ্জন, সদ্‌বংশীয় এবং পরস্পরের সুহৃৎ; আপনি মহাভয় থেকে এঁদের রক্ষা করুন। এই রাজারা যারা উত্তম বসন ও মাল্যধারণ করে এখানে সমবেত হয়েছেন, এরা ক্রোধ ও শত্রুতা ত্যাগ করে পানভোজনে তৃপ্ত হয়ে নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। পিতৃহীন পাণ্ডবগণ আপনার আশ্রয়েই বর্ধিত হয়েছিলেন, আপনি এখনও তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন।

সকলের কল্যাণপ্রদ কি সুন্দর, নীতি ও মর্যাদাপূর্ণ কথাই সেদিন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন! তাঁর কথা শুনলে রক্তক্ষয়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই হতো না। কিন্তু দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের কথায় কর্ণপাতও করল না, বরং শ্রীকৃষ্ণকেই বন্ধন করতে চাইল! বিদুর বুঝলেন, ধ্বংসোন্মুখী এদের আর রক্ষা করা যাবে না।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভয় ঢুকেছে—শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বিমুখ করেছেন; তাই পরামর্শ করবার জন্য ধর্মাত্মা অগাধ-বুদ্ধি মন্ত্রী বিদুরকে ডেকে পাঠালেন।

> যদোপহূতো ভবনং প্রবিষ্টো মন্ত্রায় পৃষ্টঃ কিল পূর্বজেন।
> অথাহ তন্মন্ত্রদৃশাং বরীয়ান্ যন্মন্ত্রিণো বৈদুরিকং বদন্তি॥
>
> ৩-১-১০॥

মন্ত্রণা বিষয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ বিদুরকে যখন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ডেকে পাঠিয়ে তাঁর কাছে সুপরামর্শ চাইলেন, তখন বিদুর যে সব অতি মঙ্গলকারী পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা এখনও মন্ত্রণা-বিশারদ ব্যক্তিরা 'বিদুর-বাক্য' বলে অভিহিত করে থাকেন।

রাজ্য-লোলুপ দুর্যোধনের কুপরামর্শে এবং পুত্রস্নেহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের প্রতি বহু অন্যায় ব্যবহার করেছেন। তাতে তার মনে মাঝে মাঝে বিবেকের দংশন হতো। তাই একদিন তিনি পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দেবার বিষয়ে দুর্যোধনকে না জানিয়েই বিদুরের পরামর্শ

চেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসিত হয়ে বিদুর তখন তিনটি শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা এতই সমীচীন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে হিতকারী ছিল যে, মন্ত্রী সম্প্রদায়ের কাছে এখনও বিদুরের সেই পরামর্শ 'বৈদুরিক'—বিদুর-বাক্য নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। বিদুর পরামর্শ দিয়েছিলেন ঃ

অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং তিতিক্ষতো দুর্বিষহং তবাগঃ।
সহানুজো যত্র বৃকোদরাহিঃ শ্বসন্ রুষা যৎ ত্বমলং বিভেষি॥
৩-১-১১॥

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির আপনার অসহনীয় অপরাধও সহ্য করে যাচ্ছেন। জতুগৃহ-দাহ, সভার মাঝে দ্রৌপদীর অপমান প্রভৃতি অতি জঘন্য অত্যাচার আপনার পুত্রেরা পাণ্ডবদের প্রতি করেছে; কিন্তু আপনি তাদের বাধা দেননি। সহ্য করা যায় না এমন অপরাধ করলেও যুধিষ্ঠির কিন্তু আপনাকে কিছু বলেননি—কারণ সে অজাতশত্রু, কারও প্রতি শত্রুতা করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। এমন যে ধার্মিক যুধিষ্ঠির তার রাজ্যাংশ তাকে ফিরিয়ে দিন; নইলে আপনার মহা অকল্যাণ হবে। ভীমের স্বভাব এবং শক্তি আপনি তো জানেন এবং তার জন্য ভীমকে আপনি অত্যন্ত ভয় করেন। সেই ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের সাথে আপনাদের অত্যাচারে অধীর হয়ে ক্রোধে দলিত সর্পের মতো ফুঁসছে; সুযোগ পেলেই তারা এই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে।

বিদুর হচ্ছেন মহাবিচক্ষণ মন্ত্রী; প্রত্যেকটি কথা তিনি মেপে বলেন; অযথা কারণ ছাড়া কোন কথা বলবার তিনি লোক নন। এই শ্লোকে বিদুর বলছেন যে, ভীম এবং তার কনিষ্ঠ ভায়েরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। এতে ধৃতরাষ্ট্র বলতে পারেন যে, ওরা রেগে আছে, থাকুক ; তার জন্য আমি ভয় পাব কেন; অতি বীর্যশালী আমারও তো একশ পুত্র রয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের মনে এইরকম চিন্তা আসতে পারে মনে করে বিদুর পরের শ্লোকে বললেন যে, আপনাদের যত শক্তিই থাকুক না কেন, পাণ্ডবদের কাছে আপনারা কিছুই নয়। পাণ্ডবদের যে একটি অসাধারণ শক্তি আছে, তা আপনাদের নেই; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন পাণ্ডবদের সেই শক্তি—কৃষ্ণ-বলে তারা বলীয়ান।

পার্থাংস্তু দেবো ভগবান্ মুকুন্দো গৃহীতবান্ সক্ষিতিদেবদেবঃ।
আস্তে স্বপুর্য্যাং যদুদেবদেবো বিনির্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ॥
৩-১-১২॥

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন—শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ বলে ভাববেন না; তিনি সাক্ষাৎ ভগবান—মানুষরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সমস্ত ঐশী শক্তি তাঁর করতলগত। সেই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছেন—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব হচ্ছেন পাণ্ডব-জননী কুন্তীর ভাই; সুতরাং কুন্তী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পিসিমা। দেবতা এবং ব্রাহ্মণ—এঁরা সবাই শ্রীকৃষ্ণের সহায়ক, তাঁরা কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র। শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় হবার জন্য পাণ্ডবেরা সর্বদাই দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সহায়তা লাভ করবে। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, যদু-প্রধানদের তিনি পরম পূজ্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে পক্ষে থাকবেন, বিপুল যদুবংশ সেই দিকেই থাকবে। শুধু তাই নয়—শ্রীকৃষ্ণ নিজের অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বহু রাজাকে পরাভূত করেছেন। জরাসন্ধ যুদ্ধে অজেয় হবার জন্য ১০০ রাজাকে বলি দিয়ে ভৈরবের পূজা করবে ঠিক করেছিল এবং তার জন্য জরাসন্ধ ৮৬ জন রাজাকে পরাজিত করে বন্দী করে রেখেছিল। আর ১৪ জন রাজা হলেই জরাসন্ধ তাদের সকলকে ভৈরবের সামনে বলি দিত। শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে দিয়ে জরাসন্ধকে বধ করিয়ে ঐ সব ৮৬ জন রাজাকে মুক্তি দিয়েছিলেন; ফলে ঐ সব রাজারা এবং আরও বহু নৃপতি শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকায় রাজ্য স্থাপন করে সেখানেই রয়েছেন। দরকার হলেই তিনি সর্ব শক্তি দিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্য করবেন। সুতরাং পাণ্ডবদের সাথে শত্রুতা না করে, তাদের ন্যায্য অংশ ফিরিয়ে দেওয়া সর্বতোভাবেই উচিত।

স এষ দোষঃ পুরুষদ্বিড়াস্তে গৃহান্ প্রবিষ্টো যমপত্যমত্যা।
পুষ্ণাসি কৃষ্ণাদ্বিমুখো গতশ্রী স্ত্যজাশ্বশৈবং কুলকৌশলায় ॥
৩-১-১৩ ॥

বিদুর ভাবলেন যে ধৃতরাষ্ট্র হয়ত বলবেন—আমি তো পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিতেই চাই; কিন্তু দুর্যোধন যে কিছুতেই রাজি নয়। তার জন্য বিদুর বললেন—দুর্যোধনকে উপেক্ষা করাই আপনার কর্তব্য; কারণ যাকে আপনি অপত্য, পুত্র বলে ভাবছেন, সেই দুর্যোধন কিন্তু যথার্থ আপনার অপত্য নয়। অপত্য হচ্ছে সে, যে কখনও মাতা-পিতার অধঃপতনের কারণ হয় না। কিন্তু দুর্যোধনের প্রতি মোহের বশে আপনি অধর্মোচিত অন্যায় কাজ করে চলেছেন। জানবেন, সে মূর্তিমান পাপ—পুত্ররূপে আপনার গৃহে প্রবেশ

করেছে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে এসেছিলেন—সামান্য ৫টি গ্রামের পরিবর্তে সন্ধি স্থাপন করতে; কিন্তু আপনি তাতেও রাজি হলেন না। তার উপর দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের সাথে অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছে। সুতরাং পুত্রের মোহে আপনি কৃষ্ণ-বিমুখ হয়েছেন; লক্ষ্মী আপনাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। তাই বলছি—এখনও সময় আছে; বংশের মঙ্গলের জন্য আপনি এই বংশের অমঙ্গলস্বরূপ কুলাঙ্গার পুত্রকে ত্যাগ করুন।

কৌরবদের মঙ্গলের জন্য বিদুর ধর্ম, নীতি এবং সময়োপযোগী যে সৎ পরামর্শ দিলেন, দুর্ভাগ্যবশত ধৃতরাষ্ট্র তা গ্রহণ করতে পারলেন না। রাজ্যলোভ, দাম্ভিকতা এবং পাণ্ডবদের প্রতি হিংসার জন্য বিদুরের আবেদন-নিবেদন দুর্যোধন সহ্য করতে পারল না। ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই দুর্যোধন বিদুরকে চরম অপমান করে বসল।

ইত্যূচিবাংস্তত্র সুযোধনেন প্রবৃদ্ধকোপ-স্ফুরিতাধরেণ।
অসৎকৃতঃ সৎস্পৃহণীয়শীলঃ ক্ষত্তা সকর্ণানুজসৌবলেন॥

৩-১-১৪॥

সাধুজনের শ্রদ্ধার পাত্র বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপরোক্ত সৎ পরামর্শ দিলেন বটে; কিন্তু তা শুনে ক্রোধে দুর্যোধনের অধর কম্পিত হতে লাগল। সে তখন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সাথে মিলিত হয়ে বিদুরকে যৎপরোনাস্তি অপমান করতে লাগল। বিদুর তো দুর্যোধনের কাকা—ধৃতরাষ্ট্রের ভাই, অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু দুর্যোধন তখন রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই অকথ্য ভাষায় বিদুরকে গালাগালি দিতে লাগল। বললে—এই অতি কুটিল দাসী-পুত্রকে এখানে কে ডেকেছে? এ যার খাচ্ছে তারই শত্রুতা করছে; একে আচ্ছা করে মেরে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রেখে এখান থেকে দূর করে দাও।

স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈর্ভ্রাতুঃ পুরো মর্মসু তাড়িতোঽপি।
স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় মায়াং গতব্যথোঽযাদুরু মানয়ানঃ॥

৩-১-১৬॥

ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এমন হৃদয়-বিদারী তিরস্কার শুনে বিদুরের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগল; বিশেষত ধৃতরাষ্ট্রের সামনে তাকে এমন অপমান

করা হলো, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র প্রতিবাদে একটি কথাও বললেন না। বিদুর দুঃখিত হলেন বটে কিন্তু দুঃখে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন না। কারণ তিনি জানতেন যে মায়ার অসাধ্য কর্ম নেই; মায়ার প্রভাবে জগতে সব কিছুই সম্ভব হতে পারে। দুর্যোধন অত্যন্ত মায়াচ্ছন্ন; সুতরাং এমন দুর্বাক্য তারই পক্ষে বলা সম্ভব; মায়ার প্রভাবে মানুষ কি না করতে পারে? মায়ার বশীভূত হয়ে মানুষ শুভাশুভ বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে পশুর মতো ব্যবহার করতে থাকে। এই মায়ার হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে মায়ার যিনি অধীশ্বর, সেই ভগবানের শরণ নিতে হবে।

এইভাবে চিন্তা করে বিদুর শোকাবেগ প্রশমিত করে স্বেচ্ছায় সেখান থেকে চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি তার নিজের ধনুকটি দরজার পাশেই রেখে গেলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিদুর তাঁর ভবিষ্য-জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। ভাবলেন—এদের পাপের মাত্রা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে শিগ্‌গিরই এদের সর্বনাশ হবে; আমি থেকেও এদের রক্ষা করতে পারব না; সুতরাং আমার আর এখানে থাকার সার্থকতা নেই। তাছাড়া দুর্যোধনের এই অপমানের পর আর এখানে থাকাও যায় না। কিন্তু যাব কোথায়? তখনই ভাবলেন—কেন, ভগবানের নাম করে তীর্থে তীর্থে ভগবানের মহিমা দর্শন করে বেড়াব। তাই যদি করি, তবে আমার আর ধনুকের প্রয়োজন কি? বিশেষত ধনুকটি যদি নিয়ে যাই তবে এরা ভাববে যে, আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যই চলে গেছি। বিদুর তাই নিজের ধনুকটি সকলে যাতে দেখতে পায় এমন জায়গায়, দরজার পাশে রেখে কৌরবদের ত্যাগ করে চলে গেলেন। দুর্যোধনের লোকেদের দ্বারা বিতাড়িত হবার আগেই বিদুর গৃহ ত্যাগ করলেন।

স নির্গতঃ কৌরবপুণ্যলব্ধো গজাহ্বয়াৎ তীর্থপদঃ পদানি।
অন্বাক্রমৎ পুণ্যচিকীর্ষয়োর্ব্যামধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্তিঃ॥

৩-১-১৭॥

বহু পুণ্যের ফলে কৌরবেরা যাঁকে লাভ করেছিলেন, সেই বিদুর হস্তি নামক পুরী থেকে, হস্তিনাপুর * থেকে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কৌরবদের ধর্মবুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতা এবং ভাগ্যলক্ষ্মীও যেন তাঁদের ত্যাগ করে গেলেন।

* হস্তিনাপুর—মিরাটের নিকট

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছিলেন—বিদুর কেন তার সর্ব-ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়েছিলেন। পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুকদেব পরীক্ষিতের অপর প্রশ্ন—কোথায়, কখন, কি পরিস্থিতিতে বিদুরের সাথে মৈত্রেয় মুনির সাক্ষাৎ হয়েছিল, এইবার তা বলতে আরম্ভ করলেন।

শুকদেব বললেন—হস্তিনাপুর ত্যাগ করে চলে যাবার পর বিদুর নানা তীর্থক্ষেত্রে পুণ্যলাভের আশায় বিচরণ করতে লাগলেন। ভগবান সহস্র মূর্তিতে অর্থাৎ অসংখ্য মূর্তিতে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবী প্রভৃতি বহু রূপে এবং বহু-ভাবে বিভিন্ন তীর্থে অবস্থান করেন। বিদুর নানা তীর্থে গিয়ে বিভিন্ন মূর্তিতে ভগবানকে দর্শন এবং তাঁর আরাধনা করে বেড়াতে লাগলেন।

গাং পর্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ সদাপ্লুতোঽধঃ শয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশো ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি॥
৩-১-১৯॥

বিদুর যখন তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করছিলেন, তখন ভগবানের প্রীতির জন্য তিনি নানা কঠোর ব্রত পালন করতেন। তিনি অত্যন্ত পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করছিলেন; তীর্থজলে স্নান, ভূমিতে শয়ন, শরীরের কোনরকম যত্ন না করে অবধূত বেশে ঘুরে বেড়াতেন। তখন তাঁকে দেখলে তাঁর আত্মীয়রাও আর চিনতে পারত না।

এইভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে যখন প্রভাস তীর্থে এলেন, তখন তিনি শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে যুধিষ্ঠির ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছে এবং নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য কৌরব বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। কৌরবদের বিনাশের কথা শুনে বিদুরের কোমল প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা লাগে। তিনি কাউকে কিছু না বলে, ভগবানের স্মরণ-মননে এই গভীর শোকের উপশমের জন্য সরস্বতী নদীর দিকে চলে গেলেন। এই সরস্বতী নদীর পারে পারে শ্রীহরির নামাঙ্কিত এবং চক্রশোভিত বহু মন্দির রয়েছে যা দেখে সহজেই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হয়। এইভাবে মন্দির দর্শন এবং কৃষ্ণ-চিন্তায় বিদুর আবার শান্ত হলেন।

ততস্ত্বতিব্রজ্য সুরাষ্ট্রমৃদ্ধং সৌবীরমৎস্যান্ কুরুজাঙ্গলাংশ্চ।
কালেন যাবদ্ যমুনামুপেত্য তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ॥

৩-১-২৪॥

বিভিন্ন তীর্থ ও মন্দির দর্শন করতে করতে ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হয়ে বিদুর ক্রমে সমৃদ্ধিশালী সুরাষ্ট্র, সৌবীর, মৎস্য, কুরুজাঙ্গল* প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করে অবশেষে যমুনার তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে মহাভাগবত উদ্ধবের সাথে বিদুরের দেখা হলো।

স বাসুদেবানুচরং প্রশান্তং বৃহস্পতেঃ প্রাক্ তনয়ং প্রতীতম্।
আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং স্বানামপৃচ্ছদ্ভগবৎ প্রজানাম্ ॥

৩-১-২৫ ॥

উদ্ধব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অনুচর; অতিশান্ত স্বভাব এবং বৃহস্পতির শিষ্যরূপে প্রসিদ্ধ। জ্ঞান ও ভক্তিতে তিনি সকলের শীর্ষস্থানীয়। এদিকে বিদুরও পরম জ্ঞানী, ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ এবং ভক্তিপথের পথিক। দুইজনেই শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত; তাই বহুদিন পরে আচম্বিতে উদ্ধবকে দেখে বিদুর পরম আনন্দিত হয়ে তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

বহু বছর পর দুইজনের দেখা; দুইজনেই ছিলেন রাজপুরুষ; আর আজ তাঁরা দুইজনেই মলিন বেশধারী রমতা সাধু! অবস্থার কি পরিবর্তন! এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা বলে থাকে? —বহুদিন পরে দেখা হলো কেমন আছ ইত্যাদি। সবই নিজেদের সম্বন্ধীয় কথা। কিন্তু বিদুর কি প্রশ্ন করলেন?

কচ্চিৎ পুরাণৌ পুরুষৌ স্বনাভ্যপাদ্মানুবৃত্ত্যেহ কিলাবতীর্ণৌ।
আসাত উর্ব্যাঃ কুশলং বিধায় কৃতক্ষণৌ কুশলং শূরগেহে ॥

৩-১-২৬॥

নিজের নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে যিনি জগতে অবতীর্ণ

---

* সুরাষ্ট্র—বর্তমান কাথিয়াবাড় ও গুজরাট, সৌবীর—রাজপুতনার দক্ষিণভাগ, মতান্তরে সিন্ধু প্রদেশ: মৎস্য—জয়পুর: কুরুজাঙ্গল—কুরুক্ষেত্র ও তার উত্তর দিক।

হয়ে পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন, সকলের আনন্দ বিধান করেছেন, সেই পুরাণ-পুরুষ, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ শূরসেনের গৃহে কুশলে আছেন তো?

বিদুর বলছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম স্বয়ং ভগবান, পুরাণ-পুরুষ। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে যে, বিদুরের যদি জানাই ছিল যে তাঁরা ভগবান, তা হলে তাঁদের সম্বন্ধে কুশল প্রশ্ন যে নিরর্থক হয়ে পড়ে। ভগবান নিত্যশ্রী, নিত্যমঙ্গল; তাঁর সম্বন্ধে আবার অমঙ্গলের আশঙ্কা কেমন করে হতে পারে? এর উত্তর হলো এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার আধিক্যের জন্যই বিদুরের মনে এই প্রশ্ন উঠেছিল। ভালবাসার স্বভাবই হলো এই যে, ভালবাসা দিয়ে ভালবাসার পাত্রটির স্বরূপকে ঢেকে দেওয়া। যেমন মা যশোদা চোখের সামনে শ্রীকৃষ্ণের কত অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়েও মনে করতেন— কৃষ্ণ আমার দুধের শিশু; আমি না দেখলে হবে না। যশোদার মাতৃ-স্নেহ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যকে, তাঁর স্বরূপকে ঢেকে রেখেছিল। সেইরকম বিদুর যদিও জানতেন যে, নিত্য-মঙ্গল শ্রীভগবান কৃষ্ণ-বলরামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তবুও ভগবৎ প্রেমের আতিশয্যে অনেক সময় তাঁর মনে এঁদের সম্বন্ধে অমঙ্গলের আশঙ্কাও হতো। সুতরাং বিদুরের প্রশ্ন সমীচীনই হয়েছে। বিদুর আরও প্রশ্ন করলেন ঃ

> কচ্চিৎ কুরূণাং পরমঃ সুহৃন্নো ভামঃ স আস্তে সুখমঙ্গ শৌরিঃ।
> যো বৈ স্বসৃণাং পিতৃবদ্দদাতি বরান্ বদান্যো বরতর্পণেন॥
> ৩-১-২৭॥

হে উদ্ধব! পিতা যেমন কন্যাকে তার অভিলষিত অর্থাদি দান করেন, সেইরকম ভাবে অতি উদার-স্বভাব বসুদেব, ভগিনীপতিদের আনন্দের জন্য কুন্তী প্রভৃতি ভগিনীদের মুক্ত হস্তে দান করতেন। কুরু বংশের পরম সুহৃদ, আমাদের ভগ্নিপতি বসুদেব এখন সুখে আছেন তো?

হে উদ্ধব! কৃষ্ণ-পত্নী রুক্মিণী ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে প্রদ্যুম্নকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। পূর্ব জন্মে এই প্রদ্যুম্নই ছিলেন কামদেব। সেই পরমবীর, যাদব-সেনাপতি প্রদ্যুম্ন সুখে আছেন তো?

> কচ্চিৎ সুখং সাত্বতবৃষ্ণিভোজদাশার্হকানামধিপঃ স আস্তে।
> যমভ্যষিঞ্চচ্ছতপত্রনেত্রো নৃপাসনাশাং পরিহৃত্য দূরাৎ ॥
> ৩-১-২৯॥

সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ, দাশার্হ প্রভৃতি বংশের অধিপতি উগ্রসেন, নিজের পুত্র কংসের অত্যাচারে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন এবং রাজ্যের আশা ত্যাগ করে দূরবর্তী স্থানে বসবাস করছিলেন। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পুনরায় রাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। সেই উগ্রসেন সুখে আছেন তো?

যে সাম্ব পূর্ব জন্মে কার্তিকেয়-রূপে দেবী অম্বিকার পুত্র ছিলেন, তিনি এই জন্মে ব্রত-নিয়ম পরায়ণা জাম্ববতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীহরির সেই অনুরূপ সুযোগ্য পুত্র, রথিশ্রেষ্ঠ সাম্ব কুশলে আছেন তো?

আরাধ্য দেবতার কুশল প্রশ্ন ভক্তের পক্ষে স্বাভাবিক। বিদুরের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং আনন্দদায়ক। সঙ্গে সঙ্গে বিদুর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনদের কথাও জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ প্রিয়জনেরা সুখে থাকলে, তবেই না শ্রীকৃষ্ণও সুখে থাকবেন; তাছাড়া ভক্তের কাছে ভগবানের প্রিয়জনের কথাও মধুময় বলে মনে হয়।

ক্ষেমং স কচ্চিদ্ যুযুধান আস্তে যঃ ফাল্গুনাল্লব্ধধনূরহস্যঃ।
লেভেঽঞ্জসাধোক্ষজসেবয়ৈব গতিং তদীয়াং যতিভির্দুরাপাম্ ॥

৩-১-৩১॥

যে সাত্যকি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে সাধুদের পক্ষেও যা দুর্লভ, সেই কৃষ্ণ-পদাশ্রয় লাভ করেছিলেন, সেই সাত্যকি সুখে আছেন তো?

কচ্চিদ্বুধঃ স্বস্ত্যনমীব আস্তে শ্বফল্কপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ।
যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংশুষ্বচেষ্টত প্রেম বিভিন্নধৈর্যঃ॥

৩-১-৩২॥

শ্বফল্ক পুত্র অক্রূর যখন কংস কর্তৃক প্রেরিত হয়ে কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় আনবার জন্য নন্দগ্রামে যাচ্ছিলেন, তখন রাস্তায় কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখে তিনি ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা হয়ে কৃষ্ণ-পদচিহ্ন-যুক্ত সেই ধুলার উপরই গড়াগড়ি করেছিলেন; সেই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ভগবানের একান্ত শরণাগত, নিষ্পাপ অক্রূর কুশলে আছেন তো?

কচ্চিচ্ছিবং দেবকভোজপুত্র্যা বিষ্ণুপ্রজায়া ইব দেবমাতুঃ।
যা বৈ স্বগর্ভেণ দধার দেবং ত্রয়ী যথা যজ্ঞবিতানমর্থম্॥
৩-১-৩৩॥

বেদ যেমন যজ্ঞের বিষয়সমূহকে নিজের মধ্যে রেখেছেন, সেইরকম যিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের গর্ভে স্থান দিয়েছেন, দেবমাতা অদিতি-সদৃশ, বিষ্ণু-জননী, সেই দেবকী কুশলে আছেন তো?

এখানে তিনটি শ্লোকে তিনজন প্রধান ভক্তের ভক্তি-ভাবের কথা বলা হয়েছে। সাত্যকি ভগবানের সেবা করে দাস্যভক্তির দ্বারা পরাগতি লাভ করেছিলেন; অক্রূর কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা; কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সকল জিনিসই তাঁর কাছে কৃষ্ণতুল্য। সুতরাং ধুলার উপর কৃষ্ণ-পদচিহ্নও তাঁর কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। আর দেবকীর শান্ত-বাৎসল্য ভাব। দেবকী জানেন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; তাই কৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁর একটা সম্ভ্রম, শ্রদ্ধার ভাবও ছিল।

অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ।
যমামনন্তি স্ম হি শব্দযোনিং মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্ ॥
৩-১-৩৪॥

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে শ্রীভগবানের ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত স্বরূপ বলা হয়েছে—তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার। বিদুর জিজ্ঞাসা করছেন—যিনি ভক্তের অভিলষিত ফল দান করেন, যা থেকে বেদরূপ শব্দ-ব্রহ্মের প্রকাশ এবং যিনি মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছেন, সেই অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন তো?

হে সৌম্য, অতি শান্ত-স্বভাব উদ্ধব! হৃদীক, সত্যভামার পুত্র চারুদেষ্ণ, গদ প্রভৃতি যাঁরা একাগ্র চিত্তে দেহ ও আত্মার অধিদেবতা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও অনুসরণ করে থাকেন, তাঁরা সকলে সুখে আছেন তো?

অপি স্বদোর্ভ্যাং বিজয়াচ্যুতাভ্যাং ধর্মেণ ধর্মঃ পরিপাতি সেতুম্।
দুর্যোধনোঽতপ্যত যৎসভায়াং সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা বিজয়ানুবৃত্ত্যা ॥
৩-১-৩৬॥

এবার বিদুর পাণ্ডবদের এবং ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রের বিশেষত্ব অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে এঁদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন।

বিদুর বলছেন—যুধিষ্ঠিরের রাজসভা যা ময়দানব তৈরি করেছিল, সেই রাজসভায় পাণ্ডবদের রাজ্য-সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধন ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজ বাহু-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সাহায্যে ধর্মপথে থেকে ধর্মের রক্ষা এবং পালন করছেন তো?

কিং বা কৃতাঘেষ্বঘমত্যমর্ষী ভীমোঽহিবদ্দীর্ঘতমং ব্যমুঞ্চৎ।
যস্যাঙ্ঘ্রিপাতং রণভূর্ন সেহে মার্গং গদায়াশ্চরতো বিচিত্রম্॥

৩-১-৩৭॥

গদাযুদ্ধের সময় যে ভীমের পদবিক্ষেপ রণভূমি সহ্য করতে না পেরে থরথর করে কাঁপত, সাপের মতো অতি কোপন স্বভাব সেই ভীম পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের প্রতি বহুদিনের সঞ্চিত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ত্যাগ করেছে তো?

কচ্চিদ্‌যশোধা রথযূথপানাং গাণ্ডীবধন্বোপরতারিরাস্তে।
অলক্ষিতো যচ্ছরকূটগূঢ়ো মায়াকিরাতো গিরিশস্তুতোষ ॥

৩-১-৩৮॥

কিরাতরূপী মহাদেব যার বাণে আচ্ছন্ন হয়ে অপরের দৃষ্টির অগোচর হয়েছিলেন এবং যার রণকৌশল দেখে মহাদেব অতীব সন্তুষ্ট হয়ে নিজের পাশুপত অস্ত্র দান করেছিলেন, স্বীয় হস্তী এবং রথসমূহের কীর্তিবিধানকারী গাণ্ডীবধারী সেই অর্জুন শত্রু বিনাশ করে কুশলে আছে তো?

যমাবুতস্বিৎ তনয়ৌ পৃথায়াঃ পার্থৈর্বৃতৌ পক্ষ্মভিরক্ষিণীব।
রেমাত উদ্দায় মৃধে স্বরিক্‌থং পরাৎ সুপর্ণাবিব বজ্রিবক্ত্রাৎ ॥

৩-১-৩৯॥

চোখের পাতা যেমন চোখ দুটিকে আবৃত করে রাখে, সেইরকম কুন্তীর পুত্রস্থানীয় নকুল ও সহদেব, যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা রক্ষিত হয়ে কুরুক্ষেত্র রণে এমনভাবে যুদ্ধ করেছিল, যেন দুইটি গরুড় পক্ষী এক সঙ্গে ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত কেড়ে নিচ্ছে। শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের রাজ্য উদ্ধার করে তারা এখন আনন্দে আছে তো?

অহো পৃথাপি ধ্রিয়তেঽর্ভকার্থে রাজর্ষিবর্যেণ বিনাপি তেন।
যস্ত্বেকবীরোঽধিরথো বিজিগ্যে ধনুর্দ্বিতীয়ঃ ককুভশ্চতস্রঃ॥

৩-১-৪০॥

বীরত্বে অদ্বিতীয়, রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু, একমাত্র ধনুর সাহায্যে চতুর্দিক জয় করেছিলেন। হায়! সেই রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর বিরহে কুন্তীদেবী কেবলমাত্র পুত্রদের লালন-পালনের জন্যই জীবন ধারণ করেছিলেন। সেই কুন্তীদেবীর কুশল সংবাদ আর কি জিজ্ঞাসা করব? অর্থাৎ রাজর্ষি পাণ্ডুর তিরোধানে পতিব্রতা কুন্তীর কুশল আর কি হতে পারে যে, জিজ্ঞাসা করব?

সৌম্যানুশোচে তমধঃপতন্তং ভ্রাত্রে পরেতায় বিদুদ্রুহে যঃ।
নির্যাপিতো যেন সুহৃৎ স্বপুর্য্যা অহং স্বপুত্রান্ সমনুব্রতেন ॥
৩-১-৪১ ॥

হে সৌম্য উদ্ধব! ভাই পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবদের প্রতি যিনি অত্যন্ত অনিষ্ট আচরণ করেছিলেন এবং আমি সদাসর্বদা যার হিতসাধন করেছি, সেই আমাকেও যিনি পুত্রদের পরামর্শে স্বগৃহ থেকে নির্বাসিত করেছেন, সেই অধঃপতিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়।

এই হচ্ছে যথার্থ মহাপুরুষের লক্ষণ। যাঁর জন্য সমস্ত কুরুবংশ ছারখার হয়ে গেল, যিনি বিদুরের মতো পরম হিতৈষীকেও নির্বাসিত করেছেন, সেই ধৃতরাষ্ট্রের উপরও বিদুরের কোন রাগ নেই—আছে কেবল দুঃখে দুঃখানুভূতি এবং অসীম সমবেদনা।

সোঽহং হরের্মর্ত্যবিড়ম্বনেন দৃশো নৃণাং চালয়তো বিধাতুঃ।
নান্যোপলক্ষ্যঃ পদবীং প্রসাদাচ্চরামি পশ্যন্ গতবিস্ময়োঽত্র ॥
৩-১-৪২॥

এতক্ষণ পর্যন্ত বিদুর শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় স্বজনদের কুশল জিজ্ঞাসা করে আনুষঙ্গিকরূপে নিজের বর্তমান অবস্থার কথা বলছেন। নিজের ঈশ্বরীয় ভাব প্রচ্ছন্ন রেখে ভগবান শ্রীহরি মানুষী ভাবের অনুকরণে লীলা করে সকলের চিত্তবৃত্তি চালনা করেন। শ্রীহরির অনুগ্রহে তাঁর মাহাত্ম্য সন্দর্শন করে আমি বিস্ময়শূন্য হয়েছি অর্থাৎ বুঝতে পেরেছি যে, ভগবানই সকলের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করেন। তাঁর ইচ্ছাতে সব কিছুই সম্ভব হতে পারে। সুতরাং আমি বিদুর, ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে এখন বিস্ময়শূন্য হয়ে অপরের অলক্ষিতে তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিদুর বললেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখে তিনি দুঃখিত; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য হন নি; কারণ তিনি বুঝেছেন যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই মানুষের চিত্তবৃত্তি বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং ভগবানের ইচ্ছাতেই যখন সব কিছু হচ্ছে, তখন আর আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে? এইটি অনুভব করে বিদুর তখন তীর্থে তীর্থে ভগবানের মহিমা দর্শন করে বেড়াচ্ছেন।

নূনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপথানাং মহীং মুহুশ্চালয়তাং চমূভিঃ।
বধাৎ প্রপন্নার্তিজিহীর্ষয়েশোঽপ্যুপৈক্ষতাঘং ভগবান্ কুরূণাম্॥
৩-১-৪৩॥

অপরাধ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অপরাধের শাস্তি বিধানে ভগবান সমর্থ হলেও যে সব দুষ্ট রাজারা বিদ্যা, ঐশ্বর্য এবং বংশগৌরবের অভিমানে মত্ত হয়ে, অসংখ্য সৈন্যের দ্বারা বার বার পৃথিবীকে উৎপীড়ন করে, তাদের তিনি বধ করেন। এইভাবে বিপন্নদের দুঃখ দূর করবার জন্যই ভগবান দুর্যোধন প্রভৃতির নানা অন্যায় অত্যাচার প্রথম দিকে উপেক্ষা করেছিলেন।

দুর্যোধন প্রভৃতিরা পাণ্ডবদের প্রতি অনেক অত্যাচার করেছে; অথচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসব দেখেও তার কোন প্রতিকার করেন নি। এদিকে তাঁরই পরম ভক্ত পাণ্ডবেরা বিনা অপরাধে বনে বনে কষ্ট করে বেড়াচ্ছেন। ভগবানের এই ব্যবহারের তাৎপর্য বোঝা খুবই কঠিন। সেইটি বোঝাবার জন্যই বিদুর এই শ্লোকে বলছেন যে, একজন অন্যায় করলে কেবল তাকে শাস্তি দিলে কি হবে? তার পেছনে যে আরও অনেকে রয়েছে, যাদের সাহায্যেই সে ঐ অন্যায় কাজ করতে পেরেছে। সুতরাং অন্যায়ের সাহায্যকারীদেরও শাস্তি বিধান করতে হবে—নইলে অন্যায়ের মূলটি থেকেই যাবে। তার জন্য উপযুক্ত সময় এবং পরিবেশের অপেক্ষা করতে হয়। ততদিন পর্যন্ত নিরপরাধ ব্যক্তিরা অত্যাচারিত হতে থাকে; উপযুক্ত সময়ে ভগবান দুষ্টের বিনাশ করেন।

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায় কর্মাণ্যকর্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্।
নন্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং পরো গুণানামুত কর্মতন্ত্রম্॥
৩-১-৪৪ ॥

ভগবান জন্মরহিত হয়েও দুষ্টের বিনাশের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং তিনি অকর্তা, কর্তৃত্ব-অভিমানরহিত হয়েও মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য কর্ম করে থাকেন। ঐ রকম মহৎ উদ্দেশ্য না থাকলে, ভগবান কেন, মায়ামুক্ত পুরুষেরাও এই কর্মাধীন জীবদেহ গ্রহণ করতেন না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান দেহ ধারণ করেন। আর একটু ছোট করে বলা যায় যে, মানুষকে ভগবন্মুখী করবার জন্যই ভগবান মানুষরূপে অবতীর্ণ হন। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে তিনি বিভিন্ন উপায়ে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেন। কাউকে শাসন করে আবার কাউকে ভালবেসে। তাঁর সংস্পর্শে সবাই ভগবৎ-সত্ত্বায় উন্নীত হয়— এইটি-ই অবতার-পুরুষের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

তস্য প্রপন্নাখিললোকপানামবস্থিতানামনুশাসনে স্বে।
অর্থায় জাতস্য যদুষ্বজস্য বার্তাং সখে কীর্তয় তীর্থকীর্তেঃ ॥
৩-১-৪৫ ॥

সংসারে আঘাত পেয়ে বিদুরের মনে বৈরাগ্য এসেছে। সংসার-যাতনা থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে হলে নিরন্তর ভগবৎ-চিন্তা চাই। তাই বিদুর উদ্ধবকে অনুরোধ করছেন—তুমি কৃষ্ণের একান্ত সচিব। সারাটা জীবন কৃষ্ণের সেবায় কাটিয়েছ; তুমি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। সুতরাং কৃষ্ণ-কথা বলবার তুমিই একমাত্র অধিকারি। তাই তোমায় অনুরোধ করছি—হে আমার প্রিয় সখা উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য কীর্তি-কথা আমায় বল, যাতে আমি এই মায়াময় সংসার থেকে চিরতরে মুক্ত হতে পারি।

৮

বিদুর-উদ্ধব সংবাদ (খ)

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বিদুর তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে যমুনার তীরে এসে হঠাৎ জ্ঞানভক্তির মূর্ত বিগ্রহ উদ্ধবকে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যাদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারা সকলেই কৃষ্ণের পরম আত্মীয় এবং পরম ভক্ত। সুতরাং তাঁদের কথা বলতে গেলে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ এসেই যাবে। বিদুর দুঃখ পেয়েই সংসার ত্যাগ করেছেন; তাই সংসারের কোন কথাই তাঁর ভাল লাগবার কথা নয়; কৃষ্ণ-কথাই এখন তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাছাড়া পূর্বের শ্লোকে বিদুর খোলাখুলিভাবেই উদ্ধবকে কৃষ্ণ-কথা শোনাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। বিদুর সংসার ত্যাগ করে চলে যাবার পর বহু বৎসর কেটে গেছে; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কৌরব রাজবংশে এবং দ্বারকায় বহু ঘটনা ঘটে গেছে যার সম্বন্ধে বিদুর কিছুই জানতেন না; জানলে তিনি নিশ্চয়ই আগের অধ্যায়ে যদুবংশীয়দের সম্বন্ধে যেসব কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন তা ঐ ভাবে করতেন না। বিদুরের প্রশ্ন শুনে উদ্ধবের মন তখন কৃষ্ণ-চিন্তায় এমন ডুবে গেল যে, তিনি সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

> ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা বার্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্।
> প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহে ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্মারিতেশ্বরঃ ॥ ৩-২-১ ॥

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! বিদুর এইভাবে উদ্ধবের কাছে প্রিয়-জনদের, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে, উদ্ধবের মনে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতির উদয় হলো। তাই তিনি কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত উৎকণ্ঠার জন্য সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না। আর পারবেন-ই বা কেমন করে?

অতি শৈশব অবস্থায়, উদ্ধবের যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন পুতুল খেলার সময়, পুতুলটিকে কৃষ্ণ মনে করে তার সেবায় উদ্ধব এতই বিভোর হয়ে থাকতেন যে, সেই সময় উদ্ধবের মা তাঁকে খাবার জন্য ডাকলেও তিনি পুতুলরূপী কৃষ্ণ-সেবা ছেড়ে যেতে চাইতেন না। ছেলেমানুষ অথচ খাবার

প্রতিও আকর্ষণ নেই—কৃষ্ণের প্রতি এমনই ছিল তাঁর ভালবাসা! সেই উদ্ধব বড় হয়েছেন; সারাটা জীবন কৃষ্ণের সেবা করে কাটিয়েছেন এবং কৃষ্ণ-সেবার প্রভাবে এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি জরাগ্রস্ত হননি। সেই প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে ছেড়ে উদ্ধব আজ একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাই হঠাৎ বিদুরের প্রশ্নে উদ্ধবের মনে শ্রীকৃষ্ণের মধুর স্মৃতিসকল এক সঙ্গে এসে উপস্থিত হলো। কৃষ্ণ-ভাব-সমুদ্রে তিনি একেবারে ডুবে গেলেন—কথা বলবে কে ? উদ্ধবের শরীরে তখন রোমাঞ্চ হতে লাগল। দুই চোখ দিয়ে অজস্র ধারে প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগল। অবাক বিস্ময়ে বিদুর উদ্ধবের এই ভাবান্তর দেখতে লাগলেন।

পুলকোদ্ভিন্নসর্বাঙ্গো মুঞ্চন্মীলদ্দৃশা শুচঃ।
পূর্ণার্থো লক্ষিতস্তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥ ৩-২-৫ ॥

ভগবৎ-প্রেমের গাঢ় অবস্থায় উদ্ধব তখন একেবারে ডুবে গেছেন। তাঁর সমস্ত শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে; ঈষৎ উন্মীলিত দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। কৃষ্ণ-কথায় উদ্ধবের এই পরিবর্তন দেখে বিদুর বুঝলেন যে, উদ্ধব যথার্থই ভগবৎ-প্রেমের সার্থকতা লাভ করেছে।

আমরা অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলি—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়; ভগবানের নামে যাদের শরীরে এই সব বিকার উপস্থিত হয়, বুঝতে হবে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে—তাঁরা ভগবানকে লাভ করেছেন। এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব অতি বিরল মহা-পুরুষের জীবনে দেখা যায়। বিদুর নিজের চোখে উদ্ধবের শরীরে এই ভগবৎ-ভাব দেখে বুঝলেন—এঁরই জীবন কৃতার্থ হয়েছে—ইনিই ধন্য। উদ্ধব বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে বসে আছেন—তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে, চোখ দিয়ে অবিরল প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ছে; আর বিদুর মহা বিস্ময়ে উদ্ধবের এই অপার্থিব ভাবান্তর দেখছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে, উদ্ধব যেন ভগবানের কাছ থেকে আবার মর্তলোকে ফিরে এলেন। ভগবানের লীলা স্মরণে উদ্ধবের মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। চোখের জল মুছে অত্যন্ত প্রীতির সাথে তখন তিনি বিদুরকে বলতে লাগলেন ঃ

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্ ॥ ৩-২-৭॥

বিদুরের সমস্ত প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় স্বজনেরা সকলে কুশলে আছেন তো?—এর উত্তর উদ্ধব মাত্র একটি শ্লোকেই বললেন—শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য অস্তমিত হয়েছেন; আমাদের গৃহসকল কালরূপী মহাসর্পের কবলিত হয়ে শ্রীহীন হয়েছে; সুতরাং তুমি যে আমায় আত্মীয়বর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করলে, সেই সম্বন্ধে আর কি উত্তর দেব?

শ্রীকৃষ্ণ যতদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন ততদিন কোনরকম অমঙ্গল যাদবদের স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু কৃষ্ণ আমাদের ত্যাগ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত অমঙ্গল যেন আমাদের ঘিরে ফেলেছে—আমরা শ্রীহীন, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে পড়েছি। সুতরাং আত্মীয়বর্গের কুশল বার্তা আর কি দেব?

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্॥ ৩-২-৮ ॥

উদ্ধব বলছেন—এই দ্বারকাবাসীরা, বিশেষত যদুবংশীয়েরা অত্যন্ত ভাগ্যহীন; কারণ শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক সঙ্গে বাস করেও তারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারেনি। একটি উপমা দেওয়া হয়েছে—জ্যোৎস্না রাতে জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে; মাছেরা ঐ প্রতিবিম্ব চাঁদের সঙ্গে খেলা করে ভাবছে যে, এই উজ্জ্বল বস্তুটি আমাদেরই মতো একজন। কিছুক্ষণ পরে যখন মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেলে, তখন প্রতিবিম্ব চাঁদও অন্তর্হিত হয়ে যায়; তখন মাছেরা ভাবে—তাইতো, কার সাথে খেলা করছিলাম? উদ্ধব বলছেন, মাছের বুদ্ধি নেই, তাদের ভ্রম তো হতেই পারে; কিন্তু যদু-বংশীয়েরা তো ওরকম ছিলেন না; তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান —তাদের অমন হলো কেন?

কিন্তু এমন-ই তো হয়ে থাকে। একদিন কাশীতে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। হরি মহারাজ, স্বামী তুরীয়ানন্দজীও বসে পাঠ শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে ভাগবতের কোন কোন অংশ সকলকে বুঝিয়ে বলছিলেন। সেদিন ভাগবতের এই অধ্যায়টিই পড়া হচ্ছিল। যখন এই শ্লোকটি পড়া হলো, তখন হরি মহারাজের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবান্তর দেখা গেল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে স্থির হয়ে বসে রইলেন। একটু পরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন—

প্রতিবিম্ব চাঁদের সাথে মাছের খেলার মতো একদিন আমরাও স্বামীজীর (বিবেকানন্দের) সাথে একত্রে বাস করেছি, এক সঙ্গে বসে খেয়েছি, একই সঙ্গে শুয়েছি; ভাবতাম স্বামীজী আমাদেরই মতো একজন। আজ তিনি নেই; আর এখন বুঝতে পারছি স্বামীজী কে ছিলেন—সাক্ষাৎ শিবাবতার। স্বামীজীর কথা বলতে বলতে হরি মহারাজের দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—তখন তাঁর উদ্ধবের মতো অবস্থা আর কি!

ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ।
সাত্বতামৃষভং সর্বে ভূতাবাসমমংসত ॥ ৩-২-৯॥

উদ্ধব বলছেন—যাদবেরা লোকের মনের ভাব বেশ বুঝতে পারতেন এবং সকল বিষয়েই তারা সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। যদুবংশীয়েরা শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে একই সঙ্গে বসবাস করেছেন, খেলাধুলা করেছেন; অথচ সর্বভূতান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা কেবল যাদব-শ্রেষ্ঠ বলেই মনে করতেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তাঁরা জানতে পারেন নি।

মাছেরা চন্দ্রের মহিমা জানে না কারণ তা জানার বুদ্ধি তাদের নেই; যদু বংশীয়েরা পরম বুদ্ধিমান হলেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরীয় ভাব বোঝবার তাঁদের সৌভাগ্য হয়নি। তাঁরা নিজেরা শ্রীকৃষ্ণের কত অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বোঝবার তাঁরা কত সুযোগ পেয়েছেন; কিন্তু তাঁরা ভাবতেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরই মতো একজন যাদব মাত্র; কেবল বিশেষ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কিছু অলৌকিক শক্তি আছে—এর বেশি কিছু নয়। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদকে তাঁরা হাতে পেয়েও হারিয়েছেন; সুতরাং তাঁদের মতো দুর্ভাগ্য আর কার হতে পারে? তাঁরা যথার্থই ভাগ্যহত। তাঁদের দুর্ভাগ্য ঠিক-ই; কিন্তু এও বলব যে, একেবারেই না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানো অনেক ভাল, অনেক ভাগ্যেই তা হয় কারণ পেয়ে হারানোর দুঃখ তাদের অতি তীব্র হয়; ফলে ভগবানকে পাবার ব্যাকুলতা তাদের শতগুণ বেড়ে যায়—এই তো পরম লাভ।

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ ॥ ৩-২-১০॥

ভগবানের মায়ায় যেসব যদুবংশীয়দের বুদ্ধি মোহিত হয়েছিল, তাঁরাই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদেরই একজন বন্ধু বলে মনে করতেন; আর কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করত। কিন্তু নিবিষ্ট-চিত্ত ভক্তেরা পরমাত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এইরকম-স্তুতি এবং নিন্দায় কিছুমাত্র বিচলিত হন না।

ভগবানের মায়ায় জীব মাত্রই বশীভূত; কেবল মাত্র যারা ভগবানের অনন্য-ভক্ত, তারাই এই-মায়াকে অতিক্রম করতে পারে। মায়ার বশীভূত ব্যক্তিরা ভগবানের সম্বন্ধে নানা কথা বললেও ভক্তেরা জানেন যে, ভগবানের মায়ার বশেই তারা ঐ রকম আজে বাজে কথা বলছে; সুতরাং ঐ সব লোকের কথায় ভক্তেরা ভগবৎ-ভাব থেকে কিছুমাত্র বিচালিত হন না।

প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্।
আদায়ান্তরধাদ্ যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥ ৩-২-১১॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্যসাধারণ মনোহর মূর্তিতে লোকের সামনে অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু যাঁদের তপস্যার তেমন জোর ছিল না, যাঁরা তেমন তপস্যা করেননি, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মূর্তি দর্শনে পরিতৃপ্ত হবার আগেই, ভগবান তাঁর শ্রীমূর্তি সম্বরণ করে অন্তর্হিত হলেন।

যোগমায়াকে অবলম্বন করেই ভগবান নরলীলা করে থাকেন। যোগমায়ার পূর্ণ সামর্থ্য দেখাবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণ এমন বিস্ময়কর পরম সুন্দররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অর্থাৎ যোগমায়া যেন রূপ-সৃষ্টি বিষয়ে, তার সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ করে কৃষ্ণ-মূর্তি সৃজন করেছেন।

যদ্ধর্ম্মসূনোর্বত রাজসূয়ে নিরীক্ষ্য দৃক্স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতুরর্বাক্সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥
৩-২-১৩॥

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমস্ত দেশের রাজারা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সেই রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণের পরম সুন্দর, পরম আনন্দ-দায়ক মূর্তি দেখে সকলেই অবাক বিস্ময়ে ভেবেছিলেন যে, মনুষ্য-সৃষ্টি বিষয়ে বিধাতা তাঁর সমস্ত নৈপুণ্য প্রয়োগ করে যেন কৃষ্ণকে তৈরি করেছেন।

উদ্ধব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পরম সুন্দর রূপের বর্ণনা করেছেন। ভগবান যখনই নররূপে আবির্ভূত হন, তখনই তিনি অতি সুন্দর রূপেই এসেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ-রূপের চমৎকারিত্ব তুলনাহীন।

যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস-লীলাবলোক-প্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ॥
৩-২-১৪॥

শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগপূর্ণ হাস্য পরিহাস, সাদর সম্ভাষণ এবং নানা মনোহর লীলা বিলাসে ব্রজস্ত্রীরা এমনই তদ্‌গতপ্রাণা, তন্মনা হয়েছিলেন যে, তাঁদের যে আরও কিছু জাগতিক কর্তব্যকর্ম বাকি রয়েছে, তা সম্পন্ন করার দিকে তাঁদের নজরই ছিল না; অর্থাৎ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণে এমনই তন্ময়তা লাভ করেছিলেন যে, জাগতিক আর কোন বিষয়েই তাঁদের কোন লক্ষ্য ছিল না।

ভগবান কেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, কেন তিনি তাঁর মূর্তি জগতে প্রকট করেন—তার কারণ হিসেবে উদ্ধব বলছেন ঃ

স্বশান্তরূপেম্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-রভ্যর্দ্যমানেম্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥
৩-২-১৫॥

ভগবানের দুইটি স্বরূপ—পর অর্থাৎ নিরুপাধিক, উপাধি-শূন্য চৈতন্য এবং অবর—উপাধি-যুক্ত আর সব কিছু, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ থেকে জীব, জগৎ, সব কিছুই হচ্ছে অবর। বিশুদ্ধচৈতন্য (পর) এবং হিরণ্যগর্ভ, জীব, জগৎ (অবর)—সবই ভগবানের বিভিন্ন রূপ। এই জগতে যত শান্ত, সত্ত্বগুণাত্মক এবং অশান্ত অর্থাৎ রজ এবং তমোগুণাত্মক যত মূর্তি রয়েছে, সে সমস্তই তিনি। জগতে ভাল-মন্দ, যা কিছু রয়েছে সবই শ্রীভগবানের এক একটা রূপ। কিন্তু যখন তাঁর অশান্ত মূর্তিগুলি, রজ এবং তমোগুণাত্মক দুষ্ট লোকেরা, তাঁরই শান্ত মূর্তিগুলোকে অর্থাৎ সৎ লোকদের উপর অত্যাচার করে, তখন ভগবানের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় এবং তিনি জন্মরহিত হয়েও, প্রকৃতির সহযোগে জন্ম পরিগ্রহ করেন। একটি উপমা দেওয়া হয়েছে—কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যেমন সব সময়ই গুপ্ত, অব্যক্তরূপে থাকে এবং বিশেষ

কারণে সেই কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হয়, সেইরকম নিত্যসিদ্ধ ভগবান প্রকৃতির সহযোগে কৃপাতে দেহধারণ করে অবতীর্ণ হন। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভগবানের অশান্ত রূপগুলির অত্যাচারে যখন সৎ লোকেরা অত্যাচারিত হয়েছিল, তখন ভগবান তাঁরই শান্তরূপী শিষ্টদের রক্ষার জন্য যোগমায়াকে অবলম্বন করে বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরই অশান্তরূপী অসুরদের বিনাশ করে আবার তিনি তাঁর নিত্যধামে চলে গেছেন।

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্মবিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে ।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্‌যদনন্তবীর্য্যঃ॥
৩-২-১৬ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হয়েও বসুদেবের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। তিনি অনন্ত বীর্যশালী হয়েও কংসের ভয়ে তাঁকে ব্রজধামে বাস করতে হয়েছিল এবং জরাসন্ধ, কালযবন প্রভৃতির ভয়েই যেন তিনি মথুরা ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন—এ সকল কথা যখন ভাবি, তখন আমার বড় দুঃখ হয়।

দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্ যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ।
তাতাম্ব কংসাদুরুশঙ্কিতানাং প্রসীদতং নোঽকৃতনিষ্কৃতীনাম্॥
৩-২-১৭॥

কংস-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ, দেবকী ও বসুদেবের চরণে প্রণত হয়ে বলে-ছিলেন—কংসের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে আমরা এতদিন আপনাদের সেবা করতে পারিনি; আমাদের এই অপরাধ আপনারা ক্ষমা করে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। এই সব কথা মনে হলে আমার বড় দুঃখ হয়।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বলছেন—তিনি পর এবং অবর—জগতে ব্যক্ত, অব্যক্ত যা কিছু আছে, সবই তিনি—সবই তাঁর স্বরূপ। তিনি জন্মরহিত, অনন্ত শক্তিশালী অর্থাৎ তিনি সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সর্বময় কর্তা। প্রশ্ন হতে পারে, শ্রীকৃষ্ণই যখন কর্মের অধীন হয়ে জন্ম মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছেন, তখন তাঁর আর পূর্ণ স্বাধীনতা, সর্বময় কর্তৃত্ব কেমন করে সম্ভব হতে পারে? জন্ম এবং কর্মের দ্বারা তিনি সীমিত হয়েছেন; সুতরাং তিনিই যে পরম ঈশ্বর—তা কেমন করে বুঝব? উদ্ধব বলছেন—বিদুর! সাধারণ মানুষের মনে এমন প্রশ্ন তো হতেই পারে। অপরের কি কথা! যে আমি

শিশুকাল থেকে তাঁর সেবা করে আসছি, সেই আমিও তাঁর এই রহস্য সব সময় বুঝতে পারি না। তাই শ্রীকৃষ্ণের কারাগারে জন্ম, শত্রুভয়ে ব্রজে বাস, বিনীত বালকের মতো মাতাপিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা—এসব কথা যখন ভাবি তখন আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ি। জন্মহীনের জন্ম, অভয়প্রদের ভীতিভাব, ক্ষমাশীলের ক্ষমা প্রার্থনা! আমি মনে প্রাণে জানি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি সুখ দুঃখের অতীত। তবুও তাঁর এই সব দুঃখ কষ্টের চিন্তায় আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হই—আমার বড় কষ্ট হয়।

কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রি সরোজরেণুং বিস্মর্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্।
যো বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমের্ভারঃ কৃতান্তেন তিরশ্চকার॥
৩-২-১৮॥

যাঁর ভ্রূকটাক্ষে পৃথিবীর ভার-স্বরূপ সমস্ত অসুরকুল নিহত হয়েছে, তাঁর শ্রীচরণের এক কণা ধূলিও যে একবার সেবা করেছে, সে কি কখনও তাঁকে ভুলতে পারে? অতএব হে বিদুর! বল তো আমি কেমন করে তাঁর কথা ভুলে থাকব?

এই হচ্ছে ভগবানের যথার্থ ভক্ত এবং তথাকথিত ভক্তের মধ্যে পার্থক্য। যথার্থ ভক্তের সমস্যা—কি করে তিনি ভগবানকে ভুলে থাকবেন—তা হলে ভগবৎ-বিচ্ছেদের দুঃখ অন্তত কিছুটা ভুলতে পারবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—ভগবানের বিচ্ছেদে গামছা নিংড়ানর মতো হৃদয়ে কষ্ট হয়। তাই যথার্থ ভক্ত ভগবানকে ভুলে থাকতে চান। আর তথাকথিত ভক্তের সমস্যা হলো—কি করে সর্বদা ভগবানের কথা স্মরণ করতে পারবেন; তা হলে তিনি ভগবৎ-আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে পারবেন। রূপ গোস্বামী তার 'বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে শ্রীরাধিকার একটি অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনোধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তি মনঃ ।
যস্য স্ফূর্তি লবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥
(বিদগ্ধ মাধব —২-২৯)

কি আশ্চর্য! মুনিগণ বিষয় থেকে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করে ক্ষণকালের জন্য যে শ্রীকৃষ্ণে মনকে নিয়োজিত করতে ইচ্ছা করে, এই বালিকা শ্রীরাধা কিনা সেই শ্রীকৃষ্ণ থেকে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করে বিষয়ে নিয়োগ করতে ইচ্ছা করছে। হায়, কি কষ্ট! যোগীরা হৃদয়মধ্যে যাঁকে এক মুহূর্ত স্ফুরণের জন্য যত্ন করে থাকেন, এই মুগ্ধা বালা সেই শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয় থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে! হে ভগবতি ! এই ভাব বোঝার ক্ষমতা আমার নেই।

উদ্ধবের এখন সেই অবস্থা—কেমন করে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে থাকবেন?

দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্ যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত ॥
৩-২-১৯॥

উদ্ধব বলছেন—হে বিদুর! তোমরা তো নিজেরাই স্বচক্ষে দেখেছ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে চেদিরাজ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিরকম বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করেছিল। তবুও শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়ে সে যোগিজন-বাঞ্ছিত পরম সিদ্ধি লাভ করেছে। শত্রুর প্রতিও যাঁর এত কৃপা, বল তো বিদুর, কে তাঁর বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করতে পারে?

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য॥
৩-২-২০॥

শিশুপাল ছাড়াও আরও যেসব বীরেরা যুদ্ধে, নয়নরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের মুখ-পদ্মের মধু চোখ দিয়ে যেন পান করতে করতে, অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে পবিত্র হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন, তারাও পরমধাম প্রাপ্ত হয়েছেন—এ সবই তুমি জান।

উদ্ধব বলছেন—শ্রীকৃষ্ণের অনেক কাজের রহস্য আমরা বুঝতে পারি না, ঠিকই; কিন্তু আবার তাঁর অনেক কাজ দেখে মনে হয় তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হয়েও জন্ম পরিগ্রহ করেছেন, সকলের অভয়দাতা হয়েও তিনি নিজে ভয় পেয়েছেন, পরম ঈশ্বর হয়েও জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মতোই গ্রহণ করেছেন। এ সবের রহস্য যেমন ঠিক বুঝতে পারি না, আবার তেমনি আমাদেরই চোখের সামনে অনুষ্ঠিত

শ্রীকৃষ্ণের নানা অলৌকিক কার্য এবং তাঁর অপার করুণা দেখে মনে হয় যে, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কারও পক্ষেই ঐ সব করা সম্ভবপর নয়।

যিনি ভ্রূ-সঞ্চালন মাত্রই পৃথিবীর ভার-স্বরূপ অসুরকুল ধ্বংস করে জগতে শান্তি স্থাপন করেছেন এবং অপর দিকে তাদেরও মুক্তি প্রদান করেছেন—একমাত্র ভগবান ছাড়া সকলের হিতকারী এমন আর কে হতে পারে? সুতরাং বল তো, এমন হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে ছোট বয়স থেকেই সেবা করে এসেছি, আজ তাঁর বিচ্ছেদ আমি কেমন করে সহ্য করব?

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥
৩-২-২১॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ করে বলছেন—বিদুর! শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অতুল মহিমময়। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অধীশ্বর এবং সর্বানন্দ পরিপূর্ণ অর্থাৎ সমস্তরকম আনন্দ তাতে সদা বিরাজিত। বহু পুরাতন রাজাদের মুকুট-শোভিত মস্তক শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হয়ে থাকে এবং তিনি সমস্তরকম পূজোপহার প্রাপ্ত হন—অর্থাৎ তিনি সকলের পূজ্য।

তৎ তস্য কৈঙ্কর্য্যমলং ভৃতান্ নো বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্।
তিষ্ঠং নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে ন্যবোধয়দ্দেব নিধারয়েতি॥
৩-২-২২॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত প্রকৃতির ঈশ্বর, সদানন্দময়, নিখিল রাজন্য-বর্গের প্রণম্য, সেই তিনি যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট উগ্রসেনের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন—হে মহারাজ, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন—তখন তাঁর ঐ সব কথা শুনে এবং তাঁর দাস্যভাব দেখে আমাদের প্রাণে বড় কষ্ট হয়।

দুঃখ তো হবারই কথা। আমার গুরু, আমার ইষ্ট—তিনি তো জগৎ-গুরু, সকলেরই ইষ্ট—তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ হতেই পারে না। সেই তিনি যদি তাঁর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট লোকের সামনে অত্যন্ত দীনহীনের মতো ব্যবহার করেন, তবে তো আমার দুঃখ হবারই কথা। তাছাড়া লোকে অপরের কাছে দাস্যভাব স্বীকার করে কেন? কেউ করে টাকা পয়সা, পসার প্রতিপত্তি,

সম্মান লাভের জন্য, আবার কেউ বা বলবানের কাছে পরাজিত হয়ে বাধ্য হয়ে দাস্যভাব স্বীকার করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বেলায় তো এর কোনটাই প্রযোজ্য নয়। তিনি সকলের ঈশ্বর, সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত শক্তি, সমস্ত আনন্দ, তাঁতে সদা অধিষ্ঠিত; প্রবল পরাক্রান্ত রাজারা তাঁর সেবার জন্য সদা ব্যগ্র। তবে তিনি কিসের জন্য উগ্রসেনের সামনে দাস্যভাব অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকেন? এ কি কেবল ভক্তের মহিমা দেখাবার জন্য? বিদুর! ভগবানের এইসব কাজের অর্থ আমি বুঝতে পারি না; তাই আমার প্রাণে বড় দুঃখ—সারাটা জীবন তাঁর সেবা করলাম, তাঁর কাছে কাছে রইলাম, তবুও তাঁকে চিনতে পারলাম না।

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥
৩-২-২৩॥

আরও দেখ বিদুর! দুষ্ট পূতনা রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণকে বধ করবার জন্য নিজের স্তনে বিষ মাখিয়ে কৃষ্ণকে সেই স্তন পান করিয়েছিল। তবুও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সেই দুষ্ট পূতনা, ধাত্রী-মাতার সদগতি লাভ করেছিল। সুতরাং এমন যে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ছেড়ে আর কার কাছে যাব?

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষপুত্রমংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্॥
৩-২-২৪॥

আমার মনে হয় কি জান বিদুর! অসুরেরাও ভগবানের পরম ভক্ত। তারা ক্রোধরূপ পথ অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবিষ্ট-চিত্ত ছিল। ভক্তেরা ভক্তি পথ অলবম্বন করে এবং অসুরেরা ভগবানে বিদ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা ভাব অবলম্বন করে ভগবানেই একাগ্রচিত্ত হয়ে থাকে। তারই জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় তারা গরুড়ের স্কন্ধে উপবিষ্ট চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিল; অন্তিম সময়ে ভগবানকে দর্শন করে অসুরেরাও পরমগতি লাভ করেছিল।

আসল কথা হলো—যেমন করে পার, ভক্তিভাবেই হোক আর শত্রুভাবেই

হোক, নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে হবে; ভগবানের চিন্তায় মন একাগ্র না হলে কিছু হবার নয়।

উদ্ধবের দুঃখ এই যে, অসুরেরা পর্যন্ত যেখানে ভগবানে একান্তমনা হয়ে মুক্ত হয়ে গেল, অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেল, সেখানে তার ভাগ্যে এখনও নিরন্তর কৃষ্ণ-দর্শন হচ্ছে না। ভক্তের কাছে, বিশেষত উদ্ধবের মতো একান্ত ভক্তের কাছে এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে!

বিদুরের কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন শুনে উদ্ধব প্রথমে ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে একেবারে তন্ময় হয়ে, কৃষ্ণ-মহিমা এবং কৃষ্ণ-গুণ কীর্তন করতে লাগলেন। ভক্ত বিদুরকে পেয়ে উদ্ধবের হৃদয়ের অবরুদ্ধ ভক্তি প্রবাহ আজ যেন বাঁধন-হারা স্রোতের মতো প্রবল হয়ে উঠল। সেই প্রবাহে বিদুরের হৃদয়ও অভিষিক্ত হলো। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে উদ্ধব বিদুরের জিজ্ঞাসিত বিষয়ে ভাবতে লাগলেন এবং বিদুরের অনুরোধ-অনুযায়ী তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে আরম্ভ করে জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সংক্ষেপে বলতে আরম্ভ করলেন। বিদুর অবাক বিস্ময়ে সেই মধুস্রাবী কৃষ্ণকথা শুনতে লাগলেন।

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥ ৩-২-২৫ ॥

উদ্ধব বলছেন—ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভগবান শ্রীহরি বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে কংসের কারাগারে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। তারপর পিতা বসুদেব কংসের ভয়ে ভীত হয়ে নবজাত শিশুকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রেখে এলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আত্মশক্তি গোপন করে, দাদা বলরামের সাথে এগার বছর বাস করেন। ব্রজধামে মনোমুগ্ধকর বাল্যলীলার অনুকরণে কখনও হাসি, কখনও কান্নার দ্বারা ব্রজবাসীদের আনন্দবর্ধন করে বৃক্ষ-লতা পরিশোভিত যমুনার উপকূলে গোপবালক পরিবৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ লীলা করেছিলেন।

প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ।
লীলয়া ব্যনুদৎ তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥ ৩-২-৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন খুব কম হলেও শিশুরা যেমন অনায়াসে তাদের খেলার মাটির পুতুল ভেঙে ফেলে, সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কংস-প্রেরিত মায়াবী অসুরদের বিনাশ করেন।

কালীয় নাগকে দমন করে তার বিষপূর্ণ জলপানে মূর্ছিত গরু এবং গোপবালকদের তিনি সুস্থ করেন; কালীয় হ্রদকে বিষশূন্য করে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে সেই জল পান করিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ নন্দকে দিয়ে ইন্দ্র-যজ্ঞ বন্ধ করে গো-পূজার প্রচলন করেন; এতে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবল বারি বর্ষণ করেন; শ্রীকৃষ্ণ তখন কৃপা করে ব্রজবাসীদের রক্ষার জন্য গোবর্ধন পর্বতকেই ছাতার মতো ধারণ করেছিলেন।

শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৩-২-৩৪॥

তারপর শরৎ ঋতুর সমাগমে শ্রীকৃষ্ণ এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে গোপীদের সাথে সুমধুর নৃত্যগীতাদি সহকারে রাস ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করেছিলেন।

৯
বিদুর-উদ্ধব সংবাদ (গ)

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর একান্ত ভক্তদের নিয়ে গো-গোপ পরিবৃত হয়ে ব্রজধামে সকলের ভগবৎ-ভাব বৃদ্ধি করে বাল্যলীলার অনুবর্তন করে চলেছেন। সেখানে পরম আনন্দের হাট বসেছে। এদিকে দেবকী-বসুদেব কংসের কারাগারে অতি কষ্টে দিন যাপন করছেন। এই কষ্টের মধ্যেও তাঁদের একমাত্র চিন্তার বিষয় সেই নবজাত শিশুটি, যাকে বসুদেব এগার বছর আগে গোপনে নন্দালয়ে রেখে এসেছিলেন। কত বছর কেটে গেল; তাকে দেখবার জন্য তাঁরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন; তাঁদের আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। ভগবান অন্তর্যামী; দেবকী-বসুদেবের হৃদয়ের বেদনা উপলব্ধি করে তিনি নিজের মধুর বাল্যলীলা সাঙ্গ করে মথুরায় এলেন এবং কর্তব্য কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রোশ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযূথনাথং হতং ব্যকর্ষদ্ব্যসুমোজসোর্ব্যাম্ ॥
৩-৩-১॥

উদ্ধব বলতে লাগলেন—শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন এগার বছর সেই সময় তিনি মাতাপিতা দেবকী-বসুদেবের আনন্দ বিধানার্থে দাদা বলরামের সাথে ব্রজধাম থেকে মথুরায় এসে উচ্চ রাজ-মঞ্চোপরি উপবিষ্ট তাঁর প্রধান শত্রু কংসকে সবলে আকর্ষণ করে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন; সেই আঘাতেই কংসের দেহান্ত হলো। অমিত শক্তিশালী কংস একটা বালকের আঘাতে মরে যাবে, এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না দেখে শ্রীকৃষ্ণ খেলার ছলে কংসের বিশাল দেহ মাটিতে টানাটানি করে দেখালেন যে, কংসের যথার্থই মৃত্যু হয়েছে।

সান্দীপনেঃ সকৃৎপ্রোক্তাং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥ ৩-৩-২ ॥

কংস বধের পর শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য সান্দীপনি মুনির কাছে গেলেন। সেখানে মুনির কাছে একবার মাত্র শুনেই তিনি সমস্ত বেদ অধিগত করলেন এবং শিক্ষান্তে গুরুদক্ষিণারূপে তিনি সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে পঞ্চজন নামক দৈত্যের উদর বিদীর্ণ করে মৃত্যুলোক থেকে ফিরিয়ে এনে গুরুকে প্রদান করলেন।

সমাহূতা ভীষ্মককন্যয়া যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্।
গান্ধর্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং জহ্রে পদং মূর্দ্ধ্নি দধৎ সুপর্ণঃ ॥
৩-৩-৩ ॥

ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণী রূপে গুণে লক্ষ্মীর সমতুল্যা এবং তাঁরই অংশ-সম্ভূতা। সুতরাং তিনি মনে মনে বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে বরণ করেছিলেন। এদিকে রুক্মিণীর ভাই, রুক্মীর ইচ্ছা যে, চেদিরাজ শিশুপালের সাথে তাঁর বোনের বিবাহ হয় এবং এই বিবাহ উপলক্ষে রুক্মী, জরাসন্ধ প্রভৃতি বহু রাজাদের নিমন্ত্রণও করেছিলেন। রুক্মিণী ভাইয়ের এই অভিসন্ধি জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে চিঠি লিখে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাকে এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এদিকে রুক্মিণীর বিবাহ সভায় জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি যেসব রাজারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন কৃষ্ণ-বিদ্বেষী। তাঁরা সবাই আশঙ্কা করছিলেন, এই বিবাহ-বাসরে শ্রীকৃষ্ণ অতর্কিতে উপস্থিত হয়ে একটা গোলমাল না বাধিয়ে ফেলে। ভগবৎ ইচ্ছায় কিন্তু তা-ই হলো। রাজাদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে রুক্মিণীকে হরণ করে তাঁকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করলেন; একটি অতুলনীয় উপমায় ভাগবতকার বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন —গরুড় যেমন বলপূর্বক অমৃত হরণ করেছিলেন সেই রকম শ্রীকৃষ্ণও সমস্ত রাজাদের মাথায় পদাঘাত করে, নিজের অংশস্বরূপা রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। রাজাদের সম্মিলিত শক্তিও প্রবল পরাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিরোধ করতে সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল।

কালমাগধসাল্বাদীননীকৈ রুন্ধতঃ পুরম্।
অজীঘনৎ স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ ॥ ৩-৩-১০॥

কালযবন, জরাসন্ধ, সাল্ব প্রভৃতি রাজারা তাঁদের বিপুল সৈন্য নিয়ে

মথুরা অবরোধ করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বজনদের দ্বারা অর্থাৎ মুচুকুন্দ, ভীম প্রভৃতিকে উপলক্ষ করে স্বয়ং তাদের বধ করলেন। এর ফলে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যে মুচুকুন্দ, ভীম প্রভৃতির কীর্তি বিস্তার লাভ করল; লোকে জানল যে, এঁরাই কালযবন, জরাসন্ধ প্রভৃতিকে বধ করেছেন। এ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ বলরাম, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিকে দিয়ে শম্বর, দ্বিবিধ, বাণ, মুর, বল্কল এবং আরও বহু অসুর-রূপী রাজাদের বধ করান এবং তিনি নিজেও দন্তবক্র প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমশালী অসুরদের বধ করেন।

উদ্ধব বললেন—হে বিদুর! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করে যেসব রাজারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিল, তাদের সৈন্যের দাপটে পৃথিবী কাঁপত। শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকলকে বিনাশ করে পৃথিবীর ভার দূর করেছিলেন।

স কর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং কুমন্ত্রপাকেণ হতশ্রিয়ায়ুষম্।
সুযোধনং সানুচরং শয়ানং ভগ্নোরুমুর্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্॥
৩-৩-১৩॥

কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতির কুপরামর্শে দুর্যোধন হতশ্রী অর্থাৎ সর্বস্ব হারিয়ে অকালে বেঘোরে প্রাণ হারাল। দুর্যোধন উরুভঙ্গ অবস্থায় অনুচরদের সাথে রণক্ষেত্রে পড়ে আছে দেখেও শ্রীকৃষ্ণ সুখী হতে পারলেন না; কারণ তাঁর আরব্ধ কাজ যে এখনও শেষ হলো না। শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হবার কারণই হলো দুষ্টের দমন, ভূভার হরণ। শ্রীকৃষ্ণ কালযবন, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি অনেক দোর্দণ্ডপ্রতাপ অসুরদের বধ করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আগত দুর্জয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এবং সানুচর দুর্যোধন হত হয়েছে। এতেই তো পৃথিবীর ভার দূর হবার কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন যে, এতে পৃথিবীর ভার সম্পূর্ণ দূর হলো না। তাই তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরও সুখী হতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন ঃ

কিয়ান্ ভুবোঽয়ং ক্ষপিতোরুভারো যদ্দ্রোণভীষ্মার্জুনভীমমূলৈঃ।
অষ্টাদশাক্ষৌহিণিকো মদংশৈরাস্তে বলং দুর্বিষহং যদূনাম্ ॥
৩-৩-১৪॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম প্রভৃতির নেতৃত্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের ভার দূরীভূত হয়েছে, ঠিক-ই; কিন্তু এতে পৃথিবীর

ভার অতি অল্পই দূর হয়েছে। কিন্তু আসল যে গুরুভার প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যারা আমারই অংশসম্ভূত—তাদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে দুর্জয় যাদব সৈন্যের ভার যে এখনও রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন—যে সব অসুরেরা এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে, তাদের অন্য কোন উপায়েও বিনাশ করা যেত; কিন্তু আমার অংশ-সম্ভূত যাদবদের তো কেউ বিনাশ করতে পারবেন না; তা হলে পৃথিবীর গুরুভার তো থেকেই গেল—তবে এখন উপায়? শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য যে ভূভার হরণ, তা সম্পূর্ণ করে সরে পড়বার মতলব করছেন। তিনি সরে পড়বার আগে যাদবদেরও সরাবার ব্যবস্থা তাঁকেই করে যেতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে দেবতারা যখন ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুর স্তব করছিলেন, তখন ভগবান আদেশ করেছিলেন যে পৃথিবীতে তাঁর কাজের সাহায্যের জন্য দেবতারা যদু বংশে জন্মগ্রহণ করুক। অতএব দেখা যাচ্ছে দেবতারাই যদু, ভোজ, বৃষ্ণি প্রভৃতি বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই বিপুল যাদবদের সাথে কেউ-ই পেরে উঠবে না, কেউ তাদের বিনাশ করতে পারবে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন যে, যাদবদের বিনাশের উপায়ও তাঁকেই করতে হবে। তিনি বুঝলেন—যাদবদের ভার দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—যখন তারা মদ্যপানে মত্ত হয়ে পরস্পর মারামারি করবে, তখনই তাদের বিনাশ হবে। নিজেরাই মারামারি করে মরবে—অপর কেউ তাদের বিনাশ করতে পারবে না।

আর একটা কথা, শক্তি যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়, সেখানেই গোলমাল, সেখানেই দম্ভ, অহংকার, অপরের উপর অত্যাচার হতে থাকে—এই তো হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস! ক্ষমতা মানুষকে অন্যায়ের পথে নিয়ে যায় এবং চরম ক্ষমতা চরম অন্যায় করতে বাধ্য করায়। একমাত্র অবতারেরাই চরম ক্ষমতা, সমস্ত শক্তি পূর্ণরূপে লাভ করেও অনাসক্তভাবে থাকতে পারেন এবং সেই শক্তিকে লোককল্যাণে নিয়োজিত করে থাকেন। কিন্তু অপর কেউ-ই তা পারে না। ফলে কৃষ্ণের বলে বলীয়ান হয়ে যাদবেরা দাম্ভিক, অহংকারী হতে থাকে; তারা তখন বয়োজ্যেষ্ঠদের এবং সাধুদের

পর্যন্ত অবজ্ঞা করতে থাকে। এই সব দেখে শ্রীকৃষ্ণ ঠিক করলেন যে, তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগেই তাঁরই অংশ-সম্ভূত যদুবংশীয়দেরও পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেবেন।

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্মজম্।
নন্দয়ামাস সুহৃদঃ সাধূনাং বর্ত্মদর্শয়ন্॥ ৩-৩-১৬ ॥

এইভাবে যদুবংশ ধ্বংসের উপায় স্থির করে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁর পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং নিজে সাধু-জনোচিত কাজ করে সকলের সামনে সৎ আদর্শ স্থাপন করে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সন্তোষ বিধান করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিন বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন এবং যুধিষ্ঠিরও অপর ভায়েদের সাথে কৃষ্ণের অনুবর্তী হয়ে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদ পথানুগঃ।
কামান্ সিষেবে দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাস্থিতঃ ॥ ৩-৩-১৯ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—যিনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বজনের আত্মস্বরূপ সেই তিনি প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য ভালভাবেই জানতেন অর্থাৎ জগৎ এবং পরমেশ্বরের বিষয় সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন; তাই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি দ্বারাবতীতে নিরাসক্ত হয়ে লৌকিক ও বৈদিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে বিষয়সকল ভোগ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি গুণাতীত হয়েও লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে অনাসক্তভাবে জীবন-যাপন করেছিলেন।

তিনি দ্বারকাতে অবস্থানকালে স্নিগ্ধ হাসি, সপ্রেম দৃষ্টি, মধুর বাক্য, অনবদ্য চরিত্র এবং লক্ষ্মীর আবাস-স্বরূপ নিজের দেহ দ্বারা সকলের, বিশেষ করে যদুবংশীয়দের আনন্দবর্ধন করে বিহার করেছিলেন।

পূর্য্যাং কদাচিৎ ক্রীড়দ্ভির্যদুভোজকুমারকৈঃ ।
কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্মতকোবিদাঃ ॥ ৩-৩-২৪ ॥

যথাসময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ বংশ সংহার করতে ইচ্ছা করলে যদু ও ভোজ বংশীয় বালকেরা আগত মুনিদের সাথে মিথ্যাচরণ করে তাঁদের

ক্রোধ উৎপাদন করেন। মুনিরা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জেনেই তাঁদের অভিশাপ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ঠিক করলেন যে, এইবার তিনি তাঁর নরলীলা সাঙ্গ করবেন, তখন তিনি তাঁর বাকি কাজ অর্থাৎ ভূভার হরণের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নিজের অংশ-সম্ভূত বিপুল যদুবংশীয়দের কেউ বিনাশ করতে পারবে না; আর এঁদের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত ভূভার হরণের কাজ পূর্ণ হবে না। এদিকে যদুবংশীয়েরা ক্ষমতার বলে দাম্ভিক, দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই একদিন যখন দ্বারকাতে যদু ও ভোজ বংশীয় যুবকেরা খেলছিল, তখন সেখানে কয়েকজন মুনি এসে উপস্থিত হলেন। যুবকেরা তাঁদের উপহাস করবার জন্য শাম্ব নামক একটি যুবককে গর্ভবতী স্ত্রীর বেশে সাজিয়ে মুনিদের জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর! আপনারা তো অন্তর্যামী—দয়া করে বলুন তো, এর ছেলে কি মেয়ে হবে? তখন শ্রীকৃষ্ণই মুনিদের হৃদয়ে ক্রোধ-রূপে আবির্ভূত হয়ে অভিশাপ দিলেন—এ একটি মুষল প্রসব করবে এবং ঐ মুষলই যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হবে। যদুবংশীয়েরা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ-স্বরূপ; সুতরাং তাঁদের অভিশাপ দেবার শক্তি মুনিদের থাকবার কথা নয়; তবুও তাঁরা অভিশাপ দিলেন—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই মুনিদের অবলম্বন করে অভিশাপরূপে অভিব্যক্ত হলো। এদিকে অভিশাপের ফলে যদুবংশে নানা দুর্যোগ, উৎপাত হতে আরম্ভ করে। তখন যাদবেরা এই সব উৎপাত-শান্তির জন্য প্রভাস তীর্থে গিয়ে দান ধ্যান করবেন ঠিক করলেন।

ততঃ কতিপয়ৈর্মাসৈর্বৃষ্ণিভোজান্ধকাদয়ঃ ।
যযুঃ প্রভাসং সংহৃষ্টা রথৈর্দেববিমোহিতাঃ ॥ ৩-৩-২৫ ॥

মুনিরা অভিশাপ দেবার কয়েক মাস পরে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হয়ে একদিন বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি বংশের লোকেরা আনন্দিত মনে রথে আরোহণ করে প্রভাস তীর্থে গমন করলেন।

সেখানে গিয়ে তাঁরা তীর্থজলে স্নান, দেবতা, ঋষি এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করে, ব্রাহ্মণদের বহু গরু, সোনা, রূপা প্রভৃতি দান করলেন।

অথ তে তদনুজ্ঞাতা ভুক্ত্বা পীত্বা চ বারুণীম্।
তয়া বিভ্রংশিতজ্ঞানা দুরুক্তৈর্মর্ম পস্পৃশুঃ ॥ ৩-৪-১॥

উদ্ধব বললেন—স্নান, তর্পণ এবং ব্রাহ্মণদের মুক্ত হস্তে দান করে, ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে যদু বংশীয়েরা তখন নিজেরা আহার করলেন। আহারের পর তারা সুরাপানে মত্ত হয়ে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দুর্বাক্য প্রয়োগ করে একে অপরের মনে আঘাত করতে লাগলেন।

তাঁরা তখন সকলেই মদের নেশায় মাতাল। বাঁশ গাছ যেমন পরস্পরের সাথে সংঘর্ষের ফলে আগুন লেগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরকমভাবে যদু-বংশীয়েরা পরস্পরের সাথে মারামারি করে যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সেই সময় সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হলেন।

ভগবানের কি অদ্ভুত মায়া! এই যাদবেরা শ্রদ্ধাবান, ভক্তিমান; নিজেরা পবিত্র জলে স্নান তর্পণাদি করে প্রথমে ব্রাহ্মণদের দান করলেন, তাদের আহার করালেন; অবশেষে তাদের অনুমতি নিয়ে নিজেরা আহার করলেন। যাদের বুদ্ধি এত মার্জিত, ব্যবহার এত সুন্দর, আশ্চর্য, তারাই পরক্ষণে সুরাপানে মত্ত হয়ে মারামারি করে সকলেই মারা পড়ল! ভগবানের নরলীলা শেষ হয়ে এসেছে; তাই তিনি এবার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে নিত্য-ধামে প্রস্থান করবেন। মায়ার আবরণ বিস্তার করে মারামারির ছল করে, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিত্যধামে পাঠিয়ে এবার তিনি নিজে স্বধামে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ।
সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূলম্ উপাবিশৎ ॥ ৩-৪-৩ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের মায়া-শক্তির প্রভাব অর্থাৎ সুরাপানে মত্ত ধ্বংসোন্মুখ যাদবদের দেখে নিজে সরস্বতী নদীর জলে আচমন করে একটি অশ্বত্থ গাছের নিচে গিয়ে বসলেন।

অহঞ্চোক্তো ভগবতা প্রপন্নার্তিহরেণ হ।
বদরীং ত্বং প্রযাহীতি স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা ॥ ৩-৪-৪ ॥

হে বিদুর! শরণাগত জনের দুঃখহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের বংশ

ধ্বংস করবার ইচ্ছা করে পূর্বেই আমাকে বলেছিলেন—হে উদ্ধব! তুমি বদরিকাশ্রমে চলে যাও—এখানে আর থেকো না।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে শরণাগতের দুঃখহারী বলা হয়েছে। উদ্ধব বলছেন—আমি তাঁর একান্ত শরণাগত; শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বংশ বিনাশ করবেন ঠিক করেই আমাকে এই ভয়ঙ্কর দুঃখ থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যই বলেছিলেন—তুমি বদরিকাশ্রমে চলে যাও—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন যে, উদ্ধবের মতো ভক্তের পক্ষে আমার বংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তা স্বচক্ষে দেখা সম্ভব হবে না—তার প্রাণে মরণাধিক আঘাত লাগবে। তাই ভক্তার্তিহারী শ্রীকৃষ্ণ আগে থেকেই উদ্ধবকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—যাতে উদ্ধবকে এই ধ্বংসলীলা দেখতে না হয়, যাতে সে পরম আনন্দে নির্জনে বসে নরনারায়ণের লীলা স্মরণ করতে পারে। কিন্তু ভক্ত তো কোন অবস্থাতেই ভগবানকে ছেড়ে থাকতে চায় না। তাই উদ্ধবও কোনরকমেই শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে যেতে পারছিলেন না। উদ্ধব বলছেন—শ্রীকৃষ্ণের বলা সত্ত্বেও, যদুকুল ধ্বংসের অভিপ্রায়ে তিনি আমাকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন জেনেও, আমি তাঁর বিরহ সহ্য করতে না পেরে দূর থেকে তাঁর অনুগমন করছিলাম।

অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্।
শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্ ॥ ৩-৪-৬ ॥

উদ্ধব বলছেন—শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে করতে সরস্বতী নদীর তীরে এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম যে, লক্ষ্মীর আবাস-স্বরূপ, সর্ব ঐশ্বর্য-যুক্ত ভগবান, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অনাশ্রয়ের মতো অশ্বত্থ গাছের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে একাকী বসে আছেন।

লক্ষ্মী যাঁর সেবা করেন, যিনি সকল সম্পদের অধীশ্বর, যিনি সকলের আশ্রয়স্থল, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিরাশ্রয়ের মতো একাকী বসে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে বসেছিলেন, এবার উদ্ধব তার বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ ॥ ৩-৪-৭ ॥

তাঁর শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, রজঃ ভাব শূন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় তাঁর

দেহ, অতি শান্ত চোখ দুটি ঈষৎ রক্তবর্ণ। তাঁর চারটি হাত এবং পরিধেয় পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র দেখে আমি তাঁকে চিনতে পারলাম।

বাম ঊরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্ঘ্রিসরোরুহম্।
অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থমকৃশং ত্যক্তপিপ্পলম্ ॥ ৩-৪-৮॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর বাম ঊরুদেশে নিজের ডান পা রেখে একটি ছোট অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তিনি তখন সমস্ত বিষয়সুখে বিমুখ হয়েছেন কিন্তু তবুও তিনি পরম আনন্দে পরিপূর্ণ রয়েছেন, দেখলাম।

শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্তিতে কংসের কারাগারে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন—দেখেছিলেন দেবকী ও বসুদেব। তখনকার বাল-কৃষ্ণের রূপের বর্ণনা ভাগবতে রয়েছে। আর এখন তাঁর লীলা সমাপ্তির পূর্বে তিনি চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিলেন উদ্ধব ও মৈত্রেয় মুনিকে। এ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তেরা বিভিন্ন সময়ে তাঁকে চতুর্ভুজ রূপে দর্শন করেছেন।

তস্মিন্ মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎ সখা।
লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া ॥ ৩-৪-৯ ॥

হে বিদুর! সেই সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের সহৃদয় সখা, পরম ভাগবত এবং তপস্যায় সিদ্ধি-প্রাপ্ত মৈত্রেয় মুনি, স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

এখানে সুহৃৎ এবং সখা, দুইটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে—দুইটির অর্থই তো এক—বন্ধু। কিন্তু এখানে সুহৃৎ শব্দটি সখার বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে; সুহৃদ অর্থাৎ শোভন চিত্ত যার, সহৃদয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে বাঁ পায়ের উপর ডান পা রেখে আত্মানন্দে বসেছিলেন, তখন ব্যাসদেবের সহৃদয় সখা মৈত্রেয় মুনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তস্যানুরক্তস্য মুনের্মুকুন্দঃ প্রমোদভাবানতকন্ধরস্য।
আশৃণ্বতো মামনুরাগহাস সমীক্ষয়া বিশ্রময়ন্নুবাচ ॥ ৩-৪-১০ ॥

মৈত্রেয় মুনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন; তাই তিনি সানন্দে ভাবের আবেগে অবনত মস্তকে তাঁর কথা শ্রবণে উৎসুক হলেন। কিন্তু

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সানুরাগ দৃষ্টি ও মধুর হাসির দ্বারা আমার ক্লান্তি দূর করে আমাকে বললেন ঃ

বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং তে দদামি যত্তদ্ দুরবাপমন্যৈঃ।
সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসূনাং মৎসিদ্ধিকামেন বসো ত্বয়েষ্টঃ॥
৩-৪-১১॥

হে উদ্ধব! পূর্ব জন্মে তুমি একজন বসু ছিলে। তখন প্রজাপতিগণ এবং বসুগণ মিলিত হয়ে যে যজ্ঞ করেছিল, তাতে তুমি আমাকে পাবার জন্য আরাধনা করেছিলে; এখন তোমার অন্তরে অবস্থিত হয়ে আমি তোমার মনোবাসনা জেনেছি। সুতরাং অপরের পক্ষে দুর্লভ হলেও, আমাকে লাভ করবার সিদ্ধি তোমায় প্রদান করছি।

স এষ সাধো চরমো ভবানামাসাদিতস্তে মদনুগ্রহো যৎ।
যন্মাং নৃলোকান্ রহ উৎসৃজন্তং দিষ্ট্যা দদৃশ্বান্ বিশদানুবৃত্ত্যা॥
৩-৪-১২॥

হে উদ্ধব! তোমার বসু প্রভৃতি অনেক জন্মের মধ্যে এইটি-ই শেষ জন্ম; কারণ এই জন্মে তুমি আমার অনুগ্রহ লাভ করেছ। আমি এখন মর্তলোক ত্যাগ করে যাচ্ছি। এই সময় তুমি যে নির্জনে পরম ভক্তিভাবে আমার দর্শন লাভ করলে, জানবে এ তোমার মহাসৌভাগ্য—তোমার জন্ম সার্থক হয়েছে।

পূর্ব জন্মে উদ্ধব অষ্টবসুর একজন ছিলেন। তখন তিনি শ্রীহরিকে পাবার জন্য আরাধনা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন উদ্ধবের মনোবাসনা জেনে, এই জন্মে পরম ভক্তের সাজে সাজিয়ে তাঁকে সহচররূপে কাছে কাছে রেখেছেন। আজ বিদায় মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—এই তোমার শেষ জন্ম; আর তোমায় জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না; তুমি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছ; মুক্তি এখন তোমার করতলগত। তুমি যে এখানে নির্জনে, ভক্তিভরে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ, জানবে এ তোমার বহু বহু সুকৃতির ফল। যাবার আগে এই কথাগুলো তোমায় বলবার ছিল। তা-ছাড়া এখন তোমাকে আরও কয়েকটি কথা বলব, যার দ্বারা তুমি বহু লোকের কল্যাণ সাধন করবে।

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥
৩-৪-১৩॥

ভগবান উদ্ধবকে বলছেন—পূর্বে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার মহিমা প্রকাশক উৎকৃষ্ট জ্ঞানের উপদেশ, আমার নাভি-পদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে দিয়েছিলাম— যা পণ্ডিতেরা এখনও চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলে অভিহিত করে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে যে জ্ঞানের কথা বলেছিলাম, এখন আমার পরমভক্ত, হে উদ্ধব! সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবত-কথা তোমাকে বলব—যার অনুশীলনে তুমি সমস্ত মায়া-মোহ অতিক্রম করতে পারবে।

শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই পরম স্নেহপূর্ণ কথা শুনে উদ্ধবের যে অবস্থা হলো তাই বলা হচ্ছে ঃ

ইত্যাদৃতোক্তঃ পরমস্য পুংসঃ প্রতীক্ষণানুগ্রহভাজনোঽহম্।
স্নেহোত্থরোমা স্খলিতাক্ষরস্তং মুঞ্চন্ শুচঃ প্রাঞ্জলিরাবভাষে॥
৩-৪-১৪॥

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি-পাত করে অত্যন্ত আদরের সাথে যখন ঐ সব কথা বললেন, তখন তাঁর প্রতি ভক্তিতে, প্রেমে আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, কথা বন্ধ হয়ে যেতে লাগল; চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমি তখন জোড় হাত করে তাঁকে বললাম ঃ

কো ত্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥
৩-৪-১৫॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে ভূমন্! হে বিরাট পুরুষ ভগবান! যাঁরা তোমার শ্রীচরণ ভজনা করেন, তাঁদের পক্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের কোনটাই দুর্লভ নয়; কিন্তু আমি এর কোনটাই চাই না; আমি একমাত্র তোমার চরণ সেবার জন্যই উৎসুক হয়ে আছি।

ভগবান এক জায়গায় বলেছেন—আমার যারা ভক্ত, তাদের সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে চাইলেও তারা তা

গ্রহণ করে না, একমাত্র আমারই সেবা করতে চায়। সুতরাং উদ্ধবের মতো ভগবানের একান্ত ভক্ত আর কি চাইবেন? ভগবানের চরণ সেবার অধিকারই তিনি প্রার্থনা করছেন।

কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্ রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥ ৩-৪-১৬ ॥

উদ্ধব বলছেন—হে প্রভু! স্পৃহাশূন্যের কর্মপ্রবৃত্তি, জন্মরহিতের জন্ম-পরিগ্রহ, মহাকালেরও যিনি সব কিছু ধ্বংস করেন, তাঁর পক্ষে শত্রু ভয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ও পলায়ন এবং আত্মারাম, যিনি নিজের আনন্দে সদাই বিভোর, তাঁর বহু পত্নীর সাথে গৃহাশ্রমে অবস্থান—এই সব বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ পণ্ডিতদের বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে।

উদ্ধব বলছেন—আমি জানি আপনি নির্গুণ, নিস্পৃহ, জন্মরহিত, জগৎ-বিধ্বংসী কাল এবং আপনি সদানন্দময় পরমেশ্বর। কেমন করে জানলাম? আপনার অলৌকিক কাজকর্ম দেখে এবং বিভিন্ন সময়ে আপনারই মুখ থেকে আপনার স্বরূপের কথা শুনে বুঝেছি, আপনি মানুষ নন—আপনি ভগবান। কিন্তু সেই আপনিও যখন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেন, শত্রু ভয়ে পালিয়ে যান, কর্মাধীন মানুষের মতোই কর্ম করেন, বহু স্ত্রী নিয়ে সংসার করেন—তখন আপনার সম্বন্ধে আমার সব ধারণা, সব বিচার-বুদ্ধি গুলিয়ে যায়—আপনাকে বুঝতে পারি না। তাই অর্জুনের মতো আমারও বলতে ইচ্ছা হয়ঃ

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।
(গীতা—১১-৩১)

হে আদি পুরুষ! আপনাকে আমি জানতে চাই কারণ আপনার এই সব কাজের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি না।

মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যৎ ত্বমকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ।
পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্তস্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব॥
৩-৪-১৭॥

উদ্ধব আরও বলছেন—হে দেব! হে প্রভু! আপনার জ্ঞান অকুণ্ঠিত, কখনো বাধাপ্রাপ্ত, বিফল হয় না এবং আপনার জ্ঞান পূর্ণ এবং সব সময়েই অভ্রান্ত। তবুও মন্ত্রণা বিষয়ে আপনি আমাকে ডেকে অনভিজ্ঞের মতো আমায় জিজ্ঞাসা করতেন—এই সব কথা ভাবলে আমি একেবারে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি; আপনার এত কাছে থেকেও আপনাকে একেবারেই চিনতে, বুঝতে পারিনি।

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং প্রোবাচ কস্মৈ ভগবান্ সমগ্রম্।
অপি ক্ষমং নো গ্রহণায় ভর্তর্বদাঞ্জসা যদ্ বৃজিনং তরেম ॥
৩-৪-১৮॥

হে প্রভু! আপনি নিজের রহস্য-প্রকাশক পরম জ্ঞান যা ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তা যদি আমাদের বোঝবার উপযুক্ত মনে করেন, তবে তা শিগ্‌গির আমাদের বলুন—যাতে আমরা এই সংসারের দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্মাকে নিজের মহিমা-প্রকাশক উৎকৃষ্ট জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন। উদ্ধব তখন তাঁকে বলেছিলেন যে, আপনার পাদপদ্মের যাঁরা সেবা করেন, তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফলই লাভ করতে পারে; কিন্তু আমার ওসব কিছু চাই না। আমি একমাত্র আপনার সেবাই করতে চাই। এ থেকে মনে হতে পারে যে, উদ্ধব হয়ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নয়—ব্রহ্মাকে দেওয়া উপদেশ তার শোনার দরকার নেই। কিন্তু পরের কয়েকটি শ্লোকে উদ্ধব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ভগবানের অনেক কাজের সামঞ্জস্য তিনি করতে পারেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃপা করে এখন উদ্ধবের ঐ সব সংশয়ের নিরসন করে ব্রহ্মাকে দেওয়া উপদেশ তাকেও বলেন, তবে উদ্ধব কৃতকৃতার্থ হবে।

উদ্ধবের মনের সংশয় কি? ভগবান হচ্ছেন নিত্য, নিষ্ক্রিয় এবং সর্বশক্তিমান; সুতরাং তাঁর পক্ষে আবার জন্মগ্রহণ করা, কর্ম করা এবং শত্রু ভয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। আবার ভগবান হচ্ছেন সদানন্দময়—তাঁর পক্ষে বিবাহ করে সংসার-ধর্ম করা যে নিতান্তই অসম্ভব। ভগবান নির্বিকার, চৈতন্যস্বরূপ, সর্বজ্ঞ; তাঁর পক্ষে উদ্ধবকে ডেকে পরামর্শ

করার যে কোনই মানে হয় না। উদ্ধব বলছেন—এই সব বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ আপনার মধ্যে দেখতে পাই, কিন্তু তার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। সুতরাং প্রথমে ভগবৎ সম্বন্ধীয় এই সব বিরুদ্ধভাবের সামঞ্জস্য করে, আপনি আপনার মহিমা-জ্ঞাপক যে জ্ঞান ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন, কৃপা করে সেই জ্ঞানের উপদেশ আমাকেও প্রদান করুন।

ইত্যাবেদিতহার্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ।
আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্ ॥ ৩-৪-১৯॥

হে বিদুর! এইভাবে আমার হৃদয়ের অভিপ্রায় তাঁকে জানালে, সেই পরম পুরুষ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ, তাঁর বিচিত্র লীলা-রহস্য আমাকে বললেন।

স এবমারাধিত পাদতীর্থাদধীত তত্ত্বাত্মবিবোধমার্গঃ।
প্রণম্য পাদৌ পরিবৃত্য দেবমিহাগতোঽহং বিরহাতুরাত্মা॥
৩-৪-২০॥

উদ্ধব বলছেন—হে বিদুর! বাল্যকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবার ফলে, তীর্থরূপী, মুক্তিদাতা, গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভের পথ জেনে, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উপদেশ লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে, বিরহ-কাতর চিত্তে বদরিকাশ্রমের পথে এখানে এসেছি।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নরলীলা সংবরণ করবেন ঠিক করেই উদ্ধবকে আগেই বদরিকাশ্রমে যেতে বলেছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে যাবার কষ্টের জন্য উদ্ধব যেতে পারছিলেন না। এখন শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সাধন-প্রণালী, যার দ্বারা উদ্ধব পরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হবেন, তা জেনে ভগবানকে প্রণাম করে বদরিকাশ্রমের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর মন অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত।

উদ্ধব বলছেন—প্রভাস তীর্থে অশ্বত্থ গাছের নিচে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখে প্রথমে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই; পরে তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। এখন আমি তাঁর প্রিয় স্থান বদরিকাশ্রমে যাচ্ছি। এই বদরিকাশ্রমে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ ভগবান নারায়ণ এবং নর নামক ঋষি নিরুপদ্রবে সুদীর্ঘকাল তীব্র তপস্যা করেছিলেন।

ইত্যুদ্ধবাদুপাকর্ণ্য সুহৃদাং দুঃসহং বধম্।
জ্ঞানেনাশময়ৎ ক্ষত্তা শোকমুৎপতিতং বুধঃ ॥ ৩-৪-২৩ ॥

শুকদেব বললেন—উদ্ধবের কাছ থেকে আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবদের এই রকম দুঃসহ বিনাশ-বার্তা শুনে বিদুর শোকে-দুঃখে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞানী বিদুর বিবেকের দ্বারা এই দুঃখ প্রশমিত করলেন।

স তং মহাভাগবতং ব্রজন্তং কৌরবর্ষভম্।
বিশ্রম্ভাদভ্যধত্তেদং মুখ্যং কৃষ্ণপরিগ্রহে ॥ ৩-৪-২৪ ॥

উদ্ধব হচ্ছেন ভগবানের পরম ভক্ত; সুতরাং উদ্ধবই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করবার শ্রেষ্ঠ অধিকারি। সেইজন্য কৌরব-শ্রেষ্ঠ বিদুর শ্রদ্ধাসহকারে, বদরিকাশ্রমে গমনোদ্যত উদ্ধবকে বললেন ঃ

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং যদাহ যোগেশ্বর ঈশ্বরস্তে।
বক্তুং ভবান্ নোঽর্হতি যদ্ধি বিষ্ণোর্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি॥
৩-৪-২৫॥

বিদুর উদ্ধবকে বললেন—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজ রহস্য-প্রকাশক যে পরম জ্ঞান তোমাকে দিয়েছেন, তা এখন আমাকে তোমার বলা উচিত ; কারণ ভগবানের যারা ভক্ত, তাঁরা নিজেদের সেবক এবং শিষ্যদের কল্যাণের জন্যই জগতে বিচরণ করে থাকেন। তাঁরা নিজের ভৃত্যদের অর্থাৎ নিজের সেবক ও শিষ্যদের প্রয়োজন সিদ্ধ করেন; তাঁদের নিজের তো আর কোন প্রয়োজন থাকে না। বিদুর বলছেন—এতদিন আমি তোমার বন্ধুর মতোই ছিলাম; এখন তুমি আমাকে তোমার সেবক ও শিষ্য মনে করে, ঐ পরম জ্ঞান আমায় প্রদান কর।

উদ্ধব বদরিকাশ্রমে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন দেখে, বিদুর ভাবলেন—উদ্ধবের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করতে হবে; এমন সুযোগ তো আর জীবনে কখনও আসবে না। তাই তিনি পরম শ্রদ্ধার সাথে উদ্ধবকে বললেন—যাঁরা ভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের তো আর পাবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না—তাই তাঁরা আর নিজের জন্য ব্যস্ত হন না, পরহিতার্থে জীবন ধারণ করেন। তাঁরা তখন নিজের সেবক ও শিষ্যদেরও সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। হে উদ্ধব! তুমি

ভক্তি-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছ; এখন আমাকে তোমার সেবক ও শিষ্য মনে করে, শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত জ্ঞান দান করে আমার জীবনকে সার্থক কর।

ননু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌশারবোঽন্তি মে।
সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্যলোকং জিহাসতা ।। ৩-৪-২৬ ।।

উদ্ধব বললেন—হে বিদুর! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মর্তলোক ত্যাগ করে যেতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি আমার সামনে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যাঁকে সেবা করা উচিত, সেই মৈত্রেয় মুনিকে আদেশ করেছেন, তোমাকে উপদেশ করবার জন্য। সুতরাং তুমি মৈত্রেয় মুনির শরণাপন্ন হও—তিনিই তোমার গুরু—তিনিই তোমায় এই পরম জ্ঞান দান করবেন।

ভক্ত উদ্ধবের কাছে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা বিস্তারিতভাবে শোনবার পর বিদুরের ইচ্ছা হলো তিনি উদ্ধবকে গুরুপদে বরণ করে নিয়ে, তার কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিষয়ক ভাগবতী জ্ঞান লাভ করবেন, যাতে তিনিও শোক-মোহ অতিক্রম করে ভগবানকে লাভ করতে পারেন। বিদুর তাঁর ইচ্ছার কথা বলতেই উদ্ধব বললেন—তা তো হবার নয়; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্য-ভক্ত তোমাকে শেষ পর্যন্ত ভোলেননি; তিনি নিজেই তোমার ব্যবস্থা করে গেছেন। লীলা সংবরণের পূর্বে আমারই সামনে তিনি মৈত্রেয় মুনিকে আদেশ করলেন, তোমাকে উপদেশ দেবার জন্য। সুতরাং তুমি এখন মৈত্রেয় মুনির কাছে যাও। বিদুরের কাছে এই-টি কত বড় আনন্দের কথা যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে শেষ সময় পর্যন্ত ভোলেননি—এমন আনন্দের সংবাদ বিদুর সারা জীবনে কখনও পাননি—ভগবান তাঁর প্রিয় বিদুরের উদ্ধারের ব্যবস্থা নিজেই করে গেছেন।

ইতি সহ বিদুরেণ বিশ্বমূর্তের্গুণকথয়া সুধয়া প্লাবিতোরুতাপঃ।
ক্ষণমিব পুলিনে যমস্বসুস্তাং সমুষিত ঔপগবির্নিশাং ততোঽগাৎ।।
৩-৪-২৭ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে উদ্ধব বিদুরের সাথে বিশ্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণ এবং মহিমা কীর্তন-রূপ অমৃত পানে স্বজন বিয়োগের দারুণ দুঃখ প্রশমিত করলেন। তাঁরা সেই রাত্রি যমুনার তীরে যেন এক মুহূর্ত সময়ের মতো কাটিয়ে, প্রভাতে উদ্ধব সেখান থেকে চলে গেলেন।

আনন্দের সময় কখনও দীর্ঘ হয় না। উদ্ধব নিজে মহাভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি-বিজড়িত যমুনার তীরে বহু দিন পরে মহাজ্ঞানী, মহাধার্মিক বন্ধু বিদুরকে পেয়েছেন। উদ্ধবের আনন্দ আর ধরে না। তাঁদের দুই জনেরই পরম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁরা সে রাত্রি অতিবাহিত করলেন—তাঁদের মনে হলো যেন এক মুহূর্তেই সেই রাত্রি শেষ হয়ে গেল।

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজেষ্বধিরথযূথপযূথপেষু মুখ্যঃ।
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যদ্ধরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ॥ ৩-৪-২৮॥

বিদুরোদ্ধব-সংবাদ শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—রথ, সৈন্য, হস্তী প্রভৃতির অধিনায়ক বৃষ্ণি এবং ভোজ বংশীয়েরা যখন সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হলেন এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যখন নরদেহ ত্যাগ করলেন, তখন যাদব-প্রধান উদ্ধব-ই বা কেন আর বেঁচে রইলেন?

যদু বংশ ধ্বংসের বৃত্তান্ত শুনে পরীক্ষিতের মনে প্রশ্ন এল—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁরই অংশ-সম্ভূত যদু বংশীয়দের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন এবং নিজেও নরদেহ ত্যাগ করলেন, তখন আর কিসের জন্য তিনি উদ্ধবকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখলেন? উদ্ধবকে নগণ্য মনে করে, উদ্ধবের দ্বারা কিছু হবে না মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন, তা বলা যায় না। কারণ উদ্ধবকে এই শ্লোকেই একজন যাদব-প্রধান বলা হয়েছে। আবার যাদব-প্রধান বলেই যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন—এটাই বা কেমন করে সম্ভব হয়? যখন যদু বংশের প্রাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চলে গেলেন, তখন উদ্ধবের আর বেঁচে থাকবার কি সার্থকতা থাকতে পারে?

পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে শুকদেব বললেন ঃ

ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ।
সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ষ্যন্ দেহমচিন্তয়ৎ॥ ৩-৪-২৯॥

ভগবানের ইচ্ছাতেই জগতে সব কিছু অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অমোঘ ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম-শাপের ছল করে, কাল-শক্তির দ্বারা বিস্তৃত যদুবংশ ধ্বংস করে, নিজের নররূপ উপসংহার করতে উদ্যত হয়ে ভাবলেন ঃ

অস্মাল্লোকাদুপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্।
অর্হত্যুদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রত্যাত্মবতাং বরঃ॥ ৩-৪-৩০॥

আমি এই মর্তধাম থেকে অন্তর্হিত হলে আত্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই আমাতে আশ্রিত জ্ঞান যথার্থভাবে ধারণ করতে সমর্থ; অর্থাৎ এক-মাত্র উদ্ধব ছাড়া মদ্বিষয়ক, ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞানের ধারক এবং বাহক আর তো কেউ হতে পারে না।

কেন হতে পারে না? জগতে তো আরও কত মুনি ঋষিরা সব ছিলেন; শেষ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের সঙ্গে মৈত্রেয় মুনিকেও ঐ উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ কেন ভাবলেন যে, একমাত্র উদ্ধব-ই তাঁর জ্ঞানের বাহক হতে পারবে? আর এই জ্ঞানের বাহক যদি জগতে কেউ না থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণের আসাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে—কয়েকজন অসুর বধের জন্যই মাত্র তিনি এসেছিলেন, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য তিনি আর কিছুই রেখে যাননি—এই দাঁড়াবে।

শ্রীশ্রীসারদা দেবী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর যাবার পর যখন দেখলেন যে, ঠাকুরের সন্তানেরা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন—ঠাকুর, তুমি এলে, এই কয়জনকে নিয়ে লীলা খেলা করে, আনন্দ করে চলে গেলে; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর অত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও শ্রীমায়ের এই কথা প্রযোজ্য; শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বাহক যদি তিনি কাউকেই রেখে না যান, তা হলে এই জ্ঞানও জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের-ই বা কি এমন দরকার ছিল? শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আরও বলেছিলেন—আর সেইটি-ই ঈশ্বরাবতরণের আসল কথা—ওরা সব, অর্থাৎ ঠাকুরের সন্তান ও ভক্তেরা, তোমাকে আর তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে; আর এই সংসার-তাপ-দগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে; এই জন্যেই তো তোমার আসা।

এই হচ্ছে ঈশ্বরাবতরণের আসল উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণের বেলাতেও এই কথাই সত্য। আর তারই জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তাঁর আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে রেখে গেলেন। উদ্ধবকে-ই তিনি কেন এই কাজে মনোনীত করলেন—আরও তো কত জ্ঞানী, ভক্ত-শ্রেষ্ঠ যাদবেরা ছিলেন?

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥ ৩-৪-৩১॥

শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন—উদ্ধব আমার থেকে একটুও কম নয়, যেহেতু উদ্ধব ত্রিগুণের বশীভূত নয়; সুতরাং আমারই মতো সে মায়াকে বশীভূত করেছে। অতএব উদ্ধব ভগবৎ-বিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ দেবার জন্য এই পৃথিবীতে অবস্থান করুক।

জগতে যখনই যে জিনিসটির দরকার হয়, তার আগেই ভগবান সেই জিনিসটির ব্যবস্থা করে রাখেন। সন্তান হবার আগেই শিশুর পুষ্টির জন্য ভগবান মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে রাখেন। আমরা ভাবি—ভগবানের আরাধনা তো করতে চাই, কিন্তু উপযুক্ত গুরু পাচ্ছি না। এইটি আমাদের ভুল। যদি আমরা যথার্থই ভগবানের আরাধনা করতে চাই, তবে উপযুক্ত গুরু জুটে-ই যায়। চাই কেবল আমাদের ইচ্ছা, আন্তরিকতা। তারই প্রমাণস্বরূপ বলা হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণ মর্তলোক ছেড়ে চলে যাবার আগে উদ্ধবকে পৃথিবীতে রেখে গেলেন, যাতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ভগবৎ-জ্ঞানের প্রচার পৃথিবীতে অব্যাহত থাকে।

এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিষ্টঃ শব্দযোনিনা।
বদর্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা ॥ ৩-৪-৩২ ॥

ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপদেশ পৃথিবীতে চলতে থাকুক, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ত্রিলোকপূজ্য বেদকর্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যেতে বলেছিলেন; উদ্ধবও তখন বদরিকাশ্রমে গিয়ে নিরন্তর একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির আরাধনা করতে লাগলেন।

উদ্ধব তো বদরিকাশ্রমের পথে চলে গেলেন। তখন যমুনার তীরে বিদুরের কি অবস্থা হলো?

বিদুরোঽপ্যুদ্ধবাৎ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য কর্মাণি শ্লাঘিতানি চ ॥ ৩-৪-৩৩ ॥

উদ্ধব চলে যাবার পর, বিদুর উদ্ধব-কথিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির দ্বারা প্রকটিত দেহে যে সমস্ত প্রশংসনীয় কর্ম করেছেন, সেসব গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন।

জ্ঞানীদের ধৈর্য-বর্ধনকারী এবং অধীর পশুতুল্য মূর্খ ব্যক্তিদের পক্ষে ধারণার অতীত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান সম্বন্ধে বিদুর চিন্তা করতে লাগলেন।

বিদুরের বার বার মনে হতে লাগল যে. তিনি আর কখনও তাঁর পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাবেন না।

আত্মানঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্।
ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৩-৪-৩৫ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণ শেষ সময়ে বিদুরের কথা ভেবে মৈত্রেয় মুনিকে উপদেশ দেবার জন্য বলে গেছেন—এই কথা চিন্তা করে মহামতি বিদুর কৃষ্ণ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

উদ্ধবের কাছে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-রহস্য, তাঁর অপার্থিব কার্যাবলী এবং ভক্তের প্রতি ভগবানের অসীম করুণার কথা শুনতে শুনতে বিদুরের ভক্তি-ভাবিত মন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। যতক্ষণ উদ্ধব কাছে ছিলেন, ততক্ষণ বিদুর কৃষ্ণ-কথায় এমনই তন্ময় ছিলেন যে, তখন তাঁর আর কোন দিকেই মন ছিল না। কিন্তু উদ্ধব চলে যেতেই বিদুর সেই সব কথা গভীরভাবে অনুধাবন করার সুযোগ পেলেন—বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ, অন্তর্ধানের পূর্বে বিদুরের কথা ভেবেছেন, তার সব ব্যবস্থা করে গেছেন—এই চিন্তায় বিদুর প্রেমে আত্মহারা হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কালিন্দ্যাঃ কতিভিঃ সিদ্ধ অহোভির্ভরতর্ষভ।
প্রাপদ্যত স্বঃসরিতং যত্র মিত্রাসুতো মুনিঃ॥ ৩-৪-৩৬ ॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যমুনার তীরে উদ্ধবের কাছে সিদ্ধিলাভের উপায় জানতে পেরে, মহামতি বিদুর কয়েক দিন পরেই গঙ্গার তীরে, যেখানে মৈত্রেয় মুনি বাস করছিলেন, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিদুর এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন তীর্থে স্নান, তর্পণ, দেবমূর্তি দর্শন, ভগবৎ-কথা শ্রবণ করে হৃদয়ের ভক্তিভাব সমৃদ্ধ করেছেন। এইভাবে যখন তিনি মায়া-মোহ অতিক্রম করে ভগবানে মনকে অধিকতর একাগ্র করেছেন, ঠিক সেই সময় উদ্ধবের সাথে বিদুরের দেখা হলো। উদ্ধবের কাছে সদ্‌গুরুর সন্ধান পেতেই বিদুরের সিদ্ধিলাভের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। সুতরাং বিদুর আর উদ্দেশ্য-বিহীন তীর্থ ভ্রমণে না গিয়ে সোজা গঙ্গার তীরে গুরু মৈত্রেয় মুনির চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হলেন।

১০

মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্।
ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাবসিদ্ধঃ পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ ॥
৩-৫-১ ॥

শুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহলাভে যিনি কৃতকৃতার্থ হয়েছেন, সেই কৌরব-শ্রেষ্ঠ বিদুর তখন গঙ্গার দ্বারদেশে অর্থাৎ হরিদ্বারে এসে অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন মৈত্রেয় মুনির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং মুনির সদ্ব্যবহারে ও গুণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মূল শ্লোকে রয়েছে—মুনির সদ্ব্যবহার এবং গুণে বিদুর অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বিদুর এসেছেন মৈত্রেয় মুনিকে গুরুপদে বরণ করার জন্য; সুতরাং মৈত্রেয় মুনির ব্যবহারে বিদুরের খুশি হবার থেকে বিদুরের ব্যবহারে মৈত্রেয় মুনির খুশি হবার বেশি দরকার; কারণ গুরু খুশি হলে তবেই তো তিনি জ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে গুরুর কিছু লক্ষণের কথা বলা হয়েছে ঃ

শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতা যো ব্রহ্মবিত্তমঃ
ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতান্ ॥ বি.চূ-৩৩ ॥

বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, কামনাশূন্য যে ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বাইরের বিষয়সমূহ ত্যাগ করে ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন, শান্ত, ধূমশূন্য অগ্নির মতো তেজস্বী, অহেতুক দয়াপরায়ণ এবং প্রণত সৎ ব্যক্তির সুহৃৎস্বরূপ—এইরকম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই যথার্থ গুরুপদবাচ্য। বিদুর মহাবুদ্ধিমান, তিনি ছিলেন কৌরবদের মহামন্ত্রী। তিনি মৈত্রেয় মুনিকে এক নজরেই বুঝে নিলেন যে, শ্রীগুরুর গুণসমূহ এঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। তাই তিনি আনন্দিত হয়ে ভাবলেন—এঁরই কাছ থেকে

সাধনরহস্য জেনে নিতে হবে। এই ভাবটিই মূল শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়েছে—মৈত্রেয় মুনির সৎগুণে পরিতৃপ্ত হয়ে বিদুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ॥
৩-৫-২॥

হে ভগবন্! লোকে সুখের জন্য কর্ম করে; কিন্তু কর্মের দ্বারা সুখ লাভ অথবা দুঃখের নিবৃত্তি কিংবা বৈরাগ্য লাভ হয় না; বরং কর্মের দ্বারা মানুষ বারবার দুঃখ ভোগই করে থাকে। সুতরাং সংসারে আমাদের কি করা কর্তব্য, তা আপনি দয়া করে বলুন।

এই তো মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন—কিসে দুঃখের নিবৃত্তি হবে, কিসে আত্যন্তিক সুখ লাভ হবে। মানুষ নিজের বুদ্ধি অনুসারে কিছু কাজ করতে পারে বটে, কিন্তু সংসারে সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ কাজের দ্বারা কেউ-ই সুখ লাভ করতে পারে না; বরং আরও দুঃখের মধ্যেই জড়িয়ে পড়ে। বিদুর বলছেন—এও তো শুনেছি যে, কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হতে পারে; যেমন মিথিলার রাজা জনক কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু সারা জীবন ধরেই তো আমি কত কাজ করলাম; তবুও আমার ভাগ্যে তো কিছু হলো না। সুতরাং এমন সদুপদেশ আপনি আমায় দিন, যাতে করে আমার মতো লোকও সফলকাম হতে পারে।

পূর্বজন্মের কর্মের ফলে মানুষ ভগবৎ-বিমুখ হয়ে পাপাচরণ করে থাকে এবং তার ফলে দুঃখ ভোগ করে। আপনার মতো যাঁরা মহাপুরুষ, ঈশ্বর-প্রেমী, তাঁরা তো পাপী-তাপীদের অনুগ্রহ করার জন্যই সংসারে বিচরণ করে থাকেন; তাই আপনার কাছে প্রার্থনা, আমার মতো দুঃখীজনের প্রতি কৃপা করে এমন উপদেশ দিন, যাতে আমার হৃদয়ের সকল সংশয় দূর হয়ে যায়, যাতে আমি বুঝতে পারি কিসে লোক যথার্থ সুখী হতে পারবে।

তৎ সাধুবর্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্ ॥

৩-৫-৪ ॥

অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি এমন কোন সহজ এবং সুখকর উপায় বলে দিন, যার অনুষ্ঠান করলে, শ্রীভগবান সাধকের ভক্তিপূত হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে আত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী অনাদি, বেদ প্রতিপাদ্য জ্ঞান দান করেন।

বিদুরের প্রশ্ন—ভক্তিভাবে ভগবানকে হৃদয়ে অনুভব করে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় কি ? পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ ভক্তি একই সঙ্গে কিভাবে লাভ করা যায় ?

বিদুর আরও প্রশ্ন করলেন—ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার যিনি অধীশ্বর সেই স্বতন্ত্র ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে যেভাবে, যেসব কর্ম করেন এবং নিষ্ক্রিয় হয়েও কল্পের প্রারম্ভে যেভাবে বিশ্ব সৃষ্টি করেন, সেই বিশ্বের পালনের ব্যবস্থা করেন, সেসব বিষয়ও আমায় বলুন।

চতুর্বর্ণের—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—যা অবশ্য করণীয়, এদের যা ধর্ম, সেসব আমি ব্যাসদেবের কাছে অনেকবার শুনেছি। ঐসব কথার মধ্যে একমাত্র অমৃতময় কৃষ্ণ-কথা ছাড়া অপর সব বিষয়েই আমার আশ মিটে গেছে, কারণ ঐসব কথা নিতান্তই তুচ্ছ; অর্থাৎ কৃষ্ণ-কথা, ভগবৎ-কথা ছাড়া আর কিছুই আমি শুনতে চাই না। আপনাদের মতো জ্ঞানী, গুণী মহামুনিদের কাছে পরমজ্ঞানী নারদাদি ঋষিরা পরম শ্রদ্ধার সাথে ভগবানের যেসব অমৃতময়ী কথা কীর্তন করে থাকেন, সেই পরম উপাদেয় ভাগবত-কথা শোনবার আকাঙ্ক্ষা আমার মেটেনি; সুতরাং সংসার-আসক্তি দূরকারী সেই অমৃতময় ভাগবত-কথাই আপনি আমায় বলুন।

শ্রদ্ধাপরায়ণ লোকেরা যখন ভগবানের কথা শোনেন, তখন তাঁদের ভগবানের উপর অনুরাগ বৃদ্ধি হতে থাকে এবং অপর দিকে সংসারের প্রতি অর্থাৎ ভগবৎ-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হয়; ঈশ্বরে অনুরাগ, অন্য বিষয়ে বিরাগ। এইভাবে ভগবৎ-চিন্তায় তাঁরা পরম আনন্দ লাভ করে অচিরেই সমস্ত দুঃখ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। কিন্তু পূর্বজন্মের পাপের ফলে যারা হরি-কথায় বিমুখ, বিদুর বলছেন—তাদের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়; কারণ তাদের সমস্ত কর্মই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং দেখতে দেখতে কাল তাদের আয়ু হরণ করতে থাকে। অতএব হে আর্তবন্ধু! হে বিপন্ন-সুহৃৎ মৈত্রেয়! আপনি লোকের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য পুণ্যকীর্তি শ্রীভগবানের কথা বলুন, যিনি

বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের জন্য নিজের মায়া শক্তিকে অবলম্বন করে, কৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অতিমানুষী লীলার কথা এবং লীলার রহস্য আমায় বুঝিয়ে বলে আমাকে কৃতার্থ করুন।

বিদুর শ্রীকৃষ্ণের বহু লীলা স্বচক্ষে দেখেছেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে থেকেছেন; মৈত্রেয় মুনির কাছে আসার আগে বিদুর উদ্ধবের কাছে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত সমস্ত কথাই বিশদ-ভাবে শুনেছেন; তবুও বিদুরের কৃষ্ণ-কথা শোনবার আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। তাই তিনি মহামতি মৈত্রেয় মুনিকে কৃষ্ণ-কথাই আবার জিজ্ঞাসা করছেন। জগতে সব জিনিসের আকাঙ্ক্ষা একদিন মিটে যায়; কিন্তু ভক্তের ভাগবত-কথা শোনার আকাঙ্ক্ষা আর মেটে না।

বিদুরের প্রশ্ন শুনে মৈত্রেয় মুনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন—হে বিদুর! তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি যে, তুমি যথার্থই ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ে উপলব্ধি করেছ। তুমি শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় পাত্র; তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্তলীলা শেষ করে যাবার আগে, তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দেবার জন্য আমায় বলে গেছেন।

মৈত্রেয় মুনি তখন প্রথমে সৃষ্টি-রহস্য বিস্তারিতভাবে বললেন। সৃষ্টির প্রবাহ অনাদি; তবে যেখানে 'সৃষ্টির পূর্বে' এই কথাটি ব্যবহার করা হয়, সেখানে সৃষ্টির পূর্বে বলতে বুঝতে হবে যে, এক কল্প শেষ হয়েছে এবং পরবর্তী কল্প তখনও আরম্ভ হয়নি—এই মধ্যবর্তী সময়কে 'সৃষ্টির পূর্বে' বলা হয়। এই অবস্থায় জগতের যা কিছু—কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, গাছপালা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জিনিস, এমন কি সৃষ্টির যে মূলীভূত কারণ, সেই অব্যক্ত মায়াশক্তি পর্যন্ত তখন একমাত্র ভগবৎ-স্বরূপে অবস্থিত ছিল। সেই অবস্থায় শ্রীভগবানের অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্ম-স্বরূপ অবস্থা ছাড়া আর কিছুই থাকে না—অর্থাৎ তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ। এই পরমাত্ম-স্বরূপ অবস্থাকেই বেদান্তে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। শ্রীভগবান সর্বদর্শী হলেও সেই সময় অর্থাৎ কল্প-সৃষ্টির পূর্বে তিনি কেবলমাত্র স্বস্বরূপে অবস্থিত ছিলেন। সুতরাং দেখবার কোন জিনিসই ছিল না। নিজের মায়াশক্তিও তাঁতেই লীন থাকায়, সেই স্বপ্রকাশ-স্বরূপ ভগবান নিজেকে যেন না থাকার মতো মনে করে-ছিলেন—অর্থাৎ তাঁর নিজের সত্তার কোন কার্যই ছিল না, তাই কোন প্রকট

অবস্থা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। পরে শ্রীভগবান তাঁর অচিন্ত্য মায়াশক্তির দ্বারা এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। কোথা থেকে করলেন? নিজের মধ্য থেকেই করলেন। তিনি বহু হবার ইচ্ছা করলেন—ক্রমে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার ইত্যাদি প্রকটিত হয়ে জীব-জগতের সৃষ্টি হলো।

বিদুর প্রশ্ন করেছিলেন—কিসে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, কেমন করে অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করা যায় এবং ভক্তিভাবে ভগবানকে হৃদয়ে অনুভব করে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

এই সব প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় মুনি প্রথমে সৃষ্টি-প্রকরণ বিশদ ভাবে বললেন। এই থেকে মনে হয় মৈত্রেয় মুনি তখনকার দিনের প্রচলিত সমস্ত দার্শনিক মতবাদই ভালভাবে জানতেন; আর জানবেনই বা না কেন? মৈত্রেয় মুনি ছিলেন বিদুরের পিতা ব্যাসদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু। পণ্ডিতের সাথে পণ্ডিতেরই বন্ধুত্ব হয়।

অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ এবং জ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মৈত্রেয় মুনি নিজে বিশেষ কিছু না বলে দেবতাদের একটি স্তবের উল্লেখ করলেন। পরমপুরুষ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে দেবতাদের স্তবের মধ্যে বিদুরের প্রশ্নেরও যথাযথ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নিজে সরাসরি উত্তর না দিয়ে অপরের কথার উল্লেখ করে উত্তর দেওয়াতে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রথমত প্রশ্নকর্তাকে যেন উৎসাহিত করে বলা হলো যে, তোমার প্রশ্ন অতি সমীচীন হয়েছে; তোমার পূর্বেও অমুক মহাপণ্ডিত তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ প্রশ্নের এইরকম উত্তর দিয়েছিলেন। এতে প্রশ্নকর্তাকে একদিকে সম্মানিত করা হলো এবং অপরদিকে প্রশ্নকর্তা যাতে মন দিয়ে উত্তর শুনে তা নিজের জীবনে আরোপ করতে সচেষ্ট হয়, তার জন্য উৎসাহিত করাও হলো।

নমাম তে দেব পদারবিন্দং প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি॥

৩-৫-৩৯॥

দেবতারা স্তব করছেন—হে ভগবন্! তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ

করে সাধকেরা সংসারের ভয়ঙ্কর দুঃখসকল অনায়াসে দূর করতে সমর্থ হয়। যারা শরণাগত, তাদের ত্রিতাপ-জ্বালা প্রতিহত করবার ছত্র-স্বরূপ তোমার যে পাদপদ্ম, আমরা তোমার সেই পাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

সংসারের লোক আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে না। সেইজন্য ভক্তেরা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করে সকল রকম দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। ছাতা যেমন রৌদ্র-তাপ থেকে রক্ষা করে, সেইরকম ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করলে মানুষ সমস্তরকম বিপদ এবং দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পায়। অজ্ঞান থেকেই দুঃখের উৎপত্তি; সুতরাং জ্ঞান লাভ হলেই দুঃখেরও নিবৃত্তি হয়; কিন্তু ভগবানের পাদপদ্ম হচ্ছে জ্ঞানেরও মূলাধার। তাই দেবতারা স্তব করছেন—আমরা আপনার জ্ঞানদায়ী চরণ-ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি। বিদুরের প্রশ্ন ছিল—কিসে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। উত্তরে বলা হলো শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় নিলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায়।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা ব্রজেম তৎ তেঽঙ্ঘ্রিসরোজপীঠম্ ॥
৩-৫-৪২ ॥

শ্রদ্ধা এবং সাধন-রূপ ভক্তির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। শ্রদ্ধা হলো, গুরু বাক্যে এবং শাস্ত্রে বিশ্বাস। এই শ্লোকে রয়েছে—গুরু-মুখ থেকে উপদেশ শুনে সেই উপদেশ অনুযায়ী সাধন-রূপ ভক্তির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধচিত্তে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করলে বৈরাগ্য জন্মে এবং সেই বৈরাগ্য থেকে জ্ঞান লাভ হয়।

গুরুর উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাস করে ভক্তিমার্গের সাধন করলে, ক্রমে চিত্ত-শুদ্ধি, বৈরাগ্য এবং জ্ঞান লাভ হয়। এখানে ভক্তির মধ্য দিয়ে জ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে। এই হচ্ছে ভাগবতের বিশেষত্ব। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানমার্গের সাধন একটু ভিন্ন রকমের। জ্ঞানমার্গের সাধকদের প্রথমেই চারটি জিনিসের দরকার হয়—এই চারটি জিনিস না থাকলে জ্ঞানের সাধন আরম্ভই করতে পারবে না।

বিবেকচূড়ামণি (১৯) গ্রন্থে রয়েছে ঃ

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্
শমদমাদিষট্সম্পত্তির্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্ ॥

জ্ঞানমার্গের সাধককে প্রথমেই জানতে হবে কোন্‌টা নিত্য এবং কোন্‌টা অনিত্য—কোন্‌টা চিরস্থায়ী এবং কোন্‌টা ক্ষণস্থায়ী। দ্বিতীয়, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখ-ভোগের আশা ত্যাগ করতে হবে; তৃতীয়—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা এবং সমাধান—এই ছয়টি সম্পত্তির অধিকারি হতে হবে এবং চতুর্থ, মুক্তি লাভের তীব্র ইচ্ছা। এইগুলি কারও জীবনে প্রকট হলে, তবেই সে জ্ঞান-মার্গের অধিকারি হয়—অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে, যথার্থ জ্ঞানমার্গের অধিকারি অত্যন্ত দুর্লভ। সুতরাং উপায় কি? ভাগবতকার বলছেন—যার গুরু বাক্যে বিশ্বাস আছে, ভক্তির মাধ্যমে তারই জ্ঞান লাভ হতে পারে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ভক্তি পথই সহজ। তাই দেবতারা বলছেন—আমরা ভক্তি-ভাবিত হৃদয়ে আপনার চরণকমল আশ্রয় করেছি।

বিশ্বস্য জন্মস্থিতিসংযমার্থে কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে।
ব্রজেম সর্বে শরণং যদীশ স্মৃতং প্রযচ্ছত্যভয়ং হি পুংসাম্ ॥
৩-৫-৪৩ ॥

হে পরমেশ্বর! এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের জন্য আপনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। আপনার পাদপদ্ম স্মরণ মাত্রই ভক্তেরা, আপনার যারা সেবক, তাঁরা নির্ভয় হয়ে যায়। তাই আমরাও আপনার অভয় পাদপদ্মে শরণাগত হয়েছি।

যৎ সানুবন্ধেঽসতি দেহগেহে
মমাহমিত্যূঢ়দুরাগ্রহাণাম্।
পুংসাং সুদূরং বসতোঽপি পুর্যাং
ভজেম তৎ তে ভগবন্ পদাব্জম্ ॥ ৩-৫-৪৪॥

দূরভিমানী লোকেরা, যারা সাধন করে না, তারা স্ত্রীপুত্রাদি-রূপ বন্ধনের সাথে নশ্বর এই দেহ এবং গৃহকে 'আমার শরীর আমার গৃহ' বলে মনে করে;

এও তো আর একটা বন্ধন। সেইজন্য দেবতারা বলছেন—হে প্রভু! আপনি অন্তর্যামী-রূপে সকলের মধ্যে অবস্থিত হলেও এইসব লোকের পক্ষে আপনার পদাশ্রয় লাভ করা অত্যন্ত দুর্ঘট। আমরা কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্ম ভজনা করি।

সংসারে লোকেরা একে তো স্ত্রীপুত্রের মায়ায় আবদ্ধ ; তার উপর তারা অনিত্য বস্তুকে চিরস্থায়ী বলে ভেবে 'আমার শরীর, আমার গৃহ' ইত্যাদি অভিমান করে থাকে। এর ফলে ভগবান, যিনি সর্বব্যাপী, সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তাঁকে এরা লাভ করতে পারে না। ভক্তি ছাড়া সাধন ভজন এবং ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করা যায় না। তাই দেবতারা প্রার্থনা করছেন—আমরা ভক্তি-ভাবিত হৃদয়ে আপনার শরণ নিলাম।

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥
৩-৫-৪৬ ॥

হে প্রভু! আপনার কথামৃত, আপনার লীলামৃত আস্বাদনে, ভক্তির আতিশয্যে, যাদের চিত্ত নির্মল হয়, তারা বৈরাগ্য-জনক জ্ঞান লাভ করে অনায়াসে আপনার স্বধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন।

তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে॥
৩-৫-৪৭॥

অপর দিকে যাঁরা মোক্ষ অভিলাষী, তাঁরা অন্তঃকরণের একাগ্রতা-রূপ যোগবলে প্রবল মায়াকে জয় করে সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে লয় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি তাঁরা লাভ করে থাকেন। যারা আত্মসমাধিযোগ অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে মুক্তি লাভ করতে সচেষ্ট, তাদের অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করতে হয়, কিন্তু আপনার ভক্তদের পক্ষে আপনার সেবায় কোন কষ্ট হয় না।

এখানে জ্ঞান ও ভক্তি পথের সাধনার পার্থক্য দেখানো হয়েছে। জ্ঞান এবং ভক্তিমার্গের সাধকের মুখ্য উদ্দেশ্য একই—আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি। জ্ঞানমার্গের সাধক তীব্র বৈরাগ্য-যুক্ত হয়ে নিত্য এবং অনিত্য

বস্তু-বিচার এবং কঠোর মনঃসংযম করে মোক্ষ লাভের চেষ্টা করেন। ভক্তি পথের সাধক সর্বদা ভগবানের নাম কীর্তন, লীলা শ্রবণ এবং ভগবানের পাদপদ্মের ধ্যানের দ্বারা পরম পুরুষার্থ, পরম আনন্দ লাভ করে থাকেন। জ্ঞান এবং ভক্তি—দুই প্রকার সাধনাতেই মনঃসংযম এবং তন্ময়তা অভ্যাস করতে হয়। জ্ঞানী পরমাত্মায় একেবারে লীন হয়ে যান, নিজের কোন সত্ত্বাই তাঁর আর থাকে না। ভক্তও ভগবানে একেবারে তন্ময় হয়ে যান; কিন্তু ভগবৎ-রস আস্বাদনের জন্য যতটুকু নিজের সত্ত্বা রাখা দরকার, কেবল ততটুকুই রাখেন। ভক্তের ভাব—'চিনি খেতে ভালবাসি কিন্তু চিনি হতে চাই না'। অধিকারি ভেদে জ্ঞান এবং ভক্তির সাধনা স্থির হয়। সাধারণত বলা হয় যে, জ্ঞানের পথ কঠিন এবং ভক্তির পথ সহজ।

দেহাভিমান থাকতে নির্গুণ ব্রহ্মের সাধন কষ্টসাধ্য কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের সাধন, ভক্তি পথের সাধন-ই সহজ।

শ্রীভগবানের উদ্দেশে দেবতাদের এই স্তুতির মধ্য দিয়ে মৈত্রেয় মুনি বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন— কেমন করে দুঃখের নিবৃত্তি এবং অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ হয়। মৈত্রেয় বললেন—একমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগত হলেই দুঃখের নিবৃত্তি এবং আত্যন্তিক সুখ লাভ হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন—ভক্তিভাবে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় কি? উত্তরে বললেন—গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করে সাধন করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়; সেই শুদ্ধ চিত্তে ভগবানের ধ্যান করলে সংসারের যাবতীয় বিষয়ের উপর বিরাগ এবং পরমাত্মায় অনুরাগ হয়। এই বৈরাগ্য থেকে জ্ঞান এবং মুক্তি লাভ হয়। ভক্তেরা মুক্তি চায় না; তারা শ্রীভগবানের চরণ-সেবা করতে চায়। এই যে জ্ঞানের সাধন বলা হলো, এটা অদ্বৈতবাদীর মত নয়—ভাগবতের মত।

বিদুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩-৭-২॥

হে ব্রহ্মন্! ভগবান হচ্ছেন শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, বিকাররহিত অর্থাৎ নির্বিকার এবং গুণরহিত। সুতরাং লীলার জন্য হলেও, কেমন করে শ্রীভগবানে ক্রিয়াশীলতা এবং গুণের সমাবেশ সম্ভব হতে পারে?

শ্রুতি বলছে—ব্রহ্ম হচ্ছেন সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ এবং ইনি হচ্ছেন সর্ব প্রকার সঙ্গরহিত ; সুতরাং ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়; এই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে গুণের প্রকাশ এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ কার্য কেমন করে সম্ভব হতে পারে? এই হলো বিদুরের প্রশ্ন।

উত্তরে মৈত্রেয় মুনি বললেন যে, শ্রীভগবান নিজের মায়াশক্তিকে অবলম্বন করে, লীলার জন্য জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করে থাকেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে, অদ্বৈত বেদান্তে নির্গুণ অর্থে সমস্তরকম গুণ-রাহিত্য এবং নিষ্ক্রিয় অর্থে সর্ব প্রকার ক্রিয়া-রাহিত্য বোঝায়। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীভগবানকে নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় বলতে একটু অন্যরকম বোঝায়; এঁদের মতে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত এবং বৈকুণ্ঠ হচ্ছে শ্রীভগবানের নিত্যধাম। সুতরাং বিগ্রহ থাকলেই তাতে গুণ এবং ক্রিয়া থাকবে। শ্রীজীব গোস্বামী বলেছেন যে, চিৎ-শব্দের অর্থ স্বরূপ-শক্তি; সুতরাং চিন্মাত্র শব্দে বুঝতে হবে যে, স্বরূপ শক্তিতে অবস্থানই হচ্ছে শ্রীভগবানের নিত্য ভাব; বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামে তিনি স্ব-ঐশ্বর্য সহ নিত্য বিরাজ করেন। শ্রীভগবানে লৌকিক গুণ—সুখ, দুঃখ প্রভৃতি এবং লৌকিক ক্রিয়া নেই। এই হচ্ছে বৈষ্ণব মতে নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় শব্দের অর্থ।

বিদুর প্রশ্ন করলেন—শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবান নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়; সুতরাং লীলার জন্যই বা শ্রীভগবানে গুণ এবং ক্রিয়াশীলতা কেমন করে হতে পারে? উত্তরে মৈত্রেয় মুনি বললেন যে, শ্রীভগবান তাঁর স্বরূপ-শক্তি মায়াকে অবলম্বন করে লীলার জন্য জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে থাকেন। কিন্তু এই যে লীলার জন্য সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করা—এটাই বা কেন? আমরা তো দেখতে পাই যে, বালকদের মধ্যে যে খেলা করার ইচ্ছা হয়, তা দুটি কারণে হয়। একটি তার নিজের খেলার ইচ্ছা এবং দ্বিতীয়টি অপর বালকদের খেলার জন্য প্রেরণা। কিন্তু শ্রীভগবানে এই দুটি-ই সম্ভবপর নয়; কারণ তিনি নিত্য-তৃপ্ত এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং কামনা এবং অন্যের প্রেরণার বশবর্তী হয়ে ভগবান কিছু করেন না।

তাছাড়া এক ঈশ্বরই সর্বভূতে জীবরূপে রয়েছেন; সুতরাং জীবের দুঃখ কেমন করে সম্ভব হতে পারে ? উত্তরে মৈত্রেয় মুনি বললেন যে, শ্রীভগবানের

ক্রিয়াশীলতা এবং জীবের দুঃখানুভূতি—এ সবই মায়ার কার্য; আর মায়ার স্বরূপই এইরকম যে, তাকে বোঝা যায় না। একটি উপমা দিয়ে জীবের দুঃখানুভূতি কেমন তা বোঝানো হয়েছে। একজন লোক স্বপ্ন দেখল যে, তার মাথা কাটা হয়েছে। আসলে কিন্তু তার মাথা কাটা হয়নি; আর নিজের শিরশ্ছেদ কেউ অনুভবও করতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে এইরকম অনুভূতি হয়। সুতরাং বুঝতে হবে যে, স্বপ্নে শিরশ্ছেদের অনুভূতি একটা ভ্রান্তি বিশেষ। সেইরকম দুঃখ বন্ধন প্রভৃতি বাস্তবিকপক্ষে জীবাত্মার থাকে না, কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীবকে দুঃখী এবং বদ্ধ বলে মনে হয়। মৈত্রেয় মুনি আর একটি উপমা দিয়ে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন ঃ

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ ॥ ৩-৭-১১॥

চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলে পড়লে, জলের কম্পনে চন্দ্রের কম্পন দেখা যায়। এই যে চন্দ্রের কম্পন দেখা যায়, এটা সত্য বলে মনে হলেও বাস্তবিকপক্ষে সত্য নয়। এই কম্পন, এটা যে জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়েছে, সেই জলেই হয়; ফলে জলের কম্পনাদি ধর্ম প্রতিবিম্ব চন্দ্রে প্রতীয়মান হয়, আকাশের চন্দ্রে হয় না। সেইরকম দেহাদির ধর্ম অর্থাৎ সুখ দুঃখ ইত্যাদি জীবে অসত্য হলেও সেগুলি জীবেরই ধর্ম বলে মনে হয়। ঈশ্বরকে যদি আকাশের চন্দ্রের সাথে, জীবাত্মাকে জলাশয়ের প্রতিবিম্ব-চন্দ্রের সাথে এবং দেহগুলিকে জলাশয় বলে ধরা যায়, তাহলে দেহের সুখ দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম জলাশয়ের কম্পন বলতে হবে। সুতরাং প্রতিবিম্ব চন্দ্রের মতো দেহের ধর্ম জীবেই প্রতীয়মান হবে ঈশ্বরে নয়। এ সবই মায়ার কাজ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, মায়ার প্রভাবে জীবের এই যে ভ্রান্তি-মূলক দুঃখ, তা কেমন করে দূর হবে?

স বৈ নিবৃত্তিধর্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ ॥ ৩-৭-১২ ॥

মৈত্রেয় মুনি বলছেন—নিষ্কাম সাধনা এবং ভগবানের কৃপায় ভক্তি লাভ হলে, সেই ভক্তির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অনাত্মধর্ম দূর হয়ে যায়।

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি মায়ার প্রভাবে, জীব যেসব দুঃখ ভোগ করে থাকে, তা থেকে মুক্তি পেতে হলে নিষ্কাম সাধনার দ্বারা শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করতে হবে। ভগবৎ কৃপায় হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদয় হলে, তাঁর গুণকীর্তন, কথা-শ্রবণ, মূর্তি-চিন্তন ইত্যাদিতে মন তন্ময় হয়ে যায়। তখন বাইরের কোন বিষয়ে আর চিত্তের বিক্ষেপ হয় না। চিত্তবিক্ষেপ না হলে ভগবানে মন স্থির হলে শ্রীবিগ্রহের ধ্যানে হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ হলেই সবরকম দুঃখের নিবৃত্তি হবে। এখানে ভক্তিভাবে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের কথাই বলা হয়েছে।

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিং বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা ॥ ৩-৭-১৪॥

শ্রীভগবানের গুণকীর্তন এবং কথা শ্রবণে সমস্তরকম দুঃখের নিবৃত্তি হয়। আর যদি তাঁর পাদপদ্ম সেবার জন্য হৃদয়ে প্রগাঢ় আসক্তি জন্মে, তবে তো আর কথাই নেই; ভগবানের চরণ সেবায় একবার অনুরাগ হলে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি তো সামান্য কথা, শ্রীভগবানকে পর্যন্ত বশীভূত করা যায়।

এই সব তত্ত্বালোচনার পর মৈত্রেয় মুনি বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য, ভক্তিভাব সমন্বিত একটি পুরাণ কাহিনী বিদুরকে বললেন ঃ

কোন এক সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র—সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎ-কুমার—এরা আজন্ম সংসার বিরাগী হয়ে, ত্রিভুবন পরিক্রমা করে ভগবান শ্রীহরির স্বধাম বৈকুণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধি অতি অপূর্ব; কিন্তু সনকাদি ঋষিরা শ্রীহরির দর্শনের জন্য এতই ব্যাকুল ছিলেন যে, শ্রীধামের সৌন্দর্য দর্শনের জন্য সময় নষ্ট না করে, তাঁরা ক্রমে ক্রমে ছয়টি ফটক পার হয়ে, সপ্তম দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখলেন যে, দুই জন দেবতা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে গদা হস্তে দ্বার রক্ষা করছেন। পূর্ব পূর্ব দ্বারে তাঁরা কোন বাধাই পাননি; তাই ঋষিরা নিঃসংকোচে দ্বারপালদের অনুমতি না নিয়েই সপ্তম দ্বারে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। ঋষিরা আত্মজ্ঞানী, সর্বত্র সমদর্শী। সুতরাং বয়স্ক হলেও তাঁরা পাঁচ বছরের শিশুর মতো নিঃসংকোচে এবং নির্ভয়ে উলঙ্গ অবস্থায় চলা-ফেরা করছিলেন। দ্বারপাল দুইজন জয় এবং বিজয় তখন ঋষিদের দেখে উপহাস এবং তিরস্কার করে লাঠি দিয়ে তাঁদের বাধা দিলেন। ঋষিরা অত্যন্ত সম্মানীয়; তার উপর তাঁদের ইষ্ট শ্রীহরির দর্শনে এসে এইভাবে অপমানিত

এবং বাধা পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—শ্রীভগবানের একান্ত সেবার ফলে এই বৈকুণ্ঠ-লোকে যাঁরা থাকেন, তাঁরা সকলেই শ্রীভগবানের ন্যায় সমদর্শী; কিন্তু তোমরা দেখছি অত্যন্ত নীচ স্বভাবের। তা ছাড়া শ্রীভগবান, যিনি সর্বগুণান্বিত বিরোধশূন্য সকলের মঙ্গলকারী তাঁর প্রতি কোন্ ব্যক্তিই বা আশঙ্কার কারণ হতে পারে? সুতরাং শ্রীহরির কাছে যেতে তোমাদের বাধা দেবার কি কারণ থাকতে পারে? তোমরা অত্যন্ত কপট স্বভাবের; তাই এমন গর্হিত কাজ করলে। এই অপরাধের জন্য তোমরা বৈকুণ্ঠ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কাম ক্রোধাদির বশবর্তী হয়ে অধম জন্ম গ্রহণ করবে। ঋষিদের অভিশাপ শুনে দ্বারপাল দুইজন তখন তাঁদের পায়ে পড়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন—শ্রীভগবানের অভিপ্রায় না বুঝে আমরা যে অপরাধ করেছি, তার জন্য আপনাদের অভিশাপ অনুযায়ী আমাদের অধম জন্ম নিতেই হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি যে, শ্রীভগবানের স্মৃতিলোপকারী মোহ যেন কখনও আমাদের অভিভূত করতে না পারে—আমরা যেন কখনও শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভুলে না যাই।

এদিকে ঋষিদের অপমানের কথা জানতে পেরে, শ্রীহরি তখন শশব্যস্তে পায়ে হেঁটেই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কিরীট-কুণ্ডলধারী, বনমালা শোভিত এবং কৌস্তুভ মণি পরিহিত শ্রীভগবানের ধ্যানগম্য সেই অপরূপ দিব্যমূর্তি দেখে ঋষিরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে বার বার প্রণাম করতে লাগলেন। ঋষিরা বললেন—হে ভগবন্! আমাদের পিতা ব্রহ্মার কাছে আপনার যেসব রহস্য, অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব শুনেছি তা আমাদের মনে আছে। এখন আপনার এই ভগবৎ-স্বরূপ আমাদের সামনে প্রকটিত হওয়াতে, আমরা বুঝতে পারছি যে, আপনিই হচ্ছেন সেই পরম তত্ত্ব, পরমাত্মা। আপনাকে সম্যক্‌রূপে জানাই হচ্ছে পরমাত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার; আপনিই সকল যোগ সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু যতদিন প্রাণে ভক্তিভাব না আসে, ততদিন কোন সাধনার দ্বারাই আপনার এই পরমতত্ত্ব জ্ঞাপক দিব্য মূর্তির দর্শন লাভ হয় না। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ধ্যানগম্য আপনার এই মূর্তির সাক্ষাৎ দর্শন করে আমরা পরিতৃপ্ত হয়েছি। কিন্তু প্রভু! একটা বড় অপরাধ করে ফেলেছি; আপনার এই দ্বাররক্ষীদের অভিশাপ দিয়েছি। এই পাপে যদি আমাদের নরক যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়, তাতেও আর দুঃখ নেই; শুধু এই মাত্র প্রার্থনা যে আমাদের কায়, মন, বাক্য যেন সর্বদাই আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকে।

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্যেত তে গুণ গণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥ ৩-১৫-৪৯॥

হে প্রভু! ভ্রমরেরা যেমন পদ্মের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত, সেইরকম আমাদের চিত্তও যদি আপনার পাদপদ্মে সর্বদা অনুরক্ত থাকে, আর তুলসী যেমন আপনার চরণে আশ্রয় পেয়ে অত্যন্ত শোভা পায়, আমাদের বাক্যও সেইরকম আপনার চরণ বন্দনাদির দ্বারা শোভমান হতে পারে এবং আপনারই গুণগানে যদি আমাদের কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে আপনার এই ভৃত্যদের প্রতি অভিশাপ দেবার জন্য যদি আমাদের নরক বাসও করতে হয়, তাও স্বচ্ছন্দে বরণ করব।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সনকাদি ঋষিরা পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন যে, তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের চরম আনন্দ এবং নরক যন্ত্রণার চরম দুঃখ—এ সবই বরণ করতে রাজি, যদি তাঁরা কায়মনোবাক্যে সর্বদা শ্রীভগবানের ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতে পারেন। এই তো সাধকের হৃদয়ের কথা, এই তো সাধনার শেষ কথা—ভগবানে সর্বদা তন্ময় হয়ে থাকা।

যাঁর এইরকম অবস্থা হয়েছে, তাঁর আর বাকি কি রইল? সনকাদি ঋষিদের কথা শুনে শ্রীভগবান অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, এই দুইজন, জয় বিজয়, এরা আমার অনুচর; অথচ তোমাদের আগমন সংবাদ আমাকে না দিয়ে তারাই নিজেদের খেয়াল খুশি মতো তোমাদের প্রতি অত্যন্ত গর্হিত আচরণ করেছে। তোমরা আমার পরম ভক্ত; আর আমারই ভৃত্যের দ্বারা তোমরা অপমানিত হলে; এতে আমার প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে। আমিই এদের শাস্তি দিতাম। অতএব তোমরা যে এদের অভিশাপ দিয়েছ, তা ঠিকই হয়েছে; তোমাদের কোন দোষ হয়নি; বরং এদের অন্যায় ব্যবহারের জন্য আমি নিজেকেই দোষী বলে মনে করছি। তাই তোমাদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি এবং প্রার্থনা করছি তোমরা প্রসন্ন হও। শ্রীভগবান আরও বললেন—তোমরা এদের যে অভিশাপ দিয়েছ, জানবে তা আমার ইচ্ছাতেই দিয়েছ; এরা শীঘ্রই অসুর রূপে জন্মগ্রহণ করবে। তখন আমার প্রতি তীব্র শত্রুভাবের

জন্য এদের মন সর্বদা আমারই ভাবনায় ব্যাপৃত থাকবে; সুতরাং সেই তীব্র এবং নিরন্তর চিন্তার ফলে তারা আবার সত্বর আমার কাছে ফিরে আসবে। ভগবান এইভাবে ঋষিদের আশ্বস্ত করার পর ঋষিরা সানন্দে ভগবানকে প্রণাম করে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। শ্রীভগবান তখন জয় বিজয়কে বললেন—ব্রহ্মশাপ অনুযায়ী এখন তোমরা গিয়ে অসুর হয়ে জন্ম পরিগ্রহ কর। কোন ভয় নেই ; আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমাদের মঙ্গল হবে। আমি তোমাদের ব্রহ্মশাপ খণ্ডন করতে পারতাম; কিন্তু তা করিনি, কারণ এই অভিশাপ আমার ইচ্ছাতেই হয়েছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তাহলে তো ভগবানের ইচ্ছাতেই তাঁর অনুচরেরা শাপগ্রস্ত হয়ে অসুর হয়ে জন্মাল! ভগবানের এইরকম অদ্ভুত ইচ্ছার তাৎপর্য কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবানের ক্বচিৎ কখনও 'যুযুৎসা'-বৃত্তি, যুদ্ধ করার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তিনি কার সাথে যুদ্ধ করবেন? সকলেই তো তাঁর কাছে হীনবল। তাই ভগবান ঠিক করলেন—এই দ্বারপাল দু-জন অসীম বলশালী এবং আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত; এদের প্রতিপক্ষ করে আমার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব। আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে এরা আনন্দই লাভ করবে। আমার প্রতিপক্ষরূপে এদের তৈরি করবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লৌকিক শিক্ষণীয় বিষয়ও থাকবে। বিশ্ব প্রপঞ্চের সকলকে নিয়েই লীলাময়ের লীলা অবিরাম চলছে। কেউ তাঁর পর নয়, সবাই তাঁর আপন। আমরাই কেবল আমাদের মিথ্যা অভিমানের বশে আপন-পর বিভেদ করে থাকি। এই তো মহামায়ার খেলা!

শ্রীভগবানের এই দু-জন দ্বারপাল জয়-বিজয় তিনবার অসুরদেহ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীভগবানের প্রতি বৈরীভাব অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমবার তাঁরা হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয়বার রাবণ-কুম্ভকর্ণ, তৃতীয়বার শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে শ্রীভগবান কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হয়ে আবার বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের কাছেই ফিরে গেলেন। মৈত্রেয় মুনি বিভিন্ন উপাখ্যানের মাধ্যমে ভক্তিভাব সমন্বিত বিদুরের প্রশ্নগুলি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন।

১১
কপিল-দেবহূতি সংবাদ

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥ ৩-২১-৬॥

মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে বললেন—ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি বিস্তারের জন্য কর্দম মুনিকে আদেশ করলে কর্দম মুনি সরস্বতী নদীর তীরে গিয়ে দশ হাজার বছর ধরে সমাহিত চিত্তে শ্রীভগবানের আরাধনা করেছিলেন। মুনির আরাধনায় তুষ্ট হয়ে শ্রীভগবান অতি সুন্দর মূর্তিতে মুনিকে দর্শন দিয়েছিলেন। ভাগবতে শ্রীভগবানের সেই রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
শ্বেতোৎপলক্রীড়নকং মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণম্ ॥ ৩-২১-১০॥

মাথায় কিরীট, কানে কুণ্ডল এবং চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শ্বেতপদ্ম ধারণ করে, সহাস্য দৃষ্টিপাতে যেন মধু বর্ষণ করে শ্রীভগবান দর্শনকারীর হৃদয় আকর্ষণ করে কর্দম মুনির সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীভগবানের মনোমুগ্ধকর রূপ দর্শন করে কর্দম মুনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জোড় হাতে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। মুনি বললেন—হে ভগবন্! কতশত মুনি ঋষি জন্ম জন্মান্তর ধরে কঠোর তপস্যা করেও যাঁর দর্শন পায় না, আজ আমি আপনারই কৃপায় আপনার শ্রীচরণের দর্শন পেলাম! আপনি সকলের প্রতিই কৃপাপরায়ণ; সকলকেই তাদের অভিলষিত কাম্যফল প্রদান করে তাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে দেন; কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকুই তো জীবনের উদ্দেশ্য নয়; আপনাকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং যারা আপনার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কাম্যফলের জন্য, ভোগতৃপ্তির জন্য আপনার আরাধনা করে তারা নিতান্তই হীনবুদ্ধি। নিষ্কাম সাধকেরা শুদ্ধাভক্তির দ্বারা আপনার সেবা করে যে অপার্থিব আনন্দ লাভ করে, তার কাছে সকাম সাধকের ভোগ্য বস্তু লাভের আনন্দ অতি তুচ্ছ। আমি এসব জেনেও আপনার কাছে এমন একটি স্ত্রী-রত্ন লাভে অভিলাষী হয়েছি যে,

আমারই মতো স্বভাব-সম্পন্না এবং আমার গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের সহায়ক হবে। মুনি এই অদ্ভুত প্রার্থনার কারণ হিসেবে বলছেন—আপনি সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মাকে নিয়োগ করেছেন; ব্রহ্মা আমার পিতা; তিনি আমাকে অনুরূপ প্রজা সৃষ্টি করতে আদেশ করেছেন; পিতৃ-আজ্ঞা যেহেতু অলঙ্ঘনীয়, তাই প্রজা সৃষ্টির জন্য আমি একটি যোগ্য পত্নীর অভিলাষী হয়েছি। হে প্রভু! আমি যথাসাধ্য আপনার আরাধনা করেও ভক্তিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারিনি। যারা আপনার একান্ত ভক্ত, তাঁরা জগতের সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র আপনার শ্রীচরণই আশ্রয় করে থাকেন; তাঁরা আপনার নাম-গুণ-কীর্তন এবং শ্রবণের দ্বারা সংসার-দুঃখ অতিক্রম করে পরম আনন্দ লাভ করেন। হে প্রভু! আমার মতো সকাম সাধকের জন্য আপনি মায়া বিস্তার করে তাদের দিয়ে বিষয় ভোগ করান। যেহেতু আমি আপনার ভক্তবৎসল মূর্তি দর্শন করে ধন্য হয়েছি সেইহেতু প্রার্থনা করি, আমার এই বিষয়-ভোগেচ্ছা যেন পরিণামে কামনাহীন ভক্তিতে পরিণত হয়ে আমার শুভ গতির কারণ হয়।

শ্রীভগবান বললেন—হে মুনিবর! যে উদ্দেশ্যে তুমি আত্মসংযম করে তদগত চিত্তে আমার আরাধনা করেছ, তা আমি আগেই জেনেছি এবং তা পূরণের ব্যবস্থাও করেছি। বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু তোমার দর্শন মানসে নিজ মহিষী এবং একটি অনূঢ়া, অশেষ গুণশালিনী, পরমা সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে পরশু দিন এখানে আসবে। সেই মনুকন্যা দেবহূতি তোমাকে পতিভাবে ভজনা করবে এবং তার নয়টি কন্যা সন্তান হবে। তারপর তুমি শুদ্ধচিত্তে সমস্ত কর্মফল আমাতে অর্পণ করে আমাকেই লাভ করবে।

কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্।
ময্যাত্মানং সহ জগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্ ॥ ৩-২১-৩১॥

তখন তুমি জীবের প্রতি দয়া এবং সকলকে অভয় প্রদান করে আত্ম-জ্ঞান লাভ করবে; আমার মধ্যে তখন তোমার আত্মা ও জগৎকে একীভূত অবস্থায় দর্শন করবে।

শ্রীভগবান আরও বললেন—হে মুনিবর! আমি নিজ অংশকলারূপে দেবহূতির গর্ভে তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের শাস্ত্র প্রণয়ন করব। এইভাবে শ্রীভগবান মহর্ষি কর্দমকে আশ্বাস দিয়ে স্বস্থানে চলে গেলেন।

এদিকে স্বায়ম্ভুব মনু, পত্নী ও কন্যাসহ পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে করতে শ্রীভগবানের নির্দেশিত দিনে কর্দম মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়ে মুনিকে প্রণাম করলেন। মুনিও সম্রাটকে যথোচিত অভ্যর্থনা করে সম্রাটের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

স্বায়ম্ভুব মনু বললেন—আমার এই অনূঢ়া কন্যা দেবহূতির যোগ্য পতির জন্য যখন চারিদিকে অনুসন্ধান করছিলাম, তখন দেবর্ষি নারদের মুখে আপনার স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞান, সৌন্দর্য, বয়স ও সদ্‌গুণের কথা শুনে দেবহূতি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। সুতরাং হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার এই কন্যাকে গ্রহণ করুন; গৃহস্থাশ্রমের কার্যে এই কন্যা সর্বতোভাবে আপনার উপযুক্ত ও অনুকূল হবে—এতে কোনই সন্দেহ নেই। উপরন্তু আমি শুনেছি যে আপনিও বিবাহে অভিলাষী ; সুতরাং আমার এই কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

কর্দম মুনি দেবহূতিকে বিবাহ করতে সম্মত হয়ে মনুকে বললেন—যতদিন পর্যন্ত না আপনার এই কন্যার সন্তানাদি হবে, ততদিন পর্যন্ত আমি গৃহস্থাশ্রমে থেকে এর যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ করব। তারপর আমি সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করে আধ্যাত্মিকভাবে নিরত থাকব। ভগবান শ্রীহরি আমাকে এইরূপই আদেশ করেছেন।

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! মুনির সম্মতি পেয়ে মনু স্বীয় কন্যা দেবহূতিকে কর্দমের সাথে বিবাহ দিয়ে স্বস্থানে চলে গেলে দেবহূতি ইন্দ্রিয় সংযম করে অপ্রমত্ত চিত্তে পতির সেবা করতে লাগলেন। দেবহূতির আপ্রাণ সেবায় কর্দম মুনি অত্যন্ত খুশি হয়ে একদিন বললেন—তুমি পাতিব্রত্য ধর্মে সিদ্ধ হয়েছ।

অনন্তর দেবহূতি সর্বাঙ্গসুন্দর নয়টি কন্যা প্রসব করলেন। এদিকে পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী কর্দম মুনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করতে ব্যগ্র হলে দেবহূতি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে স্বামীকে বললেন—আপনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলে আপনার এই কন্যাদেরই তাদের যোগ্য স্বামী খুঁজে নিতে হবে; এটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখদায়ক হবে। তাছাড়া এতকাল মায়ায় বশীভূত হয়ে আমি আপনার সেবা, আপনার সঙ্গ করলেও আপনার ঈশ্বরীয়ভাব বুঝতে পারিনি।

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৩-২৩-৫৬॥

যাদের কর্ম, ধর্মের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না কিংবা বৈরাগ্য লাভে সাহায্য করে না অথবা শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয় না, তারা জীবিত থাকলেও মৃতের মতোই অতি তুচ্ছ। তাই মনে হয় আমি ভগবৎ-মায়ায় বিমোহিত হয়েছি; কারণ আপনার মতো স্বামী, যিনি মোক্ষ পর্যন্ত দিতে পারেন, তাঁকে পেয়েও আমার সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা হলো না !

দেবহূতির কথা শুনে, কর্দম ঋষির মনে শ্রীভগবানের পূর্ব আশ্বাস-বাক্য স্মরণ হলো; তাই তিনি দেবহূতিকে বললেন—শ্রীভগবান স্বয়ং অংশকলারূপে তোমার গর্ভে আবির্ভূত হয়ে তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেবেন ; অতএব তুমি এখন শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।

যথাসময়ে শ্রীভগবান দেবহূতির গর্ভে পুত্ররূপে (কপিল নামে) জন্ম গ্রহণ করলেন।

এবার কর্দম মুনি ভাবলেন—আর তো দেরি করা চলে না। তাই তিনি তাঁর নয়টি কন্যাকে উপযুক্ত পতিদের সাথে বিবাহ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হলেন। একদিন কর্দম মুনি স্বগৃহে পুত্ররূপে আগত ভগবান কপিলকে নিভৃতে পেয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন ঃ

স্বীয়ং বাক্যমৃতং কর্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে।
চিকীর্ষুর্ভগবন্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্দ্ধনঃ॥ ৩-২৪-৩০॥

হে ভগবন্ ! তুমি তোমার ভক্তদের মান বৃদ্ধি করে থাক। এখন তুমি আমাকে দেওয়া কথা অর্থাৎ আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবে, এই কথার সত্যতা রক্ষার জন্য এবং সাংখ্য-জ্ঞান প্রচারের ইচ্ছায় আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছ।

পণ্ডিতেরা তোমার ঐশীভাব জানবার জন্য তোমার শ্রীচরণ ধ্যান করে থাকে ; ষড়ৈশ্বর্যের দ্বারা তুমি সদাই পূর্ণ; সুতরাং আমি তোমারই শরণাপন্ন হয়েছি।

হে প্রভু! তুমি আমার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করাতে আমি সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আপ্তকাম হয়েছি ; এখন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করি। সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমি তোমারই মূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করে তোমার কথাই স্মরণ করে শোকশূন্য হৃদয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করব।

শ্রীভগবান বললেন—হে মহামুনি! দেহ-বন্ধন থেকে যারা চিরকালের জন্য মুক্ত হতে চায় তাদের আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আমি সাংখ্য দর্শন প্রচার করব। এই সাংখ্যদর্শন পূর্বে প্রচলিত ছিল; কিন্তু কালের প্রভাবে তা লুপ্ত হয়ে গেছে। সেই লুপ্ত জ্ঞানের পুনরুদ্ধারের জন্যই আমি দেহ ধারণ করেছি। আমি অনুমতি দিচ্ছি—তুমি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে সর্বকর্মফল আমাতে অর্পণ করে মোক্ষলাভের জন্য আরাধনা কর।

মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্বভূতগুহাশয়ম্।
আত্মন্যেবাত্মনান্বীক্ষন্ বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি॥ ৩-২৪-৩৯॥

ক্রমে তুমি স্বপ্রকাশ, সর্বান্তর্যামী, পরমাত্মস্বরূপ আমাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে, শোকশূন্য হয়ে অভয়পদ লাভ করবে। মাতা দেবহূতির জন্য তুমি চিন্তা করো না; তাকে আমি আধ্যাত্মিক বিদ্যার উপদেশ দিলে সে সর্বকর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরাশান্তি লাভ করবে।

কর্দম মুনি সন্ন্যাস অবলম্বন করে বনে চলে যাবার পর কপিলদেব স্বীয় জননীর কল্যাণ সাধনের জন্য সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন।

নির্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ।
যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো॥ ৩-২৫-৭॥

একদিন কপিল-জননী দেবহূতি কপিলদেবকে বললেন—হে বিরাট পুরুষ! দুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গের তাড়নায় আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি; ঐ সব ইন্দ্রিয়-বর্গের ভোগেচ্ছা পূরণ করতে গিয়েই আমি মোহে অন্ধ হয়ে সংসার-দুঃখ ভোগ করছি। নশ্বর দেহে এই যে 'আমি আমার' রূপ ভ্রান্ত ধারণা, এ তো তোমারই মায়ার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে; সুতরাং হে সর্বলোক নিয়ন্তা! তুমি আমার এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দাও। আমি ভক্তিবিনম্র চিত্তে তোমার শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করছি—হে সংসারবৃক্ষের মূলোচ্ছেদক! জগতের তত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব আমায় বুঝিয়ে বল ; আমি তোমায় প্রণাম করি।

মাতা দেবহূতির কথা শুনে কপিলদেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন —হে মাতঃ! যারা সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদের পক্ষে শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা সাধন-ই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে জানবে। শ্রীভগবানে মন একাগ্র হলে, জীব সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে পরম আনন্দ-স্বরূপ মোক্ষ লাভ করে।

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥ ৩-২৫-১৫॥

চিত্তই জীবের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ; চিত্ত বিষয়াসক্ত হলে জীব বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়; আর ভগবৎ-পরায়ণ হলে মোক্ষ লাভ করে। জীবের ষড়রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য— এরাই 'আমি আমার' রূপ মিথ্যা অভিমানের কালিমা মনের উপর লাগিয়ে দিয়ে মনকে কলুষিত করে তোলে। আবার ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা 'আমি আমার' রূপ মনের কলুষ ভাব দূর হলে সেই শুদ্ধ মনে জ্যোতির্ময়, অখণ্ড, নির্লিপ্ত পরমপুরুষের অনুভূতি হয়; তখন জীব বুঝতে পারে যে, সে নিত্যমুক্ত, সুখ-দুঃখরহিত, পরমাত্মস্বরূপ; জগতের অপর সকলের সাথে তার কোনই পার্থক্য নেই; তার মধ্যে যেমন, তেমনি সকলের মধ্যে সেই একই ব্রহ্মসত্ত্বা বিরাজমান। পুরুষ তখন আর সুখ-দুঃখে লিপ্ত হয় না; প্রকৃতি তখন আর পুরুষকে মিথ্যা ভোগের অছিলায় আবদ্ধ রাখতে পারে না।

হে মাতঃ! ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য অখিলাত্মা শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি-ভাব অবলম্বন করার মতো আর কোন সহজ উপায় নেই। ভক্তির দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়, ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান জন্মে এবং প্রকৃতিকে জয় করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ভক্তির মতো মঙ্গলময় পথ আর নেই জানবে।

জাগতিক বিষয়ের উপর অত্যধিক আসক্তিই জীবের বন্ধনের কারণ; আবার এই অত্যধিক আসক্তিই যদি সাধুদের প্রতি আরোপ করা যায়, তাহলে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। সাধুসঙ্গ হচ্ছে ভক্তি লাভের উপায়। সাধুর লক্ষণ বলছেন ঃ

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ৩-২৫-২১॥

সাধু ব্যক্তিরা সর্ব দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করেন। তাঁরা অত্যন্ত করুণাশীল, জগতের সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, কেউ-ই তাঁদের শত্রু থাকে না; তাঁরা অনন্ত সদ্‌গুণে ভূষিত হয়ে সন্তাপহীন চিত্তে অবস্থান করেন এবং নিরন্তর শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণে এবং আলাপনে ব্যাপৃত থাকেন। এইরকম সদ্‌গুণের আধার সাধুর সংস্পর্শে এলে জীবের সংসারাসক্তি দূর হয়; তখন ভগবৎ-কথা শ্রবণে এবং কীর্তনে জীবের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের উদয় হয়।

হে মাতঃ! এইভাবে প্রকৃতির গুণসমূহকে, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-সমূহকে উপেক্ষা করে এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব অবলম্বন করে, সাধক প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ আমাকে হৃদয়ে ধারণা করতে সমর্থ হয়। নিষ্কাম ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে জানবে। একমাত্র আমাকে ছাড়া, অন্য সকল বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, যারা ভক্তিভাব অবলম্বন করে, সর্বস্বরূপে বিদ্যমান আমারই ভজনা করে, আমি তাদের এই দুস্তর সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করি। আমার জ্ঞান ও ভজন ছাড়া জীবের সংসার-দুঃখ কোন মতেই দূর হয় না।

যারা আমার যথার্থ ভক্ত তারা আমার চরণ সেবাতেই সর্বদা আসক্ত হয়ে যাবতীয় কার্য আমারই প্রীতির জন্য করে থাকে। তারা একত্রে মিলিত হয়ে পরস্পরে আমারই ভাগবতী লীলা-কথার আলোচনা করে পরম আনন্দ লাভ করে। এইসব ভক্তেরা একমাত্র আমার সেবা ছাড়া সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে চাইলেও গ্রহণ করে না। কিন্তু তারা মুক্তি না চাইলেও আমার প্রতি অনন্য ভক্তিই তাদের ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ দিয়ে থাকে।

আমিই ব্রহ্মাদি প্রধান পুরুষদেরও নিয়ন্তা, আমিই শ্রীভগবান; আমার ভজন এবং জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন উপায়েই জীবের তীব্র সংসার-যাতনা দূর হয় না।

হে মাতঃ! এবার আমি তোমায় সাংখ্যমতের পুরুষ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিষয় বলছি; এগুলি জানলে পুরুষ প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ অহঙ্কারাদি থেকে মুক্ত হতে পারে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হচ্ছে—পুরুষ এবং পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ , ব্যোম), পঞ্চতন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ,

স্পর্শ, শব্দ), অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্)।

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥ ৩-২৬-৩॥

পুরুষ হচ্ছেন অনাদি (নিত্য), নির্গুণ, সর্বব্যাপক এবং অনন্ত ; তিনি স্বপ্রকাশ ও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা; ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জড় জগতের প্রকাশ পুরুষের শক্তিতেই সম্পন্ন হয়।

এই পরমাত্মস্বরূপ পুরুষ, সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে তাঁর নিজেরই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি, যাকে প্রকৃতি বলা হয়, সে পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়; তখন সেই পুরুষ প্রকৃতিকে 'ঐক্ষত'—অবলোকন করেন অর্থাৎ স্বীকার করেন। প্রকৃতি হচ্ছে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণাত্মক ; এই ত্রিগুণের দ্বারা প্রকৃতি নিজেরই মতো ত্রিগুণময়ী কার্যসমূহের সৃষ্টি করে। পুরুষ, প্রকৃতিকে দেখেই প্রকৃতির আবরণ শক্তিরূপ অবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টি বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সদানন্দময় হলেও প্রকৃতির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে 'আমিই প্রকৃতি' এইরূপ মনে করে এবং নিজেকে প্রকৃতির অনুষ্ঠিত কার্যসকলের কর্তা বলে অভিমান করে। এই কর্তৃত্বাভিমানই পুরুষের বদ্ধভাব; এই বদ্ধভাবের জন্যই পুরুষ কর্মাধীন হয়ে জন্মমৃত্যুর প্রবাহে বারবার গতায়াত করতে থাকে।

পরমাত্মস্বরূপ চৈতন্যময় পুরুষ, জীবরূপে দেহাদিতে আবদ্ধ হলেও স্বরূপতঃ তিনি নিত্য, নির্গুণ, নির্বিকার, কর্তৃত্ব-অভিমান রহিত। সেইজন্য পুরুষে প্রকৃতিজ সুখ-দুঃখ সংক্রমিত হয় না। জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভাব পুরুষে যথার্থ নেই ; তবুও স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাঘ্র-ভয়ের মতো 'আমি বিষয় ভোগ করছি' এইরকম চিন্তার ফলেই সংসার-বন্ধন ভোগ করতে থাকে। স্বপ্ন-ভঙ্গের মতো বিষয়াভিমানের উপশম হলেই পুরুষের সংসার প্রবাহের নিবৃত্তি ঘটে।

সুতরাং ভগবদ্ভক্তি ও তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করতে হয়। চিত্ত বশীভূত হলে আর বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় না। চিত্তকে বশীভূত করার উপায় হচ্ছে ঃ

যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ ॥ ৩-২৭-৬॥

যম, নিয়ম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) নিয়মিত অভ্যাস করলে চিত্ত একাগ্র ও বাসনাশূন্য হয়। তখন শ্রদ্ধা ও প্রেমের সাথে শ্রীভগবানের কথাদির শ্রবণ করা আবশ্যক।

সর্বভূতসমত্বেন নির্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ।
ব্রহ্মচর্যেণ মৌনেন স্বধর্মেণ মহীয়সা ॥ ৩-২৭-৭॥

সকল প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি, অপরের প্রতি শত্রুভাব ত্যাগ, অনাসক্তি, ব্রহ্মচর্য, বৃথা বাক্যালাপ পরিত্যাগ করে মৌনভাব অবলম্বন এবং নিজের বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশীলন করা উচিত।

চেষ্টা ছাড়াই প্রারব্ধের বশে যা উপস্থিত হয়, তা-ই ভোগ করে সন্তুষ্ট থাকা, পরিমিতাহারী হয়ে সর্বদা পরমার্থ বিষয়ের চিন্তা করতে হয়; নির্জনে বাস করে রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ প্রভৃতি শূন্য হয়ে সকলের হিতকারী হওয়া আবশ্যক।

'আমি এই শরীর', 'আমার স্ত্রীপুত্র' ইত্যাদি 'আমি আমার' ভাব ত্যাগ করে প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপ—প্রকৃতি থেকে পুরুষ সম্পূর্ণ আলাদা—এইটি হৃদয়ঙ্গম করে, যারা একমাত্র শ্রীভগবানের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, তারা আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন।

দেবহূতি তখন কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে আমার সর্বজ্ঞ পুত্র! তোমার কথায় আমি বুঝেছি যে প্রকৃতি এবং পুরুষ—এরা দু-জনেই নিত্য এবং একে অপরের সাথে সম্বদ্ধ। প্রকৃতিতে গুণত্রয়ের জন্য পুরুষের মধ্যে নানাবিধ দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির প্রতীতি জন্মে; কিন্তু স্বরূপত পুরুষ সর্ব বিকারশূন্য, কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না।

পুরুষ হচ্ছে শক্তিমান এবং প্রকৃতি হচ্ছে শক্তি; শক্তি ছাড়া শক্তিমানকে ভাবা যায় না। সুতরাং শক্তিমান এবং শক্তির, পুরুষ এবং প্রকৃতির পৃথক অবস্থান কি করে সম্ভব হতে পারে? পুরুষ এবং প্রকৃতির বিচ্ছেদ যদি সিদ্ধ না হয় তবে কর্মাধীন জীবের সংসার-শৃঙ্খল কেমন করে দূর হবে?

উত্তরে কপিলদেব বললেন—কর্মফলই হচ্ছে সংসার-বন্ধনের কারণ; সাধক যখন কর্মফলে নিঃস্পৃহ হয়ে কর্তব্য কর্মের জন্য, শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম করে এবং শ্রীভগবানের স্মরণ-মননের দ্বারা হৃদয়ের ভক্তিভাবকে সুদৃঢ় করে, তখন চিত্তের মালিন্য দূর হয়।

প্রকৃতি, পুরুষকে ভোগ করায় বটে কিন্তু পুরুষ যদি বিচারপূর্বক ভোগ করে, তবে প্রকৃতি তাকে বশীভূত করতে পারে না। একটি উপমা দিয়েছেন—আগুন যেমন তার নিজের উৎপত্তিস্থল কাষ্ঠকে দগ্ধ করে ফেলে, সেইরকম পুরুষের মোহ-উৎপাদিকা প্রকৃতি, সাধকের তপস্যার বলে অবিদ্যা রূপ ত্যাগ করে অন্তর্হিত হয়; তখন স্বতন্ত্র পুরুষ নিজের পরমানন্দ স্বরূপে অবস্থান করে।

এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥ ৩-২৭-২৬॥

অজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রকৃতিকে অনর্থকারিণী বলে মনে করে; কিন্তু আমাতে সমর্পিত প্রাণ, আত্মারাম মুনিরা প্রকৃতি পুরুষের পৃথকত্ব বিচার করে, পরমানন্দ লাভ করে; প্রকৃতি আর তাদের কোন অমঙ্গল করতে পারে না।

এরপর কপিলদেব তাঁর মাকে মনের মালিন্য দূর করার জন্য পরিমিত আহার, শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এইভাবে সাধনের দ্বারা মনোমল দূর হলে মন স্থির হয় এবং সাধক তখন শ্রীভগবানের মূর্তি চিন্তা করতে থাকে। শ্রীভগবানের মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ৩-২৮-১৩॥

পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো তাঁর মুখমণ্ডল, পদ্মের ভিতরের মতো অতি সুন্দর রক্তিমাভ চোখ, নীলপদ্মের মতো অতি অপরূপ শ্যামল গাত্রবর্ণ এবং চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করে রয়েছেন। তিনি মনোহর পীতাম্বর পরিহিত, বক্ষস্থল শ্রীবৎস-চিহ্ন শোভিত এবং গলদেশ কৌস্তুভ মণি ও বনমালায় বিভূষিত।

শ্রীভগবানের এই ধ্যানমূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করতে করতে ক্রমে মন শ্রীভগবানেই তন্ময় হয়ে থাকবে; হৃদয় তখন ভক্তিভাবে পূর্ণ হবে, আত্মাভিমান দূর হবে, আনন্দে সর্বাঙ্গ পুলকিত হবে এবং আনন্দাশ্রু ঝরতে থাকবে। সাধকের তখন বিষয়াসক্তি দূর হয় এবং জীবত্বের মূল যে অহঙ্কার বোধ, তাও তিরোহিত হয়। অহঙ্কার নাশ হলে সাধকের এবং শ্রীভগবানের পার্থক্য আর হৃদয়ে অনুভূত হয় না। পুরুষ তখন নিজের পৃথক সত্তা হারিয়ে, সকলের মধ্যে চিরবিদ্যমান পরমাত্মাকেই নিজের স্বরূপ বলে অনুভব করে চিরমুক্তি লাভ করে। আর তাকে সংসার-প্রবাহে পড়তে হয় না।

এরপর দেবহূতির অনুরোধে, যে ভক্তিযোগের দ্বারা স্বরূপের জ্ঞান হয়, সেই ভক্তির কথা কপিলদেব মাতাকে বললেন। প্রসঙ্গত তিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভক্তির কথাও ব্যাখ্যা করলেন।

যারা কর্তব্যবোধে বা শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম করেন তাদের ভক্তিকে সাত্ত্বিকী ভক্তি বলে; নাম, যশ এবং ঐশ্বর্যের আশায় প্রতিমাদিতে যারা পূজা করে তাদের ভক্তিকে রাজসিক ভক্তি বলে; আর যারা হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য প্রভৃতির বশবর্তী হয়ে পূজা করে তাদের ভক্তিকে তামসিক ভক্তি বলে।

যারা সর্বান্তর্যামী পরম পুরুষ আমাকে ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে ভজনা করে, তাদের সেই ভক্তিকে নির্গুণা ভক্তি বলা হয়। এইরূপ নির্গুণা ভক্তির সাধকেরা আমার সেবা ছাড়া অন্য কিছুই চায় না; এমন কি আমার সঙ্গে এক লোকে বাস, আমার কাছে থাকা, আমার সাথে একত্ব লাভ করা প্রভৃতি পর্যন্ত চায় না। এই ভক্তিভাবকেই মুক্তি লাভের চরম উপায় বলা হয়; এই ভক্তির দ্বারা সাধক সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

আমি অন্তর্যামিরূপে সকল জীবের অন্তরে সর্বদা বিরাজ করি; কিন্তু আমার এই স্বরূপকে উপেক্ষা করে যারা প্রতিমাদিতে পূজা করে তাদের সেই পূজা নিরর্থক, বিড়ম্বনা মাত্র।

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥ ৩-২৯-২২॥

সর্বভূতের অন্তরে সর্বান্তর্যামিরূপে নিত্য অবস্থিত পরমাত্মস্বরূপ আমাকে না দেখে যারা প্রতিমাদির উপাসনা করে, সেই সব মূর্খদের অর্চনা কেবল ভস্মে আহুতি দেবার মতো নিরর্থক।

যারা অভিমানবশত অপরকে পৃথকভাবে দেখে, তাদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে, জানবে তারা আমাকেই দ্বেষ করে। তাদের কখনও শান্তি হয় না।

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ৩-২৯-২৭ ॥

আমি যখন সকল জীবের হৃদয়ে সর্বান্তর্যামি-রূপে সর্বদা বিরাজ করি, তখন সকলকে যথাযোগ্য দান, সম্মান এবং বন্ধুভাবে সকলকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে আমার স্বরূপের অর্চনা করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য জীব জন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানবদেহই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল। যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহ-রূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে দাঁড়াইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে-মুহূর্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—অন্য সব কিছুই অন্তর্হিত হইবে। আমি মুক্ত হইব।"*

ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ॥ ৩-২৯-৩৩॥

কপিলদেব বললেন—আমাতে অর্পিতচিত্ত অর্থাৎ যিনি দেহাদির সমস্ত কর্ম, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ করেছেন এবং সর্বকর্ম-ফলত্যাগী—এইরকম কর্তৃত্বাভিমানশূন্য সমদর্শী পুরুষই জগতে শ্রেষ্ঠ।

* স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা —২য় খণ্ড, কর্মজীবনে বেদান্ত (২)

শ্রীভগবানের এই ধ্যানমূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করতে করতে ক্রমে মন শ্রীভগবানেই তন্ময় হয়ে থাকবে; হৃদয় তখন ভক্তিভাবে পূর্ণ হবে, আত্মাভিমান দূর হবে, আনন্দে সর্বাঙ্গ পুলকিত হবে এবং আনন্দাশ্রু ঝরতে থাকবে। সাধকের তখন বিষয়াসক্তি দূর হয় এবং জীবত্বের মূল যে অহঙ্কার বোধ, তাও তিরোহিত হয়। অহঙ্কার নাশ হলে সাধকের এবং শ্রীভগবানের পার্থক্য আর হৃদয়ে অনুভূত হয় না। পুরুষ তখন নিজের পৃথক সত্তা হারিয়ে, সকলের মধ্যে চিরবিদ্যমান পরমাত্মাকেই নিজের স্বরূপ বলে অনুভব করে চিরমুক্তি লাভ করে। আর তাকে সংসার-প্রবাহে পড়তে হয় না।

এরপর দেবহূতির অনুরোধে, যে ভক্তিযোগের দ্বারা স্বরূপের জ্ঞান হয়, সেই ভক্তির কথা কপিলদেব মাতাকে বললেন। প্রসঙ্গত তিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভক্তির কথাও ব্যাখ্যা করলেন।

যারা কর্তব্যবোধে বা শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম করেন তাদের ভক্তিকে সাত্ত্বিকী ভক্তি বলে; নাম, যশ এবং ঐশ্বর্যের আশায় প্রতিমাদিতে যারা পূজা করে তাদের ভক্তিকে রাজসিক ভক্তি বলে; আর যারা হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য প্রভৃতির বশবর্তী হয়ে পূজা করে তাদের ভক্তিকে তামসিক ভক্তি বলে।

যারা সর্বান্তর্যামী পরম পুরুষ আমাকে ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে ভজনা করে, তাদের সেই ভক্তিকে নির্গুণা ভক্তি বলা হয়। এইরূপ নির্গুণা ভক্তির সাধকেরা আমার সেবা ছাড়া অন্য কিছুই চায় না; এমন কি আমার সঙ্গে এক লোকে বাস, আমার কাছে থাকা, আমার সাথে একত্ব লাভ করা প্রভৃতি পর্যন্ত চায় না। এই ভক্তিভাবকেই মুক্তি লাভের চরম উপায় বলা হয়; এই ভক্তির দ্বারা সাধক সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

আমি অন্তর্যামিরূপে সকল জীবের অন্তরে সর্বদা বিরাজ করি; কিন্তু আমার এই স্বরূপকে উপেক্ষা করে যারা প্রতিমাদিতে পূজা করে তাদের সেই পূজা নিরর্থক, বিড়ম্বনা মাত্র।

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥ ৩-২৯-২২॥

সর্বভূতের অন্তরে সর্বান্তর্যামিরূপে নিত্য অবস্থিত পরমাত্মস্বরূপ আমাকে না দেখে যারা প্রতিমাদির উপাসনা করে, সেই সব মূর্খদের অর্চনা কেবল ভস্মে আহুতি দেবার মতো নিরর্থক।

যারা অভিমানবশত অপরকে পৃথকভাবে দেখে, তাদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে, জানবে তারা আমাকেই দ্বেষ করে। তাদের কখনও শান্তি হয় না।

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ৩-২৯-২৭ ॥

আমি যখন সকল জীবের হৃদয়ে সর্বান্তর্যামি-রূপে সর্বদা বিরাজ করি, তখন সকলকে যথাযোগ্য দান, সম্মান এবং বন্ধুভাবে সকলকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে আমার স্বরূপের অর্চনা করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য জীব জন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানবদেহই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল। যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহ-রূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে দাঁড়াইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে-মুহূর্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—অন্য সব কিছুই অন্তর্হিত হইবে। আমি মুক্ত হইব।"*

ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ॥ ৩-২৯-৩৩॥

কপিলদেব বললেন—আমাতে অর্পিতচিত্ত অর্থাৎ যিনি দেহাদির সমস্ত কর্ম, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ করেছেন এবং সর্বকর্ম-ফলত্যাগী—এইরকম কর্তৃত্বাভিমানশূন্য সমদর্শী পুরুষই জগতে শ্রেষ্ঠ।

* স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা —২য় খণ্ড, কর্মজীবনে বেদান্ত (২)

এরপর কপিলদেব সাধকের মনে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য একে একে সংসারের ভীষণতা, কামী পুরুষের তামসী এবং রাজসী গতি, সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা ঊর্ধ্বলোকে গমন প্রভৃতি বর্ণনা করলেন।

ভগবান কপিলের উপদেশ শ্রবণে মাতা দেবহূতির মোহজাল দূর হলো; তিনি তখন সর্বজগতের গুরু কপিলদেবকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন ঃ

> অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
> তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥
>
> ৩-৩৩-৭॥

যার জিহ্বায় আপনার অমৃতময় নাম উচ্চারিত হয়, তিনি চণ্ডাল হলেও সকলের শ্রেষ্ঠ; অতএব যারা আপনার নাম কীর্তন করেন, তারা শ্রেষ্ঠ আর্য নামে অভিহিত হয়; নামের দ্বারাই তারা তপস্যা, যাগযজ্ঞ, তীর্থস্নান এবং বেদ অধ্যয়নের ফল লাভ করেন।

হে প্রভু! চিত্ত যখন বিষয় গ্রহণে বিরত হয়ে নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সমুদ্রের মতো অবস্থান করে, তখনই জীব আপনাকে লাভ করতে সমর্থ হয়। আপনি আত্মস্বরূপে সদা বিদ্যমান; গুণসমূহ আপনাকে আবৃত করতে পারে না; অনন্তজ্ঞানরূপী বেদসমূহ আপনার মধ্যেই অধিষ্ঠিত রয়েছে; আপনি পূর্ণব্রহ্ম, পুরাণ পুরুষ ভগবান; আপনাকে আমি প্রণাম করি।

মাতা দেবহূতির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে কপিলদেব বললেন—হে মাতঃ! আমি যেসব উপদেশ তোমায় দিয়েছি, তার অনুশীলনে তুমি শিগ্‌গিরই মুক্তিপদ লাভ করবে।

এইভাবে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বর্ণনা করে কপিলদেব, ব্রহ্মবাদিনী জননীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তপস্যায় চলে গেলেন। অনন্তর মাতা দেবহূতি, কপিলদেব নির্দেশিত পথে ধ্যানযোগ অবলম্বন করে অচিরেই চিরমুক্তি লাভ করলেন।

১২

ধ্রুব-কথা

এখন যে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে, তাকে ধ্রুব-কথা, ভক্ত-হৃদয়ের চিরন্তনী কথা বলা যেতে পারে। এইটি হচ্ছে মহাত্মা ধ্রুবের জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাস, যা এখনও ভক্ত-হৃদয়কে ধ্রুবসত্যের দিকে—শ্রীভগবানের দিকে নিয়ে যায়। এই অংশটি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে। মৈত্রেয় মুনি বলছেন এবং ভক্তপ্রবর বিদুর শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে ধ্রুব-কথা শুনছেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র রাজা উত্তানপাদের দুই পত্নী ছিল—সুরুচি এবং সুনীতি। এদের নাম থেকেই এদের চরিত্রের বিশেষত্ব কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। সুরুচি—সুন্দর রুচি যাঁর; ইনি সুন্দরী, সুন্দর পোষাক ব্যবহার করেন, মনোমুগ্ধকর কথা বলেন; ফলে সকলেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হবে—এই তো স্বাভাবিক। আর সুনীতি—ইনি সৎ-নীতিসম্পন্না; এঁর মধ্যে সত্য, দয়া, ভগবৎ-বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণ সদাই বিরাজিত। সুনীতি সবসময় মনোমুগ্ধকর কথা বলে রাজাকে মোহিত করে রাখেন না, বরং রাজার প্রকৃত হিতের কথাই বলেন; কিন্তু জগতে স্পষ্ট এবং হিত-বাক্য শোনার মতো লোক বেশি নেই। ফলে জগতের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ীই রাজা সুরুচির প্রতিই বেশি অনুরক্ত। আর সতীনদের মধ্যে যে ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের সম্পর্ক স্বাভাবিক, তার ফলে সুনীতির শিশু পুত্রও সুরুচির ঈর্ষা ও ঘৃণার পাত্র।

একদিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্রকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন; এমন সময় সুনীতির শিশু পুত্র ধ্রুবও বাবার কোলে উঠতে চাইল। কিন্তু স্ত্রৈণ রাজা সুরুচির ভয়ে ধ্রুবকে কোলেও তুললেন না, একটু আদরও করলেন না। তখন ঈর্ষাপরায়ণ বিমাতা সুরুচি এসে পাঁচ বছরের অবোধ শিশু ধ্রুবকে তিরস্কার করে বললেন—ধ্রুব! তুমি রাজার কোলে উঠতে চাও—এত বড় আস্পর্ধা! তুমি তো রাজার কোলে উঠবার যোগ্য নও; যদিও তুমি এই রাজারই পুত্র, তবুও বলি, তুমি তো আমার গর্ভে

জন্মগ্রহণ করনি; তুমি যে আমার সপত্নী-পুত্র; জেনে রাখ, আমার সন্তান না হলে এই রাজার কোলে ওঠা সম্ভব নয়। যদি তুমি নিতান্তই এই রাজার কোলে উঠতে চাও, রাজসিংহাসন পেতে চাও, তাহলে গিয়ে শ্রীহরির তপস্যা কর।

তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে।
গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদীচ্ছসি নৃপাসনম্॥ ৪-৮-১৩॥

তুমি যদি একান্তই রাজসিংহাসন লাভ করতে চাও, তাহলে তপস্যার দ্বারা পরম পুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করে তাঁর কৃপায় আমার গর্ভে তোমায় আবার জন্ম নিতে হবে। মানুষ কত হীন হলে, কতটা মতিচ্ছন্ন হলে একটা অবোধ শিশুকে এইরকম বলতে পারে!

মাতুঃ সপত্ন্যাঃ সুদুরুক্তিবিদ্ধঃ শ্বসন্ রুষা দণ্ডহতো যথাহিঃ।
হিত্বা মিষন্তং পিতরং সন্নবাচং জগাম মাতুঃ স রুদন্ সকাশম্॥
৪-৮-১৪॥

ধ্রুব বিমাতার তীব্র দুর্বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে দণ্ডের আঘাতে ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের মতো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে চলে গেলেন। পিতা উত্তানপাদ, এই সমস্ত দেখেও সুরুচির ভয়ে একটি কথাও বললেন না। এই তো সংসার! স্ত্রীর কত রকম দুর্ব্যবহারই না স্ত্রৈণ লোকদের সহ্য করতে হয়!

উত্তানপাদের অবহেলায় তারই শিশুপুত্রের প্রাণে যে কী দারুণ আঘাত লাগতে পারে রাজা তা একবার ভেবেও দেখলেন না। শিশুকালে মা-বাবার আদরে শিশুরা সবরকম দুঃখই ভুলে থাকে।

এদিকে সুনীতি অন্তঃপুরে থেকে, ধ্রুবের প্রতি সপত্নী সুরুচির দুর্ব্যবহারের কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। ধ্রুব কাছে আসতেই তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন; সুনীতি বুঝলেন যে, এই দুঃখের কোন প্রতিকার নেই; তাই তিনি চোখের জল মুছে ধ্রুবকে বললেন ঃ

আতিষ্ঠ তৎ তাত বিমৎসরস্ত্বমুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকম্।
আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমো যথা॥
৪-৮-১৯॥

হে ধ্রুব! তোমার বিমাতা যা বলেছেন, 'তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা কর'—তা যথার্থই বটে; সুতরাং তুমি বিদ্বেষশূন্য হয়ে সেইরকমই আচরণ কর—অর্থাৎ শ্রীহরির তপস্যা কর। আর যদি তুমি সুরুচির পুত্র উত্তমের মতো সিংহাসনে আরোহণ করতে চাও, তাহলেও শ্রীহরির পাদ-পদ্মের আরাধনা কর। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ছাড়া জগতে কারও কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। সুতরাং তুমি যদি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে চাও, তা হলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমি তো আর কোন পথ দেখছি না; বিশেষত তোমার পিতা বিরূপ, আমি স্ত্রীলোক—কিছু করবার ক্ষমতা নেই, আর তুমি নিজে শিশুমাত্র; অতএব একমাত্র ভগবান ছাড়া তোমার আর কে সহায় হতে পারে? তাই বলছি—তুমি ভগবানকে ডাক; তাঁকেই তোমার দুঃখের কথা বল ; তিনিই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য বিশ্ববিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ।
অজোঽধ্যতিষ্ঠৎ খলু পারমেষ্ঠ্যং পদং জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যম্॥
৪-৮-২০॥

সুনীতি বললেন—যিনি জগতের পালনের জন্য সত্ত্বগুণময় দেহ স্বীকার করেছেন এবং জিতাত্ম যোগীদেরও যিনি বন্দনীয়, সেই ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মের আরাধনার দ্বারাই ব্রহ্মা অতি উত্তম ব্রহ্মপদ লাভ করেছেন।

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্ দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া॥
৪-৮-২৩॥

সুনীতি আরও বললেন—হে ধ্রুব! ব্রহ্মাদি দেবগণ, যে লক্ষ্মীদেবীর অনুসন্ধান করেন সেই পদ্মধারিণী লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত যাঁর অনুসরণ করেন, সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ছাড়া অন্য কেউ-ই তোমার দুঃখ দূর করবার যোগ্য বলে দেখি না। সুতরাং আমি বলছি, তুমি ভগবান শ্রীহরির-ই আরাধনা কর। তিনিই তোমার সব দুঃখ দূর করে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

মাতা সুনীতির বিলাপ শুনে এবং তাঁর কাছ থেকে এমন উপদেশ পেয়ে, ধ্রুব তখন নিজেই নিজের মনকে সংযত করে শ্রীভগবানের আরাধনা করার জন্য গৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

বনে গিয়ে ধ্রুব একান্ত মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন—কোথায় পদ্মপলাশলোচন! দেখা দাও; আমি অবোধ অজ্ঞান—আমায় দেখা দাও, প্রভু!

এদিকে নারদ, যিনি হরি-গুণগানে মত্ত হয়ে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়ান, তিনি যোগবলে ধ্রুবের মনোগত অভিপ্রায় জেনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—এ-ও কি সম্ভব! এত অল্প বয়সে, এমন তেজস্বিতা, এমন সৎগুণের আধার, এমন ভগবৎ অনুরাগ, জগতে তো দেখা যায় না! তাই নারদ, বালক ধ্রুবের কাছে এসে তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাকে পরীক্ষা করার জন্য সাধন-পথের কঠোরতা বর্ণনা করে ধ্রুবকে সাধনা থেকে বিরত হতে বললেন। নারদ বললেন—ধ্রুব! তুমি দেখছি নিতান্তই বালক; এই বয়সে তোমার তো খেলাধুলায় মত্ত থাকাই স্বাভাবিক। এই বয়সের ছেলেপিলেরা তো মান-অপমান ঠিক ঠিক বুঝতেই পারে না। আর যদি ধরেই নিই যে, মান-অপমান সম্বন্ধে তোমার যথেষ্ট ধারণা রয়েছে, তা হলেও জেনে রাখ যে, মান-অপমান প্রভৃতি মানুষের মোহ ছাড়া আর কিছু নয়; জগতে সকলেই নিজ নিজ কর্ম-ফলে মোহের বশে, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে। সৎ কর্ম করলে শুভ ফল লাভ হয়, আর অসৎ কর্ম করলে—অশুভ ফল দুঃখ ভোগ করতে হয়; এই তো নিয়ম। যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা বিজ্ঞ, তাঁরা জানেন যে, ঈশ্বরই একমাত্র গতি—তাঁরই ইচ্ছায় লোকেরা শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করে থাকে। সুতরাং নিজের ভাগ্যানুসারে যখন যা ঘটে, তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন; মান-অপমানের জন্য অপরকে দায়ী করেন না। তাছাড়া তুমি তোমার মায়ের উপদেশে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর আরাধনা করতে অভিলাষী হয়েছ; কিন্তু তোমরা তো জান না যে, শ্রীভগবানের আরাধনা করা মানুষের পক্ষে কত দুঃসাধ্য! মুনি ঋষিরা পর্যন্ত জন্ম জন্ম ধরে নিষ্কামভাবে কঠোর যোগ-সাধনা করেও তাঁকে জানতে পারেন না; আর তুমি তো শিশুমাত্র। তাই বলছি, তোমার এই ভগবৎ আরাধনার ইচ্ছা ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে যাও। আর যদি নিতান্তই একটু সাধনা করতে চাও, তবে যখন বৃদ্ধ হবে, তখন না হয় একটু চেষ্টা করে দেখো।

ধ্রুবের মনের বল পরীক্ষা করার জন্য নারদ তাকে অনেক যুক্তি-পূর্ণ উপদেশ দিয়ে ভগবৎ-আরাধনা থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। কিন্তু

ক্ষত্রিয়োচিত তেজস্বিতায় ধ্রুবর হৃদয় তখন পূর্ণ; তাই ভগবৎ পথের কোন বাধাই ধ্রুব ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এদিকে নারদের কথা না মানলে পাছে তিনি রুষ্ট হন, তাই ধ্রুব তখন নম্রভাবে নিজের মনের আবেগ এবং দৃঢ়তার কথা নারদকে বললেন—প্রভু! আপনি যেসব উপদেশ দিলেন, সেসবই অতি সুন্দর ; কিন্তু আমি তো সেই উপদেশ পালনের অধিকারি নই; কারণ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মেছি বলে আমি অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের। তার উপর বিমাতার দুর্বাক্যে আমার প্রাণে এমন দারুণ আঘাত লেগেছে যে, আমি কিছুতেই তা ভুলতে পারছি না। সুতরাং আমার এই মানসিক অবস্থায় আপনি মনকে শান্ত করবার জন্য যে সব উপায় বললেন, তা আমার মন গ্রহণ করতে পারছে না। অতএব আপনার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে শ্রীভগবানের আরাধনা করতেই হবে। ধ্রুব আরও বললেন, প্রভু! আমি আপনাকে চিনেছি; যিনি বীণা বাজিয়ে হরিগুণগান করে সর্বদা সূর্যের মতো জগতের মঙ্গল বিধান করে সর্বত্র বিচরণ করে থাকেন, আপনি তো সেই মহামুনি নারদ। আপনি তো জগতের সব কিছুই জানেন; আমি ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পদ লাভ করতে চাই, যে পদ এখন পর্যন্ত কেউ লাভ করতে পারেনি; এমন কি আমার পূর্ব-পুরুষেরাও তা লাভ করতে সমর্থ হয়নি। সেই সর্বোৎকৃষ্ট পদ লাভের জন্য শ্রীভগবানের যে-রকম আরাধনা করতে হবে আপনি কৃপা করে আমায় সেই বিষয়ে উপদেশ দিন।

ধ্রুবের বিনয় এবং দৃঢ়তাপূর্ণ কথা শুনে নারদ খুশি হয়ে ভাবলেন— ভগবৎ আরাধনার এই তো উপযুক্ত সাধক; সুতরাং সাধনার গূঢ় রহস্য একে উপদেশ করলে মঙ্গলই হবে। নারদ তখন ধ্রুবকে বললেন ঃ

জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে।
ভগবান্ বাসুদেবস্তং ভজ তং প্রবণাত্মনা ॥ ৪-৮-৪০॥

নারদ বললেন—তোমার মাতাই তোমার অভিলষিত বিষয়-সিদ্ধির উপায় বলে দিয়েছেন; ভগবান শ্রীহরি-ই সেই উপায় বলে জানবে। তুমি বিনম্র চিত্তে তাঁরই আরাধনা কর। শ্রীভগবানের কৃপা হলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এ সবই সাধক লাভ করতে পারে; অতএব তুমি একান্ত মনে তাঁরই আরাধনায় ব্রতী হও।

নারদ বুঝলেন যে, উপযুক্ত শিষ্য সম্মুখে উপস্থিত; তাই তিনি এবার ধ্রুবকে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ দিয়ে বললেন—এই যে যোগের কথা বললাম, তার সাধনের জন্য তুমি যমুনার পবিত্র তীরে মধুবন নামে যে সুন্দর স্থান রয়েছে, যেখানে শ্রীহরি সর্বদা বিরাজ করেন, সেইখানে যাও। সেখানে গিয়ে ত্রিসন্ধ্যা যমুনার জলে স্নান করে, যথাবিধি আসন রচনা করে প্রাণায়াম দ্বারা মনের শক্তিগুলিকে একাগ্র করে, প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতিকে ফিরিয়ে মনকে ভগবন্মুখী করে ধারণা অর্থাৎ মনের একাগ্রতা অভ্যাস করবে। মন একাগ্র হলে তবেই ধ্যান সম্ভব এবং এই ধ্যানই ক্রমে সমাধি অবস্থায় পৌঁছে দেবে।

এখন অষ্টাঙ্গ যোগের সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা দরকার। যোগের আটটি অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এর মধ্যে যম এবং নিয়ম হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য চারিত্রিক প্রস্তুতি। যম বলতে বোঝায় (১) অহিংসা—কারুর হিংসা করবে না, (২) সত্য কথা এবং সত্য ব্যবহার করবে, (৩) অস্তেয়—অপরের জিনিস চুরি করবে না, (৪) ব্রহ্মচর্য পালন করবে এবং (৫) অপরিগ্রহ—কারুর কাছে কিছু চাইবে না বা নেবে না। এগুলিকে যোগশাস্ত্রে যম বলা হয়। নিয়ম বলতে বোঝায় (১) শৌচ—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, (২) সন্তোষ—সব সময় মনে আনন্দের ভাব বজায় রাখা, (৩) তপস্যা, (৪) স্বাধ্যায়—শাস্ত্র পাঠ এবং (৫) ঈশ্বরপ্রণিধান—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যম এবং নিয়মের সাথে অধ্যাত্ম সাধনার তেমন কিছু সম্পর্ক নেই; কিন্তু এগুলি না হলে আধ্যাত্মিক সাধনা সম্ভব হয় না। এই ভাবে যম এবং নিয়মের অনুশীলনে চরিত্র গঠিত হলে, আসন অর্থাৎ দীর্ঘ সময় ধরে একইভাবে বসে থাকার অভ্যাস করতে হয়। এর পর প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করলে প্রাণশক্তির উপর অধিকার হয়। এই যে অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম চারটির কথা বলা হলো— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, এগুলি সাধনার বহিরঙ্গ বলা যেতে পারে—সাধনার প্রস্তুতি। এর পর যথার্থ সাধনার আরম্ভ। প্রত্যাহার—মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে ঈশ্বরাভিমুখী করতে হবে। তারপর ধারণা—মনকে কোন এক বিশেষ স্থানে, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে একাগ্র করা। এই অবস্থায় মনকে কোন বিষয়ে কিছুক্ষণ স্থির রাখতে পারলে, মন তখন অবিচ্ছিন্ন গতিতে ঐ দিকেই ধাবিত হয়—একেই বলে ধ্যান; আর এই ধ্যান যখন গভীর হয়, তখন বাইরের কোন

কিছুরই আর অনুভব থাকে না; কেবল ধ্যেয় বস্তুর অন্তর্নিহিত সার তত্ত্বেরই অনুভব হতে থাকে এবং মনকে ভাবাতীত অবস্থায় পৌঁছে দেয়। এই হলো সমাধির অবস্থা।

নারদ বললেন, এই যে ভগবানের সম্বন্ধে ধারণা এবং ধ্যানের কথা বলা হলো, তা কেমন করে করবে?

তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণৌষ্ঠেক্ষণাধরম্।
প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্ণং শরণ্যং করুণার্ণবম্ ।। ৪-৮-৪৬।।

নারদ বললেন—মনে মনে চিন্তা করবে, শ্রীভগবানের আকৃতি কিশোর বালকের মতো; তাঁর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতি সুন্দর; ওষ্ঠদ্বয় এবং চোখ দুটি ঈষৎ রক্তাভ। তিনি প্রণতজনের আশ্রয়স্থল এবং সুখদাতা ; শরণাগতের তিনি প্রতিপালক এবং দয়ার সাগরস্বরূপ।

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্তচতুর্ভুজম্ ।। ৪-৮-৪৭।।

তাঁর বক্ষদেশে শ্রীবৎস চিহ্ন রয়েছে; নতুন মেঘের মতো ঘন নীল বর্ণ তাঁর গায়ের রং, বনমালা ধারণ করে আছেন এবং তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শোভা পাচ্ছে।

নারদ বললেন—এইভাবে শ্রীভগবানের চিন্তায় মন স্থির হলে, সেই একাগ্র মনে ভগবান ঈষৎহাস্যযুক্ত সপ্রেম দৃষ্টিতে তোমার দিকে যেন তাকিয়ে রয়েছেন এবং বরদাতাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ—এইভাবে তাঁকে ধ্যান করবে।

শ্রীভগবানের ধ্যানের প্রক্রিয়ার কথা বলে নারদ তখন কৃপা করে ধ্রুবকে শ্রীভগবানের মহামন্ত্র প্রদান করলেন এবং বাহ্য ও মানস পূজা শিখিয়ে দিলেন।

স্বেচ্ছাবতারচরিতৈরচিন্ত্য নিজমায়য়া।
করিষ্যত্যুত্তমঃশ্লোক-স্তদ্ধ্যায়েদ্ধৃদয়ঙ্গমম্ ।। ৪-৮-৫৭ ।।

নারদ যেন উঠে পড়ে লেগেছেন শিষ্যকে সর্বস্ব দেবার জন্য। বললেন—পুণ্যকীর্তি শ্রীভগবান তাঁর নিজ অচিন্ত্য মায়া-শক্তিকে অবলম্বন করে স্বেচ্ছায় অবতার শরীর পরিগ্রহ করে যেসব লীলা করেছেন, সেইসব নিজের হৃদয় মধ্যে কল্পনা করে তাঁর ধ্যান করবে। অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব অনেক অবতারের

কথাই তো ধ্রুব জানেন। সেই সব অবতারেরা যেন ধ্রুবর হৃদয় মধ্যেই ঐ সব আচরণ করছেন—এইভাবে নারদ ধ্রুবকে ধ্যান করতে বলে আরও বললেন যে, এইভাবে শ্রীভগবানকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করে ভক্তিভাবে তাঁর অর্চনা করলে ভগবান সেই সাধককে তার অভিলষিত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দান করে থাকেন। আর যে সাধক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কিছুই চান না, তার জন্য নারদ বললেন ঃ

বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা।
তং নিরন্তরভাবেন ভজেত্যদ্ধা বিমুক্তয়ে ॥ ৪-৮-৬১॥

যে সব সাধক প্রবল বৈরাগ্যবান, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বিষয়ে স্পৃহা শূন্য, তাঁরা পরমার্থরূপ বিশিষ্ট মুক্তি অর্থাৎ সর্বদা শ্রীভগবানের সেবা করবার জন্য, মন-প্রাণ, সর্বস্ব অর্পণ করে ভক্তিভাবে তাঁরই আরাধনা করেন। এই শ্লোকে নারদ, তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য ধ্রুবকে সাধনার চরম অবস্থা, শ্রেষ্ঠ উপদেশ দিয়ে বললেন—শ্রীভগবানের আরাধনা করলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এ সবই লাভ করা যায় এবং সাধারণ মানুষ এই সবই চায়। কিন্তু অতি বিরল শ্রীভগবানের বিশিষ্ট ভক্তেরা, যাঁরা তীব্র বৈরাগ্যবান, ভগবান ছাড়া আর কিছুই চান না, তাঁরা সর্বদা শ্রীভগবানের সেবা করার জন্য প্রবল ভক্তিভাব অবলম্বন করে তাঁরই আরাধনা করেন।

পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভক্তিমান ধ্রুব নারদের কাছে দীক্ষা এবং উপদেশ লাভ করে তখনই নারদকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে শ্রীহরির চরণাঙ্কিত মধুবনে চলে গেলেন।

এদিকে ধ্রুব রাজপুরী ছেড়ে চলে গেলে পর রাজার মনে অত্যন্ত অনুশোচনা এল; তিনি সর্বদা ধ্রুবর জন্য ব্যাকুল হয়ে বিষণ্ণভাবে কালাতিপাত করেন। সুরুচির প্রতি মোহ তাঁর দূর হয়েছে; বাৎসল্যভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি সর্বদা ধ্রুবর কথাই ভাবেন।

নারদ যোগদৃষ্টি সহায়ে উত্তানপাদ রাজার মনের অবস্থা জেনে রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাজা অতি সমাদরে নারদকে পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। নারদ তখন উত্তানপাদকে বললেন—রাজন! আমি দেখছি তুমি শুকনো মুখে কোন জটিল বিষয়ের চিন্তা করছ; ধর্ম, অর্থ, কাম—এই তিনটি বিষয়ে তোমার তো কোন অভাব নেই; সুতরাং তোমার এই দুশ্চিন্তার

কারণ কি ? রাজা উত্তর দিলেন—হে দেবর্ষি! আমি অত্যন্ত স্ত্রৈণ; হৃদয়ে আমার কিছুমাত্র দয়ামায়া নেই; আমার অতি বুদ্ধিমান, ধার্মিক পুত্র ধ্রুবকে আমি রাজপুরী থেকে নির্বাসিত করেছি। আমার সেই পাঁচ বছরের শিশু ধ্রুব আদর করে আমার কোলে উঠতে চেয়েছিল; কিন্তু সুরুচির ভয়ে আমি তাকে কোলে নিই নি; অভিমানে ধ্রুব আমাকে ছেড়ে চলে গেল। জানি না, বনে বনে ঘুরে ক্ষুধায় কাতর হয়ে সে এখন কি করছে; অসহায় শিশু বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে হিংস্র জন্তুরা তাকে মেরে ফেলেনি তো?

রাজা উত্তানপাদের অনুশোচনার কথা শুনে নারদ বললেন—হে রাজন! ধ্রুবর জন্য তুমি আর অনুশোচনা করো না। দেবতারা তাকে সর্বদা রক্ষা করছেন। তোমার এই প্রভাবশালী পুত্র, ইন্দ্রাদি লোকপালদের অসাধ্য কর্ম সাধন করে শিগ্‌গিরই তোমার কাছে ফিরে আসবে। তার যশে তোমার এবং তোমার বংশের গৌরব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। দেবর্ষির মুখে এইসব কথা শুনে রাজা উত্তানপাদ রাজকার্যের প্রতি আসক্তিহীন হয়ে সর্বদা ধ্রুবর কথাই চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে ধ্রুব মধুবনে গিয়ে কিছুদিন অল্পাহারে এবং পরে একেবারে নিরাহারে গুরু-নির্দিষ্ট পথে, অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে, হৃদয়ে শ্রীহরির ধ্যান করতে লাগলেন। ক্রমে ধ্রুব পূর্ণ সমাধিস্থ হলেন; বাইরের কোন কিছুই আর তাঁর বোধগম্য হলো না। সেই সময় ধ্রুব নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অতি উজ্জ্বল ইষ্টমূর্তি হৃদয়ে দর্শন করে একেবারে তন্ময় হয়ে ছিলেন। হঠাৎ ধ্রুব দেখলেন যে, হৃদয়-মধ্যস্থ সেই ইষ্টমূর্তি অন্তর্হিত হলেন; সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবর সমাধি ভঙ্গ হলো; চোখ খুলে চাইতেই দেখলেন হৃদ্‌পদ্মস্থিত শ্রীহরির সেই মূর্তি তাঁরই সামনে অবস্থান করছেন। ধ্রুবর সমস্ত সাধনার সার্থক পরিণতি হলো। ধ্রুব তখন কি করলেন?

তদ্দর্শনেনাগতসাধ্বসঃ ক্ষিতাববন্দতাঙ্গং বিনময্য দণ্ডবৎ।
দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভকশ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্॥
৪-৯-৩ ॥

বালক ধ্রুব শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করে, ভক্তি ও আনন্দে অধীর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, তাঁকে অভিবাদন করলেন। ধ্রুব

তখন দুই চোখ দিয়ে শ্রীভগবানকে এমনভাবে দেখতে লাগলেন যেন চোখ দিয়েই তিনি ভগবানকে পান করতে লাগলেন; প্রণাম করবার সময় মুখ দিয়ে ধ্রুব যেন শ্রীভগবানের চরণ-কমল চুম্বন করতে লাগলেন; আর দুই বাহু দিয়ে ধ্রুব যেন বার বার শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আলিঙ্গন করতে লাগলেন। ইষ্টের দর্শনে ভক্তি ও আনন্দের আতিশয্যে সাধকের এমনি অবস্থাই হয়।

ধ্রুবর তখন ইচ্ছা হলো, তিনি শ্রীভগবানের স্তব করবেন; কিন্তু কিভাবে যে শ্রীভগবানের স্তব করতে হয় তা তো ধ্রুবর জানা নেই। তাই শ্রীভগবান ধ্রুবর মনস্কামনা পূর্ণ করবার জন্য দয়াপরবশ হয়ে, তাঁর হাতের বেদময় শঙ্খ দিয়ে ধ্রুবর গণ্ডস্থল স্পর্শ করলেন। শ্রীভগবানের সেই স্পর্শে তখনই ধ্রুব ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে পরম ভক্তিভাবে অনন্ত-কীর্তি শ্রীহরির স্তবগান করতে লাগলেন ঃ

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিল শক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥ ৪-৯-৬ ॥

ধ্রুব স্তব করছেন—যে সর্বশক্তিমান নিজের চিচ্ছক্তি প্রভাবে আমার অন্তরে প্রবেশ করে, প্রসুপ্তের মতো অবস্থিত আমার বাক্-শক্তি, হস্ত, পদ, শ্রোত্র, চর্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে উজ্জীবিত করছেন, আপনি সেই পরম পুরুষ ভগবান—আপনাকে আমি প্রণাম করি।

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্ ॥ ৪-৯-৯ ॥

জন্ম মৃত্যুরূপ শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কারণ এবং ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু সদৃশ আপনাকে যারা কামাদি ভোগের জন্য আরাধনা করে, তারা নিশ্চয়ই আপনার মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়; কেন না প্রাণিবর্গ শবতুল্য এই যে জড়দেহ, তার জন্য যেসব উপভোগ কামনা করে থাকে, সেসব বিষয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগে নরকেও লাভ হতে পারে। ধ্রুব বলছেন—যারা ভগবানকে

ছেড়ে ভোগ্যবস্তু—যা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, সেই ভোগ্যবস্তু কামনা করে, তারা নিতান্তই হতভাগ্য; ভগবানের মায়াতেই তাদের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটে, কারণ ঐসব ভোগ্যবস্তু নিতান্তই তুচ্ছ; বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যে সুখের উৎপত্তি, তা তো ক্ষণিকের, তা নশ্বর। অস্থায়ী সুখই যদি ভোগ করতে চাও তবে তা নরকেও পাওয়া যেতে পারে—তার জন্য ভগবৎ আরাধনার কি দরকার?

তাই ধ্রুব বলছেন—হে প্রভু! আমি সর্বকালের যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ, যা আমার পূর্বপুরুষেরাও কখনও লাভ করেন নি, আমি সেই পদ লাভের জন্যই তো আপনার আরাধনা আরম্ভ করেছিলাম; কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি কি অধম কাজই না করেছি! কোথায় ভক্তি মুক্তির জন্য আরাধনা করব, তা না করে ভোগ্যবস্তুর জন্য আরাধনা করেছি। নিজের সকাম সাধনার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে ধ্রুব বললেন—প্রভু ! আপনার পাদপদ্মের ধ্যান অথবা আপনার ভক্ত জনের কথা শ্রবণে জীবের যে শান্তি লাভ হয়, সেরকম শান্তি আপনার স্বরূপ জ্ঞানে—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও হয় না। তাই বলছি ঃ

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ৪-৯-১১॥

হে অনন্তদেব ! যেসব কামনাকলুষ-রহিত, শুদ্ধ চিত্ত মহাপুরুষেরা আপনার প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভক্তিপরায়ণ আমি যেন তাঁদের সঙ্গ লাভ করতে পারি। ঐরকম সাধুজনের সংস্পর্শে এসে আপনার গুণ-কথা রূপ অমৃত পানে মত্ত হয়ে মহা বিপদ-সংকুল এই ভয়ঙ্কর সংসার-সমুদ্র অনায়াসে পার হয়ে যাব।

ধ্রুব কিসের জন্য তপস্যা করলেন, আর এখন তিনি কি চাইলেন? সকাম সাধনা করে এখন নিষ্কাম শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করলেন।

ধ্রুব আরও বললেন—আপনার একান্ত ভক্তজনের সঙ্গ যারা লাভ করেন, তারাও এই নশ্বর দেহ এবং আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-আশয় প্রভৃতির আর চিন্তা করেন না। আমি সর্ব-শ্রেষ্ঠ পদ লাভের জন্য আপনার আরাধনা করেছিলাম; এখন আপনার কৃপায় আমি বুঝতে পেরেছি যে, একমাত্র আপনি ছাড়া, এ

জগতের ভোগ্যবস্তুসমূহ—সবই অসার। তাই এখন আপনার কাছে প্রার্থনা করছি—আমার আর কিছুই চাই না; কেবল আপনার ভক্তদের সঙ্গ লাভ করে, আপনার নাম ও গুণ কীর্তন এবং কথালাপে সর্বদা যেন তন্ময় হয়ে থাকতে পারি।

ধ্রুবর প্রার্থনা শুনে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—হে ক্ষত্রিয়কুমার! তোমার মনোগত অভিলাষ আমি বুঝেছি। পরমার্থরূপ নিরন্তর ভগবৎ-ভজন—যা তুমি এখন চাইলে, তা অত্যন্ত দুর্লভ হলেও আমি তোমায় তা দান করব। তাছাড়া যে স্থানে পূর্বে কেউ কখনও যায়নি, যে স্থানকে কেন্দ্র করে গ্রহ নক্ষত্রসমূহ আবর্তিত হচ্ছে, সেই অবিনশ্বর বাসস্থান-রূপ উৎকৃষ্ট পদ, যার নাম আজ থেকে ধ্রুবলোক হবে, সেই স্থান আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করলাম। এ ছাড়াও অপরের শিক্ষার জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, তুমি শিগ্‌গিরই তোমার পিতৃরাজ্য লাভ করে বহু বছর ধর্মানুসারে রাজ্য পালন এবং ভোগ করবে। তোমার বিমাতা সুরুচি, যে বিনা দোষে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তোমার প্রাণে কষ্ট দিয়েছে, সে তার কর্মফল ভোগ করবে। তার পুত্র উত্তম মৃগয়া করতে গিয়ে প্রাণ হারাবে। সুরুচি বহুদিন পুত্রের সংবাদ না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে বনে গিয়ে, দাবানলের মধ্যে পড়ে মৃত্যু বরণ করবে। শ্রীভগবান আরও বললেন—যথাবিধি রাজ্য পালন এবং বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যখন এই পৃথিবীতে তোমার অন্তিম সময় উপস্থিত হবে, তখন আমিই সেই পরম পুরুষার্থ—এই চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই তোমার সমস্ত মনকে অধিকার করবে এবং তুমি ধ্রুবলোকে প্রয়াণ করবে। সেখানে গেলে আর কখনও পতনের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীভগবান ধ্রুবকে তিনটি বর দিলেন—যে উদ্দেশ্য নিয়ে ধ্রুব সাধনা আরম্ভ করেছিলেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ ধ্রুবলোক দান করলেন; ভগবানের দর্শন পেয়ে বীতমোহ হয়ে ধ্রুব তখন নিরন্তর ভগবৎ সেবা ও ভগবৎ ভজনের অধিকার চেয়েছিলেন, শ্রীভগবান তাও দান করলেন; সর্বশেষে ধ্রুবকে পিতার রাজ্য লাভ করে তা পালন ও ভোগ করবেন বলে বর দিলেন।

ধ্রুবকে বর দিয়ে শ্রীভগবান স্বস্থানে চলে গেলেন। এদিকে রাজা উত্তানপাদ খবর পেলেন, ধ্রুব তপস্যায় সফলকাম হয়ে আবার তার কাছে ফিরে আসছেন। ধ্রুবর বিচ্ছেদে রাজার একান্ত নিরানন্দময় জীবনে এই আনন্দ সংবাদ রাজাকে অধীর ও উদ্বেল করে তুলল। তিনি তখনই আত্মীয়-স্বজন, অমাত্যবর্গ এবং

রাজমহিষীদের সঙ্গে নিয়ে ধ্রুবকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। দূরে ধ্রুবকে আসতে দেখে রাজা তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে ছুটে গিয়ে ধ্রুবকে আলিঙ্গন করলেন। পরে ধ্রুব যথারীতি পিতা, মাতা এবং অপর গুরুজনদের প্রণাম করলেন। বিমাতা সুরুচিকে প্রণাম করতে তিনিও সস্নেহে হাত ধরে ধ্রুবকে তুলে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে আশীর্বাদ করলেন—দীর্ঘজীবী হও। এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যিনি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁর কাছে সবাই মাথা নত করে—কেউ তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে পারে না। ধ্রুবকে পেয়ে রাজপরিবারে ও রাজধানীতে আনন্দ-উৎসব চলতে থাকে। ধ্রুবর গুণে সবাই মুগ্ধ। ক্রমে ধ্রুব বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রাজা ভাবলেন—বৃদ্ধ হয়েছি; এখন সংসার ত্যাগ করে শ্রীভগবানের আরাধনা করে জীবন-পাত করতে হবে। তাই তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র ধ্রুবকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে সন্তুষ্ট চিত্তে বনে চলে গেলেন।

ধ্রুব সিংহাসনে আরোহণ করে সকল উপাধিশূন্য সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের প্রতি অচলা ভক্তিভাব অবলম্বন করে নিজের অন্তরে এবং সকল জীবের মধ্যে সেই শ্রীহরিকেই বিরাজমান দেখে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে ধ্রুবর বৈমাত্রেয় ভাই উত্তম, একদিন বনে মৃগয়া করতে গিয়ে এক যক্ষের হাতে প্রাণ হারায়। ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে ধ্রুব শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত চিত্তে যক্ষপুরীতে গিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। মহাশক্তিশালী ধ্রুবের বাণে বহু নিরপরাধ যক্ষ নিহত হয়েছেন দেখে ধ্রুবর পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু ধ্রুবর কাছে এসে বললেন—ধ্রুব, তুমি যে এই সব নিরপরাধ যক্ষদের বধ করতে আরম্ভ করেছ, তা অত্যন্ত অন্যায়—আমাদের বংশের অনুপযুক্ত। একের অপরাধে তুমি বহু যক্ষের প্রাণ নাশ করেছ। তুমি তো দেখছি এই জড় দেহকেই আত্মা মনে করে পশুদের মতোই প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়েছ; এইরকম ব্যবহার ভগবৎ-ভক্ত সাধুদের শোভা পায় না।

সর্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্।
আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্ ॥ ৪-১১-১১॥

তুমি সর্বভূতে আত্মজ্ঞান লাভ করে সকলের মধ্যে শ্রীহরিই অবস্থিত জেনে, পরমপদ, যা অতি দুর্লভ, তা লাভ করেছ; তুমি শ্রীভগবানের সেবক,

ভক্তজনের আদরের পাত্র এবং তুমি সাধু-জনোচিত আচরণ অভ্যাস করেছ; সেই তুমি এমন গর্হিত কাজ কেন করলে?

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু।
সমত্বেন চ সর্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি ॥ ৪-১১-১৩॥

সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, সকল জীবের প্রতি করুণা, বন্ধুত্ব এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করলে, সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবান প্রসন্ন হন। আর শ্রীভগবান প্রসন্ন হলে, পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে যে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, তা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায়। সুতরাং হে ধ্রুব! তুমি যুদ্ধ থেকে বিরত হও।

বিচার করে দেখ, এই যক্ষগণ তোমার ভ্রাতৃহন্তা নয়; কারণ জীবের সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ একমাত্র ঈশ্বর; তিনি সকলের অন্তর্যামী, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের সৃষ্টিকর্তা। তিনি নিজের মায়াশক্তিকে আশ্রয় করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে চলেছেন। অতএব হে ধ্রুব! যাঁকে লাভ করলে এই শত্রু-মিত্র-সংকুল জগৎকে নিতান্ত অসৎ, এর কোন অস্তিত্ব নেই বলে মনে হয়, তুমি আত্ম-দৃষ্টি-পরায়ণ হয়ে সেই নির্গুণ, নিত্যমুক্তস্বরূপ অদ্বিতীয় শ্রীভগবানকেই আশ্রয় কর। শ্রীভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি-পরায়ণ হলে তুমি, 'আমি আমার' রূপ মোহ-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

পিতামহ মনুর উপদেশে ধ্রুব বৈরী ভাব ত্যাগ করলে যক্ষরাজ কুবের এসে ধ্রুবকে বললেন—হে ধ্রুব! তুমি যে মনুর আদেশে ক্রোধ পরিহার করেছ, এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। যক্ষেরা তোমার ভাইকে বধ করেনি, আবার তুমিও যক্ষদের বধ করনি; কারণ জীবের জন্মমৃত্যুর বিধান-কর্তা হচ্ছেন—কাল। অজ্ঞানবশত দেহের প্রতি মমতার জন্য জীবের সংসার-বন্ধন এবং দুঃখ হয়। এই যে 'আমি তুমি' ইত্যাদি জ্ঞান—এ তো মিথ্যা, স্বপ্ন-কালীন জ্ঞানের মতো; ঘুম ভাঙলেই স্বপ্ন-জ্ঞান মিথ্যা হয়ে যায়। সেইরকম আত্মজ্ঞান লাভ হলে জীবের 'আমি আমার' জ্ঞান দূর হয়। অতএব হে ধ্রুব! তোমার মঙ্গল হোক। সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য, সর্বজীবে সমদর্শী, সংসার-বন্ধন মোচনকারী সেই শ্রীভগবানের ভজনা কর। তিনি সগুণ অবস্থায় ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির সাথে যুক্ত থাকেন; আবার নির্গুণ অবস্থায় তিনিই মায়াতীত। সুতরাং একমাত্র তাঁরই আরাধনা কর।

কুবের তখন ধ্রুবকে বর দিতে চাইলে, ধ্রুব বললেন—আপনি আমায় এই বর দিন, যাতে সংসার-সমুদ্রের একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীভগবানের চিন্তায় আমার হৃদয়-মন সদা সর্বদা পূর্ণ থাকে—আমি আর কোন বর চাই না। কুবের তখন সানন্দে ধ্রুবকে তাঁর অভিলষিত বর দান করে স্বধামে চলে গেলেন। ধ্রুবও তখন হৃষ্টচিত্তে তাঁর নিজের রাজ্যে ফিরে এসে যথোচিতভাবে রাজ্যপালন করতে লাগলেন।

বহু বছর রাজ্য শাসন এবং ভোগ করার পর সময় আগত হলে ধ্রুব নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে জগতের সব কিছুই অনিত্য—এই ভাবনা দৃঢ় করে বদরিকাশ্রমে চলে গেলেন। সেখানে ধ্রুব অবিচ্ছিন্ন ভক্তি ধারায় স্নাত হয়ে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ্ হতে লাগলেন; তাঁর 'আমি আমার' চিন্তা একেবারে দূর হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন ধ্রুব দেখলেন একটি উজ্জ্বল রথ আকাশ পথে নেমে এসে, তাঁকে সেই রথে উঠিয়ে আবার ঊর্ধ্বলোকে চলে গেল। মহাপ্রাজ্ঞ সপ্তর্ষিরা পর্যন্ত যে স্থান লাভ করতে পারেননি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র যে স্থানকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করে চলেছেন, সেই রথটি ধ্রুবকে নিয়ে সেই দুর্জয় ভগবৎস্থানে চলে গেল।

ভক্তেরা আজও মেঘশূন্য রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে, সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে দূরে, মহাত্মা ধ্রুবর নামাঙ্কিত একটি নক্ষত্রকে দেখিয়ে বলেন—ঐ সেই ধ্রুবমণ্ডল।

১৩
মহারাজ পৃথুর উপাখ্যান

ভাগবতের চতুর্থ খণ্ডের ১৫ অধ্যায় থেকে ২২ অধ্যায়ের মধ্যে পৃথু চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে; বক্তা মৈত্রেয় মুনি আর শ্রোতা হচ্ছেন বিদুর।

মহারাজ বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী, দুঃশীল এবং অধর্মপরায়ণ ছিলেন। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনসাধারণ ও অমাত্যবর্গ বেণের মৃত্যু কামনা করতে থাকে। বেণকে সৎপথে আনবার জন্য মুনি ঋষিরা তাকে অনেক করে বোঝালেন; কিন্তু বেণ তাদের কথায় কর্ণপাত না করে মুনি ঋষিদের অপমান করে শ্রীভগবানের নিন্দা করতে থাকে। ঋষিরা বুঝলেন যে, এই ব্যক্তি রাজ-সিংহাসনের উপযুক্ত নয়—এর মৃত্যুই শ্রেয়। ঋষিদের অভিশাপে বেণের মৃত্যু হলে অমাত্যবর্গ বেণের দেহজাত বালক পৃথুকে সিংহাসনে বসালেন। পৃথুর শরীরে শুভ লক্ষণসমূহ দেখে ঋষিরা বললেন যে, এর শরীরে যে-রকম সব মঙ্গল চিহ্ন দেখছি , তাতে একে নারায়ণের অংশ-জাত, শ্রীভগবানের অংশাবতার বলে মনে হচ্ছে। এই বালক মহামহিমান্বিত রাজা হয়ে দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করবে।

বালক অবস্থায় পৃথুকে যখন রাজপদে অভিষিক্ত করা হলো, তখন দেশের নিয়মানুযায়ী সূত, মাগধ, বৈতালিক প্রভৃতিরা তাঁর স্তুতিগান করার জন্য রাজসভায় এসে উপস্থিত হলো। পৃথু তখন সেই অল্প বয়সেই , বৈতালিকদের সম্বোধন করে বললেন—তোমরা আমার গুণকীর্তন করতে এসেছ; কিন্তু এখনও পর্যন্ত তো আমার কোন গুণই জগতে প্রকাশিত হয়নি; সুতরাং আমার সম্বন্ধে তোমরা কি স্তব করবে? আর আমি চাই না যে, আমার উদ্দেশ্যে তোমরা যে-সব ভাল ভাল কথা বলবে, তা ভবিষ্যতে মিথ্যা প্রতিপন্ন হোক। সুতরাং এখানে আমার স্তুতি না করে, কোন যোগ্য ব্যক্তির গুণগান করা হোক। তা ছাড়া, যিনি সর্বগুণের আকর, সকল মঙ্গলের অধিকর্তা, সেই ভগবানের গুণকীর্তন করাই তো সকলের উচিত; তাতে সত্য রক্ষা হবে এবং যাঁরা সেই গুণকীর্তন শুনবেন, তাঁরা সকলেই উপকৃত হবেন; সুতরাং অনন্ত-

কীর্তি শ্রীভগবানের গুণগান না করে, আমার মতো অর্বাচীনের স্তবগান করা অত্যন্ত অন্যায়।

প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ।
হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্ ॥ ৪-১৫-২৫ ॥

উদার চরিত্রের লোকেরা ক্ষমতাসম্পন্ন ও খ্যাতিমান হলেও, নিজেদের সম্বন্ধে প্রশংসাবাক্যকে ব্রহ্ম-হত্যারূপ নিতান্ত লজ্জাজনক বলে মনে করেন এবং তার নিন্দা করেন। মহৎ ব্যক্তি কখনও নিজের প্রশংসা নিজে করেন না এবং তা শুনতেও চান না। যাঁরা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা তো এমনিতেই বিনয়ী হন; নিজেদের গৌরব প্রচারে তাঁরা অত্যন্ত পরাঙ্মুখ এবং মিথ্যা প্রশংসাকেও তাঁরা ঘৃণা করে থাকেন।

যদিও পৃথুর বয়স তখন অত্যন্ত কম, তবুও তার এই সব কথা থেকেই তার অন্তরের মহত্ত্ব বোঝা যায়; পৃথুর বিনম্র ব্যবহারই তার ভবিষ্যৎ জীবনের গুণাবলীর কথা সূচিত করে।

রাজ্যভার গ্রহণ করে পৃথু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালন করতে থাকেন। প্রজাদের পালন-পোষণের জন্য তিনি পৃথিবীকে দোহন করেন—অর্থাৎ পৃথিবীকে সমতল করে যাতে পৃথিবী কৃষি উপযোগী হয় তার ব্যবস্থা করেন এবং শস্য, বীজ যোগাড় করে খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। তিনিই প্রথম গ্রাম, নগর, হাট, বাজার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে প্রজাদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা করেন।

মহারাজ পৃথু একবার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার জন্য দীক্ষিত হলেন। এই যজ্ঞে দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, যোগী মহাপুরুষ, দৈত্য, দানব প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন; এই থেকে বোঝা যায় যে, মহারাজ পৃথু প্রবল পরাক্রান্ত এবং অতি বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই তাঁর কাছে পরাভূত হয়েছিলেন। দেবতাদের তিনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং মুনি ঋষিরা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

শ্রীহরির কৃপায় পৃথুর শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ভাবলেন—পৃথুর কীর্তি যে আমাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রের

ভয় পৃথু শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলে, তিনিই ইন্দ্রত্ব পদ লাভ করবেন। তাই পৃথুর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, ইন্দ্র সর্বশেষ যজ্ঞের অশ্বটি হরণ করেন; কিন্তু ইন্দ্র ধরা পড়ে যান। পৃথু তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বধ করতে উদ্যত হলেন। পুরোহিতেরা বললেন—মহারাজ, এই যজ্ঞ এখন চলছে; অতএব শাস্ত্রবিহিত পশুবধ ছাড়া অপর কাউকে বধ করা অনুচিত। সুতরাং আপনার যজ্ঞনাশে উদ্যত ইন্দ্রকে আপনি বধ করবেন না; আমরাই বরং অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন মহামন্ত্র উচ্চারণ করে ইন্দ্রকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেব।

পুরোহিতেরা এইভাবে মহারাজকে আশ্বাস দিয়ে ক্রোধভরে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। পুরোহিতেরা ইন্দ্রকে আহ্বান করে অগ্নিতে আহুতি দিতে যাচ্ছেন, সেই সময় ব্রহ্মা এসে তাদের নিষেধ করে বললেন—তোমরা যাকে বধ করতে যাচ্ছ, এই যজ্ঞের আরাধিত দেবতারা—অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু ইত্যাদি সকলেই ইন্দ্রের অঙ্গ স্থানীয়; সুতরাং ইন্দ্রকে বধ করা তোমাদের উচিত নয়; বিশেষত ইন্দ্র হচ্ছেন শ্রীভগবানেরই অবতার বিশেষ। তা ছাড়া পৃথুর যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য ইন্দ্র যে অধর্ম পথের সৃষ্টি করল, জগতের লোক এই দেখে ঐরকম কপটাচরণ করবে; এতেই তো জগতের মহা অকল্যাণ হলো। ইন্দ্রের সাথে শত্রুতা করলে সে তো আরও অধর্ম পথেরই সৃষ্টি করবে—আরও বেশি অন্যায় করবে। তোমরা যজ্ঞ করছ জগতের কল্যাণের জন্য; কিন্তু সেই যজ্ঞ করতে গিয়ে যদি অধর্ম পথেরই সৃষ্টি হয়, তা হলে সেটা হবে জগতের পক্ষে মহা অমঙ্গল স্বরূপ—তোমাদের যজ্ঞের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং বিপুল-কীর্তি পৃথুর একটি যজ্ঞ না হয় অসম্পূর্ণই থাকল; তাতে পৃথুর কি এল গেল? ৯৯টি যজ্ঞ তো সম্পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া পৃথু তো কোন কামনার বশবর্তী হয়ে যজ্ঞ করছে না; সে তো মোক্ষ ধর্মে অভিজ্ঞ। ব্রহ্মা তখন পৃথুকে সম্বোধন করে বললেন—মহারাজ, ইন্দ্রের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর; সে তোমার আত্মতুল্য; তোমরা দুজনেই শ্রীভগবানের অংশবিশেষ। ব্রহ্মার উপদেশ শুনে পৃথু তখন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করবার আগ্রহ ত্যাগ করে, ইন্দ্রের প্রতি বৈরীভাব পরিহার করলেন।

সমস্ত যজ্ঞের যিনি ফলদাতা, সর্বলোক মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি প্রভু, সেই ভগবান শ্রীহরি এমনিতেই পৃথুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি এখন ইন্দ্রকে নিয়ে পৃথুর কাছে এসে বললেন—এই ইন্দ্র তোমার শতাশ্বমেধ যজ্ঞের

বিঘ্ন করেছে; এর জন্য ইন্দ্র তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে; তুমি একে ক্ষমা কর।

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ।
নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্ ॥ ৪-২০-৩ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে রাজন্! পৃথিবীতে যাঁরা সুবুদ্ধিসম্পন্ন, সদনুষ্ঠানে রত এবং মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ, তাঁরা জানেন দেহ আত্মা নয়; তাই তাঁরা মোহের বশবর্তী হয়ে কোন প্রাণীর অনিষ্ট করেন না।

কিন্তু তোমার মতো মহাপুরুষও যদি ভগবৎ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, ইন্দ্রকে ক্ষমা না করে তার প্রতি বৈরীভাবই পোষণ করে, তা হলে বুঝব, তুমি যে দীর্ঘ দিন ধরে বৃদ্ধদের অর্থাৎ প্রাজ্ঞজনের সেবা করেছ তা তোমার পণ্ডশ্রমই হয়েছে—তোমার চিত্ত শুদ্ধ হয়নি; কারণ যাঁরা আত্মজ্ঞানী, তাঁরা জানেন যে, এই দেহ অবিদ্যার ফলে বাসনারূপ কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে—এই দেহ আত্মা নয়; সুতরাং তাঁরা এই দেহের প্রতি কখনও আসক্ত হন না; আর এই দেহের প্রতি আসক্তিশূন্য হতে পারলে ধীর ব্যক্তি আর কখনও গৃহ, পরিবার, ধন, সম্মান, ইত্যাদির প্রতি মমতাবদ্ধ হন না; দেহের প্রতি আসক্তির জন্যই লোকে অপরের প্রতি বৈরীভাব অবলম্বন করে থাকে।

এই যে আত্মার কথা বলা হয়, এর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ঃ

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
সর্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥ ৪-২০-৭॥

আত্মা একই অবস্থাসম্পন্ন, তার কোন পরিবর্তন হয় না (কিন্তু দেহের বাল্য যৌবন প্রভৃতি অবস্থান্তর হয়); আত্মা দোষরহিত (কিন্তু মল মূত্রাদির দ্বারা দেহ দূষিত); আত্মা স্বপ্রকাশ (আর দেহ হচ্ছে জড়); আত্মা রূপ রসাদি শূন্য (আর দেহ হচ্ছে রূপ রস প্রভৃতি গুণসম্পন্ন); আত্মা হচ্ছে সত্ত্ব, রজ, তম প্রভৃতি গুণের আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ গুণাধীশ (আর দেহ হচ্ছে গুণাধীন); আত্মা সর্বব্যাপী (আর দেহ হচ্ছে ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ); আত্মা অনাবৃত, কোন কিছু দিয়েই তাকে আবৃত করা যায় না (কিন্তু দেহকে বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতির দ্বারা আবৃত করা যায়); আত্মা হচ্ছে সাক্ষী দ্রষ্টা (আর দেহ হচ্ছে দৃশ্য); আত্মা হচ্ছে নিরাত্মা অর্থাৎ অন্য কিছুতে অধিষ্ঠিত নয় (আর দেহ আত্মাতে অধিষ্ঠিত)। অতএব দেখা যাচ্ছে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন।

এখানে আত্মার সাথে দেহের নয়টি প্রভেদ দেখানো হয়েছে। যার এই জ্ঞান হয়েছে যে, দেহ আত্মা নয়, তার আর বিষয়াসক্তি থাকে না; তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সে তখন ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়—মোক্ষ লাভ করে।

শ্রীভগবান পৃথুকে এইভাবে আত্মজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ দিয়ে বললেন—হে বীর পৃথু! তুমি ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করে, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে, নিষ্কামভাবে তোমার কর্তব্য কর্ম অর্থাৎ প্রজাদের পালন কর; তাতেই তুমি পরম শান্তি, পরম পদ লাভ করবে। তোমার মতো সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অপরের সাথে বিবাদ-বিসম্বাদ নিয়ে থাকা শোভা পায় না। তোমার স্বভাব এবং গুণের জন্য আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি আমার কাছে যথা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।

মহারাজ পৃথু তখন শ্রীভগবানের সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে, প্রেমাশ্রু-ধারায় সিক্ত হয়ে বলতে লাগলেন ঃ

> বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্।
> যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ॥
> ৪-২০-২৩॥

হে বিভু! আপনি হচ্ছেন বরদেশ্বর; ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা, যাঁরা ভক্তদের বর দান করে থাকেন, আপনি তাঁদেরও ঈশ্বর। সুতরাং আপনার কাছে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কি কখনও অহঙ্কার প্রভৃতি গুণের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত অর্থাৎ দেহাভিমানী ব্যক্তিদের মতো ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা করতে পারে? হে মুক্তিদাতা পরমেশ্বর! যে-সব বর অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু, নরকবাসীদেরও কাম্য, আমি অজ্ঞান হলেও সে-সব প্রার্থনা করি না।

> ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
> মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥
> ৪-২০-২৪॥

আগের শ্লোকে ভগবানকে কৈবল্যপতি—মুক্তিদাতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে; এতে মনে হতে পারে যে পৃথু বুঝি মুক্তিই প্রার্থনা করছেন। সেইজন্য এই শ্লোকে পৃথু স্পষ্ট করেই বলছেন—মোক্ষ অবস্থাতেও যদি মহাপুরুষদের হৃদয়-নিঃসৃত আপনার পাদপদ্মের গুণকীর্তন-রূপ কথামৃত লাভ করা না যায়, তবে আমার সেরকম মোক্ষ চাই না। তাহলে পৃথু কি চান? বলছেন—

আপনি আমায় অসংখ্য কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয় দান করুন, যাতে প্রাণ ভরে আপনার গুণ কথা শুনতে পারি—মাত্র দুটি কানে আপনার গুণকথা শুনে তৃপ্তি পাচ্ছি না; সুতরাং আমায় অজস্র শ্রবণেন্দ্রিয় দান করুন—প্রাণ ভরে আপনার কথা শুনি; এইটিই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ বর হবে। সব শেয়ালের একই রা! শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন ঃ

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃশাম্॥
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥

বিদগ্ধ মাধব, ১-৩৩॥

"কৃষ্ণ"—এই দুটি বর্ণ যদি মুখে তাণ্ডবিনী হয় অর্থাৎ উচ্চারিত হয়, তবে বহু বহু মুখের জন্য বাসনা হয় অর্থাৎ বহু মুখে এই কৃষ্ণ নাম করার ইচ্ছা হয়। এই বর্ণ দুটি যদি কর্ণক্রোড়ে অঙ্কুরবতী হয় অর্থাৎ এই নাম যদি কর্ণে প্রবেশ করে, তবে দশ কোটি কর্ণের ইচ্ছা হয়; আর যদি চিত্তপ্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয় অর্থাৎ মনোমধ্যে এই কৃষ্ণ নামের স্ফুরণ হয়, তবে সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের পরাজয় ঘটে—অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে যায়। জানি না কত অমৃত দিয়ে এই দুটি বর্ণ তৈরি হয়েছে।

পৃথু আরও বললেন—হে অনন্তকীর্তিমান! সাধুদের মুখ থেকে কেউ যদি একবারও কোনরকমে আপনার মঙ্গলময় কীর্তিকথা শ্রবণ করে এবং সে ব্যক্তি যদি নিতান্তই পশুপ্রকৃতির না হয়, যদি গুণজ্ঞ হয়, তবে সে কেমন করে আপনার গুণকথা শ্রবণে বিরত হবে? সে আপনার গুণকীর্তন সর্বদাই শুনতে চাইবে; কারণ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত সকল প্রকার শ্রেয় লাভের ইচ্ছায় আপনার কীর্তিকথা শুনতে চেয়েছিলেন।

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ ন বিদ্মহে ॥ ৪-২০-২৯॥

আপনি দীনবৎসল, সেইজন্য বাসনা-কামনারহিত সাধু মহাত্মারা জ্ঞান লাভের পরেও আপনার ভজনা করেন; কারণ মায়াজনিত অহঙ্কার দ্বারা যে বিভ্রমের সৃষ্টি হয়, তা আপনাতে নেই। সেইজন্য নিষ্কাম সাধকেরা আপনার শ্রীচরণের ধ্যান ছাড়া অন্য কোন ফলই দেখতে পান না—অর্থাৎ আপনার শ্রীচরণের ধ্যান করতে পারলেই তাঁরা যথেষ্ট লাভবান হলেন বলে মনে করেন। তাই তাঁরা আর অন্য কিছুই কামনা করেন না। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম সাধকেরা জ্ঞানলাভের পরেও আপনার ভজনা করে থাকেন; কারণ আপনার শ্রীচরণ ধ্যানের চেয়েও বড় কিছু প্রাপ্তব্য যে থাকতে পারে, তা তাঁরা জানেন না। ভাগবতে অন্যত্র রয়েছে—যাঁরা আত্মারাম ব্রহ্মমননশীল, তাঁরা সমস্ত রকমের বিধি-নিষেধের পারে গিয়েও, কোন কিছু করণীয় না থাকলেও কিন্তু শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিভাব অবলম্বন করে থাকেন—ভগবানের গুণকীর্তন ও তাঁর ধ্যান করেন। কেন করেন? শ্রীভগবানের এমনই গুণ—এমনই আকর্ষণ যে, মুনিরাও তাঁকে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন।

মহারাজ পৃথু শ্রীহরিকে আরও বললেন ঃ

> মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং
> বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ।
> বাচা নু তন্ত্যা যদি তে জনোঽসিতঃ
> কথং পুনঃ কর্ম করোতি মোহিতঃ ॥ ৪-২০-৩০॥

আপনি ভক্তদের এই যে বলেন 'বর গ্রহণ কর'—আপনার এই রকম কথা আমার মনে হয় জগতের মোহ উৎপাদন করে, মানুষের বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয়। আপনার এইরকম বাক্যরূপ রজ্জুর দ্বারা যদি লোকেরা বদ্ধ না হতো, আপনার এইরকম কথায় যদি লোকেরা মোহিত না হতো, তবে ফলের লোভে উদ্ভ্রান্ত হয়ে তারা আপনার কাছে বর চাইবে কেন এবং বার বার কর্ম করে অশেষ দুঃখ ভোগ করবে কেন?

পৃথু বলছেন—আপনি আমাকে বর চাইতে আদেশ করেছেন; কিন্তু আমি তো কোন বর চাই না; অজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনারই মায়ার বশে তুচ্ছ ভোগ্যবস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বর প্রার্থনা করে; দয়া করে আমাকে আর আপনি মায়া-

রজ্জুতে বদ্ধ করবেন না। আপনি যে ভক্তদের বর দেবার লোভ দেখান এবং তাদের ভোগ করতে অনুপ্রাণিত করেন—এটা কিন্তু আপনার শোভা পায় না। যারা অজ্ঞ, তারা তো আপনারই মায়ার প্রভাবে সত্যস্বরূপ আপনার কাছ থেকে বহু দূরেই অবস্থান করে। কারণ তারা আপনাকে ছেড়ে, জগতের অন্য সব জিনিস—স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন ইত্যাদি কামনা করে থাকে। তাই বলে কি আপনিও তাদের প্রতি বিমুখ হবেন? তাই বলছি—পিতা যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পুত্রের কল্যাণ করে থাকেন, আপনিও তেমনি বিনা কারণেই আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। বর দিয়ে আর ভোগে লিপ্ত করবেন না। যদি একান্তই বর দিতে হয় তবে এই বর দিন যাতে আপনার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়।

পৃথুর স্তব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীভগবান বললেন—হে রাজন্! আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হোক। তোমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আমার সম্বন্ধে তোমার এইরকম জ্ঞান হয়েছে; এইরকম জ্ঞানের দ্বারাই ধীর ব্যক্তিরা আমার দুর্জয় মায়াকে অতিক্রম করে থাকে। এইভাবে পৃথুর প্রতি অনুগ্রহ করে শ্রীভগবান স্বস্থানে চলে গেলেন।

শ্রীভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির জন্য, মহারাজ পৃথুর মন বৈরাগ্য-ভাবে পূর্ণ থাকত। শ্রীভগবানের উপদেশে পৃথু বুঝেছিলেন যে, শ্রীভগবানের প্রতি মন স্থির রেখে নিরাসক্তভাবে কর্তব্য কর্ম করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং সেইজন্য তিনি সংসার-সুখে বীতরাগ হয়ে রাজ্য শাসন করতেন।

রাজ্য শাসন বিষয়ে মহারাজ পৃথুর এমনই বিচক্ষণতা ছিল যে, অপর সমস্ত রাজারা তাঁরই আদেশ মেনে চলতেন। ন্যায় এবং ধর্মের প্রতি অবিচল থেকে নিষ্কামভাবে তিনি প্রজাদের পালন পোষণ করতেন—কখনও আসক্তির বশে কোন কাজ করতেন না।

কর্ম দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম কর্ম। আমরা যে ভোগ করি, তা প্রায় সবই প্রারব্ধ—পূর্ব কর্মের ফল। এইভাবে ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম—পাপ অথবা পুণ্যফল ক্ষয় হয়। কিন্তু সকাম কর্মে আবার নতুন করে কর্মফল সঞ্চিত হতে থাকে। সুতরাং কর্মের দ্বারা কর্ম-স্রোতকে রোধ করা যায় না; ফলে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহও চলতে থাকে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করলে নতুন করে আর কর্মফল সঞ্চিত হয় না। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগের দ্বারাই ক্ষয়

হবে। সুতরাং প্রারব্ধ ক্ষয় হলেই কর্মস্রোতরূপ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যাবে; তখন জ্ঞান অথবা ভক্তির চরম অবস্থায় পৌঁছানো যায়।

যজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য প্রজাদের যা করা উচিত, সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া রাজার অবশ্য কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে মহারাজ পৃথু একবার একটি মহাযজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি উপস্থিত সকলকে অতি সুন্দরভাবে নিজের নিজের কর্তব্য-কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। মহারাজের যুক্তি এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনে উপস্থিত মুনিঋষি এবং প্রজাবৃন্দ সবাই মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। সেই সময় সূর্যের মতো তেজস্বী চার জন মুনি—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—আকাশ পথে সেই যজ্ঞ সভায় এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ পৃথু তখন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে যথোচিত পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে বললেন ঃ

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ।
যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্ দুর্দর্শানাঞ্চ যোগিভিঃ॥ ৪-২২-৭॥

হে মুনিগণ! আপনারা সাক্ষাৎ মঙ্গলময়; মঙ্গলময় স্থানেই আপনাদের যাতায়াত। আহা! আমি যেন কতই মঙ্গল আচরণ করেছি যাতে আজ আপনাদের দর্শন লাভ হলো! আপনাদের দর্শন যোগিদের পক্ষেও দুর্লভ। তাই বলছি, কত ভাগ্যেই না আজ আপনাদের দর্শন লাভ হলো। আপনাদের আর কুশল প্রশ্ন কি করব? আপনারা সর্বদাই তো পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন; আনন্দস্বরূপ মঙ্গলময়ের চিন্তায় যাঁরা সদাই বিভোর, তাঁদের আবার অমঙ্গলের আশংকা কোথায়?

আপনারা এই যজ্ঞস্থলে এসেছেন; সুতরাং সকলের মঙ্গলের জন্য আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি যাতে আপনাদের মুখ থেকে শুনে সকলে কৃতকৃতার্থ হতে পারে।

তদহং কৃতবিশ্রম্ভঃ সুহৃদো বস্তপস্বিনাম্।
সংপৃচ্ছে ভব এতস্মিন্ ক্ষেমঃ কেনাঞ্জসা ভবেৎ॥ ৪-২২-১৫॥

আপনাদের প্রতি আমরা দৃঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন; আপনারা সংসার-তপ্ত জনের

পরম হিতৈষী; তাই জিজ্ঞাসা করছি, এই সংসারে কেমন করে অনায়াসে মঙ্গল লাভ হতে পারে?

ঋষি চারজনকে যজ্ঞস্থলে দেখে মহারাজ পৃথু তাঁদের প্রশ্ন করলেন—সংসারে তো দেখছি সবাই ইন্দ্রিয়সুখের জন্য লালায়িত; ফলে কেউ-ই পরমার্থ সম্বন্ধে ভাবে না; আর অতি অল্প সংখ্যক লোক, যারা পরমার্থ বিষয়ে ভাবে তারাও জানে না, কেমন করে যথার্থ মঙ্গল হবে অর্থাৎ এই দুঃখময় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। এই তো মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন—কিভাবে ভবসাগর পার হওয়া যাবে—কিভাবে জ্ঞান লাভ হবে, ভক্তি লাভ হবে। পৃথু আরও বললেন—ভক্তেরা ভগবানকে ভালবাসেন এবং ভগবানও ভক্তের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন; তাই শ্রীভগবান জগতের কল্যাণের জন্য আপনাদের রূপ ধারণ করে জগতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং কিসে ভক্তি লাভ হবে, কেমন করে ভবসাগর পার হওয়া যাবে—তাই দয়া করে আমাদের বলুন।

মহাত্মা পৃথুর এই সারগর্ভ প্রশ্ন শুনে সনৎকুমার মৃদু হাস্য করলেন; তিনি পৃথুর মনোভাব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন। মহারাজ পৃথুর মতো জ্ঞানী ও ভক্তিমানের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর যে অজানা নয়, তা তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তবে যে পৃথু এই প্রশ্ন করলেন, তার কারণ হলো এই প্রশ্নের দ্বারা সর্বকালের মানুষের উপকার হবে। তাছাড়া অসাধারণ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদের মুখ থেকে শুনলে, সকলেই তা শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করবে এবং নিজের নিজের জীবনে সেইসব উপদেশ প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। তাই পৃথুর প্রশ্ন অত্যন্ত সংগত এবং লোকের মহাকল্যাণকারী। মহাত্মা সনৎকুমার তাই পৃথুর প্রশংসা করে বললেন ঃ

সাধু পৃষ্টং মহারাজ সর্বভূতহিতাত্মনা।
ভবতা বিদুষা চাপি সাধূনাং মতিরীদৃশী ॥ ৪-২২-১৮॥

সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য এই যে প্রশ্ন করলে, তা অত্যন্ত সমীচীন হয়েছে; সাধু লোকের বুদ্ধিবৃত্তি এইরকমই হয়ে থাকে; অপরের কল্যাণের জন্যই তারা সব কিছু করে থাকেন।

সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ।
যৎ সম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সর্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥ ৪-২২-১৯॥

সনৎকুমার বললেন—সাধু ব্যক্তিরা যখন একত্রিত হন, তখন তা সকলের পক্ষেই মঙ্গলকারক হয়; কারণ তাদের মধ্যে পরস্পরের যে প্রশ্নোত্তর কথালাপ হয়, তাতে প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাতা এবং শ্রোতারা—সবাই উপকৃত হয়। সনৎকুমার এইবার পৃথুর প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—তুমি প্রশ্ন করেছ—এই সংসারে কিসে মঙ্গল হবে। শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, দেহাদির প্রতি অনাসক্তি এবং পরব্রহ্ম-স্বরূপ আত্মার প্রতি প্রবল আসক্তি, তীব্র অনুরাগ—এই তো যথার্থ মঙ্গলের কারণ। ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ। 'আমি আমার' নিয়েই তো সংসার; সুতরাং এই 'আমি আমার' ভাব, অহংভাব ত্যাগ করতে পারলেই যথার্থ মঙ্গল হবে। এখন প্রশ্ন হলো—দেহের প্রতি অনাসক্তি, অহংভাব ত্যাগ এবং আত্মার প্রতি আসক্তি কেমন করে হতে পারে? এর উত্তরে সনৎকুমার বললেন ঃ

সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্মচর্যয়া জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ ॥
৪-২২-২২॥

শ্রদ্ধা, ভাগবত-ধর্মের অনুষ্ঠান, আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা, আধ্যাত্মিক যোগ-সাধনায় নিষ্ঠা, ভগবানের আরাধনা এবং সর্বদা পুণ্যকীর্তি শ্রীভগবানের পবিত্র কথা আলোচনার দ্বারা আত্মাতে রতি এবং দেহাদিতে অনাসক্তি জন্মে।

শ্রদ্ধা বলতে শাস্ত্র ও গুরু বাক্যে বিশ্বাস বোঝায়। আধ্যাত্মিক জীবন এই শ্রদ্ধা দিয়েই আরম্ভ হয়। ভগবানের প্রীতির জন্য ধর্মানুষ্ঠান, তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা, যোগ সাধনায় নিষ্ঠা, শ্রীভগবানের আরাধনা এবং সর্বদা পুণ্যকীর্তি শ্রীহরির পবিত্র কথালাপের দ্বারা আত্মাতে আসক্তি এবং দেহাদিতে অনাসক্তি জন্মে। এই যে এখানে শ্রদ্ধা, ভগবানের প্রীতির জন্য ধর্মানুষ্ঠান, যোগ সাধনা, ভগবানের আরাধনা, ভগবানের পবিত্র লীলা কথার আলোচনা ইত্যাদি বলা হলো, এইগুলো হচ্ছে অন্তরঙ্গ সাধন।

অহিংসয়া পারমহংস্যচর্যয়া স্মৃত্যা মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা।
যমৈরকামৈর্নিয়মৈরনিন্দয়া নিরীহয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ॥
৪-২২-২৪॥

অহিংসা, নিবৃত্তি, আত্মকল্যাণের অনুসন্ধান, ভগবানের লীলামৃত পানে ব্যাকুলতা, সংযম, বাসনা-ত্যাগ, শৌচাদি নিয়মপালন, অপরের নিন্দা না করা, স্পৃহা-শূন্যতা এবং শীতোষ্ণাদি সহ্য করা—এইসবের দ্বারা ভগবানে অনুরাগ এবং বিষয়ে বিরাগ জন্মে।

হিংসারহিত অবস্থা, পরমহংসেরা যেরকম আচরণ করেন অর্থাৎ নিবৃত্তি-পরায়ণতা, আত্মহিতের অনুসন্ধান, ভগবানের লীলামৃত শ্রবণে ব্যাকুলতা, সংযম, বাসনা-ত্যাগ, শৌচাদি নিয়মপালন, কারুর নিন্দা না করা, স্পৃহাশূন্যতা এবং শীত উষ্ণাদি সহ্য করা—এইসবের দ্বারা অনাত্ম বস্তুতে বিরাগ এবং আত্মাতে অনুরাগ জন্মে। এখানে যেসব উপায়ের কথা বলা হলো, যোগশাস্ত্রে সেগুলোকেই অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়েছে (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি)।

এই যে শ্লোকে অহিংসা, যম, নিয়ম, অকাম, তিতিক্ষা ইত্যাদি বলা হলো, এইগুলোকে বহিরঙ্গ সাধন বলে; আর ভগবৎ-উপাসনা, লীলা শ্রবণ ও কীর্তন ইত্যাদি হলো অন্তরঙ্গ সাধন। তা যাই হোক, বহিরঙ্গ সাধনের অভ্যাস করলে অন্তরঙ্গ সাধন তখন সহজ হয়ে যায়; আবার অন্তরঙ্গ সাধন করলে, বহিরঙ্গ সাধন—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি আপনা আপনিই হয়ে যাবে। এই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন—এরা একে অপরের পরিপূরক।

শ্রবণ-সুখদায়ক, শ্রুতি-মধুর, শ্রীভগবানের গুণ কীর্তন বার বার শুনতে শুনতে এবং প্রবল ভক্তির দ্বারা কার্যকারণাত্মক এই দেহের প্রতি বৈরাগ্য এবং পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ জন্মে। যখন পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ হয়, তখন তীব্র জ্ঞান ও বৈরাগ্যের ফলে, সে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করে। তখন তার অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ-শরীর, যা জীবের স্বরূপকে ঢেকে রাখে, সেই সর্ব দুঃখের আকর, অহঙ্কার বাসনাশূন্য হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে! সাধক তখন জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সেই লিঙ্গ-শরীরকে, অহংকে দগ্ধ করে ফেলে। অহঙ্কার দগ্ধ হয়ে গেলে, তখন আর সাধকের কর্তৃত্বাভিমান থাকে না; আগে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে ভেদ-বুদ্ধির জন্য সাধকের যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থাও চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ শ্রীভগবানের গুণগান করতে করতে পরমাত্মায় অনুরাগ জন্মে; ফলে অন্য সব বিষয়েই বিরাগের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় সাধক গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়। অহঙ্কার-মুক্ত হলে 'আমি আমার' রূপ মিথ্যা অভিমান ত্যাগ হয়ে চির আনন্দ, চির শান্তি লাভ করে।

সনৎকুমার পূর্ণ জ্ঞানী এবং মহাভক্ত। তিনি বললেন, জ্ঞান এবং ভক্তি—এই দুই পথের সাধনাতেই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হতে পারে; কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ভক্তি পথই সহজ।

যস্মিন্নিদং সদসদাত্মতয়া বিভাতি
মায়া বিবেকবিধুতি স্রজি বাঽহিবুদ্ধিঃ।
তং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধতত্ত্বং
প্রত্যূঢ়কর্মকলিলপ্রকৃতিং প্রপদ্যে ॥ ৪-২২-৩৮ ॥

মালাতে যে সর্প-বুদ্ধি হয় তা জ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হয়—মালার জ্ঞান হলেই সর্প ভ্রম দূর হয়। সেইরকম এই মায়াময় বিশ্ব, যা ভগবানকে আশ্রয় করে কার্য কারণ প্রভৃতি নানাভাবে প্রতীয়মান হয় এবং কর্ম-মলিন প্রকৃতিকে যিনি অভিভূত করে রাখেন, সেই নিত্যমুক্ত, নির্মল, সত্য-স্বরূপ শ্রীভগবানের আমি শরণ নিলাম।

জ্ঞানীরা বলেন যে, মালার জ্ঞান হলেই সর্প ভ্রম দূর হয়। এখানে বলা হচ্ছে, শ্রীভগবানে অধিষ্ঠিত বলেই এই কার্যকারণাত্মক মায়াময় বিশ্বকে আমরা দেখে থাকি এবং ভ্রম সৃষ্টিকারী মায়াকে ভগবান বশীভূত করে রাখেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান যিনি বিশ্বের মূল কারণ, তিনি মায়ার বশীভূত হন না; কিন্তু অপর সকলেই এই মায়ার জন্য এই ভ্রমাত্মক বিশ্ব দেখে থাকে। সুতরাং মালাকে জানলে যেমন সর্প ভ্রম দূর হয়, সেইরকম ভগবানকে জানলে এই 'আমি আমার' রূপ জগৎ-ভ্রম দূর হবে; তাই শ্রীভগবানকে জানবার জন্য তাঁরই শরণ নিতে হবে।

যৎ পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥ ৪-২২-৩৯॥

ভক্তজন যাঁর পাদপদ্মের আঙুলের"সৌন্দর্য"চিন্তা করেই, কর্মের দ্বারা গ্রথিত অহঙ্কার-রূপ হৃৎগ্রন্থিকে অনায়াসে উৎপাটিত করেন, সেইরকমভাবে অর্থাৎ অত সহজে, বিষয়-নিবৃত্ত সংযতেন্দ্রিয় যতিগণও কর্মপাশ ছেদন করতে পারেন না। অর্থাৎ শ্রীভগবানের পাদপদ্মচিন্তা করে মানুষ যত সহজে অহঙ্কার

মুক্ত হয়, তত সহজে জ্ঞান ও যোগের সাধনায় অহং-মুক্ত হওয়া যায় না। সুতরাং হে মহারাজ ! আপনি শরণাগত-বৎসল ভগবান শ্রীবাসুদেবের ভজনা করুন।

এখানে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার স্পষ্টই বলছেন—জ্ঞান-পথের সাধন অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার চেয়ে মোহান্ধ মানুষের পক্ষে ভক্তিযোগের সাধনা অর্থাৎ সগুণ সাকারের উপাসনা সহজসাধ্য।

সনৎকুমার আরও বললেন—সংসার-তারণকারী শ্রীভগবানকে যারা আশ্রয় করে নি, সেইসব সাধকদের পক্ষে এই সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টকর; কারণ তারা কষ্টসাধ্য যোগাভ্যাসের দ্বারা ষড়রিপুকে জয় করে এই সংসার-সমুদ্র পার হতে চায়। তাই বলছি—হে মহারাজ, সকলের যিনি আরাধ্য দেবতা, সেই ভগবান বাসুদেবের পাদপদ্মকে নৌকা-রূপে অবলম্বন করে এই দুস্তর ভব-সাগর অনায়াসে পার হয়ে যান। মূল কথা হলো এই—আত্মজ্ঞান লাভের, মুক্তি লাভের বহু উপায় আছে বটে—কিন্তু সবই কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ ; একমাত্র ভক্তিভাব অবলম্বন করে শ্রীভগবানের আরাধনা করলেই, ভক্তি এবং মুক্তি দুইই অনায়াসে লাভ করা যায়।

পূর্ণ জ্ঞানী সনৎকুমার , মহারাজ পৃথুকে ভক্তি তত্ত্বের এইসব উপদেশ দিলে পর মহারাজ জোড় হাত করে তাঁদের বললেন—শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় আমাদের সকলকে অনুগ্রহ করার জন্য আপনারা এখানে এসে এই সব অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ দিলেন; কিন্তু আমার তো আপনাদের দেবার মতো কিছু নেই। কারণ যজ্ঞের সময় দক্ষিণাস্বরূপ আমি, আমার রাজ্য, সম্পদ, দেহ—সব কিছুই সাধু মহাত্মাদের দান করেছি। তাঁরা আমার সেই দান গ্রহণ করে তাঁদের প্রসাদস্বরূপ সেইসব আমায় প্রত্যর্পণ করেছেন। সুতরাং আপনাদের আমি কি দেব? আপনারা বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েও শ্রীভগবানে ভক্তি লাভই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা আমাদের বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আপনারা দীনজনের উদ্ধারের জন্যই কৃপা করে পৃথিবীতে বিচরণ করে থাকেন; আপনাদের সেই লোকোদ্ধারের কাজ আপনারা সার্থকভাবেই আজ সম্পন্ন করেছেন—এতেই আপনারা প্রীত হোন। একমাত্র জোড় হাতে প্রণাম করা ছাড়া, আপনাদের প্রত্যুপকার করার সাধ্য আমার অথবা অপর

কারুরই নেই। পৃথুর এই বাক্য-পূজায় পরম প্রীত হয়ে ঋষিরা তখন সর্বজন সমক্ষেই আবার আকাশ পথে চলে গেলেন।

মহারাজ পৃথু যদিও গৃহস্থাশ্রমেই ছিলেন, তবুও তিনি অহঙ্কার শূন্য হয়ে সকল কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করে নিরাসক্তভাবে রাজ্য শাসন করতেন। তিনি ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা; পৃথিবী থেকে সম্পদ আহরণ করে তিনি রাজ্যের উন্নতি এবং প্রজাদের কল্যাণের জন্যই তা ব্যয় করতেন; এইভাবে তিনি বহু নগর, গ্রাম, জলাশয়, রাস্তা ইত্যাদি তৈরি করে জন-সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেন। প্রজারাও তাঁকে দেবতার মতোই সম্মান করতেন। সর্বগুণের আকর মহারাজ পৃথুর সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে ঃ

> তিতিক্ষয়া ধরিত্রীব দ্যৌরিবাভীষ্টদো নৃণাম্।
> বর্ষতি স্ম যথাকামং পর্জন্য ইব তর্পয়ন্॥ ৪-২২-৫৭॥

মহারাজ পৃথু ছিলেন ক্ষমা গুণে পৃথিবী সদৃশ; লোকের অভীষ্ট সিদ্ধিতে, বাঞ্ছিত ফল দানে তিনি ছিলেন স্বর্গের মতো এবং মেঘের মতো তিনি লোকের তৃপ্তি বিধান করে তাদের আশানুরূপ ধন দান করতেন।

এইভাবে বহুকাল রাজ্য পালন করার পর পৃথু একদিন ভাবলেন—শ্রীভগবানেরই আদেশে নিরাসক্ত চিত্তে ভগবানে কর্মফল সমর্পণ করে এত বছর ধরে রাজ্য পালন করলাম। আমি তো তাঁর কাছে শুধু ভক্তিই চেয়েছিলাম এবং তিনিও কৃপা করে আমার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন; কিন্তু ভক্তির পরাকাষ্ঠা যে সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবা, তার জন্য তো তিনি এখনও আমায় টেনে নিলেন না; তবে কি আমার চিত্ত-মালিন্য এখনও দূর হয়নি? আর যদি তাই হয়ে থাকে, তবে সংসারের মধ্যে থেকে কঠোর সাধনা করে যে চিত্তমালিন্য দূর করব—তাও তো সম্ভব নয়। সুতরাং এখন আমার পক্ষে সব কিছু ত্যাগ করে, বানপ্রস্থ অবলম্বন করে একান্তে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করাই শ্রেয়। এইভাবে চিন্তা করে মহারাজ পৃথু পুত্রদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে বনে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কখনও নিরাহারে, কখনও অর্ধাহারে, তন্মনস্ক হয়ে সমাহিত চিত্তে শ্রীভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর অবিদ্যা-জনিত দেহবুদ্ধি দূর হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ

হলো—তিনি পরম শান্তি পরম আনন্দ লাভ করে শ্রীভগবানের চির-সান্নিধ্য লাভ করলেন।

আদিরাজ পৃথু শ্রীভগবানেরই বিগ্রহ-বিশেষ ছিলেন; ভগবানের আদেশেই তিনি নিরাসক্তভাবে রাজ্য শাসন করেছেন এবং ভগবানের ইচ্ছাতেই তিনি জ্ঞান ও ভক্তির চরম উৎকর্ষ জীবনে ফুটিয়ে তুলেছেন—সর্বকালের মানুষেরই কল্যাণের জন্য।

মহামুনি মৈত্রেয় বিদুরকে এই পৃথু চরিত্র শুনিয়ে বললেন—হে বিচিত্রবীর্য-নন্দন বিদুর ! এই যে আমি তোমার কাছে পৃথু-চরিত্র কীর্তন করলাম, এই পবিত্র কাহিনী যে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ অথবা শ্রবণ করবে, সেও মহাত্মা পৃথুর গুণাবলী লাভ করে শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করবে।

১৪
প্রহ্লাদ-চরিত্র

আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগে দেশের মানুষ এখনকার মতো সংঘবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষ তখন ছোট ছোট বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারতে কৃষ্টি, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম-জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতির গবেষণা এবং তার প্রচার কেমন করে সম্ভব হতো? এখনকার মতো তখন তো সমাজগৃহ, বক্তৃতামঞ্চ এসব কিছু ছিল না। সাধারণত সেই সময় যখন কোথাও বড় রকমের যাগ-যজ্ঞ, উৎসব প্রভৃতি হতো তখন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে জ্ঞানী, গুণী, মুনিঋষিরা আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। সেইসব মহতী সভায় দেশের সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম-জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ আলোচনা হতো। যাঁরা এইসব সভায় যোগ দিতেন, তাঁদেরই মারফত দেশের জনসাধারণ এইসব তত্ত্ব জানতে পারত।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত, মুনিঋষি প্রভৃতিরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। সবাই যথাযোগ্য স্থানে বসে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখছিলেন। যজ্ঞের শেষে একটি নিয়ম আছে যে, উপস্থিত লোকেদের মধ্যে যিনি সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁকে একটি বিশেষ অর্ঘ্য দিতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এই অর্ঘ্য কাকে দেওয়া হবে? কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম বললেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এখানে উপস্থিত রয়েছেন; তিনি সর্বলোকমান্য, তিনিই সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং এই অর্ঘ্য একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। ভীষ্মের কথা শুনে চেদিরাজ শিশুপাল প্রথমে ভীষ্মকে কিছুটা তিরস্কার করে সেই সভার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন। এই শিশুপাল হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণেরই পিসতুতো ভাই; প্রথম থেকেই শিশুপাল ছিল ঘোর কৃষ্ণ-বিদ্বেষী। শিশুপালের মা ছেলের স্বভাব চরিত্র জেনে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন—তুমি আমার ছেলের অপরাধ ক্ষমা করো। শ্রীকৃষ্ণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—আমি ওর শত অপরাধ ক্ষমা করব। সেই শিশুপাল সারাটা জীবন শ্রীকৃষ্ণের সাথে শত্রুতা করেছে, অযথা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করেছে। এই রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের কৃষ্ণ-বিদ্বেষ

একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়; শত অপরাধের চেয়েও বেশি অপরাধ সে করেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ ঐ সভার মধ্যেই শিশুপালকে বধ করেন। সভাস্থ সকলে দেখলেন যে, শিশুপালের শরীর থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মিলিয়ে গেল—শিশুপাল পরম গতি, কৃষ্ণ-সাযুজ্য লাভ করল। এই না দেখে উপস্থিত সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন—যে শিশুপাল সারাটা জীবন শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা এবং বিদ্বেষাচরণ করেছে, তার তো নরক-বাসই হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তা না হয়ে, শ্রীভগবানের একান্ত ভক্তের পক্ষেও যা দুর্লভ, সেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্য লাভ, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বাস কেমন করে সম্ভব হতে পারে? উপস্থিত সকলের হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির ত্রিকালদর্শী দেবর্ষি নারদকে এই প্রশ্নের সমাধান করতে অনুরোধ করলেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন—এই যে, আমরা নিন্দা, স্তুতি, সম্মান, অপমান—এইসব বলি, এইগুলি অনুভব করছে কে? দেহাভিমানী ব্যক্তি অজ্ঞানবশতই এইসব অনুভব করে অর্থাৎ নিজের নিন্দা শুনলে রাগ হয় আবার প্রশংসা শুনলে আনন্দ হয়; এইগুলো দেহের ধর্ম—আত্মার নয়। আত্মাকেই দেহ মনে করে লোকে 'আমি আমার' করে থাকে এবং তারই ফলে মনে করে—এ আমার শত্রু, একে বধ করব; এ আমার মিত্র, একে আমি সাহায্য করব ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীভগবানে এইরকম দেহাভিমান নেই বলে, তাঁর ঐরকম ভেদ বুদ্ধিও নেই। সুতরাং নিন্দা, স্তুতিতে তিনি বিক্ষুব্ধ হন না এবং তাঁর পক্ষে অপরকে হিংসা করাও সম্ভবপর নয়। তবে যে দেখা যায়, তিনি অসুর বধ করছেন? হ্যাঁ, কিন্তু এটা অসুরদেরই কল্যাণের জন্য। ভগবানের দেহাভিমান নেই বলে নিন্দাতে তাঁর কোন প্রকার বৈষম্য হয় না।

> তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
> স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥ ৭-১-২৫॥

অতএব শত্রুভাবেই হোক অথবা বন্ধুভাবেই হোক, ভয়েই হোক অথবা স্নেহেই হোক কিংবা কামভাবেই হোক—যে-কোনভাবে ভগবানে মনঃসংযোগ করতে পারলেই, আর ভগবানে কোনরকম বৈষম্য দেখা যাবে না। ভগবানের চিন্তা করে সে নিন্দা করার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানে সাযুজ্য, তাঁর সান্নিধ্যলাভ করে। সুতরাং শত্রু, মিত্র, ভয়, স্নেহ, কাম—এর যে-কোন

একটিকে অবলম্বন করে ভগবানে মনঃসংযোগ করলেই সাযুজ্য-মুক্তি লাভ হয়। যেমন আরসোলা ভয়ে কাঁচপোকার চিন্তা করে কাঁচপোকাই হয়ে যায়। গভীর চিন্তা, গভীর ধ্যানের ফল এই যে, ধ্যানকারী ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

এই যে বলা হলো, ভগবানের সঙ্গে শত্রুতা করে তাঁকে হিংসা করে অথবা কামভাবে তাঁকে লাভ করা যায়—এটা কি একটা কথার কথা মাত্র, না এর কোন নজির আছে? উত্তরে বলা হচ্ছে ঃ

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৭-১-৩০॥

যে-কোনভাবে ভগবানে মনঃসংযোগ করতে পারলেই তাঁকে লাভ করা যায়। উপমা-স্বরূপ নারদ বলছেন—গোপীরা কামভাবে, কংস ভয়ে, শিশুপাল প্রভৃতি রাজারা বিদ্বেষবশত, যাদবেরা আত্মীয়তাবশত এবং তোমরা স্নেহময় ভাবের জন্য ও আমরা ভক্তিভাব অবলম্বন করে শ্রীভগবানে তন্ময়তা লাভ করেছি।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শেষ উপদেশ দিয়েছেন—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো*—আমাতে মন সমর্পণ কর। এইটি-ই হচ্ছে সর্ব শাস্ত্রের সার কথা—ভগবানে মনঃসংযোগ করতে হবে। *তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ (৭-১-৩১)* যে-কোনভাবে, যেমন করে পার ভগবানে তন্ময়তা লাভ করতে হবে—এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের চরম কথা—ভগবানে তন্ময়তা।

ভগবান বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিলেন জয় এবং বিজয়। এঁরা শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায়, ঋষিদের অভিশাপকে উপলক্ষ করে তিনবার অসুর দেহ ধারণ করে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব অবলম্বন করেছিলেন। প্রথম বার তাঁরা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে, দ্বিতীয় বার রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে এবং তৃতীয় বার শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং প্রতিবারই শ্রীভগবানের হাতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। বিষ্ণু-পার্ষদ এই জয় বিজয়ই শ্রীভগবানের প্রতি তীব্র বৈরীভাব অবলম্বন করে ভগবানকে গভীরভাবে চিন্তা করে আবার শ্রীভগবানের কাছেই ফিরে গেলেন। তোমাদের সামনেই শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে নিহত হয়ে শ্রীভগবানকেই লাভ করলেন।

দেবর্ষি নারদ আবার বললেন—জয়-বিজয় প্রথমবার হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তখন তাদের তেজে দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তখন ভগবান বরাহ মূর্তি ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপু তখন ভ্রাতৃহন্তা শ্রীহরির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অসুরদের আহ্বান করে বললেন—শ্রীহরি সর্বত্র তুল্য ভাবাপন্ন, তাঁর শত্রু মিত্রে কোন ভেদ নেই; তবুও এই ভীরু শক্তিহীন দেবতারা শ্রীহরিকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করে আমার প্রবল প্রতাপান্বিত ভাই হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়েছে। দেবতাদের তো আমি দেখেই নেব। এখন এই শ্রীহরির সম্বন্ধে কি করব তা তোমাদের বলছি—তোমরা সব মন দিয়ে শোন। এই নারায়ণ পূর্বে শুদ্ধ, তেজোময় থাকলেও এখন সে মায়াকে আশ্রয় করে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি মূর্তি পরিগ্রহ করে নিজের শুদ্ধসত্ত্ব স্বভাবকেই কলুষিত করেছে। সে ছিল আগে নির্গুণ, নিরাকার, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। এখন সে মায়াকে অবলম্বন করে, বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে এবং বরাহ রূপ ধারণ করে আমার প্রাণপ্রিয় ভাই হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছে। শ্রীহরি অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত—একটু আরাধনা করলেই সে সাধকের প্রতি স্নেহশীল হয়ে পড়ে। বালকের মতোই সে চঞ্চলমতি। সুতরাং আমি তাকে বধ করে তার রক্ত দিয়ে হিরণ্যাক্ষের তর্পণ করব। সেই কপট নারায়ণকে বধ করলে বিষ্ণুগতপ্রাণ দেবতারা চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবে। নারায়ণই হচ্ছে যজ্ঞ-পুরুষ ধর্মের মূল আশ্রয়। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে গিয়ে যারা তপস্যা, বেদপাঠ, ব্রত-নিয়ম পালন করছে, ধর্মাচরণ করছে, তাদের সকলকে বধ করবে; কারণ তাদের বধ করলে যজ্ঞাদি আর হবে না; ফলে যজ্ঞপুরুষ নারায়ণও নির্জিত হবে। অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর আদেশ শুনে অসুরেরা তখন পৃথিবীতে গিয়ে সকলের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করল।

এদিকে হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে তার মা, স্ত্রী ও ছেলেরা অত্যন্ত শোকাকুল হয়েছে দেখে, হিরণ্যকশিপু তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বীর হিরণ্যাক্ষের জন্য তোমাদের আর শোক করা উচিত নয়; কারণ সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু তো বীরের কাম্য। জীব পূর্বজন্মের কর্মের ফলে এক জায়গায় জন্মগ্রহণ করে কিছুদিন সেখানে থেকে নিজের অদৃষ্টের বশে আবার অন্য জায়গায় গিয়ে

জন্ম পরিগ্রহ করে—এই তো জগতের নিয়ম। সুতরাং যে চলে যায়, তার জন্য শোক করা বৃথা। আত্মার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। আত্মা শুদ্ধ, অবিনাশী, সর্বব্যাপী, সর্বসাক্ষী; আত্মা দেহ নয় কিন্তু অবিদ্যার বশে এই দেহকেই আত্মা বলে মনে করে জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে। সুতরাং বিনাশশীল দেহের মৃত্যুর জন্য শোক করা উচিত নয়। অসুর হলে কি হয়, পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে তার বেশ টনটনে জ্ঞান রয়েছে।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তখন অপরাজেয়, অমর এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হবার জন্য অতি ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তার উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে দর্শন দিয়ে বললেন—তুমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছ; আমার কাছে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হিরণ্যকশিপুর ইচ্ছা অমরত্ব লাভ করা; কিন্তু ভাবলেন, যদি অমরত্ব বর প্রার্থনা করি তবে ব্রহ্মা বলবেন যে, কল্প শেষে ব্রহ্মারও বিনাশ হয়; ব্রহ্মা-ই যখন অমর নয়, তখন তার পক্ষে কাউকে অমরত্ব বর দেওয়া সম্ভব নয়। এইভাবে চিন্তা করে হিরণ্যকশিপু তখন ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন—হে বরদ শ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি আমাকে আমার মনোমত বর দিতে চান, তবে এই বর দিন, যাতে আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণীই আমাকে বধ করতে না পারে। হিরণ্যকশিপু আবার ভাবলেন—এ তো হলো না; আমার যদি স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যুকে রোধ করবার উপায় কি ? তাই স্বাভাবিক মৃত্যু অতিক্রম করার জন্য বললেন—ঘরের ভিতরে অথবা বাহিরে, দিনে অথবা রাত্রিতে, ভূমিতে অথবা আকাশে, কোন অস্ত্রে অথবা শস্ত্রেই যেন আমার মৃত্যু না হয়—এই বর আমায় দিন। প্রকারান্তরে হিরণ্যকশিপু অমরত্ব বরই চাইলেন।

ব্রহ্মা বললেন—তোমার মনের বাসনা আমি বুঝেছি। তুমি যে বর চাইলে, তা লাভ করা অসম্ভব বলেই জানবে। তবুও তোমার এই অতি কঠোর তপস্যার জন্য আমি তোমার প্রার্থিত বরই দিলাম।

ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করে হিরণ্যকশিপু তখন নিজেকে অমর, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতে লাগলেন।

এবং লব্ধবরো দৈত্যো বিভ্রদ্ধেমময়ং বপুঃ।
ভগবত্যকরোদ্দ্বেষং ভ্রাতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৭-৪-৪ ॥

ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করে হিরণ্যকশিপু তখন সুবর্ণময় দেহ ধারণ করে ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে ভগবান বিষ্ণুর প্রতি অতি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষভাব পোষণ করতে লাগলেন।

বলমদে গর্বিত হয়ে হিরণ্যকশিপু তখন স্বর্গ, মর্ত, পাতাল দশদিক অধিকার করে সকলের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করলেন। তার এই অত্যাচারের কোন প্রতিকার নেই জেনে, দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বিষ্ণু তাদের বললেন—হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের কথা আমি আগেই জেনেছি। শিগ্‌গির তার ব্যবস্থা করব।

নির্বৈরায় প্রশান্তায় স্বসুতায় মহাত্মনে।
প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জিতম্ ॥ ৭-৪-২৮॥

হিরণ্যকশিপু যখন তার নিজেরই পুত্র অজাতশত্রু অতি শান্ত মহাত্মা প্রহ্লাদকে হিংসা করে তার উপর অত্যাচার করবে, তখনই বর-মত্ত দৈত্যরাজকে আমি বধ করব।

হিরণ্যকশিপুর চারটি ছেলে ছিল। তার মধ্যে প্রহ্লাদই ছিলেন সর্বগুণান্বিত সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং দ্বেষশূন্য। অসুর কুলে জন্ম হলেও প্রহ্লাদ আসুরিক ভাব, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত ছিলেন। প্রহ্লাদ নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করেছিলেন; তাই নারায়ণের সাথে ভক্ত প্রহ্লাদের আত্মা একীভূত হয়ে থাকত।

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদগায়তি ক্বচিৎ ॥ ৭-৪-৩৯ ॥

বৈকুণ্ঠপতির চিন্তায় প্রহ্লাদ কখনও কাঁদতেন কখনও তাঁর চিন্তায় আনন্দিত হয়ে হাসতেন। আবার কখনও গান করতেন। কখনও লজ্জা ত্যাগ করে নাচতেন আবার কখনও তাঁর চিন্তায় তন্ময় হয়ে ভগবান বিষ্ণুর লীলার অনুকরণ করতেন। কখনও বা শ্রীভগবানের অঙ্গে তার শরীরের স্পর্শ হয়েছে—এই ভাবনায় আনন্দে প্রহ্লাদের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

এদিকে হিরণ্যকশিপু তার ছোট ভাই হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে, বিষ্ণুর প্রতি ক্রমেই আরও বেশি করে বৈরীভাব পোষণ করতে

লাগলেন; অথচ তারই পুত্র বিষ্ণুর পরম ভক্ত! এ কি সহ্য করা যায়? তাই নিজের ছেলে হলেও বিষ্ণু-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের প্রতিও বিদ্বেষ-পরায়ণ হতে লাগলেন।

হিরণ্যকশিপু তার ছেলেদের আসুরিকভাবে গড়ে তুলবার জন্য ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। প্রহ্লাদ শিক্ষকদের উপদেশ শুনতেন কিন্তু সেই উপদেশে তার শ্রদ্ধা হতো না। একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আদর করে, কোলে বসিয়ে বললেন—তুমি যা ভাল করে শিখেছ এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, তার সম্বন্ধে আমাকে কিছু শোনাও। প্রহ্লাদ বললেন ঃ

তৎ সাধুমন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ ৭-৫-৫॥

হে অসুরশ্রেষ্ঠ! 'আমি আমার' রূপ মিথ্যা অভিমানে উন্মত্ত হয়ে, নরক বাসের কারণ এবং অন্ধকূপ সদৃশ এই সংসারে বাস করার থেকে আমি নির্জন বনে বাস করে শ্রীহরির চরণ সেবাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।

প্রহ্লাদের কথা শুনে দৈত্যরাজের অত্যন্ত রাগ হলো এবং তা খুবই স্বাভাবিক; কারণ হিরণ্যকশিপু শ্রীহরিকে তার পরম শত্রু বলে মনে করেন। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় যে, বর্তমান সময়ে কোন ছেলে যদি তার মা বাবাকে এইরকম কথা বলে—সংসারী হওয়ার চেয়ে সাধু হয়ে ভগবানের নাম করাই ভাল—তাহলে তারা সেই কথা কিভাবে নেবেন? অসুর না হয়েও শ্রীভগবানকে শত্রু বলে না ভেবেও শতকরা নিরানব্বই জনের অবস্থাই হিরণ্যকশিপুর মতো হবে!

এদিকে প্রহ্লাদের কথা শুনে দৈত্যরাজ ভাবলেন—প্রহ্লাদ ছেলে মানুষ—সে কি বোঝে? শিক্ষকদের শিক্ষার দোষেই প্রহ্লাদের এমন বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটেছে। সুতরাং তিনি শিক্ষকদের ডেকে, আচ্ছা করে ধমক দিয়ে বললেন—প্রহ্লাদকে এমনভাবে শিক্ষা দেবে, যাতে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেরা প্রহ্লাদকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

ষণ্ড ও অমর্ক তখন প্রহ্লাদকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা তোমার গুরু; আমরা তোমায় যেসব শিক্ষা দিয়েছি, সেসব কথা তোমার পিতাকে না বলে বুদ্ধি-বিভ্রান্তিকর এইসব কথা কেন বললে? এই

শিক্ষা তোমায় কে দিল? প্রহ্লাদ বললেন—এ ব্যক্তি আমার আপন, এ ব্যক্তি আমার পর— এইরকম যে মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিনিবেশ এটা ভগবানের মায়া থেকেই উৎপন্ন হয়; সাধারণ মানুষ এই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে দুঃখ ভোগ করে। যখন ভগবান কারও প্রতি কৃপা করেন, তখনই তার এই 'আপন-পর' রূপ মিথ্যা অভিনিবেশ মিথ্যা দেহাভিমানজনিত অসদ্বুদ্ধির নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব এই ভেদ-বুদ্ধির জন্যই, বাক্যমনের অতীত পরমাত্মাকেই, আপন এবং পর বলে মনে করে। আমি জানি না, কোন্ তপস্যার ফলে আমার এমন সৌভাগ্য হয়েছে যে, শ্রীভগবানেরই ইচ্ছানুসারে আমার মন সর্বদা তাঁরই কাছে কাছে অবস্থান করে।

প্রহ্লাদের কথা শুনে যণ্ড ও অমর্ক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার তাকে আসুরিক শিক্ষা দিতে লাগলেন। প্রহ্লাদকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী দেখে কিছু দিন পরে গুরুরা ভাবলেন যে, প্রহ্লাদ এখন ঠিক ঠিক তাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছে; তাই পুরস্কার লাভের আশায় তারা প্রহ্লাদকে তার পিতার কাছে নিয়ে গেলেন। প্রহ্লাদকে দেখে হিরণ্যকশিপু আনন্দিত হয়ে, তাকে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এত দিন গুরুর কাছে যে বিদ্যা ভাল করে শিখেছ তার কিছুটা আমায় বল।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ৭-৫-২৩ ॥

প্রহ্লাদ বললেন—বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ, নাম কীর্তন, বিষ্ণুর লীলার স্মরণ, মনে মনে তাঁর সেবা, তাঁর পূজা, স্তোত্র পাঠ, দাস্যভাবে কর্ম সমর্পণ, সখ্যভাবে তাঁতে বিশ্বাস এবং তাঁতে আত্মসমর্পণ—এই নয় প্রকার লক্ষণ-যুক্ত ভক্তি, যে অধ্যয়ন দ্বারা ভগবান বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, আমি সেই অধ্যয়নকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। কিন্তু আমার গুরুর কাছ থেকে সেইরকম শিক্ষা পাবার সম্ভাবনা নেই।

এই যে নবধা ভক্তির কথা বলা হলো, কায়মনোবাক্যে এর যে-কোন একটিকে অবলম্বন করে সাধন করলেই জীবের অভীষ্ট, পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, (১) পরীক্ষিৎ হরি কথা শ্রবণ করে, (২)শুকদেব হরিকথা কীর্তন করে, (৩) প্রহ্লাদ হরিকে স্মরণ করে,

(৪) লক্ষ্মীদেবী শ্রীহরির পাদসেবা করে, (৫) মহারাজ পৃথু শ্রীহরির অর্চনা করে, (৬) অক্রূর শ্রীহরির বন্দনা করে, (৭) হনুমান শ্রীহরিকে দাস্যভাবে সেবা করে, (৮) অর্জুন হরির সখ্যসেবা করে এবং (৯) মহারাজ বলি শ্রীহরিকে সর্বস্ব নিবেদন করে পরম পুরুষার্থ লাভ করেছেন।

প্রহ্লাদের কথা শুনে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন—যদি গুরুর কাছ থেকে এইরকম শিক্ষা পেয়ে না থাকিস, তবে কি করে তোর এই দুর্মতি হলো?

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥
৭-৫-৩২ ॥

প্রহ্লাদ বললেন—বিষয়ে স্পৃহাশূন্য মহান ব্যক্তিদের চরণ রেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত অনর্থের নিবৃত্তি হয় না; অর্থাৎ সংসার-দুঃখ নাশক শ্রীহরির চরণ কমল স্পর্শের জন্য মতি হয় না।

বেদে যে-সমস্ত কাম্য কর্মের কথা বলা হয়েছে, সেসব কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান যথারীতি করলেও, সংসার-দুঃখের একমাত্র মহৌষধ শ্রীভগবানের চরণ লাভ করা যায় না। গুরুর উপদেশে বেদোক্ত কাম্য কর্মের বিষয় জানলে কি হবে? সাধু-সঙ্গই ভগবান বিষ্ণুর চরণ লাভের—সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়।

প্রহ্লাদের কথা শুনে হিরণ্যকশিপু তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহ্লাদকে কোল থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অসুরদের আদেশ করলেন—এই দুরাত্মাকে এখনই বধ কর। এই বালক আমাদের সকলকে ত্যাগ করে আমার ভ্রাতার হত্যাকারী বিষ্ণুর চরণ সেবা করছে! যে পাঁচ বছরের বালক পিতামাতার স্নেহ ত্যাগ করে, শত্রুর উপাসনা করে, সেই কৃতঘ্ন দুর্বিনীত বালককে বিষ্ণু কেমন করে রক্ষা করে দেখি! দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন সাধুদের শত্রু তেমনি এই পুত্ররূপী প্রহ্লাদও আমার পরম শত্রু। বিষ প্রয়োগে, খড়্গাঘাতে অথবা যে-কোন উপায়ে একে বধ কর।

প্রহ্লাদ শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ করেছেন; তাই তাঁকে বধ করবার সকল রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এই দেখে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অধোবদনে

ভাবতে লাগলেন—অসীম বুদ্ধিসম্পন্ন ভয়হীন মৃত্যুহীন এই বালকের সাথে বিরোধ করে হয়ত বা আমারই মৃত্যু হবে অথবা নাও হতে পারে; কিন্তু এখন এই বালককে নিয়ে আমি কি করি! দৈত্যরাজকে চিন্তামগ্ন দেখে, ষণ্ড ও অর্মক রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আপনি নিজের বাহুবলে ত্রিলোক জয় করেছেন; আপনার চিন্তার কি কারণ থাকতে পারে? শিশুদের চরিত্রের দোষগুণ বিচার্যের বিষয় নয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের পিতৃদেব আপনার গুরু শুক্রাচার্য ফিরে না আসছেন, ততদিন পর্যন্ত একে বেঁধে রাখুন, যাতে সে ভয়ে পালিয়ে না যায়। পুরুষের স্থির বুদ্ধির দুইটি কারণ—এক বয়স এবং দ্বিতীয় সৎসঙ্গ। প্রহ্লাদ একে বালক তার উপর সৎসঙ্গের অভাব; সুতরাং তার তো বুদ্ধি-বিভ্রম হতেই পারে; সেজন্য আপনি ভাববেন না।

ষণ্ড ও অমর্কের কথা শুনে হিরণ্যকশিপু তাদের বললেন—আপনারা ঠিকই বলেছেন; এই বালককে আপনারা নিয়ে গিয়ে যথোচিত রাজধর্মের উপদেশ দিন। ষণ্ড ও অমর্ক তখন প্রহ্লাদকে নিয়ে গিয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম বিষয়ক উপদেশ দিতে লাগলেন। এদিকে ষণ্ড ও অমর্ক যখন গৃহকার্যে অন্যত্র যেতেন, প্রহ্লাদ তখন তার সমবয়সী বালকদের বিষ্ণু-ভক্তির কথা বলতেন ঃ

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥ ৭-৬-১ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্প বয়সেই ভাগবত-ধর্ম আচরণ করবে; কেন না মনুষ্য জন্ম দুর্লভ এবং অর্থবহ অর্থাৎ একমাত্র মনুষ্য জন্মেই মানুষ বিষ্ণুর আরাধনা করে পরমপদ লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই মনুষ্য জন্মের কোন নিশ্চয়তা নেই। কথায় বলে, আশি লক্ষ যোনি ঘুরে, তবে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। এই মনুষ্য জন্মের পর আবার যে কবে মনুষ্য জন্ম লাভ হবে, তার কোনই নিশ্চয়তা নেই; সুতরাং এই জীবনেই বিষ্ণুর আরাধনা করা উচিত—নইলে মহা অনর্থ হবে। আবার কবে যে মৃত্যু হবে, তাও জানা নেই। তাই প্রহ্লাদ বালকদের বললেন— এই ভাগবত-ধর্ম বাল্যকালেই আচরণ করতে হবে। বাল্যকাল কেন? যৌবন এবং বার্ধক্যে করলেই তো হয়? আর এমনিতেও বলা হয় যে, বয়স হলে অবসর নেবার পর ধর্মাচরণ করা যাবে। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কাম হচ্ছে জীবের বিষ্ণু-ভক্তির প্রধান অন্তরায়; বাল্যকালে কামের তাড়না থাকে না; সুতরাং বাল্যকালেই ভগবৎ আরাধনার

প্রকৃষ্ট সময়। মানুষের জীবন যদি একশ বছর ধরা যায়, তবে তার অর্ধেক সময় রাত্রিকাল অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর মানুষ ঘুমিয়ে কাটায়; বাল্য ও যৌবনের দশ বছর করে বিশ বছর বালক বালিকাদের সাথে খেলাধুলায় কেটে যায়। তারপর বিষয় উপার্জন, বিষয় ভোগ এবং স্ত্রীপুত্রে আসক্ত হয়ে আরও বিশ বছর কখনও সামান্য একটু সুখ এবং বেশির ভাগই দুঃখ-ভোগে অতিবাহিত হয়। তারপর বাকি জীবন জরাগ্রস্ত এবং অসমর্থ অবস্থায় কাটে। এই তো মানুষের জীবন—এর মধ্যে সুখ কোথায়?

আত্মীয় স্বজনে আসক্ত হবার দোষ জেনেও, মানুষ কেবল কুটুম্ব পোষণই করে থাকে, ভগবৎ চিন্তা করে না। বিদ্বান হলেও—এ ব্যক্তি আমার আপন, এ আমার পর—এইরকম ভাবনাযুক্ত হয়ে, মুগ্ধচিত্ত ব্যক্তির মতো, ভূতে পাওয়া লোকের মতো, অপরের জিনিস হরণ করে থাকে। তাই বলছি—হে অসুর বালকগণ! তোমরা বিষয়-মাত্র-সেবী অসুরদের সংসর্গ ত্যাগ করে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হও। নারায়ণে শরণাগতিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। হয়ত বলবে—আমরা বালকমাত্র; কেমন করে শ্রীভগবানের আরাধনা করতে হয়, কেমন করে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করতে হয়—তা তো জানি না। তার উত্তরে প্রহ্লাদ বললেন— শ্রীভগবানকে খুশি করতে কোন অসুবিধাই নেই; তিনি তো সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করছেন। সুতরাং তাঁকে খুঁজতে কোনই কষ্ট নেই। সব সময়ই মানসিক উপচার দিয়ে তাঁর সেবা করা যায়। যিনি সর্বকারণেরও কারণ, সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবান প্রীত হলে তাঁর সেবকের দুষ্প্রাপ্য কি থাকতে পারে? অর্থাৎ তারা জগতের সব কিছুই লাভ করতে সক্ষম হয়। শ্রীভগবানের চরণ সেবা করার যদি সামর্থ্য হয় এবং যত্নের সাথে যদি আমরা তাঁর নাম কীর্তন করি, তাহলে নির্গুণ মোক্ষ লাভেও আমাদের প্রয়োজন নেই।

প্রহ্লাদের কথা শুনে দৈত্যবালকেরা তখন ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত হলো। এই না দেখে ষণ্ড ও অমর্ক তখন ভয়ে অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। হিরণ্যকশিপু তখন পদাহত সর্পের মতো ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন এবং সম্মুখে অবস্থিত শান্ত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদকে বললেন—রে দুর্বিনীত কুলাধম! তুই আমার শাসন লঙ্ঘন করিস! যে আমি ক্রুদ্ধ হলে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভয়ে কাঁপতে থাকে, তুই হীনবল হয়ে, সেই আমাকে অবজ্ঞা করিস!

প্রহ্লাদ তখন পিতাকে বললেন—হে মহারাজ! ব্রহ্মাদি দেবগণ, স্থাবর, জঙ্গম—জগতে যা কিছু আছে, সবই ভগবান বিষ্ণুর বশীভূত ; তিনিই পরম পুরুষ; তিনিই আমার, আপনার এবং সকলের বল; তিনি, তাঁর শক্তির প্রভাবে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় করে থাকেন; তিনি সর্বব্যাপী। সুতরাং হে পিতঃ! আপনি হিংসা-ভাব ত্যাগ করুন। বিষ্ণু কারও শত্রু নয়। অসংযত মনই আপনার শত্রু। মন সংযত হলে শত্রুমিত্রে সমভাব হয় এবং সর্বত্র সমদর্শনই বিষ্ণু পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। প্রহ্লাদের কথা শুনে হিরণ্যকশিপু তখন একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—তুই যে বলছিস, আমি ছাড়া অন্য পরমেশ্বর আছে এবং সে সর্বত্রই রয়েছে—তাই যদি হয়, তবে এই স্তম্ভে তাকে দেখছি না কেন? জেনে রাখ, আমিই প্রকৃত ঈশ্বর; সেই আমি এবার তোর অহংকার চূর্ণ করে, তোকে বধ করব। তোর হরি পারে তো এবার তোকে রক্ষা করুক। এই বলে মহাবলী হিরণ্যকশিপু ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বার বার অস্ত্রাঘাত করে, মহাবেগে ছুটে গিয়ে সেই স্তম্ভে ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত করলেন। তখন সেই স্তম্ভ থেকে অতি ভীষণ শব্দ হতে লাগল; সেই ভয়ঙ্কর শব্দে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। তখন—

সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্ স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মনুষ্যম্ ।।
৭-৮-১৭॥

প্রহ্লাদ পূর্বে পিতাকে বলেছিলেন 'স্তম্ভেও ভগবান আছেন'। প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদের সেই কথাকে সত্যে পরিণত করার জন্য এবং সর্বভূতে নিজের ব্যাপকত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য শ্রীভগবান তখন পশুও নয় মানুষও নয়, এই রকম অতি অদ্ভুত নরসিংহ মূর্তিতে স্তম্ভের ভিতর থেকে সভামধ্যে দেখা দিলেন। সেই ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্তি দেখে হিরণ্যকশিপু ভাবলেন—মায়াবী হরি এইভাবে আমার মৃত্যু ঠিক করেছে! দেখা যাক কে কাকে বধ করে! এইভাবে চিন্তা করে হিরণ্যকশিপু তখন নরসিংহকে বধ করার জন্য গদা হস্তে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলো। তখন, সর্প যেমন মূষিককে আক্রমণ করে, সেইভাবে নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে ধরে সভার দ্বারদেশে নিয়ে গিয়ে নিজের উরুদেশে রেখে, ভয়ঙ্কর নখরাঘাতে তাকে বিদীর্ণ করলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন—মানুষ অথবা পশুর দ্বারা, ঘরের ভিতরে অথবা বাহিরে, ভূমিতে অথবা আকাশে, অস্ত্রে অথবা

শস্ত্রে, দিনে অথবা রাত্রিতে যেন তার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলে বর দিয়েছিলেন। তাই শ্রীভগবান মানুষও নয় পশুও নয়—এইরূপ নরসিংহ মূর্তি ধারণ করে, সভার ভিতরেও নয় বাহিরেও নয়—সভার দ্বারদেশে, ভূমিতেও নয় আকাশেও নয়—নিজের ঊরুদেশে, দিনেও নয় রাত্রিতেও নয়—সন্ধ্যার সময়, অস্ত্রেও নয় শস্ত্রেও নয়—নখরাঘাতে দৈত্যরাজকে বধ করলেন।

ভাগবতকার নৃসিংহদেবের সেই অতি ভয়ঙ্কর মূর্তির বর্ণনা করেছেন ঃ

সংরম্ভদুষ্প্রেক্ষ্যকরাললোচনো
ব্যাত্তাননান্তং বিলিহন্ স্বজিহ্বয়া।
অসৃগ্লবাক্তারুণকেশরাননো,
যথান্ত্রমালী দ্বিপহত্যয়া হরিঃ ॥ ৭-৮-৩০॥

দৈত্যবধে নৃসিংহদেবের চক্ষু অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল; তাঁর দিকে ভয়ে তাকানো যাচ্ছিল না এবং জিহ্বা দ্বারা তিনি বিকশিত মুখপ্রান্ত লেহন করছিলেন। কেশর ও মুখমণ্ডল রক্তে সিক্ত হয়ে অরুণ বর্ণ ধারণ করেছিল; হস্তি বধ-কারী সিংহের মতো হিরণ্যকশিপুর অন্ত্র, নাড়িভুঁড়ি দিয়ে মালা ধারণ করেছিলেন। এইরকম অতি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে নৃসিংহদেব তখন হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের সকলকে বধ করে অসুরকুল নিঃশেষ করলেন।

ততঃ সভায়ামুপবিষ্টমুত্তমে নৃপাসনে সংভৃততেজসং বিভূম্।
অলক্ষিত দ্বৈরথমত্যমর্ষণং প্রচণ্ডবক্ত্রং ন বভাজ কশ্চন ॥
৭-৮-৩৪॥

আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা নেই দেখে তিনি সভামধ্যে উৎকৃষ্ট রাজসিংহাসনে গিয়ে উপবেশন করলেন। যদিও শ্রীভগবান তাঁর তেজ সংবরণ করেছেন, তবুও অতি ক্রোধান্বিত ভয়ঙ্কর বদনবিশিষ্ট নৃসিংহদেবের কাছে গিয়ে কোন ভক্তই তাঁর সেবা করতে সাহস করলেন না।

তখন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা দূর থেকেই নৃসিংহদেবের স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণুর পার্ষদগণ করজোড়ে নৃসিংহরূপী দেবাদিদেবকে বললেন—হে শরণাগতের রক্ষাকর্তা! আপনার এই অতি অদ্ভুত নরসিংহ মূর্তি দেখে আজ আমরা কৃতার্থ হয়েছি। হে প্রভু ! এই হিরণ্যকশিপু আপনারই আজ্ঞাবহ ভৃত্য; সনক-সনাতনাদির অভিশাপে সে অসুর হয়ে জন্মেছিল।

আপনি যে আজ তাকে বধ করে আবার বৈকুণ্ঠে পাঠালেন, এ তো আপনার পরম অনুগ্রহ।

ব্রহ্মাদি দেবতারা নৃসিংহদেবের ক্রোধ প্রশমনের জন্য লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর কাছে যেতে অনুরোধ করলেন; কিন্তু তিনিও এই অদৃষ্টপূর্ব ভয়ঙ্কর মূর্তির কাছে যেতে সাহস করলেন না। ব্রহ্মা তখন নিরুপায় হয়ে ভাবলেন— কমলাও যখন কমলাপতির ক্রোধ নিবারণে অসমর্থ, তখন কে আর সাহস করে নৃসিংহদেবের কাছে যাবে? ভাবলেন ভগবানের এই মূর্তি-পরিগ্রহ তো তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার জন্য—নইলে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মেরেই ফেলত ; আবার এও ঠিক যে, বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয়-বিজয়কে শাপমুক্ত করার জন্য, শ্রীভগবান এই নৃসিংহ মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং ভক্তের জন্যই ভগবানের এই ভয়ঙ্কর ক্রোধ-মূর্তি ; অতএব একমাত্র প্রাণপ্রিয় প্রহ্লাদ ছাড়া, আর কেউ-ই ভগবানের এই ক্রোধ উপশম করতে পারবে না। তাই ব্রহ্মা তখন প্রহ্লাদকে বললেন—তোমার পিতার উপর ইনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন; সুতরাং তুমি গিয়ে এঁকে শান্ত কর।

মহাভাগবত বালক প্রহ্লাদ তখন ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য করে ধীর পদে নৃসিংহদেবের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

স্বপাদমূলে পতিতং তমর্ভকং
বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ।
উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং
কালাহিবিত্রস্তধিয়াং কৃতাভয়ম্ ॥ ৭-৯-৫ ॥

প্রহ্লাদকে নিজের চরণতলে নিপতিত দেখে নৃসিংহদেব তখন অতি দয়ার্দ্র চিত্তে প্রহ্লাদকে ধরে তুললেন এবং মৃত্যু-ভীতি বিনাশক তাঁর অভয় করকমল প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপন করলেন। শ্রীভগবানের করস্পর্শে প্রহ্লাদের তখন কি অবস্থা হলো?

স তৎকরস্পর্শধুতাখিলাশুভঃ সপদ্যভিব্যক্তপরাত্মদর্শনঃ।
তৎপাদপদ্মং হৃদি নির্বৃতো দধৌ হৃষ্যত্তনুঃ ক্লিন্নহৃদশ্রুলোচনঃ॥
৭-৯-৬॥

নৃসিংহদেবের করস্পর্শে প্রহ্লাদের সমস্ত অশুভ, অমঙ্গল দূর হলো, এবং তৎক্ষণাৎ তার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হলো। প্রহ্লাদ তখন পরম আনন্দ লাভ করলেন; তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ হতে লাগল এবং প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, অশ্রুধারায় চক্ষুপ্লাবিত করে নৃসিংহদেবের পাদপদ্ম নিজের হৃদয়ে ধারণ করলেন। প্রহ্লাদ তখন ভগবানে মন সমাহিত করে শ্রীহরির স্তব করতে লাগলেন ঃ

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ
সত্ত্বৈকতানগতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ।
নারাধিতুং পুরুগুণৈরধুনাপি পিপ্রুঃ
কিং তোষ্টুমর্হতি স মে হরিরুগ্রজাতেঃ ॥ ৭-৯-৮॥

প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের স্তব করে বলছেন—এই মাত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিঋষিরা, সিদ্ধ তপস্বীরা এবং একাগ্রচিত্ত জ্ঞানিগণ ধ্বনি, গুণ এবং অলঙ্কারযুক্ত বাক্যে অর্থাৎ অতি সুললিত সুমিষ্ট এবং অর্থযুক্ত বাক্যে স্তবস্তুতি করেও যাঁকে তুষ্ট করতে পারেননি, তাঁকে উগ্র-স্বভাব, অসুরজাতিসম্ভূত আমি কেমন করে তুষ্ট করব?

ভক্তিই হচ্ছে শ্রীহরির প্রীতি লাভের একমাত্র উপায়। ভক্তি ছাড়া ভগবৎ-তোষণ সম্ভবপর নয়। ভগবৎ-বিমুখ ব্রাহ্মণের যদি ধন, সৌন্দর্য, তপস্যা, শাস্ত্রচর্চ্চা, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণও থাকে, তবুও আমি মনে করি যে, সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, যে চণ্ডালের মন-প্রাণ-বাক্য শ্রীভগবানে অর্পিত হয়েছে, সে-ই শ্রেষ্ঠ। কারণ হরিভক্তি কুল পবিত্র করে; আর ভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ কেবল গর্বই পোষণ করে।

তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য
সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্।
নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ
পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন ॥ ৭-৯-১২ ॥

প্রহ্লাদ বলছেন—ভগবান একমাত্র ভক্তিতেই প্রীত হন; সেইজন্য আমি নীচ বংশজাত হলেও, নিঃশঙ্ক চিত্তে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী ঈশ্বরের মহিমা সর্বপ্রযত্নে কীর্তন করব; কারণ অবিদ্যার বশে সংসারে এসেও কেবল মাত্র ভগবানের মহিমা কীর্তন করেই মানুষ শুদ্ধ হয় অর্থাৎ অবিদ্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্ত হতে পারে।

তদ্ যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য
মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা।
লোকাশ্চ নির্বৃতিমিতাঃ প্রতিযন্তি সর্বে
রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি ॥ ৭-৯-১৪ ॥

হে নৃসিংহদেব! আপনি এখন ক্রোধ পরিত্যাগ করুন; কারণ যার জন্য আপনার এই ক্রোধ, সেই অসুর আজ আপনার দ্বারা নিহত হয়েছেন এবং তাতে সকলেই আনন্দিত হয়েছেন; কারণ অপরের অনিষ্টকারী বৃশ্চিক, সর্প প্রভৃতিকে বধ করলে সর্বজীবে দয়াপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরাও সন্তুষ্ট হন। সুতরাং অসুর বধে সকলে আনন্দিত হয়ে শান্তি লাভ করে আপনার ক্রোধ উপশমের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। আপনি এই নৃসিংহ রূপ ধারণ করে সকলকে নির্ভয় করেছেন; সুতরাং সকলে ভয় থেকে মুক্ত হবার জন্য আপনার এই রূপ স্মরণ করবে; আপনার এই নৃসিংহ মূর্তির কথা চিন্তা করলেই সকল ভয়, সকল বিপদ দূর হবে।

আপনার এই অতি ভয়ঙ্কর মুখ, বিকট দন্তশ্রেণী, অন্ত্রের মালা, রক্তাক্ত কেশর এবং শত্রু-বিদারণকারী নখর-বিশিষ্ট নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করেও আমি কিন্তু ভয় পাইনি। সিংহ-শাবক যেমন সিংহকে ভয় করে না, কিন্তু অপরে সিংহকে ভীষণ ভয় করে, সেইরকম আমিও আপনার এই রূপ দেখে ভয় পাইনি। আমি কেবল সংসারের করাল মূর্তি দেখে ভয় পাচ্ছি।

ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-
সংসারচক্রকদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধঃ স্বকর্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু ॥ ৭-৯-১৬ ॥

হে কৃপণ-বৎসল! হে দীনবন্ধু! সংসার চক্রের দুঃসহ ক্লেশে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি এবং নিজেরই কর্মবশে অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়েছি। হে অতি কমনীয়! আপনি কবে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আপনার অপবর্গপ্রদ চরণকমলের প্রতি আমাকে আহ্বান করবেন, কবে আপনার মুক্তিপ্রদ চরণে আমায় আশ্রয় দেবেন?

প্রিয়জনের বিয়োগ এবং অপ্রিয়জনের সংস্পর্শে এসে বার বার নানা দেহ

ধারণ করে আমি অশেষ দুঃখ ভোগ করেছি। কিন্তু দুঃখের প্রতিকার কি তা বুঝলাম না। দুঃখের প্রতিকারের আশায় যা-ই করতে যাই, তাতেই দেহাভিমানের জন্য আরও বেশি দুঃখে জড়িয়ে পড়ি। তাই বলছি, হে প্রভু! আমাকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করে, আপনার পাদপদ্মে স্থান দিয়ে আমায় কৃতার্থ করুন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, ভগবৎ-দাস্যে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রারব্ধ-জনিত দুঃখের নিরসনের উপায় কি? উত্তরে প্রহ্লাদ বলছেন ঃ

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ৭-৯-১৮ ॥

হে নৃসিংহদেব! আপনার পদযুগলকে আশ্রয় করেছে এমন মহাজ্ঞানী ভক্তজনের সঙ্গগুণে, আমি রাগদ্বেষ প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে প্রিয় বন্ধু এবং পরমদেবতা-স্বরূপ আপনার মহিমময়ী লীলাকথা কীর্তন করে আপনার ভক্তের সঙ্গলাভ করে সমস্ত দোষমুক্ত হয়ে মহাদুঃখসমূহ অতি শীঘ্রই অতিক্রম করব।

এখানে দুঃখ-নিবৃত্তির ক্রম বলা হয়েছে। ভগবৎ-সেবার ইচ্ছা হলে ভগবানের কৃপায় ভক্তসঙ্গ লাভ হয়; ভক্তসঙ্গে রাগদ্বেষের নিবৃত্তি; বীতরাগ হলে ভগবানের গুণকীর্তনে আগ্রহ হয় এবং তখনই সকল প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

প্রহ্লাদ বলছেন যে, দুঃখ নিরসনের অনেক লৌকিক উপায় থাকলেও ভগবৎ-কৃপা ছাড়া কিছুতেই কিছু হবার নয়। পিতামাতার দ্বারা সুরক্ষিত হয়েও শিশুর মৃত্যু হয়, উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করার পরেও রোগীর মৃত্যু হয়, নৌকা থাকা সত্ত্বেও মানুষ সমুদ্রে ডুবে মরে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আপনার কৃপাই হচ্ছে দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিলধিষ্ণ্যপানা-
মায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যান্ জনোঽয়ম্।
যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রূ-
বিস্ফূর্জিতেন লুলিতা স তু তে নিরস্তঃ॥ ৭-৯-২৩ ॥

স্বর্গের দেবতাদের আয়ু, সম্পদ, ঐশ্বর্য যা সংসারের লোকেরা কামনা করে থাকে, সেসব আমি দেখে নিয়েছি। হে প্রভু ! আমার পিতা হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ এবং সহাস্য ভ্রূভঙ্গি দর্শন করে, দেবতারাও ভয়ে কম্পিত হতো; আমার সেই প্রবল পরাক্রান্ত পিতা আপনার দ্বারা নিহত হয়েছেন; সুতরাং দেবতাদের পরমায়ু, স্বর্গের ঐশ্বর্য, আমি সব দেখে নিয়েছি, ওতে কিছু নেই—ওসব আমার চাই না। কেবল দয়া করে আপনার পাদপদ্মে আমাকে আশ্রয় দিয়ে আমার ত্রিতাপ জ্বালা দূর করুন।

ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥ ৭-৯-২৬ ॥

হে ঈশ! আমি রজঃ প্রকৃতি তমোগুণ-প্রধান অসুর কুলে জন্মেছি; আমিই বা কোথায় আর আপনার কৃপাই বা কোথায়! অর্থাৎ অসুর-প্রকৃতি আমি আপনার কৃপা লাভের একেবারেই অযোগ্য। তবুও ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী পর্যন্ত যা লাভ করতে সক্ষম হননি, আপনার সেই করকমল আপনি কৃপা করে আমার মস্তকে স্থাপন করেছেন।

আপনার কাছে শত্রু, মিত্র, দেবতা, অসুর প্রভৃতিতে কোনই প্রভেদ নেই; কারণ আপনি সর্বত্র সমদর্শী; তবুও যে আপনি কাউকে অনুগ্রহ, কাউকে নিগ্রহ করেন, সেটা তাদের সেবার তারতম্যের জন্য অর্থাৎ জীব তাদের কর্মানুসারে আপনার কাছে যে যেমন প্রার্থনা করে, আপনিও তাদের সেইরকম অভিলষিত ফল প্রদান করে থাকেন। সুতরাং দেবতা ও অসুরে যখন আপনার তুল্য-দৃষ্টি, তখন অসুর বলে আমার হতাশ হবার কারণ নেই।

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ।
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবন্ গৃহীতঃ
সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্ ॥ ৭-৯-২৮॥

কামনাযুক্ত যোগ্য বস্তুর অনুসন্ধানে সংসার-রূপ সর্পযুক্ত কূপে নিপতিত জনগণের অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের সঙ্গবশত আমিও ঐ কূপে পড়তে যাচ্ছিলাম। সেই সময় দেবর্ষি নারদ আমাকে নিজের করে নিয়ে মহামন্ত্র

প্রদান করেন। সুতরাং হে ভগবন্! সেই আমি কেমন করে আপনার ভৃত্যের সেবা ত্যাগ করব?

প্রহ্লাদ আরও বললেন—আমার অসংস্কৃত মন অত্যন্ত চঞ্চল; জিহ্বা মিষ্টি রসের জন্য, কর্ণ শব্দ সুখ উপভোগ করার জন্য, উদর আহারের জন্য, নাসিকা গন্ধের জন্য, চক্ষু রূপের জন্য সর্বদাই লালায়িত। একটি উপমা দিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলেছেন—বহুপত্নীককে যেমন সকল পত্নীরা নিজের নিজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে টানাটানি করে, সেইরকম আমার ইন্দ্রিয় সকল বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কেবল যে আমারই এই অবস্থা তা নয়; সংসারে নিমজ্জিত সবারই এই অবস্থা। তাই করজোড়ে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি—সংসারতাপ-ক্লিষ্ট সকলকেই আপনি উদ্ধার করুন। ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে উদ্ধার করতে আপনার কিছুমাত্র প্রয়াস করতে হবে না; কারণ আপনি তো অনায়াসেই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংস করে থাকেন; তার তুলনায় সকলের উদ্ধার-সাধন তো কিছুই নয়। তাছাড়া মূঢ় ব্যক্তিদেরও তো আপনি কৃপা করে থাকেন; সুতরাং হে আর্তবন্ধু! জগতের সকলকে আপনি কৃপা করে উদ্ধার করুন—এই আমার একান্ত প্রার্থনা। আর যদি সকলকে উদ্ধার করতে একান্তই রাজি না হন, তবে বলব মূঢ় জনদেরই আপনি উদ্ধার করুন। আমার মতো যারা আপনার ভক্ত, তাদের উদ্ধারের প্রয়োজনই বা কি? তারা তো আপনার নামকীর্তন করে সংসার-জ্বালা অতিক্রম করে পরম আনন্দেই অবস্থান করেন।

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥ ৭-৯-৪৩ ॥

হে পরমেশ্বর! দুস্তর ভববৈতরণী পার হতে আমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নই; কারণ আমি আপনার মহিমা কীর্তন-রূপ মহা-অমৃতে আমার চিত্তকে নিমগ্ন করে রেখেছি। কিন্তু যারা বৃথা ইন্দ্রিয়-সুখের আশায় স্ত্রীপুত্রের ভার বহন করে, অথচ আপনাতে বিমুখ হয়ে আপনার নাম কীর্তন করে না—সেই সব মূঢ়দের জন্যই আমার ভাবনা—তাদের উপায় কি হবে?

ভগবান বলতে পারেন—তুমি অপরের জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তোমার কি চাই তা বল। এর উত্তরে প্রহ্লাদ বলছেন ঃ

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥ ৭-৯-৪৪ ॥

কেন এই সব ভগবৎ-বিমুখ লোকদের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করছি—তাই আপনাকে বলছি—

মুনি ঋষিরা তো প্রায়ই নিজের মুক্তির জন্য নির্জনে মৌন ব্রত অবলম্বন করে সাধনা করেন। তাঁরা কিন্তু অপরের মঙ্গলের জন্য কিছু করেন না। যে-সব মূঢ় ব্যক্তিদের কথা বলছি, তাদের কি উপায় হবে, তাদের কে একটু সাহায্য করে আপনার দিকে নিয়ে আসবে? তাই বলছি—এইসব মূঢ়দের, সাধন-বিহীন ব্যক্তিদের ছেড়ে আমি একা মুক্তি পেতে চাই না। হে দীনবন্ধু! এই সমস্ত দীনজনের আপনিই একমাত্র আশ্রয়; আপনি ছাড়া তাদের অন্য কোন আশ্রয় আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না। তাই প্রার্থনা করি, আপনি কৃপা করে ঐসব দীনজনদের রক্ষা করুন।

অতি অসাধারণ কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে অপরের মঙ্গলের জন্য এইরকম হৃদয়-নিংড়ানো আর্তি দেখা যায়। তাঁরা অপরের কল্যাণের জন্য নিজের জীবনকে বলি দিতে প্রস্তুত; অপরের মুক্তির জন্য নিজে বার বার জন্ম পরিগ্রহ করে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতেও রাজি। ভগবান বুদ্ধ ছাগ শিশুর জন্য নিজের জীবন বলি দিতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী লিখেছেন—

"নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান—একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার-বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির, সর্বজীবের দরিদ্রনারায়ণ!" (স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী—মেরী হেলকে লিখিত ৯-৭-১৮৯৭)

তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ
কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ৭-৯-৫০॥

হে পূজ্যতম! প্রণাম, গুণকীর্তন, সর্বকর্ম সমর্পণ, পরিচর্যা, স্মরণ-মনন এবং গুণগান শ্রবণ—এই ষড়্বিধ ভাবে ভগবৎ-সেবা ছাড়া পরমহংসদের প্রাপ্তব্য ভক্তি সাধারণ মানুষ কিভাবে লাভ করবে? তাই প্রার্থনা করছি আমাকে আপনার দাস্যে আপনার সেবায় নিযুক্ত করুন।

প্রহ্লাদ একান্ত ভক্তিভাবে এই প্রকার স্তব করলে নৃসিংহদেব ক্রোধ পরিহার করে সন্তুষ্ট হয়ে প্রহ্লাদকে বললেন ঃ

প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্ ॥ ৭-৯-৫২ ॥

হে অসুরশ্রেষ্ঠ সৌম্য প্রহ্লাদ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি আমার কাছে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি সকলের কামনা পূরণ করে থাকি। আমাকে সন্তুষ্ট না করলে কেউ-ই আমার দর্শন পায় না; আর আমার দর্শন পেলে জীব আর কখনও শোক অথবা মোহে অভিভূত হয় না।

শ্রীভগবান প্রহ্লাদকে বর প্রার্থনা করতে বললেও ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ ভগবানের কাছে কোন বরই চাইলেন না।

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ ॥ ৭-১০-২ ॥

প্রহ্লাদ বললেন—আমি কামরূপ অমঙ্গলে আসক্ত; আমার চিত্ত কাম-মলিন; কামনার সঙ্গ আমি অত্যন্ত ভয় করি; তাই নিঃস্পৃহ হয়ে মুক্তি লাভের ইচ্ছায় আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। সুতরাং আমাকে বর দিয়ে আর প্রলুব্ধ করবেন না। আপনার প্রীতি উৎপাদন করে যে নিজের ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য বর প্রার্থনা করে, সে ভক্ত নয়—সে বণিক মাত্র; ভক্তি দিয়ে সে ভোগ্য-বস্তু ক্রয় করে।

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্ ॥ ৭-১০-৭ ॥

হে বরদশ্রেষ্ঠ! যদি আমার অভিলষিত বর দিতে চান, তবে যাতে আমার হৃদয়ের কামবীজ চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়—এই বর আমায় দিন।

বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে ॥ ৭-১০-৯॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মানুষ যখন হৃদয়ের সমস্ত কামনা ত্যাগ করে, তখনই ভগবৎ-তুল্য ঐশ্বর্যের অধিকারি হয়।

শ্রীভগবান বললেন—হে প্রহ্লাদ! যারা তোমার মতো ভক্ত, তারা কখনও আমার কাছে ভোগ-বিলাস প্রার্থনা করে না। তবুও তুমি এই মন্বন্তর পর্যন্ত দৈত্যেশ্বরের ঐশ্বর্য ভোগ কর। আমি সর্বভূতে বিদ্যমান, অদ্বিতীয়, যজ্ঞেশ্বর—আমাকে এইভাবে চিন্তা করে তুমি আমার লীলা-কথা শ্রবণ করবে এবং যোগ অবলম্বন করে সর্বকর্মফল ত্যাগ করে আমার পূজা করবে। এইভাবে তুমি বিপুল কীর্তি স্থাপন করে তোমার শুভ প্রারব্ধ ক্ষয় হলে অন্তে আমাকেই লাভ করবে।

নারদ মুনি বললেন—এইভাবে শাপভ্রষ্ট বিষ্ণুপার্ষদ হিরণ্যকশিপুরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে ভগবান বিষ্ণু ও ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি বিদ্বেষভাব অবলম্বন করে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হন এবং শ্রীভগবানকেই লাভ করেন।

নারদ মুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হিরণ্যকশিপুর কাহিনী বিবৃত করে বললেন ঃ

এতদ্ য আদিপুরুষস্য মৃগেন্দ্রলীলাং
দৈত্যেন্দ্রযূথপবধং প্রযতঃ পঠেত।
দৈত্যাত্মজস্য চ সতাং প্রবরস্য পুণ্যং
শ্রুত্বানুভাবমকুতোভয়মেতি লোকম্ ॥ ৭-১০-৪৭॥

যিনি আদি-পুরুষ বিষ্ণুর এই নৃসিংহ-লীলারূপ হিরণ্যকশিপু-বধ বৃত্তান্ত শুদ্ধান্তঃকরণে পাঠ করবেন, তিনি সাধু-শ্রেষ্ঠ দৈত্যেন্দ্র তনয় প্রহ্লাদের পুণ্য কথা শ্রবণ করে অভয়পদ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করবেন।

১৫

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা

পরম জ্ঞানী পরম ঈশ্বরপ্রেমী শুকদেব ভাগবত-কথা বলছেন মহারাজ পরীক্ষিৎকে, যিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত। সাত দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাই তিনি সংসার থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়ে শ্রীভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে গঙ্গার তীরে বসে শুকদেবের কাছ থেকে ভাগবত-কথা শুনছেন; আর সেখানে এসে মিলিত হয়েছেন বহু সংসারবিরাগী ঈশ্বরপ্রেমী মুনি-ঋষিরা। ভাগবত-কথা ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রথমে যার জন্য শুকদেব ভাগবত-কথা বলেছেন, সেই পরীক্ষিতের মনের অবস্থা নিজের মধ্যে আরোপ করতে হবে; অর্থাৎ যে পরিস্থিতিতে মনের যে অবস্থায় পরীক্ষিৎ ভাগবত-কথা শুনেছেন, সেইরকম মনের অবস্থা হলে ভগবানের প্রতি সেইরকম নির্ভরশীল হলে তবেই ভাগবতের অর্থ হৃদয়ে স্ফুরিত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গল্প বলতেন—এক রাজা ভাগবতের পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পাঠ শুনত; পাঠের পর পণ্ডিত রাজাকে জিজ্ঞাসা করত — রাজা বুঝেছ? রাজাও প্রত্যেক দিন জবাব দিত—পণ্ডিত, তুমি আগে বোঝ। পণ্ডিত বাড়ি এসে প্রত্যেক দিন ভাবত—আমি ভাগবতের পণ্ডিত, ভাগবত বুঝেছি বলেই তো রাজাকে ভাগবত শোনাই; তবে রাজা কেন প্রত্যেক দিন আমাকে আগে বোঝবার কথা বলেন? কয়েক দিন এইভাবে চিন্তা করবার পর একদিন পণ্ডিতের মনে হলো—ভাগবতের শব্দার্থ আমি বুঝেছি বটে, কিন্তু ভাগবতের তত্ত্বার্থ তো আমার অনুভব হয়নি; মহারাজ পরীক্ষিৎ সংসারের সব কিছু ত্যাগ করে ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে ভাগবত-কথা শুনেছিলেন, আর সেখানে উপস্থিত মুনি ঋষিরাও সেই একই মনের অবস্থা নিয়ে এসে মিলিত হয়েছিলেন; কিন্তু আমার মনের তো সেই অবস্থা আসেনি! পণ্ডিত তখনই সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন; যাবার আগে রাজাকে সংবাদ পাঠালেন—রাজা, এখন আমি বুঝেছি!

শুকদেবের কাছ থেকে শ্রীভগবানের কথা শুনতে শুনতে তিন দিন কেটে গেছে; এই তিন দিন মহারাজ পরীক্ষিৎ এক কণা অন্ন অথবা এক বিন্দু জলও মুখে দেননি; তন্ময় হয়ে ভাগবত-কথা শুনছেন। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ যাঁর কথা শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছেন, যিনি পরীক্ষিতের জন্মের সময় তার প্রাণ দান করেছিলেন, যিনি পরীক্ষিতের হৃদয় দেবতা—সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা তো এখনও আরম্ভই হলো না; এদিকে তিন দিন কেটে গেছে; আর তো মাত্র চারটি দিন অবশিষ্ট আছে। তাই এবার পরীক্ষিৎ নিজেই সেই প্রসঙ্গ তুলে শুকদেবকে প্রশ্ন করলেন ঃ

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্যয়োঃ।
রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১০-১-১ ॥
যদোশ্চ ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ ॥ ১০-১-২ ॥

এই হচ্ছে ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক; এই দুইটি শ্লোক দিয়েই পরীক্ষিৎ কৃষ্ণ-কথার অবতারণা করলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণ-কথা শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে শুকদেবকে প্রশ্ন করলেন—হে মুনি-শ্রেষ্ঠ! আপনি চন্দ্র ও সূর্য বংশের রাজাদের কথা এই তিন দিন ধরে বিস্তারিতভাবেই বলেছেন; সুতরাং চন্দ্র বংশোদ্ভূত ধর্মপরায়ণ মহাত্মা যদুর কথাও বলেছেন; সেই যদু-বংশে ভগবান বিষ্ণু বলরামের সাথে কৃষ্ণরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। এখন আপনি আমাদের কাছে কৃষ্ণ-বলরামের সেই মহাপ্রভাবময় লীলার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

ভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—ব্রহ্ম হচ্ছেন নির্গুণ, নিরাকার, সর্বব্যাপী; সেই তিনি, জগতের কল্যাণের জন্য সগুণ সাকাররূপে দেহ ধারণ করেন। ভগবান জন্ম-রহিত হয়েও অধর্মের বিনাশের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন, নিজে কর্তৃত্বশূন্য হয়েও মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হন।

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভগবান মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করে এমন সব মনোহর লীলা করেন, যাতে মানুষের মন স্বভাবতই তাঁর দিকে ধাবিত হয়। মনকে ভগবন্মুখী করতে হবে;

আর মনকে ভগবন্মুখী করা তখনই সম্ভব হবে যখন ভগবানের সাথে একটা ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে; ভালবাসা না হলে ভগবানের দিকে মন যাবে-ই না। এখন প্রশ্ন হলো—কেমন করে ভগবানের সাথে এই ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। শাস্ত্রে রয়েছে—তাঁর রূপ-চিন্তন, গুণ-কীর্তন, এবং তাঁর লীলা-স্মরণের দ্বারা ভগবানের প্রতি ভালবাসা হয়। নরহরি ঠাকুর ছিলেন চৈতন্যদেবের একজন পার্ষদ। মহাপ্রভুর লীলার বিষয়ে তিনি বলেছিলেন—এই লীলা আমি সবিশেষ লিখে রাখতে চাই; কিন্তু আমি তো লিখতে জানি না, ভাষা জ্ঞানও আমার নেই; তবুও মহাপ্রভুর এই লীলার একটু দিগ্‌দর্শন রেখে যাব, যাতে ভবিষ্যতে কোন ভাগ্যবান, এই দিগ্‌দর্শন থেকে মহাপ্রভুর পরম মনোহর লীলা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে; আর তখন মহাপ্রভুর এই লীলা-শ্রবণে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হবে—'গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা'।

ব্যাসদেব অতি অপরূপভাবে এবং ভাষায় কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনা করেছেন; আর তা শুনে, তা স্মরণ করে কত যে কয়লা-হৃদয় হীরকে পরিণত হয়েছে, কত যে পাপী মহাপুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

পরীক্ষিৎ কৃষ্ণ-কথা শুনতে চেয়েছেন; তাই শুকদেব তখন সমাহিত হয়ে কৃষ্ণ-কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১০-১-১৭ ॥

শুকদেব বললেন—কোন এক সময় অসংখ্য দৈত্যের অত্যাচারে পীড়িতা হয়ে পৃথিবী একটি গাভীর রূপ ধরে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন—অসুরদের অত্যাচার আমি আর সহ্য করতে পারছি না; আপনি এর প্রতিকার করুন। ব্রহ্মা তখন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদ সাগরে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে স্তব করতে লাগলেন; স্তব করতে করতে ব্রহ্মা সমাধিস্থ অবস্থায় শ্রীভগবানের বাণী শুনে দেবতাদের বললেন—ক্ষীরোদ-পতি বিষ্ণু পৃথিবীর দুঃখের কথা আগেই জেনেছেন এবং তা দূর করবার জন্য তিনি নিজেই এবার সপার্ষদ বসুদেবের পুত্র রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। ভগবানের অবতরণের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়ে শুকদেব আবার বলতে আরম্ভ করলেন।

তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ।
দেবক্যা সূর্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ ॥ ১০-১-২৯ ॥

শুকদেব বললেন—কোন এক সময় মথুরায়, যেখানে শ্রীভগবান সর্বদা বিরাজ করেন, সেই পুণ্যভূমি মথুরায় শূর বংশীয় বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে নব পরিণীতা পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে স্বগৃহে যাবার জন্য রথে আরোহণ করলেন। সেই সময় উগ্রসেন-পুত্র কংস তার ভগ্নী দেবকীর প্রীতির জন্য নিজেই সেই রথ চালাতে লাগলেন। বরবধূকে নিয়ে যখন রথ চলেছে সেই সময় কংসের প্রতি দৈববাণী হলো ঃ

অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥ ১০-১-৩৪ ॥

'রে মূর্খ! তুই যার রথের সারথি হয়েছিস, তারই অষ্টম গর্ভের সন্তান যে তোকে বধ করবে'! আকাশবাণী শুনেই সেই দুরাত্মা কংস তখন খড়্গ হস্তে দেবকীকে বধ করবার জন্য তার কেশ ধারণ করল। বসুদেব তখন সেই ঘৃণিত-কার্যকারী নিষ্ঠুর কংসকে ভগ্নি-বধ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য বলতে লাগলেন ঃ

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্বণি ॥ ১০-১-৩৭ ॥

হে কংস! যারা বীর, তারা তোমার বীরত্বের প্রশংসা করে থাকে ; আর তুমি হচ্ছ ভোজবংশের যশোবর্ধনকারী; সুতরাং তোমার পক্ষে ভগিনী বধ, বিশেষত এই বিবাহ উৎসবের দিনে শোভা পায় না।

সাধারণ মানুষ প্রাণের ভয়ে এইভাবেই অত্যাচারীর চাটুকারিতা করে থাকে। কিন্তু বসুদেবের মতো ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে এইরকম চাটুকারিতা শোভা পায় না। তাই টীকাকারেরা বলেছেন যে, বসুদেবের কথার একটি অন্তর্নিহিত বিপরীত অর্থ আছে। *শ্লাঘনীয় গুণঃ*—গুণ অর্থাৎ গৌণ, নিকৃষ্ট; অর্থাৎ হে কংস! বীরগণ যাদের বীরত্বের প্রশংসা করেন তাদের কাছে তুমি অতি তুচ্ছ; তা না হলে কেউ কি কখনও প্রাণের ভয়ে নিজের ভগ্নীকে বধ করতে পারে? যারা বীর তারা কখনই সহায়হীন দুর্বল স্ত্রীলোকের কাছে বীরত্ব প্রকাশ করে না। আর তুমিই হচ্ছ প্রকৃত *ভোজযশস্কর*—তোমা হতে ভোজ বংশের যশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কেন না সকলেই বলছে যে, ভোজ

বংশে উগ্রসেন প্রভৃতি মহানুভব রাজারা জন্মেছেন; এই পাপমতি কংস সেই মহান বংশের কলঙ্কস্বরূপ। বলছেন—তুমি যদি ধার্মিক হতে তবে কেউ কিছু বলত না; কারণ ভোজ বংশের মতো পবিত্র বংশে ধার্মিক লোকেরই জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার পাপ কর্ম দেখে লোকেরা তোমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতির গুণ-গান করছে। *স কথং ভগিনীং হন্যাৎ*— তুমি এমন গুণের সাগর, তুমি যে কেবল ভগিনী বধেই তৃপ্ত হবে, তা তো মনে হচ্ছে না; তোমার অনাচারে এতদিন পর্যন্ত যে ভোজ বংশ ধ্বংস হয়ে যায়নি, এ-ই আশ্চর্য। দুষ্ট কংস বসুদেবের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে না পেরে বোকার মতো প্রথম অর্থটি-ই গ্রহণ করেছিল।

বসুদেব আরও বললেন—জীব মাত্রেরই জন্মাবার সাথে সাথে তার মৃত্যুরও জন্ম হয়ে থাকে, অর্থাৎ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক হয়ে যায় যে একদিন তার মৃত্যু হবে-ই। সুতরাং মৃত্যু হচ্ছে জীবের চিরসাথী। অতএব আজই হোক অথবা একশ বছর পরেই হোক, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং মরণের ভয়ে ভীত হয়ে তুমি ঘৃণিত কাজ কেন করবে? মরবার সময় জীবেরা নিজের কর্মানুসারে এই দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে থাকে। আর যদি বল—অন্য দেহ হবে বটে, কিন্তু কিরকম দেহ যে হবে তার তো কোন স্থিরতা নেই। সাধারণ দেহ থেকে রাজদেহ দুর্লভ; সুতরাং জীব হিংসা করেও এই রাজদেহ রক্ষা করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। তার উত্তর এই যে, সূর্যের ছায়া যখন জলে পড়ে তখন বাতাসে সেই ছায়াই কাঁপে; সূর্য কিন্তু কাঁপে না। সেইরকম দেহে আত্মবুদ্ধি হওয়ার জন্য জীবেরাই দেহের ধর্ম—রোগ, শোক, জরা, মরণ ইত্যাদি ভোগ করে থাকে; আত্মার কিন্তু কোন কষ্ট হয় না। আর যে দেহকে রক্ষা করবার জন্য তুমি পাপাচরণ করবে, সেই দেহকে তো তুমি রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং অপরকে হত্যা করেও রাজদেহ বেশিদিন রক্ষা করা যায় না। বসুদেব এইভাবে যুক্তি বিচারের দ্বারা কংসকে দেবকী-বধ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেও কংস কিন্তু তার সংকল্প কিছুতেই ত্যাগ করল না। কংসকে ভগিনী-বধে কৃত-নিশ্চয় দেখে বসুদেব আর একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্য বললেন ঃ

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য! যদ্ বাগাহাশরীরিণী।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্॥ ১০-১-৫৪ ॥

হে কংস! আকাশবাণী যা বলেছে তাতে তো দেবকী থেকে তোমার কোন ভয়ের কারণ দেখা যাচ্ছে না; তবে যেহেতু দেবকীর পুত্র থেকে তোমার মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে তার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে দেবকীর পুত্র জন্মানো মাত্রই আমি তাদের তোমার হাতে অর্পণ করব। ভাবখানা এই যে, নবজাত শিশু নিতান্তই দুর্বল, সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না; কিন্তু তুমি তাকে অনায়াসেই বধ করতে পারবে। অতএব দৈববাণী হলেও এইভাবে শিশুদের বধ করে তুমি দৈববাণীকে অতিক্রম করতে পারবে; সুতরাং এখনই তোমার দেবকীকে বধ করবার দরকার নেই।

বসুদেব এইভাবে কংসের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন বটে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাবে যে, বসুদেব তাঁর অষ্টম পুত্রটিকে কংসের হাতে না দিয়ে গোপনে নন্দালয়ে রেখে এসেছিলেন। এতে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, বসুদেব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু টীকাকারেরা বসুদেবের কথার মধ্যে দ্ব্যর্থক ভাবের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরা বলেন—বসুদেব বলেছিলেন *যতস্তে ভয়মুত্থিতম্* যে পুত্রদের থেকে তোমার ভয় আছে, তাদের তোমার হাতে দেব। এখন যতস্তে এবং ভয়মুত্থিতম্—এই দুইটি শব্দের মধ্যে যদি একটি লুপ্ত 'অ' থাকে, তবে উচ্চারণে কোন পার্থক্য হবে না, কিন্তু অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। *যতস্তেঽভয়মুত্থিতম্* অর্থাৎ যাদের থেকে তোমার অভয়, কোন ভয়ের আশঙ্কা নেই, এমন পুত্রদেরই আমি তোমার হাতে সমর্পণ করব; প্রকারান্তরে বলা হলো যে পুত্রটি থেকে তোমার ভয় আছে সেই পুত্রটিকে কিন্তু আমি তোমায় দেব না। কংস সহজ অর্থই গ্রহণ করেছিল; দ্বিতীয় অর্থটি সে বুঝতেই পারল না।

কংস জানত যে বসুদেব কখনও মিথ্যা বলে না; তাই বসুদেবের কথায় বিশ্বাস করে কংস তখন দেবকী-বধে নিবৃত্ত হয়ে স্বগৃহে চলে গেল। বসুদেবও তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে—তিনি দেবকীকে রক্ষা করতে পেরেছেন ভেবে সানন্দে নিজের গৃহে ফিরে গেলেন। এইভাবে বসুদেব-দেবকীর বিবাহ উৎসব শেষ হলো।

শুকদেব ভাবে বিভোর হয়ে বলে যাচ্ছেন— সময় উপস্থিত হলে দেবকী প্রতি বৎসর একটি একটি করে আটটি পুত্র এবং সুভদ্রা নামে একটি কন্যা প্রসব করলেন। সত্য-প্রতিজ্ঞ বসুদেব মিথ্যাকে অত্যন্ত ভয় করতেন;

সেইজন্য তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য তাঁর প্রথম সন্তান কীর্তিমন্তকে অতি কষ্টে মৃত্যুরূপী কংসের হাতে দিলেন।

কংস তখন বসুদেবের সত্যনিষ্ঠা এবং শত্রু মিত্রে সমভাব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে হাসতে হাসতে বসুদেবকে বললেন—এই পুত্রটি থেকে আমার তো কোন ভয় নেই; সুতরাং তুমি একে ঘরে নিয়ে যাও। দৈববাণী বলেছে যে, তোমাদের অষ্টম পুত্রই আমার মৃত্যুর কারণ হবে। বসুদেব তখন সেই পুত্রটিকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু কপট-মতি কংসের কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না।

তখন দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে, কংস যদি বসুদেব-দেবকীর সাথে ভাল ব্যবহার করে তবে কংসের পাপের মাত্রা পূর্ণ হতে দেরি হবে; সুতরাং ভগবানও শিগ্‌গির অবতীর্ণ হবেন না। এইরকম চিন্তা করে দেবর্ষি নারদ তখন জগতের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যদের বধের উপায় স্থির করে কংসের কাছে এসে বললেন—হে মহারাজ কংস! এই যে বসুদেব দেবকী—এরা কিন্তু মানুষ নয়, এরা দেবতা। শুধু এরাই নয়, তোমার অনুগত ভোজবংশীয় যেসব জ্ঞাতি রয়েছে তাদেরও দেবতা বলে জানবে। পূর্ব জন্মে তুমি হিরণ্যাক্ষের পুত্র কালনেমি নামক অসুর ছিলে। বিষ্ণু তখন তোমায় বধ করেছিল। এবারও বিষ্ণু তোমায় বধ করবার ফন্দি করেছে; তুমি যে দেবকীর প্রথম সন্তানটিকে ছেড়ে দিলে, এটা ভাল করলে না; কারণ দৈববাণীতে অত বিশ্বাস করতে নেই। অষ্টম সন্তান তোমায় বধ করবে—এই জেনেই তুমি নিশ্চিন্ত আছ; কিন্তু অষ্টম তুমি কাকে বলবে? প্রথম থেকে গণনা করলে যে অষ্টম হবে, আবার সেখান থেকে গণনা করলে প্রথমটিই অষ্টম হবে; এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে গণনা করলে সবগুলোকেই অষ্টম বলা যায়—এই তো সোজা হিসাব! যাই হোক, আমি তোমায় কিছু গোপন কথা বলে গেলাম; এখন তুমি যেমন ভাল বুঝবে তা-ই করবে।

নারদ এই সব কূট পরামর্শ দিয়ে চলে যাবার পর কংস বুঝতে পারল যে, তাকেই বধ করবার জন্য এবার বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। তখন সে বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আবদ্ধ করে ভগবান বিষ্ণু—যিনি জন্ম রহিত, তাঁরই জন্মের আশঙ্কায় দেবকীর সন্তান

ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাদের একে একে বধ করতে লাগল। কংসের অত্যাচারের মাত্রা তখন এতই বেড়ে গেল যে, সে নিজের পিতা মহারাজ উগ্রসেনকে পর্যন্ত বন্দী করে নিজেই সৌর দেশ, মথুরা মণ্ডল ভোগ করতে লাগল। প্রজারাও অনেকেই কংসের অত্যাচারে মথুরা ছেড়ে যে যেখানে পারল পালিয়ে গেল।

এইভাবে কংস দেবকীর ছয়টি সন্তান বধ করবার পর দেবকীর সপ্তম সন্তান, যাঁর অপর নাম অনন্ত, তিনি দেবকীর আনন্দ এবং দুঃখ বর্ধন করে তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হলেন। আনন্দ এইজন্য যে, এরপরই শ্রীভগবানের আবির্ভাব হবে, যাঁর আশায় বুক বেঁধে তাঁরা এত কষ্ট সহ্য করছেন, যাঁকে পাবার আশায় তাঁরা যুগ যুগ ধরে কত তপস্যা করেছেন; সেই ভগবান এর পরই আসবেন। আর দেবকীর দুঃখ হলো এই ভেবে যে, পূর্বের ছয়টি সন্তানের মতো কংস এটিকেও বধ করবে।

দেবকীর মনের এই দুঃখ এবং ভয়ের কথা জেনে ভগবান তাঁর যোগমায়া শক্তিকে আদেশ করলেন—হে দেবি! দেবকীর গর্ভে আমারই অংশভূত সংকর্ষণ নামে যে পুত্রটি রয়েছে, তাকে তুমি আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর। পৃথিবীতে এসে যোগমায়া তখন দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন; লোকে জানল যে, দেবকীর এই গর্ভটি নষ্ট হয়ে গেছে।

এইবার শুকদেব শ্রীভগবানের আবির্ভাবের কথা বলছেন। সর্ব জগতের যিনি আধার সেই সর্বানন্দময় শ্রীভগবানের আধার হয়ে সর্বব্যাপী ভগবানকে গর্ভে ধারণ করেও দেবকী, বসুদেব প্রভৃতি দুই এক জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া, আর কারও কাছে আনন্দদায়িনী হতে পারেননি; কারণ তিনি যে তখন কংসের কারাগারে আবদ্ধ।

ভগবান দেবকীর গর্ভে অবস্থিত থাকায় দেবকীর অঙ্গচ্ছটায় তখন সমস্ত কারাগার উদ্ভাসিত হয়েছিল। এই অবস্থায় একদিন কংস দেবকীকে দেখে মনে মনে ভাবতে লাগল—এইবার আমার প্রাণহন্তা শ্রীহরি এর গর্ভে এসেছে; কারণ এর আগে তো কখনও দেবকীর এইরকম অঙ্গ-কান্তি দেখিনি! এইভাবে সর্বদা ভগবানের জন্মের কথা চিন্তা করে করে কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ। ১০-২-২৩ ॥

যাঁর কখনও জন্ম হয় না, সেই জন্ম-মৃত্যু-বিহীন শ্রীহরির জন্মের প্রতীক্ষা করতে লাগল। কেন? *হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ*—ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক শত্রুভাবের জন্য কংস ভগবানের জন্মের প্রতীক্ষা করতে লাগল। ভগবানকে শত্রুভাবে আরাধনা করার জন্যই কংসের জন্ম হয়েছিল। ভগবানকে সর্বদা শত্রুভাবে চিন্তা করে করে কংস তখন সর্বত্রই ভগবানকে দেখতে লাগল।

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥ ১০-২-২৪ ॥

শত্রুভাবের জন্য ভয়ে তখন কংস শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে—সব সময় ভগবানের কথা চিন্তা করে সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় দেখতে লাগল। 'যত্র যত্র দৃষ্টি পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে'—যারা কৃষ্ণের ভক্ত, যারা কৃষ্ণগত প্রাণ, তারা জগৎকে কৃষ্ণময় দেখে। কিন্তু এখানে দেখছি কংস শত্রুতা করেও জগৎময় কৃষ্ণ দেখছে। তাহলে কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণবিদ্বেষীর মধ্যে তফাত কোথায় রইল? তফাত এই যে, কৃষ্ণ-ভক্ত প্রেমে জগৎকে কৃষ্ণময় দেখে পরমানন্দে পূর্ণ হয়; আর কৃষ্ণ-বিদ্বেষী শত্রুভাবে সর্বত্র কৃষ্ণময় দেখে ভয়ে, হিংসায়, রাগে অত্যন্ত কষ্ট পেতে থাকে। সে যাই হোক, জগৎকে কৃষ্ণময় দেখে পরমানন্দই হোক আর পরম দুঃখই হোক, ফল কিন্তু একই—কৃষ্ণপ্রাপ্তি। সর্বত্র কৃষ্ণকে দেখে কংস তখন মহাভয়ে কালাতিপাত করতে থাকে—এই বুঝি বিষ্ণু তাকে বধ করতে ছুটে আসছে।

শ্রীভগবানের আবির্ভাবের সময় হয়েছে দেখে দেবতারা তখন অপরের অলক্ষিতে কংসের কারাগারে গিয়ে শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন ঃ

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥
১০-২-২৬॥

শ্রীভগবানের স্তব করতে এসে দেবতারা প্রথমে ভাবলেন—যিনি অচিন্ত্য, যাঁকে চিন্তা করাও যায় না, যিনি অনন্ত গুণসম্পন্ন, সেই শ্রীহরির স্তব করা কেমন করে সম্ভব? অনন্তদেব সহস্র মুখে, অনন্তকাল ধরে, যাঁর গুণ বর্ণনা করেও শেষ করতে পারেন না, আমরা কেউ চার মুখ (ব্রহ্মা),

কেউ পাঁচ মুখ (শিব) দিয়ে তাঁর গুণ বর্ণনা কতটুকুই বা করতে পারি? তবে যার বুদ্ধিতে যতটুকু তাঁর গুণ প্রকাশিত হয়, সে যদি ততটুকুই স্তবরূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে, তবে তিনি কৃপা করে তার সেই স্তবকে স্বীকার করে নেন অর্থাৎ স্তব করে ভগবানকে প্রকাশ করা যায় না; তবে তিনি ভক্তকে কৃপা করবার জন্য তার সেই স্তব স্তুতিকে স্বীকার করেন।

ভগবান তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেবতারা ক্ষীরোদ-সাগর তীরে গিয়ে পৃথিবীর ভার দূর করবার জন্য তাঁর স্তব করেছিলেন। সেই সময় তিনি পৃথিবীতে স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন বলে দেবতাদের কথা দিয়েছিলেন। ভগবান সেই কথা রেখেছেন; তাই দেবতারা বললেন—*সত্যব্রতং*— আপনি সত্যসংকল্প। যদি কোন লোক নিয়ম করে কিছু করে, কখনও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম না করে, তবে সেই নিয়মকে তার ব্রত বলা যায়। রাম অবতারে ভগবান বিভীষণকে বলেছিলেন ঃ

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মিতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

যুদ্ধকাণ্ড ১৮-৩৩॥

শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন—যদি কেউ আমার শরণাপন্ন হয়ে মাত্র একবার 'আমি তোমার হলাম'—এই বলে প্রার্থনা করে, তাহলে আমি চিরকাল তাকে অভয় দিয়ে থাকি—এই হচ্ছে আমার ব্রত। দেবতারা বলছেন—আমরা ক্ষীরোদ-সাগর তীরে গিয়ে আপনার শরণ নিয়েছিলাম। সেইজন্য আপনি নিজে আমাদের রক্ষা করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার ব্রত সত্য হলো—এইটি অনুভব করে আমরা পরম আনন্দ লাভ করেছি। আপনি সত্যব্রত।

সত্যপরং—কেবলমাত্র সত্যকে আশ্রয় করেই যাঁর চরণাশ্রয় লাভ করা যায়, তিনিই হচ্ছেন সত্যপর অর্থাৎ ভগবান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন 'সত্যই কলির তপস্যা; যে সত্যকে ধরে থাকে, সে সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করে।'

ত্রিসত্য—যে জিনিস আগে ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, তা-ই হচ্ছে ত্রিসত্য। জাগতিক কোন জিনিসই ত্রিসত্য হতে পারে না;

একমাত্র ভগবানই ত্রিসত্য—অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই তিনি বর্তমান। দেবতারা বলছেন আপনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, স্থিতিকালে রয়েছেন এবং জগতের ধ্বংসের পরেও থাকবেন। কারণ এই যে সত্য, পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের আপনিই উৎপত্তি-স্থল, এই পঞ্চভূতে অন্তর্যামিরূপে আপনিই বর্তমান থাকেন, আবার যখন এই পঞ্চভূতের লয় হয়, তখনও আপনি থাকেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে রয়েছে তৎ *সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ (২-৬)*—ভগবান জগৎ সৃষ্টি করে অন্তর্যামিরূপে তাতে প্রবেশ করলেন। *তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত*—ভগবান থেকেই জগতের উৎপত্তি, তিনিই জগতের পালক এবং মহাপ্রলয়ের সময় জগৎ তাঁতেই লীন হয়। এই তত্ত্বটি জেনে সর্বকামনা পরিত্যাগ করে তাঁর উপাসনা কর। দেবতারা বলছেন—সত্যবাক্য এবং সর্বত্র সমদর্শন দ্বারাই আপনাকে লাভ করা যায়। তাই কায়মনোবাক্যে আমরা *সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ*—সত্যস্বরূপ আপনার শরণাগত হলাম।

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥
১০-২-২৮॥

এই সংসারের আপনিই একমাত্র উৎপত্তির কারণ; আপনিই এর পালনকর্তা, আবার আপনিই এর সংহারকর্তা। তবে যদি বলেন—আমি কেন? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এরাই তো সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন; সুতরাং আমাকে এইসব কথা বলছ কেন? তার উত্তরে দেবতারা বলছেন—আপনার মায়ায় যাদের বুদ্ধি আবৃত হয়েছে, তারাই আপনাকে ব্রহ্মাদি থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে; কিন্তু যারা বিদ্বান, তারা আপনাকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপে দেখে থাকেন।

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি নানা মূর্তিতে ভগবান জগতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, ধর্মস্থাপন প্রভৃতি লীলা করেছেন। আবার *একমেবাদ্বিতীয়ম্*—এই শ্রুতিবাক্যে, তিনি এক—এটাও বোঝা যায়। কিন্তু যারা অজ্ঞ, তারা ভগবানের একত্বে এবং বহুত্বে সামঞ্জস্য করতে না পেরে ভুল সিদ্ধান্ত করে বসে। শ্রুতি বলছে *একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি*—এক হয়েও যিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন। সুতরাং ভগবানের মধ্যে একত্বে ও বহুত্বে বিরোধ

নেই—তিনি এক হয়েও বহুরূপে প্রকাশিত হন। ভক্তেরা শ্রীভগবানকে যে যে মূর্তিতে উপাসনা করেন, তিনি কৃপা করে তাঁদের সেই সেই মূর্তিতেই দর্শন দেন। সুতরাং ভগবানের বহু মূর্তি স্বীকারে দোষ নেই; কিন্তু তাঁর একত্ব লোপ করাই দোষের। দেবতারা বলছেন—মায়া-মোহিত ব্যক্তিরা শ্রীভগবানের একত্ব না বুঝে কেবলমাত্র বহুত্বই দেখে থাকে। আর মায়ামুক্ত লোকেরা একই ভগবানে নানা মূর্তি দেখে আনন্দ করেন। দেবতারা বলছেন—যে যাই বলুক না কেন, আমরা কিন্তু স্পষ্টই জেনেছি যে, আপনি লীলার জন্য দেহ ধারণ করেছেন; আপনি বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন, আপনিই রুদ্ররূপে সংহার করেন; আপনিই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি নানা-রূপে নানা লীলা করেছেন, আবার আপনিই ব্রহ্মরূপে সর্বত্র অবস্থিত। যে আপনাকে জানে, সে সবই জানে; আর যে আপনাকে জানে না, সে কিছুই জানে না।

হে প্রভু! আপনি যদি বলেন যে, আমি দেবকীর পুত্রমাত্র; তবে তোমরা আমার স্তব করছ কেন? তার উত্তরে বলছি—আপনি জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা। এই জগতের মঙ্গলের জন্য, ধার্মিকদের সুখকর এবং অধার্মিকদের নাশকর বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ আপনি বার বার ধারণ করে থাকেন। অতএব আপনি কারও পুত্র নন।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সর্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের অজ্ঞান দূর হয় কিন্তু লীলার আস্বাদন হয় না। তাই ভগবান সর্বব্যাপী নিরাকার হয়েও লীলার জন্য রূপ ধারণ করেন। দেবতারা জানেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন।

হে পদ্মপলাশলোচন! আপনি হচ্ছেন যাবতীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার-স্বরূপ। যারা বিবেকবান, তাঁরা আপনার চরণকেই একান্তভাবে আশ্রয় করে সেই চরণ-তরীর সাহায্যে ভবসাগর অনায়াসে পার হয়ে যান।

শ্রীভগবান তাঁর নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি যখন জগতে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দর্শন করে তাঁর সেবা করে ভক্তেরা কৃতার্থ হন। অসুর-প্রকৃতি দুষ্ট লোকেরাও সেই সময় তাঁর সংস্পর্শে এসে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু জগতের এই সৌভাগ্য তো বেশি দিন স্থায়ী হয় না। বহুকাল পরে শ্রীভগবান প্রকট হয়ে অল্প দিন-ই এই জগৎকে ধন্য করে আবার অপ্রকট হয়ে যান। ভগবানের

প্রকট লীলায় যারা তাঁর দর্শন পায়নি তারা ভাবে—আমার তো তখন জন্মগ্রহণ করবার সৌভাগ্য হয়নি—আমার কি গতি হবে? নরোত্তম দাস চৈতন্যদেবের সময় জন্মগ্রহণ করতে পারেননি বলে দুঃখ করে বলেছিলেন—তখন না হইল জন্ম/এবে দেহে কিবা কর্ম / বৃথা মাত্র বহি দেহভার।

ভগবানের তিরোধানে হতাশ জীবের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে দেবতারা বলছেন—হে প্রভু! আপনার প্রকট-লীলায় যারা আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে, তাঁরা পরম ভাগ্যবান। অন্য সময়ে আপনার শ্রীমূর্তি ধ্যান করেই জীবেরা ভব-সাগর পার হয়ে যায়।

স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্র-সৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহ-নাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥
১০-২-৩১॥

হে স্বপ্রকাশ! ভক্তের প্রতি আপনার অসীম কৃপা। আপনার কৃপায় তাঁরা আপনার চরণাশ্রয় লাভ করে এই দুস্তর ভব-সাগর পার হয়ে যান। বিষয়াসক্ত দীনজনের উপর আপনার ভক্তের বড় করুণা। তাই তাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায় রূপে আপনার চরণ-তরী জগতেই রেখে যান। এইভাবে শিষ্য পরম্পরায় ভক্তদের ভব-নদীর পারে যাবার উপায় হয়ে থাকে। যে একবার আপনাকে আশ্রয় করেছে, তাঁর আর অন্য কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না; আপনি নিজেই তার উদ্ধার করেন।

হে কমললোচন! যারা আপনার চরণাশ্রয় না করেই দম্ভভরে নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তির অভাবের জন্য তাদের চিত্ত নির্মল হয় না। সেই মলিন-চিত্ত লোকেরা সাধনা করে কিছুটা অগ্রসর হলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করার জন্য তারা আবার অধঃপতিত হয়।

যাদের ঠিক ঠিক জীবন্মুক্তির অবস্থা হয় নি, কিন্তু ভ্রান্তিবশত নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে এবং ভাবে 'আমি মুক্ত হয়েছি, আমার আর কিছু করার নেই। আমি আর ভগবান এক-ই; সুতরাং তাঁর চরণাশ্রয় লাভের আমার কোন প্রয়োজন নেই'—এইরকম ভ্রান্ত মুক্তাভিমানী ব্যক্তিরা আপনাকে অবজ্ঞা করে অধঃপতিত হয়। কিন্তু আপনার চরণাশ্রিত ভক্তদের কখনও অধঃপতন হয় না। যদিও বা কখনও তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁদের জন্মান্তর

গ্রহণ করতে হয়, তবুও তাঁদের ভক্তি নিত্য আপনাতে আবদ্ধ বলে তাঁদের কখনও অধোগতি বা বিনাশ হয় না। *ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি*—আমার ভক্তের কদাচ বিনাশ নেই। সেইজন্য আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়ে ভক্তেরা গুরুতর বিঘ্নসমূহের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করে থাকে।

জগৎ পালনের জন্য মানুষের মঙ্গলপ্রদ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর আপনি ধারণ করেন। লোকে ঐ মূর্তি অবলম্বন করে চতুরাশ্রম ধর্ম পালন করেন। ব্রহ্মচারীরা বেদ অধ্যয়ন দ্বারা, গৃহস্থেরা কর্মযোগ অবলম্বন করে, বানপ্রস্থীরা তপস্যার দ্বারা এবং সন্ন্যাসীরা সমাধির দ্বারা আপনারই পূজা করে থাকেন। আপনি যদি শরীর ধারণ না করতেন, তবে আপনাকে পূজা করতে না পেরে কারুর-ই সিদ্ধি লাভ হতো না। যদি বলা যায় শাস্ত্রেই তো ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীদের কর্তব্য নির্ধারিত আছে—লোকে সেই সেই কর্তব্য পালন করলেই তো জ্ঞান লাভ করতে পারবে; তবে আর অবতারের জন্মের দরকার কি? এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। কিরকম জান? গরুর যেখানটাই ছোঁবে গরুকেই ছোঁয়া হবে; কিন্তু গরুর বাট থেকেই দুধ হয়; দুধ পেতে হলে গরুর বাট ছুঁতে হবে। সেইরকম ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হলে অবতারের প্রয়োজন হয়'।

হে ধাতঃ, হে সর্বশক্তিমান! বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আপনার এই শরীর যদি প্রকটিত না হতো, তবে ভজনের অভাবে মানুষের অজ্ঞান দূর না হয়ে জ্ঞানের উদয় হতো না; আর জ্ঞানের উদয় না হলে কারও ভাগ্যে আপনার দর্শন লাভ হতো না। বুদ্ধি এবং অন্যান্য জড় গুণের দ্বারা আপনার ঈশ্বরত্ব বা অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে; কিন্তু তাতে আপনার দর্শন লাভ হয় না। আপনার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে ধ্যানে সেই বিগ্রহের সেবা করলে ভক্তেরা আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করতে পারে। এখানে বলা হলো যে, নিত্য শ্রীবিগ্রহের দর্শন এবং তাঁর সেবা করা ভক্তের অবশ্য কর্তব্য।

ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥
১০-২-৩৬॥

হে দেব! মন অথবা বাক্যের দ্বারা আপনার বিষয় নিরূপণ করা যায় না—কেবল অনুমানই করা যায় মাত্র। সুতরাং গুণ, কর্ম এবং জন্মের দ্বারা আপনার নাম ও রূপ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। গুণ কি—না, আপনি ভক্তবৎসল; কর্ম কি—না, আপনি গোবর্ধন-ধারণ, কালীয়-দমন ইত্যাদি করেছেন; জন্ম কি—না, আপনি দেবকী সুত। সুতরাং এই যে আপনার বিভিন্ন নাম—ভক্তবৎসল, গোবর্ধনধারী, দেবকীনন্দন ইত্যাদি—এই সমস্ত নামের দ্বারা আপনার সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায় মাত্র; কিন্তু এসবের দ্বারা আপনার স্বরূপের দর্শন হয় না; কারণ আপনি হচ্ছেন বাক্য মনের অতীত, সাক্ষীস্বরূপ। এইভাবে আপনি সর্বলোকের অগোচর হলেও ভক্তেরা কিন্তু আপনাকে দর্শন করে থাকেন; কারণ ভক্তের কাছে আপনি স্বপ্রকাশ।

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে ॥
১০-২-৩৭॥

দেবতারা বলছেন—হে প্রভু ! যে-সকল ভক্তেরা নানা কাজের মধ্যেও সর্বদা আপনার নাম ও রূপ শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করেন তাদের আর এ সংসারে ফিরে আসতে হয় না।

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ অজ্ঞেয় এবং তিনিই সর্বজ্ঞানের জ্ঞাতা। জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর অনুভব হয়, কিন্তু জ্ঞাতার অনুভব হয় না। সুতরাং শ্রীভগবানের স্বরূপানুভবের প্রয়াস বৃথা। শ্রুতিও বলেছে —*বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ*—যিনি সর্বজ্ঞানের জ্ঞাতা, তাঁকে কেমন করে জানা যাবে? আবার শ্রুতিই বলছে—*তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়*—ভগবানের স্বরূপানুভব ছাড়া সংসার-মুক্তির আর অন্য কোন উপায় নেই। ভগবান যদি অজ্ঞেয় হন তবে জীবের মুক্তির উপায় কি? আগের শ্লোকে বলা হয়েছে, ভগবান অভিমান-বিজড়িত জ্ঞানের বিষয় না হলেও ভক্তের শরণাগতির কাছে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তাই এই শ্লোকে দেবতারা বলছেন যে, ভগবানের নাম-গুণ-গান সর্বদা করলে ভক্তের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতা ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যামো গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্ ॥ ১০–২-৩৮ ॥

হে সর্বদুঃখহারিন্! আপনি সর্বেশ্বর। আমাদের মহাসৌভাগ্য যে আপনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাতেই পৃথিবীর ভার দূর হয়েছে। আপনার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কিত পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করে পৃথিবী অলঙ্কৃতা হবেন এবং অসুরকুল বিনাশ করে আপনি স্বর্গকে অনুগৃহীত করবেন। ভগবান হচ্ছেন সর্বেশ্বর; তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে; তাঁরই ইচ্ছাতে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র নিজ নিজ পথে চলেছে; তাঁরই ইচ্ছাতে দেবতারা ক্ষীরোদ-সাগর তীরে গিয়ে স্তুতি করেছিলেন; আবার তাঁরই ইচ্ছাতে দেবতারা কংসের কারাগারে এসে দেবকীর গর্ভজাত ভগবানের স্তব করছেন। দেবতারা বলছেন—আপনি তো ইচ্ছামাত্রই পৃথিবীর ভার দূর করতে পারেন; তবুও যে আপনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে বুঝতে পারছি যে পৃথিবীর দুঃখ দূর করা ছাড়াও আপনি আরও বহু লীলা করবেন, যা দেখে আমরা কৃতকৃতার্থ হব।

শ্লোকে *ত্বৎ পদৈঃ* না বলে *ত্বৎপদকৈঃ* বলা হয়েছে। অল্পার্থে ক-প্রত্যয়—ক্ষুদ্র পদচিহ্ন বলা হয়েছে। ভাবটি এই যে, বামন অবতারে শ্রীভগবান যখন বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি চেয়েছিলেন তখন তিনি পৃথিবীতে এক চরণ এবং স্বর্গে এক চরণ প্রসারিত করেছিলেন। শ্রীভগবানের প্রসারিত চরণ স্বর্গ অতিক্রম করে মহঃ, জনঃ, তপঃ, এবং সত্যলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। দেবতারা তখন ত্রিবিক্রমের চরণের অন্ত পাননি। এবার ভগবান নরলীলা করবেন; তাই দেবতারা আনন্দে ভাবছেন—এবার অসীমকে সীমার মধ্যে পাব। ত্রিবিক্রমের লীলার সময় দেবতারা তাঁর চরণের একটা অংশ মাত্রই দেখেছিলেন; এবার কৃষ্ণ লীলায় তাঁরা ভগবানের সমগ্র চরণই দর্শন করে কৃতার্থ হবেন।

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥
১০-২-৩৯॥

হে পরমেশ্বর! আপনি যে আমাদের প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে আমাদের মঙ্গলের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন—এই যদি আমরা ভাবি, তবে তা হবে আমাদের অভিমানের কথা; কারণ আপনি জন্মরহিত; কেবলমাত্র লীলা বিলাসের জন্যই আপনি জন্ম-রহিত হয়েও জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই লীলা বিলাস ছাড়া আপনার জন্মের আর কোন কারণ-ই থাকতে পারে না। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের জন্য যে, আপনি জন্ম পরিগ্রহ করেন তাও বলা যায় না; কারণ আপনার মায়াশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ঐসব কাজ করে যাচ্ছেন। অতএব কেবলমাত্র লীলা বিলাস করা এবং ভক্তদের সেই লীলামৃত পান করিয়ে পরম আনন্দ দেবার জন্যই আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনং চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ১০-২-৪০ ॥

হে প্রভু! আপনি পূর্বে মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, রাজন্য (রামচন্দ্র), পরশুরাম, বামন প্রভৃতি বহুবিধরূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের এবং পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন। এবারও আপনি পৃথিবীর ভার দূর করে আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। হে যদুবর! আমরা নতমস্তকে আপনাকে বার বার প্রণাম করি।

দেবতারা এইভাবে অপরের অলক্ষিতে কংসের কারাগারে এসে ভগবানের স্তব করে দেবকীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—মা! আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার গর্ভে এসেছেন; সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, কংসের মৃত্যুর আর দেরি নেই। সেজন্যই কংস এখন এত অত্যাচার আরম্ভ করেছে। যাই হোক, আপনি আর ভয় করবেন না। আপনার গর্ভস্থ এই সন্তান যদুকুল রক্ষা করবে। সুতরাং আপনার কিংবা বসুদেবের আর কোন ভয় নেই।

এইভাবে দেবতারা করজোড়ে চিন্ময়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে এবং দেবকীকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার স্বর্গে চলে গেলেন।

১৬

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম ও কংসের মন্ত্রণা

দেবতারা সকলের অলক্ষিতে শ্রীভগবানের স্তব করে কংসের কারাগার থেকে চলে যাবার পর শ্রীভগবানের জন্মলগ্ন উপস্থিত হলো। সেই সময় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি শান্ত ভাব ধারণ করল; জলাশয়ে পদ্মফুল ফুটে উঠল; মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল এবং আকাশে রোহিণী নক্ষত্রের উদয় হলো। মুনিঋষিদের মন এই শুভমুহূর্তে এক অজানা আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল এবং স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠল। সেই সময় সবাই অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে। সমস্ত আকাশে বাতাসে যেন কি এক অপার্থিব আনন্দের প্লাবন বইতে লাগল। ঠিক এই সময় শ্রীভগবান কংস-কারাগারে বসুদেব-দেবকীর সম্মুখে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হলেন। শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করছেন ঃ

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ॥
মহার্হ-বৈদুর্য-কিরীট-কুণ্ডল-ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দাম-কাঞ্চ্যঙ্গদ-কঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥
১০-৩-৯/১০ ॥

ভগবান পরম সুন্দর মূর্তিতে আর্বিভূত হয়েছেন। ভক্তের ধ্যানগম্য সেই অপরূপ রূপ বসুদেব অপলক নয়নে দেখতে লাগলেন। জগতের সাধারণ মানুষও যাতে যুগ যুগ ধরে সেই অতিসুন্দর রূপের ধ্যান করতে পারে, তার জন্য শুকদেব সেই রূপের কিছুটা বর্ণনা করেছেন।

সেই শিশু পদ্মপলাশলোচন, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং গলদেশে কৌস্তভ মণি শোভা পাচ্ছে। পীতাম্বর পরিহিত তাঁর শরীরের বর্ণ হচ্ছে নবজলধরশ্যাম। তিনি মহামূল্য বৈদুর্য মণি সংযুক্ত কিরীট ধারণ করেছেন; কুণ্ডলের জ্যোতিতে কুন্তলরাশি উদ্ভাসিত হয়েছে। এমন অদ্ভুত মহা-তেজোময় বালককে বসুদেব প্রাণভরে দেখতে লাগলেন।

শ্রীভগবান তাঁর পুত্ররূপে জন্মেছেন দেখে বিস্ময় এবং আনন্দে বসুদেবের নয়ন-যুগল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বসুদেব যদিও তখন কংসের কারাগারে আবদ্ধ তবুও তিনি মনে মনেই ব্রাহ্মণদের দশ হাজার দুগ্ধবতী গাভী দান করলেন। বসুদেবের বিস্মিত হবার চারটি কারণ বলা হয়েছে ঃ

প্রথম—বসুদেব ভাবলেন—আমি মায়ামুগ্ধ জীব, কংসের কারাগারে আবদ্ধ রয়েছি; জানি না কোন্ মহাসৌভাগ্যের ফলে মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত যুগ যুগ তপস্যা করে যাঁর দর্শন পান না, আমি কি না এই কারাগারে বসেই তাঁর দর্শন পেলাম; এও কি সম্ভব!

দ্বিতীয়—যিনি পরব্রহ্ম, সর্বব্যাপী তিনি কেমন করে মানুষের গর্ভে জন্ম নিতে পারেন? অসীমকে কি সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায়!

তৃতীয়—সাধারণত উলঙ্গ অবস্থাতেই তো শিশুদের জন্ম হয়ে থাকে ; কিন্তু এই অদ্ভুত শিশু যে পীতবস্ত্র এবং বিবিধ ভূষণে সজ্জিত হয়ে চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করেই আবির্ভূত হয়েছেন।

চতুর্থ—যিনি মহাকালেরও কালস্বরূপ, সেই আদিপুরুষ নারায়ণ কি না আমার মতো ক্ষুদ্র জীবের কংস-ভয় দূর করার জন্য, আমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন। মরি মরি, এঁর দয়ার সীমা পরিসীমা নেই।

শিশুর অঙ্গ-জ্যোতিতে তখন সমস্ত সূতিকাগৃহ আলোকিত হয়েছে দেখে বসুদেব নিশ্চিতরূপে অনুভব করলেন যে, যথার্থ-ই শ্রীভগবান আবির্ভূত হয়েছেন। কংস-জনিত ভয় দূর হওয়াতে বসুদেব তখন অবনত মস্তকে করজোড়ে সেই শিশুরূপী ভগবানের স্তব আরম্ভ করলেন ঃ

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ১০-৩-১৩ ॥

বসুদেব বললেন—হে ভগবন্! আপনি সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ন্তা নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং সকলের অন্তর্যামী। যিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, তিনি তো কারও গোচরীভূত হন না; তাঁকে অনুভব করেই আনন্দ হয়। সেই আপনি যে আমার পুত্ররূপে আমার সম্মুখে রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন, এটা আমার পরম সৌভাগ্য। বসুদেব বলছেন —আপনি প্রকৃতির নিয়ন্তা, পরম পুরুষ; অপরের কাছে আপনি অজ্ঞেয়

হলেও আমি কিন্তু আপনাকে প্রত্যক্ষ জেনেছি এবং সাক্ষাৎ দেখছি; এই তো আমার প্রতি আপনার অপার কৃপা।

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ ১০-৩-১৪॥

বসুদেব বলছেন—সৃষ্টির পূর্বে ভগবান নিজের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে বশীভূত করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করে অন্তর্যামিরূপে তাতে প্রবেশ করেন বলে মনে হয়। ভগবান যিনি সর্বব্যাপী তাঁর পক্ষে তো কোথাও প্রবেশ করা সম্ভব নয়; অসীম কেমন করে সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে? কথাটা হলো এই যে, ভগবান সর্বব্যাপী, তাই তিনি সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছেন বলে মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা, তিনি দেবকীর গর্ভজাত নন। বসুদেব ভাবছেন—ভগবান ভক্তকে কৃপা করার জন্য আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু আমি কেমন করে তাঁর পিতা হতে পারি? তাই বলছেন—আপনি দেবকীর গর্ভজাত নন—আপনি বিশ্ব-পালক। বসুদেবের কৃষ্ণ-স্তুতি পড়লে মনে হয়, তিনি কখনও তাঁকে ভগবানরূপে আবার কখনও বা পুত্ররূপে দেখে থাকেন।

যেসব লোক দেহ এবং অন্যান্য বস্তুকে আত্মা ছাড়া পৃথক্ বলে মনে করে, তারা মূর্খ; কারণ শ্রুতি বলছে—*আত্মৈবেদং সর্বং*—আমরা যা কিছু দেখছি সবই আত্মা বলে জানবে—আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন কিছুরই পারমার্থিক সত্তা নেই; সুতরাং ভগবানই সর্বাত্মা, সর্বস্বরূপ, সর্বব্যাপী। বসুদেব বলছেন—দেহাদি কোন বস্তুই চিরসত্য নয়—একমাত্র আত্মাই চিরসত্য; সুতরাং আত্মাকে ছেড়ে যারা দেহাদি ভোগসুখের জন্য লালায়িত হয়, তারা নিতান্তই মূর্খ। আপনার যারা ভক্ত, তারা পরমাত্মস্বরূপ আপনাকে ছাড়া অনিত্য বস্তুকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করে; আর অজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ সব অনিত্য বস্তুকেই পরম আদরে গ্রহণ করে থাকে।

হে সর্বব্যাপক! আপনি নিস্পৃহ, সর্বচেষ্টারহিত, গুণাতীত এবং বিকার-শূন্য হলেও আপনার থেকেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়ে থাকে—এই তো শাস্ত্রের কথা। আপনি নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নির্বিকার হয়েও যে সৃষ্টি

স্থিতি প্রলয় করছেন—এতে কোন বিরোধ হয়নি। আপনার আশ্রিত প্রকৃতি-ই সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের দ্বারা এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করে থাকেন। আপনি প্রকৃতিরও কর্তা বলে প্রকৃতির ঐসব কাজও আপনাতেই আরোপিত হয়।

হে প্রভু! আপনি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নির্বিকার হয়েও কৃপা করে জগৎ-পালনের জন্য শুদ্ধ সত্ত্বময় বিষ্ণু রূপ, জগৎ সৃষ্টির জন্য রজোগুণাত্মক রক্তবর্ণ ব্রহ্মা-মূর্তি এবং জগৎ সংহারের জন্য তমোগুণাত্মক কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রমূর্তি প্রকাশ করে থাকেন।

হে বিভো! হে সর্বব্যাপিন্! আপনি এই জগতের পরিপালনের জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন; এই অবতারে রাজ-রূপী বহু অসুরকে আপনি সসৈন্যে বধ করবেন।

অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ ॥
১০-৩-২২ ॥

হে সুরেশ্বর! আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণ হবেন—এই দৈববাণী শুনে, এই পাপাত্মা কংস আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের আগেই বধ করেছে; এখন দ্বার-রক্ষীদের কাছে আপনার জন্ম-সংবাদ শুনে সে এখনই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে আসবে।

বসুদেব কারাগৃহে তাঁর পুত্রকে দর্শন করলেন মহা ঐশ্বর্য-মণ্ডিত চতুর্ভুজ রূপে; সুতরাং সাক্ষাৎ অনুভব করেছেন যে, স্বয়ং ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন; একই সঙ্গে ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্য-জ্ঞান এবং বাৎসল্য-প্রেমে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। বসুদেব স্তব করছেন—আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে থাকেন; আপনি নির্গুণ, নিরাকার, সর্বব্যাপী। কিন্তু আপনার স্বরূপকে কেউ-ই ঠিক বুঝতে পারে না; তাই জগতের কল্যাণের জন্য কৃপাপরবশ হয়ে আপনি দেহ ধারণ করে থাকেন; অসীম হয়েও সীমার মধ্যে প্রবেশ করেন। আপনার কৃপার কথা বলে শেষ করা যায় না। আপনার ভক্তদের রক্ষা করার জন্য আপনি আমার গৃহে আমার পুত্ররূপে এসেছেন। আপনি পরমপুরুষ জগৎ-পিতা হয়েও

আমাকে পিতা বলে স্বীকার করেছেন। আমি এখন কংসের কারাগারে রয়েছি; তাই আমাকে কৃপা করার জন্য আপনি এই কারাগারেই আবির্ভূত হয়েছেন। যাঁর নামে জীবের ভব-বন্ধন দূর হয়, তিনি ভক্ত বাৎসল্যের জন্য স্বয়ং কারাগারের বন্ধন স্বীকার করলেন। আপনি তো সর্বশক্তিমান—ইচ্ছামাত্রই সব কিছু করতে পারেন। কয়েকটি অসুরকে বধ করার জন্য তো আপনার আসার দরকার ছিল না; কাউকে শক্তি সঞ্চার করলে, সেইতো সমস্ত অসুরকুল সংহার করতে পারত; তবুও আপনি নিজে আমার কাছে এসেছেন—এ-ই তো আপনার মহান করুণা।

বসুদেব ভাবছেন—আমি বুঝেছি, জেনেছি, আপনি সর্বশক্তিমান; কংস আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না; কিন্তু কী দুর্দৈব! পিতৃস্নেহে অন্ধ হয়ে আপনার স্বরূপের কথা ভুলে আপনাকে কংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। তাই বলছি যে, কারারক্ষীদের কাছে আপনার জন্মের সংবাদ শুনে, কংস এখনই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আপনাকে বধ করার জন্য ছুটে আসবে।

ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্য ও বাৎসল্যভাবে বসুদেব একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন; তাঁর বাক্ রুদ্ধ হলো, চোখ দিয়ে অবিরল প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগল; অপলক নয়নে তিনি পুত্ররূপী কৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন এবং বার বার শঙ্কিত হতে লাগলেন—এই বুঝি কংস এসে পড়ল। ভাগবতকার এইভাবে বসুদেবের অতি অপরূপ ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ভীতা শুচিস্মিতা ॥ ১০-৩-২৩ ॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ! বসুদেব এইভাবে ভগবানের স্তব করার পর কংস-ভয়ে ভীতা দেবকী পুত্রের শরীরে মহাপুরুষের লক্ষণসকল দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে শ্রীভগবানের স্তব করতে আরম্ভ করলেন।

বসুদেব যখন ভগবানের স্তব করছিলেন, তখন দেবকী পুত্রের সর্ব শরীর ভালভাবে দেখতে লাগলেন। দেখলেন—তাঁর নবজাত পুত্র পীতবস্ত্র পরিধান করে রয়েছেন; কেয়ূর, কুণ্ডল প্রভৃতি মণিময় রত্নালঙ্কারে সর্বাঙ্গ ঝলমল করছে। বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ মণি এবং বনমালায় পরিশোভিত। চার

হাতে রয়েছে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম; পুত্রের অঙ্গ-জ্যোতিতে কারাগার উদ্ভাসিত হয়েছে। পুত্রের শরীরে এইসব অপার্থিব লক্ষণ দেখে দেবকী ভাবলেন—তবে তো সেই তিনিই জন্ম পরিগ্রহ করেছেন—যাঁর সম্বন্ধে দৈববাণী হয়েছিল এবং যা শুনে কংস আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেছে। যাঁর আগমন প্রতীক্ষায় আমরা দুঃসহ কারাগার-যন্ত্রণা সহ্য করছি এবং যাঁর চরণাশ্রয়ে জীবের ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়—সেই পরমপুরুষ ভগবান যথার্থ-ই আবির্ভূত হয়েছেন!

দেবকী ভাবছেন—কি আশ্চর্য! পরমপুরুষ ভগবান আমার গর্ভে জন্মেছেন! হায়, আমি এখন কি করি! আমার গর্ভের সন্তানেরা তো কেউ-ই কংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি; এখন এই শিশু পুত্রকে আমি কি করে রক্ষা করব? পুত্রকে ঈশ্বর-ভাবে দেখে দেবকীর বিস্ময় এবং সন্তান-ভাবের জন্য দেবকীর ভয়—একই সঙ্গে দেবকীকে বিহ্বল করে তুলল। তাই তিনি করজোড়ে পুত্ররূপী শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন ঃ

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥
১০-৩-২৪ ॥

হে প্রভু! বেদে যাঁকে অব্যক্ত, সর্বকারণের কারণ, বৃহত্তম, চেতন-স্বরূপ, নির্গুণ, নির্বিকার, সত্তামাত্র, নির্বিশেষ, নিশ্চেষ্ট এবং অনির্বচনীয় তত্ত্ব বলা হয়ে থাকে, আপনি সেই সর্বতত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশক সাক্ষাৎ ভগবান।

দেবকী বলছেন—আপনার স্বরূপ নির্ণয় করা অথবা তা প্রকাশ করার সাধ্য কারুর-ই নেই। মন আপনাকে মনন করতে পারে না, ইন্দ্রিয়গুলি আপনাকে অনুভব করতে পারে না; সেইজন্য আপনি বাক্য-মনের অতীত অনির্বচনীয়; আপনাকে ব্যক্ত করা যায় না বলেই যে আপনার অস্তিত্ব নেই—এমন কথা বলা যায় না কারণ আপনিই সর্বকারণের কারণ; আপনার থেকেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় কিন্তু আপনার উৎপত্তি নেই; তবু যে দেখতে পাচ্ছি আপনি আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এটা আপনার উৎপত্তি নয়—কৃপাপরবশ হয়ে আপনি আপনার নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেছেন এবং এইটি-ই যেন উৎপত্তির মতো প্রতীয়মান হচ্ছে। আপনি

উৎপত্তি-বিহীন হলেও আপনার আবির্ভাব উৎপত্তির মতোই যেন মনে হয়। দেবকী বলছেন আপনি অব্যক্ত হয়েও ভক্তের কাছে—আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছেন, সর্বব্যাপী হয়েও এই কারাগারে আমার পুত্ররূপে এসেছেন—এই তো আপনার অপার করুণা।

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥
১০-৩-২৭ ॥

দেবকী বলছেন—হে পুরুষপ্রবর! সকলেই মৃত্যুর অধীন; কিন্তু সকলেই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। মৃত্যুও কালসর্প রূপে তাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে কোথাও নির্ভয়ে থাকতে দেয় না। বহু সুকৃতির ফলে জীব যখন তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই মাত্র সে মৃত্যু-ভয় অতিক্রম করে থাকে। মৃত্যু-রূপ কালসর্প তখন আর তাদের কাছে ঘেঁসতেও পারে না।

জীব মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য কত উপায়, ঔষধ পথ্য, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে থাকে; কিন্তু কিছুতেই মৃত্যুকে এড়াতে পারে না। একমাত্র ভগবানের চরণ-রূপ ধন্বন্তরিকে আশ্রয় করলেই মরণ ভয় দূর হয়।

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন-
স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি ।
রূপং চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥ ১০-৩-২৮ ॥

দেবকী বলছেন—তুমি যে সর্ব-দুঃখ ত্রাতা—সকলের সকল দুঃখ দূর করে থাক এবং কেউ যদি একবার তোমার শরণাগত হয়, তবে চিরকাল তাকে অভয় দাও; সুতরাং আমাদেরও কংস-ভয় থেকে মুক্ত কর। ধ্যানগম্য তোমার এই অপ্রাকৃত চতুর্ভুজ মূর্তি তুমি সংবরণ কর।

আগে বলা হয়েছে যে, সকলেই মরণ ভয়ে ভীত; কিন্তু তোমার শ্রীচরণকে আশ্রয় করলে জীবের মৃত্যু ভয় দূর হয়। তুমি সর্বমঙ্গল-কারক; তুমি জগৎ-কারণ; জগৎ-পিতা হয়েও আমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছ। আমরা হয়ত

ঠিক ঠিক তোমার শরণাপন্ন হতে পারিনি; কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি আমাদের পুত্রত্ব স্বীকার করেছ; সুতরাং আমাদের কংস-ভয় দূর কর।

দেবকী আরও বললেন—মুনিঋষিরা সমাধির অভ্যাস করে তোমার যে মূর্তি ধ্যানে প্রত্যক্ষ করেন, তুমি তোমার সেই ধ্যানগম্য মূর্তিতে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছ—এই তো আমাদের মহা সৌভাগ্য; কিন্তু তোমার এই অপ্রাকৃত মূর্তি তো প্রাকৃত চোখ দিয়ে চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। চর্মচক্ষে তোমার এই অপ্রাকৃত মূর্তি দেখলে সাধারণ জীব এই অপ্রাকৃত রূপকেও প্রাকৃত বলে ভুল করবে। ফলে আপনার স্বরূপ দর্শন করেও লোকেরা তার অপ্রাকৃত মাধুর্য অনুভব করতে পারবে না। অতএব যোগীদের ধ্যানগম্য তোমার এই অপ্রাকৃত রূপ সাধারণ লোকের চর্মচক্ষুর গোচর করো না। তা ছাড়া অজ্ঞ লোকেরা আপনার অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ দেখে যদি প্রাকৃত জিনিসেরই মতো ব্যবহার করে, তবে ভক্তদের প্রাণে বড় আঘাত লাগবে। তাই বলছি তোমার এই অপরূপ রূপ তুমি সংবরণ কর। দেবকী নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না—পুত্র বোধে কখনও 'তুমি' বলছেন এবং ভগবান বোধে কখনও 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন।

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ১০-৩-২৯ ॥

হে মধুসূদন! তুমি যে আমার গর্ভে জন্মেছ, তা যেন কংস জানতে না পারে। তার জন্য কংস যদি আমার উপর আরও অত্যাচার করে, তবুও আমি আর ভয় করি না। তোমার জন্যই কেবল আমার ভয় পাছে সে তোমার কোন অনিষ্ট করে।

দেবকী বলছেন—আমি জানি আপনি মধু, কৈটভ প্রভৃতি দৈত্যদের বধ করেছেন; তবুও আমি কংসের ভয়ে ভীত; কারণ আমারই ভাগ্যদোষে সে তোমার অগ্রজদের বধ করেছে; তাই তোমার মঙ্গল চিন্তায় আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। যদি কেউ এক মুহূর্তের জন্যও ধ্যানে তোমার দর্শন লাভ করে, তবে তাঁর চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যায়, মনে চাঞ্চল্য আর থাকে না; কিন্তু আমার বেলায় দেখছি উলটো বিপত্তি হলো; তোমাকে কাছে

পেয়েও আমার মন শান্ত হতে পারছে না; তোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমি ভয়ে অত্যন্ত কাতর হয়েছি। তাই বলছি তোমার অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার যে ভয়—সেই ভয় থেকে তুমি আমায় মুক্ত কর।

আগের শ্লোকে দেবকী ভগবানকে বিশ্বের উৎপত্তির কারণ, সর্বশক্তিমান, অনুগতজনের ভয়াপহারী ইত্যাদি বলেছেন; আবার এখানে সেই ভগবানকেই বলছেন—তোমার অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি ভীত হয়েছি। এখানে ভাগবতকার দেবকীর চরিত্রের দুটি দিক একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন; একদিকে ভগবানের অসীম ঐশ্বর্য দেখে দেবকী তাঁর স্তব করছেন, আবার পরমুহূর্তেই দেবকীর মাতৃভাব সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠছে—ভাবছেন, কৃষ্ণ যে আমার শিশুপুত্র—তাকে যে আমাকেই রক্ষা করতে হবে। ঐশ্বর্য ও বাৎসল্যভাবের যুগপৎ অবস্থান!

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ১০-৩-৩০ ॥

হে বিশ্বাত্মন্! তুমি অন্তর্যামী, সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করছ ; তবে আমারও হৃদয়ে অবস্থান করে কেন আমায় ভয়-বিহ্বল করছ? এখন তোমার এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অপূর্ব চতুর্ভুজ রূপ তুমি সংবরণ কর।

কংসের ভয়ের আশঙ্কায় আমি তোমাকে কোন গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখতে চাই; কিন্তু তোমার এই চতুর্ভুজ মূর্তি তো কোথাও লুকিয়ে রাখা যাবে না। অন্ধকার কারাগৃহ তোমারই অঙ্গচ্ছটায় আলোকিত হয়ে উঠেছে; আর যার হৃদয়ে তুমি প্রকাশিত হও, তাঁর হৃদয়ের অন্ধকার চিরতরে দূর হয়ে যায়। সুতরাং তোমাকে তো লুকিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব। তাই বলছি তোমার এই অপূর্ব রূপ তুমি পরিহার করে সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ কর; তাহলে তোমায় হয়ত আমি কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারব।

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥
১০-৩-৩১॥

দেবকী বলছেন তুমি পরমপুরুষ ভগবান। মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই বিলীন হয়ে যায়; আবার বিশ্ব-সৃষ্টির সময় তোমার অঙ্গে

বিলীন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে তুমি আবার প্রকাশ করে থাক। তুমি সর্বজগতের আধার; সেই বিরাট পুরুষ তুমি আমার গর্ভে জন্মেছ; যদিও তা সত্য তবু লোকে তো তা বিশ্বাস করবে না; অসীম কি কখনও সীমার মধ্যে আবদ্ধ হতে পারে? সুতরাং তুমি আমার গর্ভে জন্মেছ শুনলে লোকে যে আমায় উপহাস করবে। তারা বলবে—ওরে মূঢ় দেবকী! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান তোর গর্ভে জন্মেছেন, এ কথা বলতে তোর লজ্জা করে না? তাদের সেই উপহাস বাক্য আমার পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনাজনক হবে; অতএব তোমার এই অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ তুমি পরিহার কর।

বসুদেবের মতোই দেবকীও ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্য-মিশ্রিত বাৎসল্য-ভাবে বিমোহিত হতে লাগলেন; কখনও কংস-ভয়ে ভীত হয়ে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করছেন, আবার কখনও বাৎসল্য-ভাবে পুত্রের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন। বিপরীতমুখী ঐশ্বর্য ও বাৎসল্যভাবের টানা-পড়েনে তাঁরা একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

শ্রীভগবান তখন বসুদেব ও দেবকীর এই ভাব-বিহ্বল অবস্থা এবং ঐশ্বর্য-সমন্বিত বাৎসল্যভাবের অপূর্ব বিকাশ দেখে খুশি হয়ে বললেন—আমি যে কেবল এই জন্মেই তোমাদের সন্তান হয়ে এসেছি—এমন নয়। পূর্বেও আমি তোমাদের সন্তানরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেছি। তোমাদের সেইসব পুরান কথা মনে নেই; তাই বলছি—সেই পুরাকালে তোমরা আমাকে পুত্ররূপে পাবার জন্য আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে বহু সহস্র বছর ধরে অতি কঠোর তপস্যা করেছিলে। তোমাদের সেই কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আমি যখন এই চতুর্ভুজরূপে তোমাদের সামনে এসে, বর দিতে চেয়েছিলাম, তখন তোমরা আমার মতো পুত্র কামনা করেছিলে। আমার মতো তো কেউ হতে পারে না—আমি যে তুলনা-বিহীন। এদিকে তোমরা চেয়ে বসেছ—আমার মতো পুত্র। তাই তোমাদের সুখী করার জন্য আমি নিজেই তিন বার তোমাদের পুত্ররূপে এসেছি; তোমাদের পুত্ররূপে এই হচ্ছে আমার শেষ জন্ম; এর আগে আরও দু-বার তোমাদের পুত্র হয়ে জন্মেছি। এই বলে ভগবান তখন সেই কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর সামনেই দ্বিভুজ মূর্তি মানবশিশুর রূপ ধারণ করলেন।

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥
১০-৩-৪৭ ॥

শুকদেব বললেন—তখন ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বসুদেব পুত্র কোলে নিয়ে কারাগার থেকে বাইরে এলেন। সেই সময় আপনা থেকেই বসুদেবের শৃঙ্খল খুলে গেল; কারাগারের দরজা উন্মুক্ত হলো; প্রহরীরা ঘুমে অচেতন হয়ে রইল। আর ঠিক এই সময় যোগমায়া নন্দালয়ে যশোদার কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হলেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে বসুদেবের পক্ষে কংসের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার কোনই উপায় ছিল না; তিনি কংসের কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ, কারাগারের দরজা সব বন্ধ, বাইরে প্রহরীরা সদা জাগ্রত। কিন্তু ভগবৎ-ইচ্ছায় এ সবের মধ্যেও বসুদেব পুত্র কোলে নিয়ে বাইরে এলেন। ভাগবতকার যেন ইঙ্গিতে বলছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমপ্রেমে হৃদয়ে ধারণ করে যে ভক্ত পথে বের হয়, তাঁর কাছে মায়া-মোহের শৃঙ্খল, কামনা-বাসনার রুদ্ধ কপাট এবং কামক্রোধাদি-রূপ প্রহরীরা কি করতে পারে? বিনা চেষ্টাতেই তাঁর সংসার-মুক্তি হয়, যেমন হয়েছিল বসুদেবের কারাগার-মুক্তি।

বসুদেব যখন পুত্র কোলে নিয়ে বাইরে এলেন, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। ভগবানের শরীরে যাতে জল না লাগে, তার জন্য অনন্তনাগ ফণা বিস্তার করে বসুদেবের পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন।

বসুদেব পুত্র কোলে নিয়ে নন্দালয়ে এসে দেখলেন যে, দরজা সব খোলা এবং গোপগণ সবাই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বসুদেব তখন অতি সন্তর্পণে যশোদার শয্যায় নিজের পুত্রটিকে রেখে যশোদার কন্যাটিকে নিয়ে আবার কংসের কারাগারে ফিরে এসে দেবকীর শয্যায় কন্যাটিকে রাখলেন। ঠিক সেইসময় কারাগারের দ্বারসকল আবার পূর্বের মতোই আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥ ১০-৩-৫৩ ॥

নন্দপত্নী যশোদা যোগমায়ার প্রভাবে নিদ্রাবেশে তাঁর একটি সন্তান হয়েছে এই মাত্র বুঝেছিলেন; কিন্তু সেই সন্তানটি পুত্র না কন্যা তা না জেনেই মায়ার প্রভাবে তিনি নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে নন্দরাজ, যশোদা এবং ব্রজবাসীগণ কেউ জানতেও পারলেন না যে, যশোদার বাস্তবিক কন্যা হয়েছিল পুত্র নয়। কিন্তু নিজের সন্তান না হলে তার উপর পরিপূর্ণ বাৎসল্য ভাব তো আসে না; তাই ভগবান যশোদা ও নন্দরাজকে পরিপূর্ণ বাৎসল্য-প্রেমরস পান করাবার জন্যই যোগমায়াকে দিয়ে এই গোপনতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। যশোদা জেগে উঠে দেখলেন নীল পদ্মের মতো অতি অপরূপ একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে; তখন যশোদার আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না।

এদিকে কংসের কারাগারে শ্রীভগবানের ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ঠিক হয়ে গেল; অর্থাৎ বসুদেব যশোদার কন্যা যোগমায়াকে নিয়ে কারাগারে ফিরে এসেছেন, লৌহ শৃঙ্খল আবার পরিধান করেছেন, কারাগারের দরজা সব বন্ধ হয়ে গেছে; ঠিক সেই সময় কন্যারূপী যোগমায়া নবজাত শিশুর মতো কেঁদে উঠল। শিশুর ক্রন্দন শুনে প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হলো এবং তারা তখন ছুটে গিয়ে কংসকে শিশুর জন্মের সংবাদ দিল। এদিকে কংসের চোখে তো ঘুম নেই; ভাবছেন—কখন দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান, যে তাকে বধ করবার জন্য আসছে, তার জন্ম হবে। প্রহরীদের কাছে সংবাদ পেয়েই কংস তাড়াতাড়ি ভয়-বিহ্বল চিত্তে কারাগারে এসে প্রবেশ করলেন। কংসকে আসতে দেখে দেবকী যদিও নিজের পুত্রের জন্য নিশ্চিন্তই ছিলেন, তবুও তার সখী যশোদার কন্যাটির বিনাশের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে কংসকে অতি কাতরভাবে বললেন—তুমি তো আমার অনেকগুলি সন্তানকে বধ করেছ; এ তো পুত্র নয় এ তো কন্যা; তাই বলছি—একে তুমি আর বধ করো না। বড় হলে এই কন্যাটি আমি তোমাকেই দেব তোমার পুত্রবধূরূপে। সুতরাং স্ত্রী বধ করে আর কলঙ্কের ভাগী হয়ো না। কিন্তু কংস তো ভাল কথা শোনবার লোক নয়; সে দেবকীর হাত থেকে কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে পাথরের উপর আছাড় মারল।

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥ ১০-৪-৯॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই কনিষ্ঠা ভগিনী, কংসের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে তখনই অষ্টভুজা দেবীমূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর আটটি হাতে ধনু, শূল, বাণ, চর্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র এবং গদা শোভা পেতে লাগল; বিবিধ বসন-ভূষণ এবং মাল্য চন্দনে ভূষিত হয়ে তিনি আকাশে কংসাদি সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে কংসকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব বা পূর্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥ ১০-৪-১২ ॥

রে পাপিষ্ঠ ! আমায় বধ করে তোর কি লাভ হতো? তোর শত্রু যে তোকে পূর্বজন্মে বধ করেছিল, এবারও সে তোকে বধ করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। সে যাই হোক তুই আর এদের বৃথা কষ্ট দিস না। এই বলে সেই কন্যারূপী যোগমায়া আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যোগমায়ার কথা শুনে এবং তাঁর ঐশ্বর্যাদি দেখে কংস পরম বিস্মিত হয়ে ভাবল— দেবকীর গর্ভে ভগবতী দুর্গার জন্ম কেমন করে হলো, আর পূর্বের সেই দৈববাণীই বা কেমন করে মিথ্যা হলো? এইসব ভাবতে ভাবতে ব্যাকুল হয়ে কংস তখন দেবকী ও বসুদেবের শৃঙ্খল মোচন করে, তাঁদের বলতে লাগলেন—হে আমার ভগ্নি! হে ভগ্নিপতি ! আমি বড়ই পাপিষ্ঠ; রাক্ষসেরা যেমন সন্তান জন্মানমাত্র ভক্ষণ করে, আমিও সেইরকম তোমাদের অনেকগুলি পুত্র সন্তান বধ করেছি। হায়! আমি কি নিষ্ঠুরের মতোই না কাজ করেছি; নিরপরাধ ভাগিনেয়দের অযথা বধ করে তোমাদের মতো জ্ঞাতি বন্ধুদের পরিত্যাগ করেছি। হায়, আমার কী গতি হবে? ইহলোকে জীবিত থাকলেও আমি মৃতবৎ। আমার এই সব পাপের যে কোন প্রায়শ্চিত্তও নেই। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আছে—এইসব ঘৃণিত কাজের জন্য একমাত্র আমি-ই দোষী নই। দেবতারাও দোষী; কেন না দৈববাণীর উপর নির্ভর করেই আমি দেবকীর সন্তানদের বধ করেছি। এতদিন জানতাম যে মানুষেরাই কেবল মিথ্যা কথা বলে; এখন দেখছি দেবতারাও মিথ্যা কথা বলে। হায়, দৈববাণীর উপর নির্ভর করে আমি কি জঘন্য কাজই না করেছি!

কংস তখন শাস্ত্রের কথা বলে বসুদেব ও দেবকীকে সান্ত্বনা দিতে লাগল ঃ

মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতংভুজঃ।
জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে ॥ ১০-৪-১৮ ॥

কংস বলল—তোমরা মহাভাগ্যবান কারণ শ্রীদুর্গাকে তোমরা কন্যারূপে পেয়েছ; সুতরাং অপর পুত্রে তোমাদের আর প্রয়োজন কি? মানুষ নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে। প্রাণী মাত্রই দৈবাধীন; সুতরাং নিজের নিজের কর্মফলে এবং দৈববশে জীবেরা চিরকাল আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারে না—পরস্পরের বিচ্ছেদ হয়েই থাকে। সুতরাং পুত্রদের জন্য তোমরা আর শোক করো না।

কংস আরও বলল—এই পৃথিবীতে বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয়ে আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় না। সেইরকম আত্মাতেও দেহাদি বিষয় উৎপন্ন হয়ে আবার ধ্বংস হয়; কিন্তু আত্মার ধ্বংস হয় না; দেহের-ই বিকার হয়, আত্মা নির্বিকার; যাদের এই জ্ঞান নেই তাদেরই দেহে আত্মবুদ্ধি হয় এবং এই বুদ্ধি থেকেই দেহ ও আত্মা অপৃথক্ বলে মনে করে; এই অভেদ-জ্ঞানের জন্যই মানুষ পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু এবং পুত্রাদির সাথে মিলন-বিরহ জনিত সুখ দুঃখ ভোগ করে থাকে; এর ফলে তাদের আর সংসার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না।

কংস আরও বলল—দেহ কখনও আত্মা নয় এবং আত্মার কখনও বিনাশ নেই; সুতরাং তোমাদের সন্তানদের বধ করলেও তাদের আত্মার বিনাশ হয় নি; তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের বধ করাও হয় নি। অতএব অজ্ঞানদৃষ্টিতে তাদের বধ করেছি বলে মনে হলেও তাদের জন্য আর বৃথা শোক করো না। যদি বল—আমাদের তো আত্মজ্ঞান হয় নি; আমরা যে পুত্রদের জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়েছি। তার উত্তরে বলছি জীব কর্মফলের অধীন; তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে থাকে। তোমাদের পুত্রেরাও নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করেছে মাত্র। শয়তানও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজের দোষ কাটাতে চায়!

ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ ॥ ১০-৪-২৩॥

কংস বলল—আত্মজ্ঞানের অভাবে তোমরা যদি আমায় তোমাদের পুত্রহন্তা বলে দোষীও কর তবুও বলছি, আমি তোমাদের কাছে আমার অন্যায়ের

জন্য ক্ষমা চাইছি। তোমরা সাধু স্বভাবের এবং বন্ধুবৎসল; তোমরা আমায় ক্ষমা কর—এই বলে কংস তখন কাঁদতে কাঁদতে দেবকী ও বসুদেবের পা জড়িয়ে ধরল।

কংসকে অনুতপ্ত দেখে দেবকী তাকে ক্ষমা করে তার প্রতি ক্রোধ এবং নিজের শোক ত্যাগ করলেন। এই হচ্ছে মহাপুরুষের লক্ষণ—এই না হলে ভগবান তাঁদের ঘরে জন্ম পরিগ্রহ করেন! বসুদেব তখন হাসতে হাসতে কংসকে বললেন ঃ

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি দেহিনাম্।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ ॥ ১০-৪-২৬ ॥

বসুদেব বললেন—হে মহারাজ! তুমি যা বললে তা ঠিকই, দেহে আত্মবুদ্ধি করা অজ্ঞানেরই কাজ। দেহকেই আত্মা বলে মনে করে মানুষ—এ হচ্ছে আমার আপন, এ হচ্ছে আমার পর—এইরকম ভুল সিদ্ধান্ত করে থাকে।

বসুদেব কংসকে মহাভাগ বলে সম্বোধন করে প্রকাশ্যে তার প্রশংসা করে বললেন—তোমার দেখছি শাস্ত্রজ্ঞানও রয়েছে; আবার প্রকারান্তরে এও বললেন—তুমি মহা-অভাগ অর্থাৎ তোমার কথায় ও কাজে মিল নেই। সুতরাং তোমার মুখে এইরকম শাস্ত্রের কথা শোভা পায় না—তুমি মহা অভাগ, তোমার ব্যবহার অত্যন্ত অশোভন।

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বসুদেব এবং দেবকী সন্তুষ্ট হয়ে কংসের প্রতি সাদর সম্ভাষণ করলে কংস তাদের অনুমতি নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

এইভাবে কৃষ্ণের জন্ম-রাত্রি অতিবাহিত হলো। দেখা যাচ্ছে, মহা দুষ্ট, মহা-পাপীরও সময় সময় বিবেকের দংশন হয় এবং তখন তারা ভাল হবারও চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের সঙ্গীরা দুষ্ট পরামর্শ দিয়ে তাদের আবার পাপের পথেই নিয়ে যায়।

কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি প্রভাত হলে, কংস প্রলম্ব, কেশী, চাণূর প্রভৃতি দুষ্ট মন্ত্রীদের আহ্বান করে, কন্যারূপী যোগমায়া যা যা বলেছিলেন সেসব বলতে

লাগলেন। কংসের বিবরণ শুনে সেই দেবদ্বেষী অসুর-রূপী মন্ত্রীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল—বটে, আপনার পূর্ব-শত্রু জন্মগ্রহণ করেছে!

এবং চেত্তর্হি রাজেন্দ্র পুরগ্রামব্রজাদিষু।
অনির্দশান্নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্ ॥ ১০-৪-৩১॥

হে মহারাজ! যদি তা-ই হয়ে থাকে, যদি আপনার পূর্ব-শত্রু জন্মগ্রহণ করেই থাকে, তা হলে নগর, গ্রাম এবং ব্রজধামের সকল স্থানে, দশদিনের কম বয়স্ক এবং দশদিনের কিছু বেশি বয়স্ক, সব শিশুদেরই আমরা আজই বধ করব। তা হলেই আপনার পূর্ব-শত্রুরও নিধন হবে। যদি বলেন এইভাবে নির্বিচারে শিশু-হত্যা করলে দেবতারা যদি রেগে গিয়ে যুদ্ধ করতে আসে, তখন কি হবে? তার উত্তরে বলছি—দেবতারা যদি যুদ্ধ করতেই আসে, তবেই বা আমাদের ক্ষতি কি? দেবতারা তো নিতান্ত কাপুরুষ; তারা তো সর্বদা আপনার ধনুকের টংকার শুনেই অস্থির—তারা আবার যুদ্ধ করবে কি? মনে নেই ইতো পূর্বে দেবতাদের বধ করার জন্য আপনি বাণ নিক্ষেপ করলে, দেবতারা কতবার প্রাণভয়ে পলায়ন করেছিল। দেবতাদের মধ্যে তখন কেউ কেউ ভীত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে জোড়হাতে আপনার কাছে এসেছিল; কেউ বা আবার বসন আচ্ছাদন ত্যাগ করে আলুলায়িত কেশে 'আমরা ভীত হয়েছি' বলে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিল। আপনি তখন সেই সব অস্ত্রত্যাগী রথচ্যুত ভয়াকুল যুদ্ধ-বিমুখ দেবতাদের বধ করেন নি। আপনি তখন ধর্মভাব দেখিয়েছিলেন বলেই তো দেবতাদের আজ বংশবৃদ্ধি হয়েছে; নইলে এতদিনে তাদের কোন অস্তিত্বই থাকত না। যাই হোক মহারাজ, এখন আর ধর্ম নিয়ে থাকলে চলবে না; এখন আর ধর্ম করার সময় নয়। মহারাজ! যদি বলেন, দেবতারা যুদ্ধে হেরে গিয়ে একেই রেগে রয়েছে; তার উপর নির্বিচারে শিশু-হত্যা রূপ অন্যায় কাজ দেখে যদি বিক্রম প্রকাশ করে? তার উত্তরে বলছি—দেবতারা যদি একটু আধটু বিক্রম প্রকাশ করেই তাতে আমাদের কি এসে যাবে? দেবতারা নির্ভয় দেশে, যেখানে যুদ্ধ নেই সেখানে, আর স্ত্রীলোকের কাছে মুখে মুখেই বীরত্ব প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং এইরকম ভীরু দেবতাদের কাছ থেকে আমাদের কোনই ভয় নেই। তবে যদি বলেন যিনি সকলের হৃদয়-কন্দরে বাস করেন সেই বিষ্ণু রয়েছেন, আর রয়েছেন বনবাসী মহাদেব—এদের

থেকে আপনার ভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তা হলে বলি শুনুন—বিষ্ণুই তো আপনার ভয়ে পালিয়ে গুপ্তভাবে মানুষের হৃদয়-কন্দরে অথবা ক্ষীর-সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছে। যদি তার শক্তিই থাকত তবে এমন লুকিয়ে থাকা কেন? সামনে এসে যুদ্ধ করলেই হয়। অতএব বিষ্ণু থেকে কিছু ভয় নেই। আর শিব! সে তো বনে বনেই থাকে—তাকে আবার ভয় করতে হবে নাকি! আরে ছ্যা! তবে যদি বলেন ইন্দ্র তো রয়েছে, সে তো মহাশক্তিধর, বৃত্রাসুরকে বধ করেছিল। তার উত্তরে বলছি—ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিল বটে, কিন্তু জানেন তো ইন্দ্র কেমন করে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিল; ইন্দ্র নিজের শক্তিতে তাকে বধ করতে পারেনি; বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য দধীচির কাছে বজ্রের জন্য প্রার্থনা করতে হয়েছিল। সুতরাং বৃত্র-বধে ইন্দ্রের বীরত্ব কোথায়? অতএব এমন হীনবীর্য ইন্দ্রের কাছ থেকে আমাদের কোনই ভয়ের আশঙ্কা নেই। আর বাকি রইল কে? ব্রহ্মা! সে আর কি করবে? সে তো সামান্য তপস্বী মাত্র। তবে যদি বলেন যে, সে তপোবলে বলীয়ান—আমাদের অভিশাপ দিয়ে ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু প্রভু! সেরকম কোন আশঙ্কা করবেন না; কারণ তার নিজেরও ভয় আছে যে, অভিশাপ দিলে তার তপোবল ক্ষয় হয়ে যাবে। অতএব তপস্বী ব্রহ্মার কাছ থেকেও আমাদের কোন ভয় নেই। মন্ত্রীরা কেমন সুন্দর চুলচেরা বিচার করে কংসকে বুঝিয়ে দিলে যে, দেবতাদের কাছ থেকে কোনই ভয় নেই; তবে আর নির্বিচারে শিশু-হত্যায় বাধা কোথায়?

মন্ত্রীরা আরও বললে—দেবতারা শত চেষ্টা করেও আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ঠিক; তবুও তারা যখন আমাদের চিরশত্রু, তখন নগণ্য হলেও নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী তাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। আমরা আপনার অনুগত; সুতরাং দেবতাদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য আপনি আমাদের নিযুক্ত করুন। ক্ষুদ্র শত্রুকেও প্রথমে উপেক্ষা করলে, পরিণামে সহায় সম্পদ সংগ্রহ করে সে যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন আর তাকে দমন করা যায় না। তাই বলছি ঃ

মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ।
তস্য চ ব্রহ্মগোবিপ্রাস্তপো যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ ॥ ১০-৪-৩৯ ॥

হে মহারাজ কংস! বিষ্ণুই সর্বদেবতার মূল; যেখানেই সনাতন ধর্ম রয়েছে, সেখানেই বিষ্ণুও রয়েছে; আবার এই সনাতন ধর্মের মূল হচ্ছে বেদ,

গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং যজ্ঞ। অতএব হে মহারাজ! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তপস্বী, যজ্ঞকারী এবং দুগ্ধবতী গাভীদের আমরা সর্বপ্রযত্নে বধ করব; তা হলেই আমাদের যে আসল শত্রু বিষ্ণু, তার মূল ধ্বংস হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ, গরু, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা ও যজ্ঞ—এইগুলি হলো বিষ্ণুর দেহ-স্বরূপ; সুতরাং এদের ধ্বংস করলেই বিষ্ণুরও ধ্বংস অনিবার্য। তাছাড়া বিষ্ণু হলো ঘোর অসুর-বিদ্বেষী; কিন্তু সে গোপনে হৃদয়-কন্দরে অবস্থান করে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাকে বধ করা সম্ভবপর নয়; অতএব বিষ্ণুর অঙ্গ-স্বরূপ বেদবিদ্ ঋষি ও ব্রাহ্মণদের বধ করলেই বিষ্ণুরও বিনাশ হবে। কি সুন্দর যুক্তিপূর্ণ মন্ত্রণা!

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আসন্ন-মৃত্যু কংস তার দুষ্ট-বুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রীদের সাথে এইরকম যুক্তি করে, ব্রহ্ম-হত্যা প্রভৃতি ঘৃণিত কাজকেই নিজের পক্ষে হিতকর বলে স্থির করল।

মানুষ যখন সনাতন ধর্ম, শাস্ত্র-নির্দেশিত পথ থেকে দূরে যেতে চায়, তখন সে শাস্ত্রকে অবলম্বন করেই শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করেই সনাতন ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়; তারা তখন যেন কালপাশে আবদ্ধ হয়েই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে।

কংস তখন মন্ত্রীদের কথা অনুযায়ী সাধু লোকদের হিংসা করার জন্য পরদ্রোহ-পরায়ণ, ইচ্ছামত রূপ ধারণ করতে পারে এমন সব অসুরদের চারিদিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে স্বগৃহে প্রবেশ করল। তখন সেই সব অসুরেরা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে নিরীহ ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করল।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ১০-৪-৪৬ ॥

সৎ ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ করলে যে কেবল মৃত্যুই হয় তা নয়; ভগবদ্ভক্তদের যদি অপমানও করা হয়, তবে সেই পাপে অপমানকারীর আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, পরলোকে স্বর্গাদি লোক—সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। অতএব মহতের মর্যাদা যাতে লঙ্ঘন করা না হয় তার জন্য সকলেরই অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত।

১৭
পূতনা-মোক্ষ লীলা

নন্দালয়ের ঘটনা জানবার জন্য সকলেই উদগ্রীব; বিশেষ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এবং তা খুবই স্বাভাবিক ; কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে পরীক্ষিতের পিতামহী সুভদ্রার ভাই—অতি আপনজন এবং পরীক্ষিতের জীবন-দাতা; সুতরাং কৃষ্ণের জীবনের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার জন্য পরীক্ষিতের মহা ঔৎসুক্য। পরীক্ষিৎ জানতেন যে, ব্রজবাসীদের ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদন করাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে যাবার কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এখন কি আর ভগবৎ-বিমুখ, অসুরদের কথা শুনতে ভাল লাগবে? আর যদি অসুরদের কথা বলতেই হয়, তবে কৃষ্ণ-কথা মিশিয়ে বলাই তো ভাল। তাই পরীক্ষিতের ঔৎসুক্য দেখে শুকদেব তখন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বলতে আরম্ভ করলেন।

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ।। ১০-৫-১ ।।

মহামনা নন্দের পুত্র জন্মগ্রহণ করলে তিনি পরমানন্দে স্নান ও বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণ করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে তাদের দিয়ে পুত্রের জাতকর্মাদি করালেন। এই আনন্দোৎসব উপলক্ষে নন্দ ব্রাহ্মণ ও অপরদের মুক্ত হস্তে দান করলেন। উদ্দেশ্য এই যে, দানের দ্বারা ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তার পুত্রের কল্যাণ করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে বসুদেব-দেবকীর পুত্র, একথা অপর কেউ-ই জানতেন না। বসুদেব-পুত্রকে নন্দ ও যশোদা নিজেদের পুত্ররূপেই লালন পালন করতে লাগলেন। ভাগবতের একটা বিশেষত্ব এই যে, বহু সম্প্রদায়ের সাধক-ভক্তেরা ভাগবতের উপর টীকা-টিপ্পনী করেছেন এবং অনেক সময় সেইসব ব্যাখ্যা পরস্পর-বিরোধীও হয়েছে। কিন্তু মজা এই যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাতারা নিজের নিজের ভাবে তাঁদের টীকা-টিপ্পনীর মধ্য দিয়ে ভগবৎরস

আস্বাদন করেছেন এবং রসিকজনের জন্য সেই রস-সম্ভার রেখে গেছেন। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই শুকদেব বলেছেন ঃ

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে—নন্দের আত্মজ উৎপন্ন হলে তাঁর মধ্যে এক অভূত-পূর্ব আনন্দেরও উদ্ভব হলো এবং সেই পরমানন্দে নন্দ একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন; খুবই স্বাভাবিক। আনন্দ-স্বরূপ ভগবানের আগমনে সবই আনন্দময় হয়ে উঠল। কিন্তু কথা হলো এই যে, এই শ্লোক থেকে মনে হয়, নন্দালয়ে কৃষ্ণের জন্মের মধ্যে একটু বিশেষ রহস্য রয়েছে, যা শুকদেব স্পষ্ট ভাবে না বলে ইঙ্গিতই করেছেন মাত্র। শুকদেবের যদি বলার উদ্দেশ্য এই হতো বসুদেব-পুত্রকেই নন্দ নিজের পুত্রবোধে লালন পালন করেছিলেন—আসলে কৃষ্ণ নন্দের পুত্র নয়, তাহলে শুকদেব বলতেন—বসুদেব সকলের অলক্ষিতে নিজের নবজাত শিশুকে নন্দালয়ে রেখে এলে নন্দ বসুদেব-পুত্রকেই নিজের পুত্র বলে মনে করে পরম আনন্দ লাভ করলেন। তাহলে ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকত এবং সকলেই বুঝতে পারত ; কিন্তু তা না করে শুকদেব বললেন—নন্দেরও আত্মজ উৎপন্ন হলে ইত্যাদি। এই কথা থেকে মনে হয় যেন শুকদেব ইঙ্গিতে বলছেন—শ্রীভগবান নন্দেরও পুত্র। শ্রীভগবান নন্দেরও পুত্র—এই কথা শুনেই সকলে চিৎকার করে উঠবেন—এ কেমন করে সম্ভব? এ যে ঘটনাবিরোধী কথা! কৃষ্ণ মথুরা থেকে ব্রজে এলেন; সুতরাং তিনি কেমন করে নন্দের পুত্র হতে পারেন? জীব গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবতোষণী টীকায় এর অতি সুন্দর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, বাইরের দৃষ্টিতে নন্দ-পুত্র অসম্ভব হলেও তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ নন্দেরও পুত্রই বটে।

শ্লোকে রয়েছে *আত্মজ*; আত্মজ শব্দের অর্থ আত্মা থেকে দেহ থেকে জাত অর্থাৎ নিজের ঔরসজাত পুত্র। কিন্তু ভগবানের জন্ম তো সাধারণ জীবের মতো কর্মফল ভোগ করার জন্য হয় না; ভগবান যখন তাঁর ভক্তদের সাথে লীলারস আস্বাদন করার জন্য তাঁর নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জগতে প্রকট করেন, তখনই আমরা তাঁর জন্ম আখ্যা দিই। সুতরাং ভগবানের আত্মজ হওয়া অর্থাৎ কারও পুত্ররূপে আবির্ভূত হওয়ার মধ্যে বিশেষ রহস্য থাকে। জীব কর্মফল ভোগ করার জন্য দেহান্তর-প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কর্মফলই নেই; সুতরাং জীবের মতো কর্মফলের জন্য তাঁর জন্মও

হয় না এবং দেহত্যাগও হয় না। ভগবান যখন জগতের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় তাঁর নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জগতে প্রকট করেন, তখনই আমরা তাঁর জন্ম হলো বলি; সুতরাং ভগবান যখন কারও আত্মজ হন তখন বুঝতে হবে যে, সাধারণ জীবের মতো পিতামাতার দেহ থেকে তাঁর জন্ম হয়নি; তাঁর জন্ম অপ্রাকৃত।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—*জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ* (৪-৯)—যে আমার অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্মের স্বরূপ যথার্থত জানে, তার আর পুনর্জন্ম হয় না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে তাঁর জন্ম অলৌকিক। জীব জন্মগ্রহণ করে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে; আর ভগবানের জন্ম-কথা শুনে জীব মুক্ত হয়ে যায়—কত তফাত!

ভগবান হচ্ছেন জন্ম-রহিত, তিনি সর্বকারণের কারণ, তিনিই জগৎ-পিতা; সুতরাং তাঁর কেউ পিতা কিংবা মাতা হতেই পারে না। তবুও তিনি বাৎসল্য-প্রেমময় ভক্তকে মাতাপিতা বলে স্বীকার করে তাঁদের বাৎসল্য প্রেম-রস আস্বাদন করেন। ভক্ত যখন ভগবানের ঐশ্বর্য ভুলে তাঁকে নিজের পুত্ররূপে লালন পালন করার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হন, তখন ভগবান জগৎ-পিতা সর্বেশ্বর হয়েও ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য তাঁর হৃদয়ে ঐশ্বর্য-শূন্য শিশু-রূপে স্ফুরিত হন। ভক্ত যখন নিরন্তর ভগবানকে শিশুরূপে হৃদয়ে চিন্তা করতে থাকেন, তখন ভগবানও তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিষয়ে এই কথাই ভাগবতে রয়েছে—*আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ* —(১০-২-১৬)—শ্রীভগবান স্বয়ং বসুদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন। ভগবান স্বয়ং বসুদেব দেবকীর বাৎসল্য-প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছেন বলেই তিনি বসুদেব-দেবকীর আত্মজ।

প্রশ্ন হতে পারে, ভগবান তো সবারই হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত —*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি (গীতা ১৮-৬১)*—তিনি সবার হৃদয়েই রয়েছেন; তবে কি তিনি সবারই আত্মজ? না, তা নয়। যাঁরা বাৎসল্য-প্রেমময় ভক্ত, তাঁরা যখন ভগবানকে পুত্ররূপে লালন পালন করার জন্য ব্যাকুল হন, তখনই তিনি তাঁদের হৃদয়ে পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। যখন পুত্রভাবে ভগবানকে হৃদয়ে চিন্তা করে করে আর সাধ মেটে না, প্রত্যক্ষভাবে লালন পালন করার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তখনই তাঁদের হৃদয়স্থ

প্রেমমূর্তি বাইরে প্রকটিত হয়। বাৎসল্য-প্রেমময় ভক্তের হৃদয়স্থ মূর্তির বাইরে প্রকটিত হওয়াকেই ভগবানের জন্ম হওয়া বলে। ভগবান হচ্ছেন অজ জন্মরহিত, তিনি নিত্য; তিনি কারও আত্মজ নন এবং তাঁর উৎপত্তিও হয় না। তবুও যখন কোন মহাপ্রেমময় ভক্ত সর্ব বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে, একমাত্র ভগবানকে নিরন্তর পুত্রভাবে চিন্তা করেন, তখন ভগবান তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হন এবং বাৎসল্য-প্রেমোচিত সেবা গ্রহণ করে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য জগতে প্রকটিত হন। *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্*—(*গীতা* ৪-১১) যে আমাকে যেভাবে চায়, আমি সেইভাবেই তার মনোবাসনা পূর্ণ করি—এই তো তাঁর মহান কৃপা!

বসুদেব-দেবকী যুগ যুগ ধরে ভগবানকে পুত্ররূপে পাবার জন্য তপস্যা করেছিলেন; তাঁরা ভগবানের কাছে বর চেয়েছিলেন—তোমার মতো পুত্র চাই। ভগবান কংসের কারাগারে চতুর্ভুজ মূর্তিতে বসুদেব-দেবকীর সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চতুর্ভুজ মূর্তিতে তো কোন জীবের জন্ম হয় না; সুতরাং তাঁকে দেখেই বসুদেব-দেবকী বুঝেছেন যে, ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে; তাই তাঁরা তখন করজোড়ে শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন; আবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-বুদ্ধিতে কংসের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য ব্যগ্রও হয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বসুদেব-দেবকীর ভগবানে ঐশ্বর্য-মিশ্রিত বাৎসল্যভাব ছিল। অপর দিকে নন্দ ও যশোদার শুদ্ধ-বাৎসল্যভাব; তাঁরা ভগবানকে প্রাকৃত শিশুরূপে লালন-পালন করতেই কেবল চেয়েছিলেন এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁরা ভগবানকে সেইভাবেই হৃদয়ে অনুভব করতেন। বাৎসল্য-প্রেমময় ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়াকেই ভগবানের আত্মজ হওয়া বলে এবং লোকচক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হওয়াকেই ভগবানের জন্ম হওয়া বলে—এই তো শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। জীবের মতো আত্মজ হওয়া কিংবা জন্মগ্রহণ করা ভগবানের জন্য নয়; কারণ তিনি অজ নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

শ্রীভগবান বসুদেব ও দেবকীর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং কংসের কারাগারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান নন্দ ও যশোদার হৃদয়েও প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং নন্দালয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণের আত্মজ হওয়া এবং জন্মগ্রহণ করা, উভয় পক্ষেই সমান। তফাত শুধু এই যে, বসুদেব ও দেবকীর ঐশ্বর্য-মিশ্রিত বাৎসল্যভাবের জন্য ভগবান তাঁদের সামনে

চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে আবার প্রাকৃত শিশুরূপ ধারণ করেছিলেন। অপর দিকে নন্দ-যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্যভাব; তাই ভগবান মাধুর্যময় দ্বিভুজ শিশুরূপেই তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন; তখন তাঁরা কৃষ্ণের স্তব করেন নি ; বরং পুত্র বলে কোলে তুলে নিয়ে তাঁকে স্তন পান করিয়েছিলেন, তাঁর কল্যাণের জন্য জাতকর্মাদির অনুষ্ঠান করেছেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, নন্দ ও যশোদার মনে এই ধারণা একেবারেই ছিল না যে, স্বয়ং ভগবান তাঁদের পুত্ররূপে এসেছেন। তাঁদের ধারণা নারায়ণের অসীম কৃপায় তাঁরা এই পুত্রটি পেয়েছেন; সুতরাং তাঁদের মনে ঐশ্বর্য-ভাবের লেশ মাত্রও ছিল না; ছিল কেবল শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাব। তাই মনে হয় কৃষ্ণের আবির্ভাবের আগে ভগবানের দ্বিভুজ শিশু মূর্তিই নন্দ-যশোদার হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক থাকত।

নন্দ-যশোদা যাঁকে পুত্ররূপে পেয়েছেন, তিনিই পরম ঈশ্বর। তাঁর নাম গ্রহণ, গুণকীর্তন করে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান, নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-প্রেমের আতিশয্যে প্রকাশ পায়নি এবং তারই জন্য অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতিও সাধারণ শিশুরূপে সেই পরম বাৎসল্য-প্রেমরস আস্বাদন করেছেন। এই পরম প্রেমের বলেই নন্দ জগৎ-পিতারও পিতা হয়েছেন এবং জগৎ-পিতাও নিজের পিতৃত্ব ভুলে নন্দের পুত্রত্ব স্বীকার করে ঈশ্বরের বাল্য লীলা-রসে জগৎকে ভাসিয়েছেন।

ভগবান এক হলেও তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন; ভক্তের ভাব ও প্রার্থনা অনুসারে ভগবানের শ্রীমূর্তির আবির্ভাব হয়ে থাকে। সুতরাং একই ভগবানের পক্ষে বসুদেব-দেবকীর প্রার্থনামত চতুর্ভুজ কৃষ্ণরূপে এবং নন্দ-যশোদার ভাব অনুযায়ী দ্বিভুজ বালগোপাল মূর্তিতে আবির্ভূত হওয়া কিছু-মাত্র আশ্চর্য নয়। দেবকী-নন্দন এবং যশোদা-নন্দন স্বরূপত অভেদ হলেও দেবকী ও যশোদার ভাবের পার্থক্যের জন্য ভগবানেরও প্রকাশের পার্থক্য হয়েছে। রাসলীলায় কৃষ্ণ যদি অসংখ্য গোপীদের সাথে একই সঙ্গে অসংখ্য কৃষ্ণ হয়ে নৃত্যগীতাদি লীলা করতে পেরে থাকেন, তবে দেবকী ও যশোদার মনোবাসনা পূরণের জন্য তিনি দুইভাবে প্রকাশিত হতে পারবেন না কেন? ভগবানের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়—তিনি যে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং ভাগবতে কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কথা আছে বলে নন্দালয়েও যে তাঁর জন্ম হয়নি, তা বলা যায় না। জীব গোস্বামী তাঁর 'গোপাল চম্পূ' গ্রন্থে নন্দালয়ে কৃষ্ণের জন্মের কথা বর্ণনা

করেছেন। 'কৃষ্ণ যামল' গ্রন্থে রয়েছে যে, বসুদেব-দেবকীর ভাব অনুযায়ী ভগবান চতুর্ভুজ মূর্তিতে কংসের কারাগারে আবির্ভূত হয়েছিলেন; ঐশ্বর্য-মিশ্রিত বাৎসল্য-প্রেমময় বসুদেব-দেবকীর এই চতুর্ভুজ মূর্তিই একান্ত প্রিয়; কিন্তু কংসের ভয়ে তাঁরা ভগবানের ঐ রূপ সংবরণ করতে বললেন। ভগবান তখন নন্দ-যশোদার নন্দনরূপে দ্বিভুজ মূর্তিতে প্রকটিত হলেন। ভগবানের এই দ্বিভুজ বাল-মূর্তি কেবলমাত্র শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাবের ভক্তেরই সেব্য। সুতরাং এই দ্বিভুজ মূর্তিতে ভগবান মথুরায় না থেকে নন্দালয়ে গিয়ে সেখানকার শুদ্ধ বাৎসল্য রস আস্বাদন করে নন্দ-যশোদাকে পরম আনন্দ দান করলেন।

ভগবান কৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে জন্মেছেন—এই ভাবটি বসুদেব-দেবকীর হৃদয়ে চিরবদ্ধমূল হয়ে আছে; আবার নন্দ-যশোদার মনে কৃষ্ণ তাঁদেরই অবোধ সন্তান—এই ধারণা তাঁদের হৃদয় এমনভাবে অধিকার করে আছে যে, কোন ঘটনাই তাঁদের এই ভাব থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এখন ভগবানের উপায় কি? তিনি কাদের সন্তান? ভগবান হচ্ছেন ভক্ত-বৎসল—ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন; তার উপর তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন— যে আমাকে যেরকমভাবে ভজনা করে, আমি সেইরকম ভাবেই তাকে অনুগৃহীত করি। সুতরাং একই সঙ্গে ভগবানের দেবকী ও যশোদার ভাব অনুযায়ী তাঁদের পুত্র হওয়া ছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে?

শুকদেব কৃষ্ণ-জন্ম কথা বিশেষ করে পরীক্ষিৎকে বলছেন। কৃষ্ণ ছিলেন পরীক্ষিতের পিতামহী সুভদ্রার ভাই, পরীক্ষিতের নিকট আত্মীয়। সুতরাং কৃষ্ণের কথা শুনতে পরীক্ষিৎ স্বভাবতই খুব লালায়িত। শুকদেবের কথায় পরীক্ষিৎ বুঝলেন যে, তাঁর পরম আত্মীয় বসুদেব-পুত্রকেই নন্দ-যশোদা পুত্র-জ্ঞানে লালন-পালন করেছেন—বসুদেব পুত্রই ব্রজধামে মধুর লীলা করেছেন। এই ধারণার জন্য পরীক্ষিৎ কৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়েছেন। শুকদেবের কথায় পরীক্ষিৎ যদি বুঝতেন যে, কৃষ্ণ যেমন বসুদেব-দেবকীর পুত্র, তেমনি তিনি নন্দ-যশোদারও পুত্র—তাহলে ব্রজলীলায় পরীক্ষিৎ অত গভীর আনন্দ অনুভব করতেন না। ব্রজলীলা মধুর বটে কিন্তু আমারই পরম আত্মীয় যদি সেই লীলার নায়ক হন, তবে সেই মাধুর্যের অনুভূতির আর তুলনা হয় না।

তাই শুকদেব পরীক্ষিতের আনন্দের ব্যাঘাত না করে কৃষ্ণের স্বরূপ এবং তিনি একই সঙ্গে বসুদেব ও নন্দের পুত্র—এই কথা ইঙ্গিতেই মাত্র বলে গেলেন।

'মহারাজ নন্দের পুত্র হয়েছে'—এই সুসংবাদ শুনে ব্রজবাসীরা বহু-মূল্য উপহার নিয়ে নবজাত শিশুকে দেখবার জন্য নন্দালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বয়োবৃদ্ধ গোপগণ পর্যন্ত নন্দ-নন্দনের জন্মোৎসব উপলক্ষে এতই আনন্দিত হয়েছেন যে, তাঁরা নিজেদের গাম্ভীর্য ভুলে চঞ্চল বালকের মতো নাচতে লাগলেন এবং একে অপরের গায়ে দুধ, ঘি, দই, প্রভৃতি ঢেলে দিয়ে আনন্দ করতে লাগলেন। চারিদিকেই যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল। পদকর্তা শিবানন্দ গেয়েছেন ঃ

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে নড়ি কাঁধে ভার থৈয়া থৈয়া থৈয়া।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ আনন্দ পাইয়া॥

গোপ-নারীরাও এই আনন্দ উৎসবে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা ' চিরজীবী হও'—বলে নব-জাতককে আশীর্বাদ করে, আনন্দে একে অপরের গায়ে হলুদ চূর্ণ, তেল, জল ইত্যাদি ছিটিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের গুণগান করতে লাগলেন। চারিদিকেই যেন একটা মহা আনন্দের স্রোত বইতে লাগল।

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ১০-৫-১৮ ॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রজধামে শ্রীভগবান নিত্য বিরাজ করেন; সুতরাং এমনিতেই ব্রজধাম সর্ব সম্পদে পরিপূর্ণ; তাই কৃষ্ণের জন্মদিন থেকে ব্রজধাম মহালক্ষ্মীদেরও বিহার-ভূমি হয়ে উঠল।

ভগবান যেখানে সপার্ষদ বিহার করেন, সেখানকার ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধির ইতি করা যায় না। ব্রহ্মসংহিতায় বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মী সহস্রশতসম্ভ্রম-সেব্যমানং-গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি॥

যেখানে গৃহসমূহ চিন্তামণির দ্বারা নির্মিত, যেখানে লক্ষ লক্ষ কল্পতরুর বন রয়েছে এবং অসংখ্য কামধেনু বিদ্যমান, সেই সুরম্য বৃন্দাবনে লক্ষ্মীগণ পরিসেবিত গোবিন্দের ভজনা করি।

গোকুলে কৃষ্ণের জন্মোৎসব মহাধুমধামে এবং পরম আনন্দে অতিবাহিত হলে গোপরাজ নন্দ একদিন রাজকর প্রদানের জন্য মথুরাতে গেলেন। ব্রজমণ্ডল ছিল মথুরার করদ রাজ্য। নন্দরাজ যথারীতি কংসকে রাজস্ব প্রদান করে ব্রজে ফিরবার ব্যবস্থা করছিলেন। এদিকে বসুদেব সেই যে জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে গোপনে নিজের পুত্রটিকে রেখে এসেছিলেন, তখন থেকে তিনি সর্বদা সেই পুত্রের চিন্তাতেই বিভোর থাকতেন। বসুদেব জেনেছিলেন যে, কংস ও তার মন্ত্রীরা ঠিক করেছে দশদিনের মধ্যে যাদের জন্ম হয়েছে, সেইসব শিশুদের সবাইকে বধ করবে। স্বভাবতই বসুদেব নিজের পুত্রের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি গোপনে নগরের উপকণ্ঠে গিয়ে নন্দরাজের সাথে দেখা করলেন। বসুদেবকে দেখে নন্দরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। বসুদেবও কৌশলে পুত্রের কুশল সংবাদ জেনে নিয়ে বললেন—ভাই! বড়ই সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় যে, বৃদ্ধ বয়সে তুমি একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছ ; তোমরা তো এখন গোকুলে বাস করছ ; সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে তৃণাদি রয়েছে তো? ভাই, আমার স্ত্রী রোহিণী তার শিশু সন্তানসহ তোমারই গৃহে বাস করছে; সে ভাল আছে তো? ভাই, তুমি মহাভাগ্যবান; তুমি আত্মীয়-স্বজনদের তো পালন করছই; বন্ধুপত্নী ও তার শিশুপুত্রকেও প্রতিপালন করছ। এদিকে আমার দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলব? আমি এখন রাজবন্দী, নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালনের সামর্থ্যও আমার নেই। নন্দ মহারাজ তখন বসুদেবকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তোমাদের সমস্ত কথাই আমি জানি ; হায়! দুরাত্মা কংস তোমাদের অনেক পুত্র বধ করেছে; অবশেষে যে একটি কন্যা জন্মেছিল সেও আকাশ পথে চলে গেল; কি দুঃখের কথা! ভাই, অদৃষ্টই জীবের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের কারণ। যে-ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানে, সে কখনও দুঃখে বিচলিত হয় না। অদৃষ্টের প্রভাবে তুমি এখন দুঃখ

পাচ্ছ বটে, কিন্তু অদৃষ্ট-চক্রের পরিবর্তনে তোমারও সুখের দিন আবার ফিরে আসবে। যাঁর ইচ্ছায় এই অদৃষ্ট-চক্রের নিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, তাঁর চরণাশ্রয় লাভ করাই জীবের একমাত্র কর্তব্য। নন্দ মহারাজের কথা শুনে বসুদেব বুঝলেন, যে শিশু পুত্রকে তিনি গোপনে নন্দালয়ে রেখে এসেছিলেন, সে ভালই আছে। নন্দের সাথে দেখা করার আসল উদ্দেশ্যই তো ছিল এই সুসংবাদটি পাওয়া; তাছাড়া উপস্থিত ব্রজমণ্ডলের অমঙ্গল, যা কংসানুচরেরা করবার জন্য বদ্ধ-পরিকর, সেই বিষয়েও নন্দকে সাবধান করার দরকার ছিল। বসুদেব আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, তাঁর পুত্রটি নন্দালয়ে ভালই আছে এবং পুত্র কন্যার ঐ বদলা-বদলির খবর ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারেনি। বসুদেব তখন নন্দকে বললেন—ভাই, তোমার রাজস্ব দেওয়া তো হয়ে গেছে ; আমার সাথেও দেখা হলো; সুতরাং এখানে আর বেশিক্ষণ থেকো না; কারণ গোকুলে নানা উৎপাত হতে পারে। বসুদেবের কথা শুনে নন্দ ভাবলেন—তাই তো, আমার তো আর এখানে থাকা উচিত নয়; বসুদেব সত্যবাদী; সে যখন বলছে তখন ব্রজের অমঙ্গলের আশঙ্কা ঠিকই রয়েছে। নন্দের মনে তাঁর শিশুপুত্রের মুখচ্ছবি ভেসে উঠল; অমনি নন্দ মহারাজ আর কালবিলম্ব না করে গোকুল অভিমুখে রওনা হলেন।

গরুর গাড়ি করে যেতে যেতে নন্দ মহারাজ ভাবতে লাগলেন—বসুদেব ঠিকই বলেছে; দুরাত্মা কংস ব্রজের কাছেই থাকে ; তার অনুচরেরা নানাভাবে চারিদিকে প্রজা-পীড়ন করছে; নিত্যই এইসব কথা শুনতে পাই; ব্রজেও উৎপাত হওয়া স্বাভাবিক। এই কথা মনে হতেই তিনি তাঁর হৃদয়মণি গোকুলানন্দের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তেই তিনি গোকুলে গিয়ে পৌঁছাতে চান। বার বার দেখছেন—গোকুল আর কত দূর; দুশ্চিন্তায় চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। বারবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন—নারায়ণ রক্ষা কর; বুড়ো বয়সে তোমারই কৃপায় পুত্ররত্ন লাভ করেছি; তাকে তুমি রক্ষা কর।

এদিকে কংস-প্রেরিতা অতি ভয়ঙ্করী পূতনা রাক্ষসী ব্রজমণ্ডলের গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিশু-হত্যা করতে আরম্ভ করেছে। সে ইচ্ছামত রূপ ধারণ করতে পারত; তাই সে সুন্দরী স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে নবজাত শিশুর

গৃহে প্রবেশ করত এবং তাকে সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে তার বিষ-মিশ্রিত স্তন পান করিয়ে শিশুর প্রাণ নাশ করত। এই ছিল পূতনার শিশু-হত্যার কৌশল । এই কৌশল অনুযায়ী পূতনা সেদিনও অতি সুন্দরী ব্রজরমণীর বেশ ধারণ করে নন্দালয়ে প্রবেশ করে শয্যায় শায়িত শিশু ভগবানকে দেখতে পেল। ছাই চাপা আগুন যেমন উপর থেকে বোঝা যায় না, সেইরকম বালমাধুর্যে আচ্ছাদিত পরমপুরুষ কৃষ্ণকে পূতনা প্রাকৃত শিশু বলেই মনে করল।

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ ॥
১০-৬-৮ ॥

অখিল জীব জগতের যিনি অন্তর্যামী সেই ভগবান বালঘাতিনী পূতনাকে আসতে দেখে চোখ বুজলেন। নির্বোধ ব্যক্তি যেমন রজ্জু মনে করে সুপ্ত সর্পকে গ্রহণ করে, সেইভাবে পূতনাও নিজের মৃত্যুস্বরূপ ভগবানকে সামান্য শিশু ভেবে কোলে তুলে নিল।

পূতনাকে আসতে দেখে শিশু চোখ বন্ধ করল—এই কথা বিশেষ করে বলার সার্থকতা কোথায়? ছয় দিনের শিশু তো বেশির ভাগ সময়ই ঘুমিয়ে অথবা চোখ বুজেই থাকে; সুতরাং গোপী-বেশী পূতনাকে আসতে দেখে কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করলেন—এ তো সাধারণ শিশুর মতোই ব্যবহার হয়েছে ; এতে আর বিশেষ কি আছে? কথাটা হচ্ছে এই যে, ভক্তের কাছে ভগবানের প্রতিটি ভঙ্গিই অর্থবহ এবং রসবহ। কৃষ্ণের এই সামান্য চোখ বোজার মধ্য দিয়ে, তাঁর মনন এবং রসের আস্বাদনের জন্য শুকদেব বিশেষ করে পরীক্ষিৎকে শিশুর চোখ বোজার কথা বলেছেন। এই সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবতোষণী গ্রন্থে বলেছেন যে, শিশুর স্বভাবই এই যে, তারা কিছুক্ষণ জেগে থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তাছাড়া শিশুরা মায়ের কাছে আনন্দে খেলা করে ; কিন্তু অপরিচিত লোক দেখলেই চোখ বন্ধ করে। কৃষ্ণও সাধারণ শিশুর মতো ব্যবহার করে অন্তরঙ্গদের কাছে তাঁর বাল্য-লীলার মাধুর্য প্রকাশ করলেন। চোখ বোজার দ্বিতীয় কারণ হিসেবে বলেছেন যে, ভগবান অন্তর্যামী, সকলের মনের ভাব জানতে পারেন। পূতনা এসেছে ব্রজের শিশুদের বধ করতে একথা কৃষ্ণের অজানা নয় ; এদিকে

ব্রজের শিশুরা হচ্ছে কৃষ্ণের সখা, তাঁর পরম ভক্ত। কৃষ্ণ ভাবলেন—পূতনা সর্বদা অপরের অনিষ্ট করে বেড়ায় এবং আমার সখা ও ভক্তদের বধ করতে এসেছে; আমি এর মুখ দর্শনও করতে চাই না। তাই তিনি চোখ বন্ধ করেছিলেন। তৃতীয় কারণ হলো এই যে, পূতনা মায়া অবলম্বন করে নিজের আসল রূপ ঢেকে সুন্দরী গোপনারী বেশে নন্দালয়ে এসেছে ; ভগবান হচ্ছেন জ্ঞানস্বরূপ; তাঁর কাছে মায়া ঘেঁসতেও পারে না। কৃষ্ণ ভাবলেন—আমি যদি পূতনার দিকে তাকাই তবে তার মায়ার বেশ দূরীভূত হয়ে আসল রাক্ষসী রূপ বেরিয়ে পড়বে; তখন সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসী রূপ দেখে আমার স্নেহশীলা মায়েরা আমারই অমঙ্গলাশঙ্কায় ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়বেন; তাই তিনি চোখ বুজে ছিলেন। চতুর্থ কারণ হিসেবে বলেছেন যে, ভগবান জানেন পূতনারই মঙ্গলের জন্য তাকে বধ করতে হবে ; কিন্তু বধ করার কাজটা তো ক্রূর এবং লজ্জাজনকও বটে। পিতামাতা সন্তানের দৌরাত্ম্যে বাধ্য হয়ে তাদের শাস্তি দেন বটে, কিন্তু মনে মনে তারা দুঃখিতও হন। সেইরকম ভগবানও পূতনার মঙ্গলের জন্য তাকে বধ করতে হবে ভেবে দুঃখে ও লজ্জায় তার দিকে না তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত শোনাচ্ছেন যাতে সাতদিনের মধ্যে পরীক্ষিৎ ভগবৎ চিন্তায় বিভোর হয়ে জীবনের পরম পুরুষার্থ লাভ করতে পারেন। তাই তিনি কখনও কখনও ভগবানের অঙ্গ-ভঙ্গি, চোখের ইশারা প্রভৃতির ইঙ্গিত দিয়েছেন, যাতে পরীক্ষিৎ ভগবৎ চিন্তার জাল বুনে ভগবৎ ভাবে তন্ময় হতে পারেন।

সুন্দরী গোপনারী বেশী পূতনাকে দেখে যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি অবাক হলেন; ভাবলেন—একে তো কখনও দেখিনি কিন্তু কোন বাধা দিলেন না। কারণ নবাগতা তো শিশুকে আদরই করছে। পূতনা তখন সুযোগ বুঝে শিশুকে বধ করবার জন্য তার মুখে বিষ মিশ্রিত স্তন প্রদান করলেন। কৃষ্ণ তখন কি করলেন?

> তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্যমুল্বণং
> ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
> গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ
> প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥ ১০-৬-১০॥

অতি ভয়ঙ্করী পূতনা শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে, স্পর্শমাত্র প্রাণান্ত-কারী অতি উগ্র বিষযুক্ত স্তন তাঁর মুখে প্রদান করল। শিশুরূপী ভগবান তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দুই হাতে সবলে স্তন পীড়ন করে পূতনার প্রাণের সাথে সেই স্তন পান করলেন।

পূতনা তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হয়ে 'ছাড়, ছাড়, আর স্তন পান করতে হবে না' বলে চিৎকার করতে লাগল ; তার চোখ দুইটি কোটর থেকে বাইরে আসার উপক্রম হলো, সর্বাঙ্গে দরদরধারে ঘাম ঝরতে লাগল; পূতনা বার বার হাত পা ছুড়ে শিশুকে বুক থেকে ফেলতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই শিশুকে বুক থেকে ছুড়ে ফেলতে পারল না।

ভগবানের সাথে কোনরকমে একবার সম্বন্ধ হলে, সেই সম্বন্ধ আর ছাড়ানো যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—ছেলে বাপের হাত ধরলে ছেলে পড়ে যেতেও পারে; কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরলে ছেলের আর পড়বার ভয় থাকে না। ভগবান একবার ভক্তকে ধরলে ভক্তের আর কখনও ভগবান থেকে বিচ্যুতি হয় না; ভগবান পূতনাকে সর্বদোষ থেকে মুক্ত করে আপন করে নেবেন; সুতরাং তিনি পূতনাকে ছাড়বেন কেন?

পূতনা কিছুতেই বুক থেকে শিশুকে সরাতে না পেরে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তার নিজের রাক্ষসী রূপ-ধারণ করল এবং ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে শিশুকে নিয়েই আকাশপথে মথুরার দিকে যেতে লাগল; উদ্দেশ্য একবার মথুরায় গিয়ে পৌঁছাতে পারলে শিশুকে ছাড়াবার একটা ব্যবস্থা হবে—সেখানে আরও সব অসুরেরা আছে। কিন্তু পূতনার উদ্দেশ্য সফল হলো না; অল্প কিছুদূর গিয়েই পূতনার পর্বত-প্রমাণ দেহ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে গেল। শিশু তখনও পূতনার বুকে নীলমণি পদকের মতো সংলগ্নই ছিল।

এদিকে নন্দালয়ে যশোদা প্রভৃতি গোপীরা পূতনার আর্তনাদ, রাক্ষসী রূপ ধারণ এবং বক্ষ-সংলগ্ন শিশুকে নিয়েই উড়ে যেতে দেখে ভয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁরাও দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে রাক্ষসীর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়েই দেখলেন যে, রাক্ষসী মরে পড়ে আছে; এবং নির্ভীক শিশু মৃত রাক্ষসীর বুকের উপর হাত পা ছুঁড়ে আনন্দে খেলা করছে ; এই দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাড়াতাড়ি রাক্ষসীর বুক থেকে শিশুকে এনে বক্ষে ধারণ করলেন।

গোপীরা ভাবলেন—এই শিশুর এখনও ভয়ঙ্কর জিনিস বোঝবার বয়স হয়নি; তাই সে মৃত্যু-রূপা রাক্ষসীর বুকের উপর আনন্দে খেলা করছিল। যাক, নারায়ণের কৃপায় আজ এই শিশুর প্রাণ রক্ষা হলো। রাক্ষসীর স্পর্শ-জনিত অমঙ্গল দূর করবার জন্য যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি নারীরা তখন শিশুর শরীরে সরষে ছিটিয়ে গোপুচ্ছ স্পর্শ করিয়ে এবং ভগবানের বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করে শিশুর রক্ষা-বিধান করলেন। কি আশ্চর্য! যাঁর নামে সর্ব অমঙ্গল দূর হয়, তাঁরই মঙ্গলের জন্য গোপীরা এই সব তুচ্ছ দেশাচার পালন করলেন! এই তো শুদ্ধ বাৎসল্যভাবের লক্ষণ! গোপীদের কাছে কৃষ্ণ সাধারণ শিশু বই তো কিছু নয় ।

গোকুলে যখন এইসব কাণ্ড হচ্ছে, তখন নন্দাদি গোপেরা মথুরা থেকে গোকুলে এসে পূতনার বিশাল মৃতদেহ দেখে এবং আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

> পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
> জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্ ॥ ১০-৬-৩৫ ॥

শিশু হত্যাকারী রক্তখেকো রাক্ষসী পূতনা হিংসা করার অভিপ্রায়েই শ্রীহরিকে স্তন পান করিয়েছিল; আর তারই জন্য পূতনা সদ্‌গতি লাভ করল।

পূতনার রাক্ষসকুলে জন্ম, শিশু-রক্ত-পায়ী, অপরের হিংসা করাই তার একমাত্র কাজ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভগবানের কৃপালাভের সে একেবারেই অযোগ্য; তবুও ভগবান তাকে ধাত্রীগতি দান করেছিলেন; কেন? এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়; শুধুমাত্র বলা যায়, এ হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য কৃপা-শক্তির অভিব্যক্তি। এ-রকমটি তিনি আর কোথাও করেননি। পূতনা ভগবানকে স্তন দান করেছিল, যদিও তার পেছনে ছিল তার জিঘাংসা প্রবৃত্তি। কিন্তু ভগবান তার এই স্তনদানের মধ্যে যে দোষাংশ ছিল, হিংসা প্রবৃত্তি ছিল, তা গুণে রূপায়িত করে পূতনার স্তন-দান-রূপ সেবাংশকেই গ্রহণ করেছিলেন। সকলের সব দোষ হরণ করেন বলেই তো তাঁর নাম 'হরি'।

শুকদেব বলছেন—বিষযুক্ত স্তনদান করেও যদি পূতনা মুক্তি লাভ করে থাকে, তবে কৃষ্ণের মায়েদের মতো বিশ্বাস এবং আদরের সাথে যারা

অখিলাত্মা কৃষ্ণকে নিজেদের অতি প্রিয় বস্তু সমর্পণ করেন, তাঁদের যে পরাগতি লাভ হবে—এতে আর বলবার কি থাকতে পারে?

যশোদার সমবয়স্কা গোপীরা সবাই কৃষ্ণের মাতৃস্থানীয়া; তাঁরা সবাই কৃষ্ণকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন; তাঁদের আত্মসুখ বলতে কিছু নেই; কৃষ্ণের সুখেই তাঁদের আনন্দ। এইরকম প্রেমময় ভক্তেরা যখন আদরের সাথে কোন জিনিস ভগবানে সমর্পণ করেন, তখন ভগবান প্রতিদানের বিষয় ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন; অর্থাৎ সেই ভক্তকে প্রতিদান দেবার মতো জিনিস ভগবানের ভাণ্ডারেও বেশি নেই।

পূতনাবধ লীলায় ভগবান যে কৃপা-বৈভব প্রকাশ করেছেন তা আমাদের ধারণাতীত। ভগবানের আর কোন লীলাতেই এমনটি হয়নি। ভগবান তাঁর শত্রুভাবাপন্ন জীবদের বধ করেই ক্ষান্ত হন না। তিনি তাদের সদ্‌গতিরও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সে সদ্‌গতি কেবল মাত্র মুক্তিদান পর্যন্তই। কিন্তু পূতনার বেলায়, তিনি তাকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমপ্রেম দান করলেন এবং অবশেষে তাকে 'ধাত্রীগতি' ভগবৎ-সেবার অধিকার পর্যন্ত দিলেন; এমন দয়া তিনি আর কোন লীলাতেই প্রকাশ করেননি।

যাঁরা কর্মী, তাঁরা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে যাগ যজ্ঞাদি করে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। জ্ঞানীরা সিদ্ধ অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। যোগীরা সিদ্ধাবস্থায় ভগবানকে অন্তর্যামিরূপে সাক্ষাৎকার করেন বটে কিন্তু তাঁকে ভালবাসতে সক্ষম হন না। ভক্তেরা ভক্তিযোগের সিদ্ধ অবস্থায় ভগবৎস্বরূপের সন্ধান পান এবং তাঁকে ভালবাসতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁরা ভগবানের সাথে সম্বন্ধ-যুক্ত হয়ে ভগবৎ সেবার অধিকার পান না। অতি বিরল কোন শুদ্ধ ভক্ত যখন ভগবানের নিত্য পার্ষদদের অনুগত হয়ে তাঁদের ভাব অনুযায়ী ভগবানের সেবার অনুশীলন করেন তখন তাঁরাই ক্রমে ভগবৎ সেবাধিকার লাভ করে ধন্য হন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তি থেকে ভগবানের সেবাধিকার লাভ করা দুরূহ। ভগবৎ সেবার অধিকার দেওয়াই হচ্ছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। ভগবান সেই শ্রেষ্ঠ জিনিস পূতনাকে দিয়েছিলেন, যদিও পূতনার সেই জিনিস পাবার কোন যোগ্যতাই ছিল না। মনে হয় এই লীলা কৃষ্ণের শিশু ভাবেরই পরিচয়; শিশুরা যাকে ভালবাসে, তাকে সবকিছুই দিয়ে দেয়,

কোনরকম বিচার করে না; ভগবানও তাঁর প্রথম বাল্যলীলায় এই শিশু ভাবেরই প্রকাশ করলেন। এই তো ভগবানের অসীম কৃপা-বৈভবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

জীব গোস্বামী তাঁর 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকায় বলেছেন— নন্দনন্দন নন্দালয়ে জন্মের পর পূতনা রাক্ষসীকে বধ করে তাঁর পরম করুণাময় লীলার সূত্রপাত করেছেন। তিনি রাক্ষসীকে জননী-গতি প্রদান করে লীলারম্ভ করলেন বলে মনে হয়, তিনি তাঁর ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণ এবং লীলা-মাধুর্যে ভক্তদের লালসা উৎপাদন করেই লীলারম্ভ করলেন। এতে সকলেরই মনে হওয়া উচিত, যাঁর ভক্তের বেশ এবং ভাবের অনুকরণ করে রাক্ষসীরও জননী-গতি লাভ হয়, সত্যই তাঁর ভক্ত হলে না জানি আরও কত কি লাভ হতে পারে! এই লীলায় ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য গুণের পরিচয় বিশেষভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর ভক্তকে এতই ভালবাসেন যে, যদি কেউ তাঁর ভক্তের বেশ ধারণ করে ভক্তের অনুকরণও করে তবে তিনি তাকেও কৃতার্থ করতে কুণ্ঠিত হন না।

১৮

কৃষ্ণের নামকরণ ও তাঁর বাল্যলীলা মাধুরী

বসুদেব সেই যে রাত্রির অন্ধকারে যশোদার শয্যায় নিজের পুত্রটিকে রেখে এসেছিলেন, সেই থেকে ঐ পুত্রটিই তাঁর সমস্ত মন প্রাণ অধিকার করে রয়েছে—প্রতি মুহূর্তে বসুদেব কেবল তাঁরই কথা ভাবছেন; দেবকীর অবস্থাও তাই; ছেলেটিই তাঁদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। একদিন বসুদেব দিন গণনা করে দেখলেন যে, তার পুত্রের ৯৯ দিন বয়স হয়েছে। শততম দিনে পুত্রের নামকরণ করাই বিধেয়। বসুদেব ভাবলেন—ব্রজরাজ নন্দ ঐ ছেলেটিকে তাঁর নিজের পুত্র বলেই জানে এবং সেইভাবেই তাঁর লালন-পালন করছে। নন্দ যদি আগামীকাল ঐ পুত্রের নামকরণ সংস্কার করে, তবে সেটা ভাল হবে না; কারণ নন্দ তো নিজ পুত্র-জ্ঞানেই ঐ শিশুর বৈশ্যোচিত সংস্কার করবে এবং রোহিণী-পুত্র ক্ষত্রিয় বলে তাঁর কোন সংস্কারই করবে না। কিন্তু রোহিণী-নন্দন এবং দেবকী-নন্দন—এই দুইজনের সংস্কারই যদি আমাদের কুলপুরোহিত গর্গাচার্যকে দিয়ে করানো যায় তাহলে সব দিক থেকেই ভাল হবে; মহামুনি গর্গাচার্য সকল বর্ণেরই সংস্কার করতে পারেন। এইসব ভেবে বসুদেব তখন গোপনে গর্গাচার্যের কাছে গিয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা—নিজের পুত্রের সাথে নন্দের কন্যার বিনিময় ইত্যাদি সমস্ত বললেন। বসুদেবের কথা শুনে গর্গাচার্য সহাস্যে বললেন—আমি এই বৃত্তান্ত এবং এ ছাড়া আরও কিছু জানি। যাই হোক, এখন আমায় কি করতে হবে তাই বল। বসুদেব বললেন, আপনি আমাদের কুলপুরোহিত; সুতরাং আপনি কৃপা করে কাল নন্দালয়ে গিয়ে আমার পুত্র দুইটির ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার করুন। গর্গাচার্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষি; তিনি বসুদেবের কথায় রাজি হলেন, কারণ তিনি জানেন যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতিই বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করে এখন নন্দালয়ে রয়েছেন; সুতরাং তাঁর নামকরণ সংস্কার করা তো মহাভাগ্যের কথা।

পরদিন প্রাতঃকালে গর্গাচার্য নন্দালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন; নন্দ তখন পরমানন্দিত হয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে সসম্মানে বসিয়ে বললেন—আপনি

সর্বজ্ঞ-শিরোমণি এবং আত্মানন্দে সদাই পূর্ণ থাকেন; সুতরাং আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করার কোন মানেই হয় না। আপনারা অপরের কল্যাণের জন্যই এখানে সেখানে ইচ্ছামত গতায়াত করেন। আপনার আগমনে আমাদের বংশ পবিত্র হয়েছে, আমরা কৃতার্থ হয়েছি। আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা—আপনি কৃপা করে এই শিশু দুটির নামকরণ সংস্কার করে এদের আশীর্বাদ করুন। নন্দ জানেন যে, গর্গাচার্য ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ; তিনি নামকরণ করলে ছেলে দুটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছুটা জানা যাবে।

গর্গাচার্য বললেন—আমি যদু বংশের আচার্য, একথা সবাই জানে; আমি যদি তোমার পুত্রের নামকরণ করি তাহলে কংস তাকে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র বলে মনে করতে পারে। তোমার সাথে বসুদেবের খুব বন্ধুত্ব—একথাও কংসের অজানা নয়; তাছাড়া দৈববাণী অনুযায়ী দেবকীর অষ্টম সন্তান কন্যা হতেই পারে না—কংস এইরকম ধারণা করে আছে। সুতরাং তোমার পুত্রের নামকরণ করলে কংসের সেই ধারণাই বলবতী হবে; তার জন্য কংস যদি তোমার পুত্রের কোন ক্ষতি করে তাহলে বড়ই দুঃখের বিষয় হবে। গর্গাচার্যের কথার যথার্থতা অনুভব করেও নন্দ এমন মহা সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। তাই নন্দ বললেন—আপনি অতি গোপনে এদের নামকরণ করুন; তাহলে বাইরের কেউ-ই জানতে পারবে না। নন্দের কথায় গর্গাচার্য রাজি হয়ে শিশু দুইটির নামকরণ সংস্কার করলেন।

গর্গাচার্য প্রেমবান ভক্ত বটে, কিন্তু নন্দ-যশোদার মতো প্রেমান্ধ নন; তিনি নন্দনন্দনের সকল কথা এবং তত্ত্বই জানেন। তিনি দেখে অবাক হলেন যে, ভগবানকে পুত্ররূপে পেয়েও নন্দ-যশোদা তাঁকে অতি সাধারণ শিশুর মতোই বাৎসল্য-ভাবে লালন পালন করছেন এবং ভগবানও এই শুদ্ধ বাৎসল্য-রস পরম আনন্দে আস্বাদন করছেন। গর্গাচার্য ভাবলেন—নন্দ-যশোদার যে শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাব দেখছি, যার জন্য ভগবানও এঁদের বশীভূত হয়েছেন সেই বাৎসল্য-ভাবে কোনরকম আঘাত করা চলবে না; অর্থাৎ এ-কথা বলা চলবে না যে, তোমাদের পুত্রই স্বয়ং ভগবান। নন্দ-যশোদা যদি গর্গাচার্যের কথায় বোঝে যে, তাঁদের পুত্রই স্বয়ং ভগবান, তাহলে তাঁদের শুদ্ধ বাৎসল্য ভাবে বিষম আঘাত লাগবে এবং ভগবানও শুদ্ধ বাৎসল্য-রস আস্বাদনে বঞ্চিত হবেন; তাহলে যে, কৃষ্ণের ব্রজে আসার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ত্রিকালজ্ঞ

মহামুনি গর্গাচার্য এমন কাজ করতেই পারেন না। সুতরাং গর্গাচার্য ঠিক করলেন—শিশু দুটির নামকরণের সাথে, তাঁদের ভবিষ্যৎ এমনভাবে বলবেন, যাতে নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-ভাবে কোনরকম আঘাত লাগবে না। রোহিণী ও যশোদা নিজ নিজ পুত্রকে কোলে নিয়ে বসলেন; নন্দও গর্গাচার্যের কাছেই রইলেন।

অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ।
যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যত ॥ ১০-৮-১২ ॥

রোহিণী-পুত্র বড় বলে গর্গাচার্য প্রথমে তাঁর সম্বন্ধে বললেন। এই রোহিণী-পুত্র সদ্‌গুণের দ্বারা বন্ধুদের *রময়ন্*—আনন্দ বিধান করবে; তাই সে 'রাম' নামে খ্যাত হবে; এ অত্যন্ত বলবান বলে লোকে একে 'বল' নামেও অভিহিত করবে। এই শিশু বসুদেব প্রভৃতি যাদবদের সাথে তোমাদের একইভাবে দেখবে; সেইজন্য এ 'সঙ্কর্ষণ' নামেও খ্যাত হবে।

তত্ত্বজ্ঞ-শিরোমণি গর্গাচার্য জানেন যে, শ্রীভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ বলরামই প্রভুর সেবার জন্য রোহিণী-নন্দনরূপে জন্মেছেন এবং অনাদিকাল থেকেই তিনি পুরাণে রাম, বল, সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু নন্দ, যশোদা ও রোহিণী বুঝলেন যে, এই পুত্রের ভাগ্য সুপ্রসন্ন—তাই সে বহু সদ্‌গুণের অধিকারি হবে; সুতরাং তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১০-৮-১৩ ॥

রোহিণী-পুত্রের নামকরণ করার পর গর্গাচার্য বললেন—এই যে যশোদা-নন্দন, এ সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি সকল যুগেই অবতীর্ণ হয়ে থাকেন; ইনি পূর্ব পূর্ব যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণরূপে দেহ-ধারণ করে এখন কৃষ্ণবর্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

গর্গাচার্য ভাবলেন, ভগবানের অনন্ত নাম; তার মধ্যে 'কৃষ্ণ' নামই মুখ্য—তিনি সকলকে *কর্ষতি*—আকর্ষণ করেন বলে কৃষ্ণ। সুতরাং গর্গাচার্য শিশুর নাম রাখলেন 'কৃষ্ণ'। শিশুর গায়ের রং-এর সাথেও কৃষ্ণ নামের সাদৃশ্য

রয়েছে। কিন্তু বাৎসল্য-প্রেমবান নন্দ বুঝলেন যে, তাঁর উপাস্য দেবতা নারায়ণের একটি নাম কৃষ্ণ; তাই গর্গাচার্য কৃপা করে ইষ্ট দেবতার নামের সাথে মিলিয়ে তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন কৃষ্ণ। এতে নন্দ পরম আনন্দই অনুভব করলেন। গর্গাচার্যের কথায় নন্দ আরও বুঝলেন যে, ভগবান প্রতি যুগেই—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—প্রতি যুগেই বিভিন্ন বর্ণে, কখনও শুক্লবর্ণ, কখনও রক্তবর্ণ, কখনও পীতবর্ণ বিগ্রহ ধারণ করে আবির্ভূত হন। আমার এই পুত্রটি প্রতি যুগেই ভগবানের আরাধনা করে যুগাবতারের সাথে জন্মেছে; এবারও নারায়ণের উপাসনা করে তাঁরই মতো কৃষ্ণবর্ণ দেহ ধারণ করেছে। আমার এই পুত্রটি যে মহা যোগ-বিভূতিসম্পন্ন, তা গর্গাচার্যের কথায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে; সুতরাং এই পুত্রটি সাধারণ জীবের মতো নয়। যাই হোক, নারায়ণের অসীম কৃপায় এমন পুত্ররত্ন লাভ করেছি; এখন তাঁর কৃপায় এর দীর্ঘজীবন লাভ হলেই আমি কৃতার্থ হব।

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥ ১০-৮-১৪ ॥

গর্গাচার্য বললেন—হে নন্দ! তোমার এই পুত্র কোন সময়ে বসুদেবের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল; সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা একে 'বাসুদেব' বলেও অভিহিত করে থাকেন।

গর্গাচার্যের ভাব এই যে, স্বয়ং ভগবান নন্দ-নন্দনই বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভগবানই যুগপৎ মথুরাতে বাসুদেব এবং নন্দালয়ে কৃষ্ণ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু বাৎসল্য-প্রেমে অন্ধ নন্দ বুঝলেন—বসুদেবের কোন পূর্ব জন্মে আমার এই পুত্রটি তাঁর পুত্ররূপে জন্মেছিল এবং তখন সেই শিশুর নাম রাখা হয়েছিল বাসুদেব। সেইজন্য সর্বজ্ঞ-শিরোমণি গর্গাচার্য আমার পুত্রের পূর্ব জন্মেরও নাম প্রকাশ করলেন।

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ১০-৮-১৫ ॥

গর্গাচার্য আরও বললেন—তোমার এই পুত্রের বহুরূপ এবং নাম আছে; সে সবই আমি জানি, কিন্তু অপরে তা জানে না।

গর্গাচার্যের বলার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবানের অনন্ত নাম ও অনন্ত রূপ;

তার মধ্যে কৃষ্ণ নামই মুখ্য; সুতরাং এই মুখ্য নামই আমি শিশুকে দিয়েছি। নন্দের অথবা অপরের পক্ষে ভগবানের অনন্ত নাম গ্রহণ করার শক্তি না থাকলেও একমাত্র কৃষ্ণ নাম গ্রহণেই সকলের সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কিন্তু গর্গাচার্যের কথায় নন্দ বুঝলেন যে, তাঁর পুত্র প্রতি যুগেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং প্রতি যুগেই সে বিভিন্ন নামে এবং রূপে বহুবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করেছে; সেইসব অতীত জন্মের কথা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়; কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ গর্গাচার্য সে সমস্তই জানেন।

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ॥ ১০-৮-১৬॥

গর্গাচার্য বললেন—তোমার এই পুত্র গোপগণের এবং গোকুলবাসীদের আনন্দবর্ধন করবে; এর দ্বারা তোমরা সর্ব বিপদ থেকে মুক্তি পাবে।

গর্গাচার্যের মনের ভাব এই যে, এই শিশু অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি ; তোমরা তাঁর নিত্য-পার্ষদ; সুতরাং তাঁর প্রকট এবং অপ্রকট লীলায় তাঁর সেবাধিকার লাভ করবে; এর চেয়ে বড় আনন্দ, বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে? কিন্তু বাৎসল্য-ভাবে অন্ধ নন্দ বুঝলেন—আমার এই পুত্রটি কোন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ; সুতরাং এর দ্বারা গোকুলবাসীদের সকল অভীষ্ট পূরণ হবে, তাদের মঙ্গল হবে।

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ॥ ১০-৮-১৭॥

গর্গাচার্য বললেন—হে ব্রজপতি! পুরাকালে সাধুব্যক্তিরা দস্যু কর্তৃক পীড়িত হলে, তোমার এই পুত্রই তাদের রক্ষা করেছিল। সাধুব্যক্তিরা তোমার পুত্রের বলে বলীয়ান হয়ে অসুরদের নির্জিত করেছিল।

গর্গাচার্যের বলার উদ্দেশ্য এই যে, পুরাকালে হিরণ্যকশিপু, বলি, রাবণ প্রভৃতি অসুরেরা স্বর্গরাজ্য অধিকার করলে শ্রীভগবানই নৃসিংহ, বামন, রাম প্রভৃতিরূপে অসুরদের পরাজিত করে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু গর্গাচার্যের কথায় নন্দ বুঝলেন, আমার এই পুত্র পূর্ব পূর্ব জন্মে মহা শক্তিশালী ছিল এবং বার বার সাধুদের নানা বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। গর্গাচার্য তাঁর সর্বজ্ঞতা শক্তির প্রভাবে সেইসব পুরান কথা বলছেন।

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ ১০-৮-১৮॥

গর্গাচার্য আরও বললেন—গোবিন্দ-চরণাশ্রিত ব্যক্তিদের যেমন অসুরেরা পরাভূত করতে পারে না, সেইরকম তোমার এই পুত্রকে যারা ভালবাসবে, তাদেরও কোন শত্রু পরাভূত করতে পারবে না।

এই শ্লোকে গর্গাচার্যের ভাব এই ছিল যে, যাঁর চরণাশ্রয় লাভ করলে সাধারণ জীব পর্যন্ত মহাসৌভাগ্যশালী হয়, সেই শিব-বিরিঞ্চি-বন্দিত নন্দ-নন্দনকে মহাসৌভাগ্যবান বললে তাঁর স্বরূপের কোন পরিচয়-ই দেওয়া হয় না। সুতরাং 'মহাভাগ' শব্দে গর্গাচার্য নন্দনন্দনের পরিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যেরই পরিচয় দিলেন। কিন্তু গোপরাজ নন্দ এই শ্লোকে বুঝলেন যে, তাঁর পুত্রটি মহাসৌভাগ্যবান।

তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥ ১০-৮-১৯॥

গর্গাচার্য আরও বললেন—তোমার এই পুত্রের গুণের কথা আর কি বলব? তোমার এই পুত্র সম্পদ, সদ্‌গুণ, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণের তুল্য। অতএব সাবধানে এর পালন-পোষণ কর।

শ্লোকে *নারায়ণ সমো গুণৈঃ*—বলতে গর্গাচার্যের মনের ভাব এই ছিল যে, নন্দ-নন্দন নারায়ণের তুল্য নয়, বরং নারায়ণ-ই নন্দ-নন্দনের তুল্য; অর্থাৎ নন্দ-নন্দনের অশেষ গুণাবলী নারায়ণের গুণসমূহকেও অতিক্রম করবে। সুতরাং তোমার এই অনন্ত গুণসম্পন্ন পুত্রকে সাবধানে পালন করবে। গর্গাচার্যের মনে হয়ত এই ভাবটিও ছিল যে, তোমার এই পুত্র *গোপ-আয়-স্ব-সমাহিত*—অর্থাৎ গোপগণের আয়, স্ব অর্থে ধনাদির উপার্জন এবং উপার্জিত ধনাদির রক্ষণ বিষয়ে, *সমাহিতঃ*—সর্বদা সাবধান হবে—অর্থাৎ গোপগণের বিষয়ের উপার্জন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নশীল হবে। এর দ্বারা গর্গাচার্য বলতে চাইছেন যে, এই পুত্রের মধ্যে ভক্তের 'যোগক্ষেম' বহন করার মতো ভক্তবাৎসল্য গুণও থাকবে। কিন্তু গর্গাচার্যের কথায় গোপরাজ বুঝলেন—আমার পুত্র পূর্ব জন্মে নারায়ণের উপাসনা করে এই জন্মে নারায়ণের মতো গুণশালী হয়েছে; অবশ্য গর্গাচার্যের কথায় একটু অতিশয়োক্তি রয়েছে;

নারায়ণের মতো গুণ থাকা তো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তা যাই হোক এটা ঠিক যে, এইরকম গুণবান পুত্র জগতে অতি দুর্লভ এবং সেইজন্যই গর্গাচার্য অতি সাবধানে আমাকে পুত্রের পালন করতে বলেছেন।

এইভাবে নামকরণের কাজ শেষ করে গর্গাচার্য ভাবলেন—ভগবানের অসীম কৃপায় তাঁর নিত্যসিদ্ধ 'কৃষ্ণ', 'বাসুদেব' নাম প্রকাশ করে আমি ধন্য হয়েছি এবং জগৎবাসী কালে এই নাম জপ করে অনায়াসে ভক্তি মুক্তি লাভ করবে। যাক, কাজ তো হয়ে গেছে; নন্দ-যশোদার মতো বিশুদ্ধ প্রেমময় ভক্তের কাছে আর বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়; কারণ আমার কথায় যদি তাঁরা ঘুণাক্ষরেও পুত্রের মধ্যে ঈশ্বরত্বের আভাস পায়, তাহলে তাঁদের শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাবে বিষম আঘাত লাগবে; আর সেটা হবে আমার মহাপরাধ। এই সব ভেবে গর্গাচার্য তাড়াতাড়ি নন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এদিকে গর্গাচার্যের কথায় নন্দ-যশোদা পুত্রের মহাসৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাম ও কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে প্রাঙ্গণে খেলা করে। তাঁদের বাল্যলীলা দেখার জন্য প্রতিবেশী গোপনারীরা প্রায় সর্বদাই নন্দ-ভবনে এসে থাকেন। কখনও কখনও রাম ও কৃষ্ণ বাছুরের লেজ দেখে আশ্চর্য হয়ে তা জোর করে ধরে; এতে বাছুরেরা ভয় পেয়ে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে রাম ও কৃষ্ণ পড়ে গিয়ে অঙ্গনে গড়াগড়ি করতে থাকে। বাৎসল্যবতী গোপীরা রাম ও কৃষ্ণের বাল্যলীলা দেখে আনন্দে মত্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাঁদের বুকে তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—অহো বীরত্ব! কি শক্তিমান!

ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্ ॥ ১০-৮-২৭ ॥

এর পর কৃষ্ণ সমবয়স্ক ব্রজবালক এবং বলরামের সাথে মিলিত হয়ে ব্রজদেবীদের আনন্দবর্ধন করে নানাপ্রকার বাল্যলীলা করতে লাগলেন। কৃষ্ণের মনোরম বাল্য-চাপল্য দেখে ব্রজ-রমণীরা মা যশোদার কাছে গিয়ে তাঁর দুষ্টুমিপনার কথা বলতেন।

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
১০-৮-২৯ (পূর্বার্ধ)॥

ব্রজ-রমণীরা যশোদাকে বলছেন—হে যশোদে! তোমার পুত্রের কীর্তি-কথা বলছি, শোন। আমরা যখন গৃহকার্যে খুব ব্যস্ত থাকি, তখন সে আমাদের অঙ্গনে প্রবেশ করে গো-দোহনের সময় না হলেও বাছুরদের ছেড়ে দেয়।

তোমার এই পুত্রটি বড়ই চঞ্চল হয়েছে এবং আমাদের বাড়ি গিয়ে মহা উপদ্রব করতে আরম্ভ করেছে। এই অল্প বয়সেই সে চুরিবিদ্যায় এত প্রবীণ হয়েছে যে, আমরা ধারণাও করতে পারি না। তার চুরি করার কৌশল-ই বা কত! সে ক্ষীর ননী চুরি করার জন্য আমাদের বাড়ি ঢুকেই, আমরা কে কোথায় আছি সব এক নজরে দেখে নেয়। যদি দেখে আমরা ঘরেই রয়েছি, তখন সে নিঃশব্দে গোশালায় গিয়ে বাছুরদের খুলে দেয়; বাছুরেরা তখন বাইরে এসে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করে; আমরা তখন বাধ্য হয়ে বাছুরদের বাঁধবার জন্য বাইরে আসি। আর এই সুযোগে সে ঘরে ঢুকে ক্ষীর ননী যা থাকে সব চুরি করে নিয়ে যায়। যশোদা বললেন—আমার কৃষ্ণ তোমাদের ঘরে গিয়ে উৎপাত করে; তা তোমরা তাকে একটু শাসন করলেই তো পার; তাহলেই সে আর ঐরকম করবে না। গোপীরা হেসে বললেন—তাকে শাসন করব কি? সে কি আমাদের ভয় করে? আমরা একটু তর্জন-গর্জন করলে সে দূর থেকে দাঁড়িয়ে হাসে; আর তার ঐ চাঁদ মুখের হাসি দেখে আমরা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই—আর কিছু তাকে বলতে পারি না।

যশোদা বললেন—আমার কৃষ্ণ সমবয়সীদের সাথে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে তোমাদের ঘরে যায়; তখন যদি তোমরা তাকে একটু খেতে দাও তবে তো আর সে চুরি করবে না; খিদেয় কাতর হয়েই না সে তোমাদের জিনিস না বলে খায়; সুতরাং তোমাদের ঘরে গেলেই বাপু তোমরা তাকে একটু খেতে দিও; তাহলেই তার না-বলে খাবার অভ্যাস চলে যাবে। আর সে ছেলেমানুষ কতটুকুই বা খায়! গোপীরা বললেন—যশোদা, তুমি তো জান কৃষ্ণ আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়; তাকে খাওয়াবার জন্য আমাদের কত সাধ; ক্ষীর ননী হাতে করে তাকে খাওয়াবার জন্য

কত সাধাসাধি করি; কিন্তু সে কিছুতেই খেতে চায় না; বলে—তোমাদের ক্ষীর ননী ভাল নয়; আমার মার ক্ষীর ননী খুব ভাল; মা আমাকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছে; বিশ্বাস না কর, পেটে হাত দিয়ে দেখ। তখন আমরা আর কি করি! মনের দুঃখে ক্ষীর ননী আবার রেখে দেই। কিন্তু তোমার ছেলের স্বভাবই এই যে, আদর করে দিলে সে খাবে না, কিন্তু চুরি করে বেশ খায়; আর তার চুরি করার কৌশল-ই বা কত!

মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥
১০-৮-২৯ (উত্তরার্ধ)॥

তোমার ছেলে দুধ, দই প্রভৃতি চুরি করে নিজে খাবার আগে বানরদের ভাগ করে খাওয়ায়; তারা যদি না খায়, তবে দধি-দুগ্ধের ভাণ্ডগুলি ভেঙে ফেলে। আর যদি সে ঘরে খাবার খুঁজে না পায়, তবে রাগ করে শিশুদের কাঁদিয়ে পালিয়ে যায়।

ব্রজ-রমণীরা বলছেন—কৃষ্ণ যদি পেট ভরে ক্ষীর ননী খায়, তবে তো আমরা খুশিই হই; সে যদি তার বন্ধুদেরও খাওয়ায়, তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু বল দেখি, সে প্রথমেই বানরদের খাওয়াবে! বানরেরা যেন তার কত পরিচিত! তারাও তাকে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে নাচতে থাকে। বানরদের পেট ভরে খাওয়াবার পর তারা যখন আর খেতে চায় না, তখন তোমার গুণধর পুত্র রেগে গিয়ে দধি-ভাণ্ড ভেঙে ফেলে বলে—তোদের জন্য চুরি করলাম, আর তোরা খাবি না! তোমার পুত্রের কথা শুনে ও মুখভঙ্গি দেখে বানরেরা একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

যশোদা বললেন—তোমরা যদি ক্ষীর ননী ইত্যাদি একটি ঘরে লুকিয়ে রাখ, তবে তো আর সে চুরি করতে কিংবা বানরদের খাওয়াতে পারে না। তোমরা ঐ সব খাবার জিনিস প্রকাশ্য স্থানে রেখে দাও এবং এই-ভাবে তোমরাই আমার ছেলেকে চুরি করার উৎসাহ দিচ্ছ। তোমাদের অসাবধানতা ও শৈথিল্যের জন্যই আমার কৃষ্ণ তোমাদের ঘরে গিয়ে উৎপাত করে।

যশোদার কথা শুনে গোপীরা হেসে বললেন—ও যশোদা! তুমি যে আমাদেরই দোষ দিচ্ছ। তবে শোন বলি—আমরা ক্ষীর ননী লুকিয়ে

রেখেও দেখেছি; সে খুঁজে না পেলে রেগে গিয়ে বলতে থাকে—যে ঘরে আমার খাবার জিনিস পাওয়া যায় না, সে ঘর থেকে লাভ নেই—সে ঘর পুড়িয়ে দেওয়াই ভাল। এইভাবে আমাদের শাসিয়ে চলে যাবার আগে নিদ্রিত শিশুদের খাম্‌চি মেরে তাদের কাঁদিয়ে চলে যায়।

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ ।

১০-৮-৩০ (পূর্বার্ধ)॥

গোপ-রমণীরা যশোদাকে বলছেন—আমরা যখন গৃহ কর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি, তখন তোমার পুত্র উচ্চস্থানে সুরক্ষিত দধি দুগ্ধ পাড়বার জন্য পিঁড়ি, উদূখল প্রভৃতির সাহায্য নেয়; তাছাড়া শিকার উপর কোন্ পাত্রে কি আছে, সে সব জানতে পারে। শিকার উপর রক্ষিত দধি ক্ষীর পাবার জন্য সে ঐ সব পাত্র ফুটো করে দেয়।

যশোদা বললেন—ক্ষীর ননী খুঁজে না পেলে আমার পুত্র তোমাদের গৃহে গিয়ে নানা উপদ্রব করে; তা তোমরা ঐ সব জিনিস একটু উঁচু স্থানে শিকায় ঝুলিয়ে রাখলেই তো পার। গোপীরা বললেন—তোমার ছেলের হাত থেকে ক্ষীর ননী রক্ষা করার জন্য আমরা কতই না উপায় করেছি; কিন্তু তোমার ছেলের কাছে আমরা হেরে গেছি; কিছুতেই তাকে এড়ানো যায় না। আমরা শিকার উপর ক্ষীর ননীর ভাণ্ড ঝুলিয়ে রেখে দেখেছি। তোমার পুত্র তখন পিঁড়ির উপর পিঁড়ি সাজিয়ে তার উপর উঠে অথবা উদূখলের উপর উঠে ঐসব জিনিস নিচে নামিয়ে আনে; এইরকম ভাবেও যদি হাতের নাগাল না পায়, তবে সে অপর বালকের কাঁধে উঠে অথবা অপর বালককে তার কাঁধে উঠিয়ে ক্ষীর ননী প্রভৃতি পেড়ে আনে। তাতেও যদি সে হাতের নাগাল না পায়, তবে পাথর ছুড়ে হাড়ির তলা ফুটো করে দেয় এবং মুখ হাঁ করে নিচে দাঁড়িয়ে সেই গলিত ক্ষীরধারা পান করে। আর একটা কথা তোমার পুত্র কোন দিনই শূন্য পাত্রে হাত দেয় না; বাইরে থেকেই সে বুঝতে পারে কোন্ পাত্রে কি আছে।

ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ ॥

১০-৮-৩০ (উত্তরার্ধ) ॥

যশোদা বললেন—তোমরা ক্ষীর ননী শিকায় ঝুলিয়ে রাখ ঠিক; কিন্তু ঐ ঘরটির যদি দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকার করে রাখ, তবে তো কৃষ্ণ আর ঐসব জিনিসের খোঁজ পায় না; আর খোঁজই যদি না পায়, তবে চুরি করবে কেমন করে?

যশোদার কথা শুনে গোপীরা বললেন—ও হরি! তোমার পুত্র যে ঘরে যায়, সে ঘর কি আর অন্ধকার থাকতে পারে? তার অঙ্গচ্ছটায় অন্ধকার ঘরও আলোকিত হয়ে ওঠে; তার উপর তুমি আবার ওর গায়ে নানাপ্রকার মণি-মাণিক্যের অলঙ্কার পরিয়ে দাও; তোমার পুত্রের অঙ্গচ্ছটায় ঐসব রত্নালঙ্কার আরও সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং অন্ধকার ঘরে প্রদীপের কাজ করে; ঐ আলোতে ঘরের কোথায় কি আছে, সে তা সহজেই দেখতে পায়। সুতরাং তোমার পুত্রের হাত থেকে আমাদের ক্ষীর ননী রক্ষা করার কোনই উপায় নেই। যশোদা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমার পুত্রের গায়ে এত সব রত্নালঙ্কার তুমি পরাও কেন? লোকেরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কার ব্যবহার করে। কিন্তু তোমার পুত্র এতই সুন্দর যে, রত্নালঙ্কার পরিয়ে তার সৌন্দর্য আর বাড়ানো যায় না; বরং কৃষ্ণের অঙ্গ-সান্নিধ্যে ঐসব অলঙ্কারই আরও বেশি সুন্দর দেখায়; অলঙ্কার সুন্দর দেখানোর জন্য তুমি নিশ্চয়ই তাকে অলঙ্কার পরাও না। তাই মনে হয় যে, পুত্রকে চুরি করতে সাহায্য করার জন্যই তুমি ওর গায়ে রত্নালঙ্কার পরিয়ে দাও। অলঙ্কার পরাবার আর একটা কারণও থাকতে পারে, তুমি হয়ত বলতে চাইছ—যার এত রত্নালঙ্কার, সে কখনও চুরি করতে পারে? তোমার পুত্রের কীর্তি আরও বলি শোন ঃ

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে ।
১০-৮-৩১ (পূর্বার্ধ)॥

হে যশোদে! তোমার এই পুত্রটি চুরি বিদ্যায় সিদ্ধ হয়েছে এবং নানা উৎপাত করে। শুধু কি এই! কখনও কখনও সে রাগ করে আমাদের ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করে চলে যায়। যশোদা! তোমার পুত্রের ধৃষ্টতা দেখে আমরা হেসে বাঁচিনে। ভাবি, এই অল্প বয়সে এত বুদ্ধি কৌশল শিখল কেমন করে?

ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ॥
১০-৮-৩১ (উত্তরার্ধ) ॥

গোপীরা বললেন—যশোদে! দেখ, কৃষ্ণ এখন কেমন ভাল মানুষের মতো তোমার কোলে বসে আছে! গোপরমণীরা এইভাবে যশোদা-নন্দনের বাল্য-চাপল্য বর্ণনা করে ভয়বিজড়িত কৃষ্ণের মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইলেন। কৃষ্ণ ভয় পেয়েছে দেখে তারা যশোদাকে আর কিছু বললেন না। গোপীদের কথা শুনে যশোদা হাসলেন বটে, কিন্তু পুত্রকে ভীত দেখে কোন তিরস্কার করলেন না।

কৃষ্ণ সমবয়সী বালকদের সাথে খেলা করে; একদিন খেলাতে কৃষ্ণ বার বার হেরে যাচ্ছে দেখে অন্যান্য বালকেরা খুব আনন্দ করতে থাকে; এতে কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মাটি খেতে লাগল। তখন বালকেরা ছুটে গিয়ে মা যশোদাকে বললে—কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। যশোদা তখনই হাতের সব কাজ ফেলে দুষ্টু বালকের কাছে এসে বললেন—তুই মাটি খেয়েছিস কেন? কৃষ্ণ সোজা বলে দিল—না মা, আমি মাটি খাইনি; এরা সবাই মিথ্যাবাদী; আমার কথা যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার মুখ দেখ। যশোদা বললেন—ঠিক আছে, তুই হাঁ কর। যশোদা তখন কৃষ্ণের মুখের মধ্যে তাকিয়ে সেখানে সমস্ত বিশ্বচরাচর, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভূলোক, দ্যুলোক প্রভৃতি দেখতে পেলেন। এই অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে যশোদা শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন—

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ ॥
১০-৮-৪০॥

এ আমি কি দেখছি? এ কি স্বপ্ন অথবা কোন দেবমায়া অথবা আমারই বুদ্ধিভ্রম? গর্গাচার্য তো বলেছিলেন যে, কৃষ্ণ পূর্ব পূর্ব জন্মে সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিল; এ কি কৃষ্ণেরই কোন সিদ্ধি অথবা ঐশ্বর্যের প্রকাশ? যশোদা এইভাবে চিন্তা করে কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং চেতোমনঃকর্মবচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্॥
১০-৮-৪১॥

যশোদা প্রার্থনা করছেন—চিত্ত, মন, কর্ম ও বাক্যের দ্বারা যাঁর তত্ত্ব কিছুই জানা যায় না এবং এই বিশ্ব যাঁর অধিষ্ঠান, যাঁর শক্তিতে বিশ্বের সব কিছুই অনায়াসে জানা যায়, আমি সেই অচিন্ত্য মহাশক্তির আশ্রয় নারায়ণের শরণ নিলাম।

আমি যশোদা, নন্দ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র, আমি গোপরাজের স্ত্রী এবং তাঁর ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী এবং গোধনাদিসহ ব্রজবাসী গোপ এবং গোপিকারা সকলেই আমার প্রজা—এইরকম 'আমি আমার' রূপ ভ্রান্ত-বুদ্ধি যাঁর মায়ার দ্বারা সংঘটিত হয়, সেই নারায়ণই আমার একমাত্র গতি।

যশোদা ভাবছেন—'আমি আমার' এই তো মায়া; আমি গোপরাজের স্ত্রী, কৃষ্ণ আমার পুত্র—এইসব অভিমানসূচক বিষয়ের চিন্তায় আমি নারায়ণকে ভুলে কষ্ট পাচ্ছি; আমার পুত্র কৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কায় সদাই উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছি; ফলে আমার ইষ্ট দেবতা, নারায়ণের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। তাই তো আমার এত কষ্ট; স্বরূপের জ্ঞান হলে তো আর এই কষ্ট থাকবে না। এইভাবে চিন্তা করে যশোদা প্রার্থনা করছেন—হে নারায়ণ! আমার এই মমতার বন্ধন তুমি ছিন্ন করে দাও; আমি যেন দেহ, গেহ, পতি, পুত্রাদিতে মমতাশূন্য হয়ে তোমার পদাশ্রয় লাভ করতে পারি।

যশোদা চাইলেন স্বরূপের জ্ঞান; এই স্বরূপের জ্ঞান হলে তাঁর সংসার-মমতা 'আমি আমার' ভাব দূর হবে বটে, কিন্তু ভগবানের আর বাৎসল্য-লীলা রসের আস্বাদন করা চলবে না। তাই কৃষ্ণ-জননীর এইরকম বৈরাগ্য দেখে বৈষ্ণবীমায়া, তাঁর বাৎসল্য-স্নেহ-রূপী মায়া যশোদার উপর বিস্তার করলেন।

সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্ ।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা ॥ ১০-৮-৪৪॥

ভগবানের বৈষ্ণবীশক্তি তাঁর বাৎসল্য-স্নেহ-রূপী মায়া বিস্তার করলে

যশোদা তখনই তার প্রার্থনার কথা ভুলে গিয়ে আগের মতোই স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন।

যশোদা পুত্ররূপী কৃষ্ণের সম্বন্ধকে মায়া বলে মনে করে এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইলেন; কারণ মায়ায় আবদ্ধ হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানেরই বৈষ্ণবীশক্তি, বাৎসল্য-মায়া বিস্তার করে যশোদাকে আরও ভালভাবে বেঁধে ফেললেন। প্রশ্ন হতে পারে, কৃষ্ণের প্রতি যশোদার এই বাৎসল্য-স্নেহ কি অজ্ঞান থেকে উদ্ভূত? ভগবানের সাথে সম্বন্ধ-যুক্ত কোন কিছুই অজ্ঞানসম্ভূত হতে পারে না। ভগবান হচ্ছেন জ্ঞানের প্রতিমূর্তি; সুতরাং জ্ঞান এবং অজ্ঞান এক সঙ্গে থাকতেই পারে না।

জ্ঞানীরা জ্ঞান যোগে সিদ্ধ হয়ে যাঁকে অবাঙ্‌মনসোগোচরম্—বাক্যমনের অতীত বলে দূরে সরিয়ে রাখে, মা যশোদা তাঁকেই বাঁ-হাতে ধরে ভর্ৎসনা করে বলেন—কেন তুই মাটি খেয়েছিস্? সুতরাং যশোদার বাৎসল্য-ভাব সর্বশাস্ত্রের ধারণার অতীত। ভগবান সকলের নিয়ন্তা হলেও মা যশোদার অধীন; তিনি জন্মরহিত হয়েও যশোদার পুত্র; তিনি সর্বব্যাপী হয়েও মা যশোদার কোলে আসীন; তিনি সর্বেশ্বর হয়েও মা যশোদার শাসনাধীন। ভক্তের এই বাৎসল্য-প্রেম এবং ভগবানের এই প্রেমাধীনতা—এই রহস্য বোঝার সামর্থ্য কার আছে?

একজন গোপী, যিনি শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য যে সচ্চিদানন্দব্রহ্ম তাঁর বিষয়েও জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি একদিন তাঁরই সমভাবা এবং সমবয়স্কা গোপীদের ডেকে বলছেন ঃ

শৃণু সখি! কৌতুকমেকং নন্দনিকেতাঙ্গনে ময়া দৃষ্টম্।
ধূলি ধুসরিতাঙ্গো নৃত্যতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ।।

হে আমার সখিরা! একটা বড় মজার কথা শোন। আমি দেখে এলাম নন্দের অঙ্গনে ধূলিধুসরিত হয়ে বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে নির্গুণ, নিরাকার, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, সেই তিনিই নৃত্য করছেন। এর চেয়ে কৌতুক আর কি হতে পারে! কে এই কৌতুক বুঝবে? তাই শ্রীভগবানের শরণাগতিই একমাত্র উপায়।

১৯
দাম-বন্ধন লীলা

আগে বলা হয়েছে যে, ব্রজরমণীরা প্রায় প্রত্যেক দিনই যশোদার কাছে এসে তার পুত্রের ক্ষীর ননী চুরি করা এবং নানাপ্রকার দৌরাত্ম্যের কথা বলতেন। ব্রজরমণীরা যে রাগ করে অথবা যশোদার কাছে নালিশ করবার জন্য ঐসব কথা বলতেন, তা নয়। কৃষ্ণ যে তাদের ঘরে গিয়ে চুরি করে খায় কিংবা নানা দুরন্তপনা করে, এতে তারা মোটেই অসন্তুষ্ট নয়, বরং চৌর্য-চাতুর্য দেখে তারা অতিশয় আনন্দিতই হন। তবে যে তারা যশোদার কাছে কৃষ্ণের কীর্তির কথা বলেন, তার কারণ হলো এই যে, গোপীরা কৃষ্ণের কথা বলতে ও শুনতে বড় আনন্দ পান; কৃষ্ণের বাল্য-লীলার কথা শুনে তাদের সখি যশোদাও আনন্দ পাক, এই তাদের উদ্দেশ্য; যশোদাও তাদের মনোভাব ভালভাবেই জানেন।

একদিন যশোদা মনে মনে ভাবলেন—আমার কৃষ্ণ প্রতিবেশীদের বাড়ি গিয়ে চুরি করে কেন খায়? আমার ঘরে তো ক্ষীর ননীর অভাব নেই; তবুও কেন সে অপরের বাড়ি গিয়ে চুরি করে খাবে? এইভাবে চিন্তা করে যশোদা সাব্যস্ত করলেন যে, তার দাস-দাসীরাই ক্ষীর ননী তৈরি করে; তারা সম্ভবত ঠিকমত তৈরি করতে পারে না; তাই কৃষ্ণ খেয়ে তৃপ্তি পায় না; আর খেয়ে তৃপ্তি পায় না বলেই তার পেটও ভরে না; সুতরাং ক্ষুন্নি-বৃত্তির জন্যই সে অপরের জিনিস চুরি করে খায়। ব্রজবাসীরা সকলেই আমার কৃষ্ণকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে; কৃষ্ণ তাদের বাড়ি গিয়ে কিছু খেলে তারা মহা আনন্দিতই হয়; কিন্তু আমার কৃষ্ণ যে বড় লাজুক; কারও সামনে কিছু খেতে চায় না; সেইজন্য তারা কৃষ্ণকে ক্ষীর ননী খেতে সাধাসাধি করলেও সে তাদের সামনে খায় না; সুতরাং খিদের জন্য তাকে চুরি করে খেতে হয়। এতে অবশ্য কৃষ্ণের কোন দোষ নেই। আর চুরি করা যে দোষের তা ঐটুকু ছেলে বুঝবে কেমন করে? যাক, আমি যদি নিজেই কৃষ্ণের জন্য ক্ষীর ননী তৈরি করে তাকে খেতে দিই তবে সে

তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খাবে; তা হলেই আর অপরের বাড়ি গিয়ে চুরি করে খাবার ইচ্ছা হবে না। এইভাবে চিন্তা করে যশোদা এখন থেকে নিজেই কৃষ্ণের জন্য ক্ষীর ননী তৈরি করবেন ঠিক করলেন।

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্মান্তরনিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি ॥ ১০-৯-১ ॥

শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বলতে গিয়ে পরীক্ষিৎকে বললেন —একদিন নন্দরাজ গৃহে দাসদাসীরা গৃহকাজে অন্যত্র ব্যাপৃত থাকলে নন্দপত্নী যশোদা নিজেই দধি-মন্থন করতে আরম্ভ করলেন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, যশোদা তো ঠিকই করেছেন যে, তিনি নিজেই কৃষ্ণের জন্য ক্ষীর ননী প্রভৃতি তৈরি করবেন; সুতরাং গৃহদাসীরা কর্মান্তরে নিযুক্ত থাকলে, যশোদা নিজেই দধি-মন্থন করতে আরম্ভ করলেন— এ কথা বলার সার্থকতা কোথায়? যেন গৃহদাসীরা কর্মান্তরে নিযুক্ত না থাকলে যশোদা নিজে দধি-মন্থন করতেন না। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, যশোদা তো ঠিক করলেন, তিনি নিজেই কৃষ্ণের জন্য ক্ষীর ননী তৈরি করবেন; কিন্তু পরিচারিকারা কিছুতেই রাজমহিষীকে ঐসব কাজ করতে দিতে চায় না; তারা যশোদাকে বলে—আমরা এত দাসদাসী থাকতে তুমি রাজরানী, স্বহস্তে ঐসব কাজ করবে তা কি হয়? আর আমরাই কি তা হতে দিতে পারি? প্রাণ থাকতে আমরা তোমাকে ঐসব পরিশ্রমের কাজ করতে দেব না। কোমল-প্রাণা যশোদাও তাদের প্রাণে কষ্ট দিতে পারেন না; ফলে যশোদা আর নিজে ক্ষীর ননী তৈরি করার সুযোগ পান না; তাই যশোদার মনে একটা অতৃপ্ত বাসনা থেকেই যাচ্ছে। ভালবাসার স্বভাবই এই যে, ভালবাসার পাত্রকে স্বহস্তে সেবা করতে চায়—অপরকে দিয়ে সেবা করিয়ে তৃপ্তি হয় না। সুতরাং বাৎসল্য-ভাবময়ী যশোদাও পুত্রের সেবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন।

যশোদা ভাবছেন বটে যে, পরিচারিকারা ঠিকমত ক্ষীর ননী তৈরি করতে পারে না; তারই জন্য কৃষ্ণ পেট ভরে খায় না এবং অপরের বাড়ি গিয়ে চুরি করে খায়। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ব্রজরাজ গৃহের পরিচারিকারা সকলেই কৃষ্ণকে নিজের সন্তান, নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি

ভালবাসে। তাদের হৃদয়ও কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-ভাবে পূর্ণ; সুতরাং নিজেদের তৃপ্তির জন্যই তারাও প্রাণপণে সর্বদা কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করার জন্য লালায়িত। অতএব তাদের তৈরি ক্ষীর ননী ভাল নয় আর যশোদার তৈরি ক্ষীর ননী ভাল, এ হতেই পারে না। তবে যে যশোদা ঐরকম ভাবেন, তার কারণ বাৎসল্য-প্রেমের দুর্নিবার উচ্ছ্বাস; নিজের হাতে তৈরি করে কৃষ্ণকে খাওয়াবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

একটা সুযোগও জুটে গেল। তখন প্রতি বছর গোবর্ধন পর্বতে মহা-সমারোহে ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান হতো। অনুষ্ঠানের আগের দিন যশোদা মহোৎসবের জন্য দাসদাসীদের গোবর্ধনে পাঠিয়ে দিলেন। এই সুযোগে পরদিন যশোদা ভোরে উঠে নিজেই কৃষ্ণের জন্য দধি-মন্থন করতে লাগলেন।

যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধিনির্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥ ১০-৯-২ ॥

কৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলা অর্থাৎ কৃষ্ণের হামাগুড়ি দিয়ে চলা, তাঁর বাল্য চাপল্য, চৌর্যাদি বিষয়ে তাঁর পরম মধুর আচরণ যা ইতোপূর্বে সংঘটিত হয়েছে, সেইসব বাল্যলীলা যশোদা দধি-মন্থনকালে স্মরণ এবং গান করতে লাগলেন।

কৃষ্ণের জন্মের পর থেকেই গোপীরা সম্ভবত কৃষ্ণ-লীলা-গান ছাড়া আর কোন গানই গাইতেন না। বহু বছর পরেও কৃষ্ণ-সখা উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে এসেছিলেন, তখন তিনিও অতি প্রত্যুষে ব্রজনারীদের দধি-মন্থনের শব্দের সঙ্গে তাদের কৃষ্ণ-বিষয়ক গান শুনেছিলেন।

যশোদা স্বহস্তে কৃষ্ণের জন্য দধি-মন্থন করছেন, মনে কৃষ্ণের বাল্যলীলা চিন্তা এবং মুখে কৃষ্ণগান করছেন; অর্থাৎ কায়, মন, বাক্য—সবই কৃষ্ণে নিবদ্ধ হওয়াতে যশোদা এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। যাদের কায়, মন, বাক্য ভগবানে একতানতা লাভ করেনি অর্থাৎ একযোগে ভগবন্মুখী হয়নি তাদের পক্ষে ভগবানে তন্ময়তা লাভ করা সম্ভব নয়; তাদেরই কাছে ভগবান নিদ্রিত; কিন্তু ভক্তের সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কথা যখন একমাত্র ভগবৎ বিষয়েই নিবদ্ধ থাকে, তখন ভগবান সেই ভক্তের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠেন। সাধারণ মানুষ যাদের কায়, মন, বাক্য

এক যোগে ভগবন্মুখী হয়নি, তারা শত ডাকলেও ভগবান তাদের ডাকে সাড়া দেন না; কিন্তু যশোদার সমস্ত মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ই তো কৃষ্ণ অভিমুখী; তাই কৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠে নিজেই দধিমন্থন-রত জননীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং দধি-মন্থনের দণ্ড চেপে ধরে তাকে দধি-মন্থন করতে বারণ করলেন—উদ্দেশ্য, তাকে এখন কোলে নিতে হবে।

পুত্রের আগ্রহ দেখে যশোদা তাঁকে সাদরে কোলে নিয়ে স্তনপান করাতে লাগলেন। এতে কৃষ্ণের যেমন আনন্দ তেমনি বাৎসল্য-প্রেমময়ী যশোদারও আনন্দ। একের আনন্দ অপরের আনন্দের পরিপূরক। স্তনপানে ও স্তনদানে যখন দুইজনেই আনন্দ সাগরে ভাসছেন, সেইসময় হঠাৎ যশোদার নজরে পড়ল—চুলার উপর দুধ উদ্বেলিত হচ্ছে। তাই তিনি হঠাৎ কৃষ্ণকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে দুধ রক্ষা করতে চলে গেলেন। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, বাৎসল্য-প্রেমময়ী যশোদা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণকে স্তনপান করাচ্ছিলেন। যদিও যশোদা কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, তবুও তিনি তো গর্গাচার্যের কথায় বুঝেছিলেন কৃষ্ণ সামান্য বালক নয়—মহাপুরুষ। তাছাড়া কৃষ্ণ যে যশোদার প্রাণের চেয়েও প্রিয়; সেই প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে তিনি সামান্য একটু দুধ রক্ষা করবার জন্য ক্ষুধার্ত, অতৃপ্ত রেখেই চলে গেলেন! যশোদার কাছে কি কৃষ্ণের চেয়েও দুধ রক্ষা করাই বড় হলো? সামান্য কিছুটা দুধ না হয় নষ্টই হতো; গোপরাজের গৃহে কি দুধের অভাব? সুতরাং ঐভাবে কৃষ্ণকে ক্ষুধার্ত অতৃপ্ত রেখে চলে যাওয়া কি যশোদার ঠিক হয়েছে?

যারা কর্মী, তারা যাগ-যজ্ঞাদির দ্বারা সর্বকর্মফলদাতা ভগবানের প্রীতি বিধান করে স্বর্গাদি ভোগ্য-বস্তু কামনা করেন এবং সেইসবের ভোগেই মত্ত হয়ে থাকেন; যারা জ্ঞানী, তারা নেতি নেতি বিচার করে নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে থাকেন; যারা যোগী, তারা অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনার দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাতে সচেষ্ট হন। দেখা যাচ্ছে এরা কেউ-ই ভগবানের সাথে ভালবাসার সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। একমাত্র ভক্তই ভগবানের সেবার জন্য তাঁর সাথে একটা ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করে নেন অর্থাৎ ভগবানের সেবাই তাদের কাছে মুখ্য—ভগবান মুখ্য নয়! সুতরাং ভগবানের সাথে এক লোকে বাস (সালোক্য), তাঁর কাছাকাছি থাকা (সাযুজ্য) ইত্যাদি সেইসব ভক্তের পছন্দ নয়; তাঁরা কেবল ভগবানের সেবা করতেই

চান, তাতেই তাঁদের আনন্দ, তাতেই চরম প্রাপ্তি। ভগবানকে ত্যাগ করলে যদি তাঁর সেবা হয়, তবে তাঁরা ভগবানকে ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হন না। প্রেমময়-ভক্ত সেবা ভুলে কখনও ভগবানে আত্মহারা হন না। তাঁরা নিজেরা দুঃখ স্বীকার করে এবং ভগবানকেও কষ্ট দিয়ে, তাঁর হিতসাধন করেন; যেমন তেতো ওষুধ খেতে ছেলের কষ্ট হবে জেনেও, তার রোগমুক্তির জন্য মা তাকে তেতো ওষুধ-ই খাওয়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে যশোদা কৃষ্ণকে ত্যাগ করে দুধ রক্ষা করতে গিয়ে ঠিকই করেছিলেন। কারণ ঐ দুধ খেয়ে কৃষ্ণ হৃষ্টপুষ্ট হবে; যশোদা কৃষ্ণের সেবার জন্যই কৃষ্ণকে ছেড়ে গিয়েছিলেন; এতে তাঁর নিজের এবং কৃষ্ণের যত কষ্টই হোক না কেন, তিনি তা ভ্রূক্ষেপও করেননি; কৃষ্ণ-সেবাই তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এদিকে আচম্বিতে কোল থেকে নামিয়ে দেওয়াতে কৃষ্ণের কি অবস্থা হলো? তার তখন পেটও ভরেনি, স্তনপানের পিপাসাও মেটেনি; তাই প্রথমে কৃষ্ণের খুব রাগ হলো।

সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং সন্দশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গরমন্তরং গতঃ ।।
১০-৯-৬॥

কোল থেকে নামিয়ে দেওয়াতে কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে স্ফুরিত অরুণ অধর দংশন করে কাঁদতে কাঁদতে একটি নোড়া দিয়ে দধিভাণ্ড ভেঙে দিলেন এবং অন্যত্র গিয়ে নবনীত খেতে লাগলেন।

ভাগবতকার এই শ্লোকে কৃষ্ণের এক অতি অপরূপ ছবি এঁকেছেন। প্রথমে কৃষ্ণের রাগ হলো; রাগে তিনি অধর দংশন করে শিশুদের মতো একটু কেঁদে নিয়ে পাথর দিয়ে দধিভাণ্ড ভেঙে সেখান থেকে সরে পড়লেন এবং দূরে গিয়ে সদ্য তোলা মাখন খেতে লাগলেন।

চুলো থেকে দুধ নামিয়ে যশোদা এসে দেখলেন—দধিভাণ্ড ভঙ্গ, সর্বত্র দধি ছড়িয়ে পড়েছে, মাখনের পাত্র শূন্য, আর কৃষ্ণ পালিয়েছে। এই দেখে যশোদার রাগ তো হলোই না বরং একটু হেসে ভাবলেন--ছেলেটা বড় দুষ্টু হয়েছে; কিন্তু সে গেল কোথায়?

যশোদা দেখলেন—অধোমুখে অবস্থিত উদূখলের উপর বসে কৃষ্ণ শিকা

থেকে নবনীত নিয়ে বানরদের খাওয়াচ্ছে; আবার চুরি করছে বলে সে সভয়ে এদিক ওদিক দেখছে পাছে কেউ দেখে ফেলে।

যশোদা ভাবলেন—কৃষ্ণ দিন দিন অশান্ত হয়ে উঠছে; একে এখনই একটু শাসন করা দরকার। প্রতিবেশী রমণীরা অনেক দিন থেকেই আমায় বলছে যে, কৃষ্ণ তাদের বাড়ি গিয়ে মাখন চুরি করে খায় এবং নানা উৎপাত করে; কিন্তু তাদের কথা আমার বিশ্বাস হতো না। ভাবতাম তারা পরিহাস করে এই সব কথা বলছে; কিন্তু আমি তো আজ নিজের চোখেই কৃষ্ণের সব কীর্তি দেখলাম। সুতরাং আজই একে একটু শাসন করব; তাহলেই সে শান্ত হয়ে যাবে।

এইসব ভেবে যশোদা একটি লাঠি নিয়ে আস্তে আস্তে কৃষ্ণের পেছনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যশোদাকে আসতে দেখেই বানরেরা সব পালিয়ে গেল; ওদের পালাতে দেখে কৃষ্ণ পেছন ফিরে লাঠি হাতে মাকে আসতে দেখে ভয়ে চম্পট দিলেন।

কৃষ্ণ ছুটে পালাচ্ছেন, আর মা যশোদা লাঠি হাতে তাঁর পেছনে ধাওয়া করছেন—মানস চক্ষে এই অপরূপ দৃশ্য দেখে শুকদেব বলে উঠলেন ঃ

গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ॥ ১০-৯-৯॥

কি আশ্চর্য! নির্বিকল্প সমাধিবান যোগীরা চিত্তের একাগ্রতার দ্বারাও যাঁকে স্পর্শ করতে পারেন না, যশোদা কিনা সেই যোগী-শ্রেষ্ঠদেরও অপ্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণকে ধরবার জন্য তাঁর পেছনে ছুটছেন! ভগবান পরমাত্মা-রূপে সকলের হৃদয়ে আছেন বটে কিন্তু কেউ-ই তাঁকে ধরতে পারে না। কিন্তু যশোদার বাৎসল্য-প্রেমে গড়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ সদা চঞ্চল, তবুও যশোদার হাত তিনি এড়াতে পারেন না। যোগের সিদ্ধাবস্থায় যোগীরা পরব্রহ্মে লীন হয়ে যান; কিন্তু তাঁরাও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের হদিস পান না। যোগীরাও যাঁর সন্ধান পান না, সেই লীলা-বিগ্রহধারী কৃষ্ণকে ধরবার জন্য লাঠি হাতে যশোদা তাঁর পেছনে ছুটছেন—এর চেয়ে মজা, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে! বাৎসল্য প্রেমের কি অপার মহিমা!

কৃষ্ণ মায়ের ভয়ে পালাচ্ছেন আর যশোদা তাঁকে ধরবার জন্য পেছনে পেছনে ধাওয়া করছেন আর মাঝে মাঝেই শাসাচ্ছেন—আজ তোর দুষ্টুমির উচিত শাস্তি দেব। কৃষ্ণ ছুটছেন—সুতরাং যশোদার সাধ্য কি তাঁকে ধরেন। হঠাৎ যশোদার মনে হলো—কৃষ্ণের পা তুলোর চেয়েও নরম; সেই নরম পা নিয়ে কৃষ্ণ আমারই ভয়ে ছুটছে; না জানি কৃষ্ণের পায়ে কতই ব্যথা লাগছে। হায়, হায়! এ আমি কি করলাম; আমারই জন্য আমার প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ কষ্ট পাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে যশোদার গতি মন্থর হয়ে এল। কি আশ্চর্য! কৃষ্ণও আর ছুটতে পারলেন না। যশোদা তখন তাঁকে ধরে ফেললেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই—যতক্ষণ যশোদা কৃষ্ণকে ধরবার জন্য ছুটছিলেন, ততক্ষণ তিনি নিজের শক্তির উপর নির্ভর করেই ছুটছিলেন। তাই কৃষ্ণও তাঁর নাগালের বাইরে ছিলেন। কিন্তু যখনই কৃষ্ণের কষ্ট হচ্ছে—এই কথা মনে হয়ে যশোদার প্রাণ কেঁদে উঠল, তখনই তিনি যশোদার হাতে ধরা পড়ে গেলেন। ভাগবতকার যেন ইঙ্গিতে বলছেন—কৃষ্ণের জন্য প্রাণ না কাঁদলে তাঁকে ধরা যায় না।

চৌর্যাপরাধে ধৃত এবং ক্রন্দনপরায়ণ কৃষ্ণ তখন বাঁ-হাতে কজ্জল-লিপ্ত চক্ষু মার্জন করতে করতে বার বার ভয়বিহ্বল চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন; যশোদা তখন পুত্রের হাত ধরে লাঠি তুলে ভয় দেখিয়ে একটু ভর্ৎসনা করলেন।

মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম এবং ভগবানের প্রেমাধীনতার মাধুর্য জগতে অতুলনীয়। মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করেও যিনি অপরাধী হন না, সেই তিনি একটা সামান্য দধিভাণ্ড ভেঙে মা যশোদার কাছে অপরাধী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে মনে করছেন। কৃষ্ণ ভয়বিহ্বল কণ্ঠে যশোদাকে বললেন—মা, এমন অন্যায় কাজ আর করব না, তুমি তোমার হাতের লাঠি ফেলে দাও; লাঠি দেখে আমার বড় ভয় করছে। যশোদা বললেন—বটে! তুই বলছিস এমন অন্যায় কাজ আর করবি না; তাহলে তুই জেনে শুনেই অন্যায় করেছিস? কেন তুই দধিভাণ্ড ভাঙলি তা ঠিক করে বল। 'গোপাল চম্পূ' গ্রন্থে রয়েছে, কৃষ্ণ বললেন—মা, তুমি যখন আমাকে

কোল থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলে তখন তোমার পায়ের অলঙ্কারের আঘাতে দধিভাণ্ড ভেঙে গেছে; এতে আমার কি অপরাধ? তারপর বানরগুলি ঘর খোলা দেখে দধি ক্ষীর চুরি করে খাচ্ছিল। আমি তাদের তাড়াবার চেষ্টা করেই বা কি অন্যায় করেছি? তারপর তোমাকে লাঠি হাতে আসতে দেখে আমি ভয়ে পালিয়েছিলাম। সুতরাং তুমি আমাকে অযথা ভর্ৎসনা করছ। নিজের দোষ ঢাকবার জন্য কৃষ্ণের এই উপস্থিত বুদ্ধি এবং যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে, যশোদা মনে মনে বিস্মিত হয়ে বললেন—ওরে বাক্‌চাতুর্য-সুনিপুণ! ওরে চোরের রাজা! তুই নরশ্রেষ্ঠ গোপরাজ নন্দের পুত্র হয়ে বানরের বন্ধু এবং বানর প্রকৃতির হলি? যশোদার তিরস্কারে কৃষ্ণের ক্ষোভের সীমা রইল না। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল—মা, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও; আমি বনে গিয়ে বানরদের সঙ্গেই থাকব; তোমার কাছে আর আসব না, ক্ষীর ননীও আর খাব না। পুত্রের কথা শুনে যশোদা ভাবলেন—আমার এই অভিমানী পুত্রের পক্ষে বনে চলে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আমি এখন কি করি? সে বনে চলে গেলে কে তাকে খুঁজে আনবে? ঘরে তো আজ কেউ-ই নেই। আর আমি যদি একে ধরে বসে থাকি, তবে ঘরের কাজই বা কে করবে? দাসদাসীরা তো সবাই ইন্দ্রযাগের জন্য গোবর্ধনে গেছে। এইভাবে চিন্তা করে যশোদা ঠিক করলেন যে ছেলেকে বেঁধে রেখে তিনি ঘরের কাজকর্ম করবেন। তাহলে ছেলেকেও রক্ষা করা হবে এবং গৃহ-কাজও করা সম্ভব হবে। তাছাড়া দুষ্টু ছেলেকে একটু শাসন করাও দরকার।

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ১০-৯-১৩ ॥

শুকদেব বলছেন—যাঁর ভিতরও নেই বাহিরও নেই, যাঁর পূর্বে কেউ ছিল না পরেও কেউ থাকবে না, অর্থাৎ যিনি জগতের অন্তরে ও বাহিরে এবং সৃষ্টির পূর্বে এবং ধ্বংসের পরেও বিদ্যমান থাকেন, এমন কি এই জগৎই যাঁর স্বরূপ থেকে আলাদা নয়, সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপকেই, বাৎসল্য-প্রেমময়ী যশোদা বাঁধবেন বলে ঠিক করলেন।

ভগবানের স্বরূপের ইয়ত্তা করা যায় না; তিনি সর্বব্যাপী, অনন্ত। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁতেই অবস্থিত; সুতরাং তাঁকে কে বাঁধবে, আর কোন্ দড়ি

দিয়েই বা তাঁকে বাঁধা যাবে? এ যে অসম্ভব। তবুও বাৎসল্য-ভাবময়ী মা যশোদা সর্বকারণের যিনি কারণ সর্বজগতের যিনি আধার, সর্ব-জগতের যিনি নিয়ন্তা—সেই ভগবানকে একটা তুচ্ছ দড়ি দিয়ে বাঁধলেন। এটা আপাতত অসম্ভব বলে মনে হলেও ভক্ত-ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধের জন্য এই অসম্ভবও সম্ভব হয়; বাৎসল্য-প্রেমময়ীর বন্ধন ভগবান স্বীকার করেন, কারণ তিনি যে প্রেমের অধীন।

যশোদা সেই অব্যক্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর নরাকৃতি পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য প্রেমে নিজের পুত্র বলে মনে করে প্রাকৃত জীবের মতো দড়ি দিয়ে উদূখলে বাঁধলেন।

মা যশোদা বাৎসল্য প্রেমের বলে অসীম অনন্তকে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন এবং অচিন্ত্য মহাশক্তির আধার ভগবানও তখন সীমার মধ্যে এসে বন্ধন স্বীকার করে ভক্তবাৎসল্য গুণের পরিচয় দিলেন।

পুত্রের অপরাধে তাঁকে বাঁধবার জন্য গৃহীত দড়ি যশোদা দেখলেন দুই আঙুল পরিমাণ ছোট—কৃষ্ণকে বাঁধা যাচ্ছে না; তাই যশোদা সেই দড়ির সঙ্গে আর একটি দড়ি যোগ করলেন। দ্বিতীয় দড়ি যোগ করেও যশোদা দেখলেন যে, কৃষ্ণকে বাঁধা যাচ্ছে না; আরও দুই আঙুল দড়ি কম পড়ছে। এইভাবে যশোদা যত বারই দড়ি যোগ করেন, ততবারই দেখেন যে, দুই আঙুল পরিমাণ দড়ি ছোট হচ্ছে! এইভাবে যশোদা নন্দ-ভবনে যত দড়ি ছিল সব এনে যোগ করেও কৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে সমাগতা প্রতিবেশী গোপীরা কৌতুক বোধ করে হাসতে লাগলেন এবং যশোদাও তাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন।

কথা হচ্ছে—ঐ ভোরে প্রতিবেশী গোপীরা কোত্থেকে এল? যশোদা যখন কৃষ্ণকে বাঁধতে উদ্যত হলেন, তখন আর উপায়ান্তর নেই দেখে কৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে মা রোহিণীকে ডাকতে লাগলেন—ও রোহিণী মা! কোথায় আছ, শিগ্‌গির এসে আমায় রক্ষা কর; আমি একটু মাখন খেয়েছি বলে মা আমায় বাঁধছেন—শিগ্‌গির এস। সেদিন আবার রোহিণীদেবী নিমন্ত্রিত হয়ে উপানন্দের গৃহে গিয়েছিলেন; সুতরাং তিনি কৃষ্ণের ডাক শুনতে পেলেন না এবং তাঁর কাছে যেতেও পারলেন না।

কিন্তু কৃষ্ণের এই আর্ত চিৎকার প্রতিবেশী রমণীদের কানে গেল। তারা তখনই সমস্ত কাজকর্ম ফেলে নন্দালয়ে এসে দেখলেন, যশোদা নিজের মাথার চুল বাঁধবার পট্টডোরী দিয়ে কৃষ্ণের উদর বেষ্টন করতে চেষ্টা করছেন। এই না দেখে তারা মজা দেখবার জন্য যশোদা ও কৃষ্ণকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। যশোদা কিছুতেই কৃষ্ণকে বাঁধতে পারছেন না দেখে গোপীরা যশোদাকে বলতে লাগলেন—ও যশোদা! তুমি তো বহুক্ষণ ধরেই কৃষ্ণকে বাঁধবার চেষ্টা করছ; কিন্তু কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারছ না; বুঝতে পারছ না, তোমার পুত্রের অদৃষ্টে বন্ধন যোগ নেই। সুতরাং ওকে তুমি এখন ছেড়ে দাও। কিন্তু যশোদার তখন রোখ চেপে গেছে—কৃষ্ণকে আজ যেমন করে হোক, বাঁধতেই হবে।

ভগবান তো যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেমে চির আবদ্ধ আছেনই; তবুও কৃষ্ণের দেহকে বাঁধতে হলে দুইটি জিনিসের দরকার—প্রথমত তাঁকে বাঁধবার জন্য পূর্ণ ব্যগ্রতা এবং দ্বিতীয়ত তাঁর কৃপা। ভক্তের ব্যগ্রতা এবং ভগবানের কৃপা একত্র না হলে শত চেষ্টাতেও তাঁকে বাঁধা যায় না। যশোদার বেলাতে এই দুইটি জিনিসেরই অভাব ছিল; তাই প্রতিবারই দুই আঙুল পরিমাণ দড়ি কম পড়ছিল। যশোদা কৃষ্ণকে নিজের পুত্র জেনে, তাঁকে ভয় দেখান, শাসন করেন; সুতরাং তাঁকে বাঁধা যশোদার পক্ষে কিছুই নয়; এর ফলে কৃষ্ণকে বাঁধবার জন্য যশোদার তীব্র ব্যগ্রতা ছিল না; সুতরাং বন্ধন স্বীকারের জন্য ভগবানেরও কৃপা-শক্তির বিকাশ হচ্ছিল না; তাই বাঁধতে গিয়ে বাঁধতে না পারার অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

বারে বারে বিফল হয়ে যশোদার রোখ চেপে গেল। তিনি কৃষ্ণকে না বেঁধে ছাড়বেন না, আর কৃষ্ণও কিছুতেই বন্ধন স্বীকার করবেন না। মা যশোদা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘেমে উঠলেন; তবুও কৃষ্ণকে আজ বাঁধতেই হবে। দেখা যায়, ভক্ত-ভগবানের মধ্যে যখন এইরকম জেদাজেদি আরম্ভ হয়, তখন ভগবান নিজের জেদ ছেড়ে ভক্তের জেদ-ই রক্ষা করেন। প্রমাণ?—কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না; আবার ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি কৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করবেন। শেষ পর্যন্ত ভীষ্মের জেদ-ই বজায় রইল—কৃষ্ণ অস্ত্র ধরেছিলেন।

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ।। ১০-৯-১৮ ।।

মা যশোদার ঘর্মাক্ত কলেবর এবং তাঁর খোঁপার মালা খুলে গেছে দেখে কৃষ্ণ মায়ের পরিশ্রম বুঝে কৃপা করে বন্ধন স্বীকার করলেন।

যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে চাইলেও, তাঁর মধ্যে প্রথমে ব্যগ্রতা ছিল না; কিন্তু বার বার বিফল মনোরথ হয়ে যখন তিনি পূর্ণোদ্যমে কৃষ্ণকে বাঁধবার প্রয়াস করলেন, তখনই ভগবানের কৃপা-শক্তির বিকাশ হলো; কৃষ্ণের কৃপাতেই যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধলেন। আত্মশক্তির অভিমানে তাঁকে বাঁধা যায় না। ভগবান অসীম অনন্ত হলেও কৃপাতে তিনি ভক্তের বন্ধন স্বীকার করেন; এই তো তাঁর ভক্তবাৎসল্য!

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ।। ১০-৯-২০।।

ভগবান, যিনি মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করে থাকেন, সেই তাঁর কাছে যশোদা যে অনির্বচনীয় কৃপা লাভ করেছিলেন, সে-রকমটি ব্রহ্মা, মহাদেব, এমন কি বিষ্ণুবক্ষ-বিলাসিনী লক্ষ্মীও লাভ করতে সমর্থ হননি।

আগে বলা হয়েছে ভগবান তাঁর ভক্ত, এমন কি তাঁর শত্রুকেও কখনও কখনও মুক্তি পর্যন্ত দিয়ে থাকেন; কিন্তু ঐ পর্যন্তই; এর বেশি তিনি সহজে কাউকে কিছু দেন না। প্রশ্ন হতে পারে মুক্তির চেয়ে বড় আর কি হতে পারে? মুক্তির চেয়ে বড় হচ্ছে ভগবানের সেবাধিকার লাভ করা। কেমন করে তা লাভ হতে পারে? অতি বিরল কোন শুদ্ধাভক্তির সাধক যখন ভগবানের নিত্য-সিদ্ধ সেবক অথবা সেবিকাদের অনুগত হয়ে তাঁদের ভাব অনুযায়ী ভগবানের সেবা করতে প্রয়াসী হন, তখনই তাঁরা ক্রমে ভগবানের সেবাধিকার লাভ করেন। যশোদা হচ্ছেন ভগবানের এইরকম এক জন নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্য-ভাবময়ী সেবিকা। একমাত্র এঁদেরই কাছে ভগবান বদ্ধ হন।

কৃষ্ণের পূতনা বধ, যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন প্রভৃতি লীলায় তাঁর সর্ব-শক্তিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়—তিনি ইচ্ছামাত্রই সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু দাম-বন্ধন লীলায় তিনি যা করেছেন তা আমাদের বুদ্ধির

অগম্য। তিনি শিশুর মতো নিজের আমিত্ব একেবারে মুছে দিয়ে মা যশোদার বশ্যতা পূর্ণরূপে স্বীকার করেছেন।

যাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করে যোগীরা আত্মারাম আত্মতৃপ্ত হন, সেই যোগী-শ্রেষ্ঠদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর হয়ে মা যশোদার স্তনপান করার জন্য লালায়িত! নিত্যতৃপ্ত হয়েও যশোদার স্তনপানে নিত্য অতৃপ্ত! শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহ হয়েও তিনি ক্রোধান্বিত হন! সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী যাঁর চরণ সেবা করেন, তিনি মাখন চুরি করে খান! যাঁর ভয়ে স্বয়ং মহাকালও ভীত, তিনিই যশোদার ভয়ে পলায়ন করেন! আনন্দস্বরূপ হয়েও রোদন করেন! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উদরে রেখেও যশোদার বন্ধনে আবদ্ধ হন! এই যে কৃষ্ণের সম্বন্ধে এক নিঃশ্বাসে পরস্পর বিরোধী এত সব কথা বলা হলো তার সামঞ্জস্য কেমন করে সম্ভব হতে পারে? একমাত্র ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য গুণের দ্বারাই এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন—হে উদ্ধব! যোগ, বৈরাগ্য, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, বেদপাঠ, দান প্রভৃতির দ্বারা আমাকে লাভ করা যায় না; আমি কেবল মাত্র শুদ্ধাভক্তির দ্বারাই লভ্য। শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাবময়ী যশোদা ভগবানের নিত্য বাৎসল্য-সেবার অধিকার লাভ করেছেন; তাই যশোদা ভগবানকে শিশু সাজিয়ে মাতৃভাবে চিরদিন তাঁর লালন পালনাদি-রূপ সেবা করে যাচ্ছেন। এইটি যশোদার নিত্য সম্পদ। সুতরাং ব্রহ্মা, মহাদেব, লক্ষ্মী—এঁদের কারুর-ই পক্ষে ভগবানের এই সেবা-রূপ কৃপা লাভ করা সম্ভব নয়। এই বাৎসল্য সেবাধিকারে যশোদা অনন্যা।

এদিকে কৃষ্ণকে বেঁধে রেখে মা যশোদা কার্যান্তরে প্রস্থান করলে, কৃষ্ণ সম্মুখে অর্জুন-বৃক্ষরূপে অবস্থিত কুবেরের পুত্রদ্বয়ের প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

নলকুবর ও মণিগ্রীব—এই দুই কুবের পুত্র পুরাকালে ধনমদে এবং মদিরা পানে প্রমত্ত হয়ে মহর্ষি নারদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করেছিল। এতে নারদ তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছিলেন—তোমরা দুই জনে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হও; দেবতাদের একশত বৎসর পরে (পৃথিবীর ৩৬০ বছরে দেবতাদের এক বছর হয়) ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন, তখন তাঁর চরণ স্পর্শে তোমাদের বৃক্ষ-দেহ শেষ হবে। তোমরা তখন দেবদেহ লাভ করে ভগবানের সেবা করবে। তখন থেকে বৃক্ষ-রূপী নলকুবর ও

মণিগ্রীব গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের আশায় অপেক্ষা করছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন নারদের বাক্য সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য, বদ্ধ অবস্থাতেই হামা-গুড়ি দিয়ে উদূখলটিকে পেছনে টানতে টানতে সেই অর্জুনবৃক্ষ দুইটির মধ্যে সংকীর্ণ পথ দিয়ে অপর দিকে চলে গেলেন; তিনি বৃক্ষ দুইটির মাঝখান দিয়ে চলে যেতেই উদূখলটি তেরছা হয়ে বৃক্ষ দুইটিতে আটকে গেল। কৃষ্ণ তখন উদূখলটিকে সজোরে আকর্ষণ করতেই সেই অতি প্রাচীন বিশাল অর্জুনবৃক্ষ দুইটি বিকট শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল। সেই বৃক্ষ দুইটি থেকে তখন যক্ষকুমারদ্বয় জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বেরিয়ে এসে বাল্য-লীলারসে আবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন ঃ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ১০-১০-২৯ ॥

হে কৃষ্ণ! হে বাল্যলীলাবেশে উদূখল-আকর্ষণকারী! আপনি অচিন্ত্য ঐশ্বর্যবান; আপনিই জগতের আদি; সর্বজীবের অন্তর্যামী যে পুরুষ, সে আপনারই অংশ। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্যকারণাত্মক জগৎকে আপনারই অধিষ্ঠান বলে ধ্যান করে থাকেন। আপনিই জগতের মূল কারণ; জগৎ হচ্ছে আপনারই রূপ; আপনিই জগতের নিয়ন্তা।

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ১০-১০-৩৬ ॥

হে পরম কল্যাণ-স্বরূপ! হে বিশ্বমঙ্গলকারী! আমরা আপনার চরণে প্রণাম করি। বিশুদ্ধ সত্ত্ব থেকে আপনার প্রকাশ; আপনি আনন্দ-স্বরূপ। আপনি যাদব এবং গোপগণের পালনকর্তা। আপনার শ্রীচরণে আমরা বার বার প্রণাম করি।

নলকুবর ও মণিগ্রীব স্তব করে বলছেন—*নমঃ পরম কল্যাণ*—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতারে আপনি জগতের মঙ্গল করেছেন বটে; কিন্তু এবার আপনি জীবের পরমকল্যাণ করবেন। পরমকল্যাণ হচ্ছে প্রেম, কারণ প্রেমের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। আপনি এবার মানুষকে পরম কল্যাণরূপ প্রেম দান করবেন, যাতে তারা আপনাকে লাভ করতে পারে। *নমঃ পরমমঙ্গল*—পূর্ব পূর্ব অবতারে আপনি অসুর বধ করে জগতের মঙ্গল করেছিলেন; কিন্তু এবার আপনি *পরমমঙ্গল*—ভাল, মন্দ, সুর, অসুর সবারই মঙ্গল বিধান করবেন। পূতনা রাক্ষসী মাতৃগতি লাভ করেছে;

আপনার দ্বারা নিহত হয়ে অথবা মৃত্যুর সময় আপনাকে দর্শন করে অসুরেরাও মুক্ত হয়ে যাবে। এমন পরমমঙ্গলকারী, এমন মঙ্গলাবতার আর কখনও হয়নি। তাই আপনাকে বার বার প্রণাম করি।

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥ ১০-১০-৩৮॥

যক্ষ দুইজন কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছেন—আমাদের বাগিন্দ্রিয় যেন আপনার নাম গুণকীর্তনে সদাই ব্যাপৃত থাকে এবং আমাদের কান যেন সর্বদা আপনার কথা শ্রবণে নিযুক্ত থাকে। আমাদের কর্মেন্দ্রিয় যেন আপনার সেবাতে যুক্ত থাকে। আমাদের মন যেন সর্বদা আপনারই চরণ কমলের স্মরণ মননে ব্যাপৃত থাকে। আমাদের মস্তক যেন আপনার নিবাসস্বরূপ জগতের কাছে সর্বদা নত থাকে অর্থাৎ আপনি অন্তর্যামিরূপে সবারই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন—এইটি জেনে আমরা যেন সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত আপনাকেই প্রণাম করতে পারি, সকলের কাছে যেন আমরা নম্র হতে পারি। আমাদের চক্ষু যেন সর্বদা আপনার ভক্তদের এবং আপনার শ্রীবিগ্রহ দর্শনে লিপ্ত থাকে অর্থাৎ আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন যেন সর্বদা আপনারই কথায় আপনারই সেবায় আপনারই লীলা-চিন্তায় বিভোর থাকে। আমরা যেন কখনও আপনাকে ছাড়া না হই।

ইত্থং সংকীর্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ।
দাম্না চোলূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ ॥ ১০-১০-৩৯॥

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! নলকুবর ও মণিগ্রীব এইভাবে কৃষ্ণের স্তুতি করলে ভগবান গোকুলেশ্বর উদূখলে বদ্ধ অবস্থাতেই একটু হেসে তাদের বললেন—তোমাদের সব কথাই আমি জানি; অভিশাপের মধ্য দিয়ে তোমরা আমার পরমভক্ত নারদের কৃপা লাভ করেছ; সুতরাং এখন তোমরা আমার চিন্তা করতে করতে স্বধামে প্রস্থান কর; তোমরা ভক্তি লাভ করেছ—তোমাদের আর কখনও পতনের ভয় থাকবে না।

ভগবানের এই কৃপাদেশ পেয়ে নলকুবর ও মণিগ্রীব তখন উদূখলে বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমা করে এবং বার বার তাঁকে প্রণাম করে উত্তর দিকে নিজেদের আবাস অভিমুখে চলে গেলেন।

এদিকে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ অর্জুনবৃক্ষের পতনের ভীষণ শব্দ শুনে ভাবলেন যে, গোকুলে হয়ত আবার কোন অসুরের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। তাই তারা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দেখলেন যে অর্জুনবৃক্ষ দুটি সমূলে উৎপাটিত হয়ে প্রাঙ্গণে পড়ে রয়েছে এবং উদূখলের সঙ্গে বাঁধা কৃষ্ণও সেখানেই রয়েছে। কৃষ্ণের সহচরেরা যারা কৃষ্ণের কাছে কাছেই ছিল তারা বললে যে, কৃষ্ণই তেরছাভাবে অবস্থিত উদূখলকে সজোরে আকর্ষণ করে বৃক্ষ দুটিকে ধরাশায়ী করেছে এবং সেই গাছ থেকে দুইজন জ্যোতির্ময় পুরুষ বেরিয়ে এসে কৃষ্ণকে প্রণাম করে চলে গেছে। এ সবই তারা স্বচক্ষে দেখেছে। কিন্তু বাৎসল্য-প্রেমান্ধ নন্দ-যশোদা বিশ্বাসই করতে পারলেন না যে, কৃষ্ণই বৃক্ষ দুটির পতনের কারণ। তারা ভাবলেন এটা নিশ্চয়ই কোন দৈত্যের উৎপাত থেকে হয়েছে এবং কৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কায় তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কিন্তু অপর কোন কোন গোপ, বালকদের কথা শুনে, 'হতেও পারে'—বলে সন্দেহ করতে লাগলেন। তারা ভাবলেন—এই শিশুর জন্মের পর থেকে আমরা গোকুলে কতই না অসম্ভব কাণ্ড দেখেছি। ভয়ঙ্কর পূতনা রাক্ষসী শিশুর প্রাণ নাশ করতে এসে নিজেই মরল; শকটাসুর, তৃণাবর্ত এরাও প্রাণ হারাল। এ সবই অসম্ভব ঘটনা এবং আমাদের সামনেই হয়েছে; সুতরাং বালকেরা যা বলছে তা হতেও পারে।

যাই হোক, নন্দ তখন পুত্রকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলেন যে, বাস্তবিকই কৃষ্ণের শরীরে কোন আঘাত লাগেনি। তিনি তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাসতে হাসতে পুত্রের বন্ধন মোচন করে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

কৃষ্ণের এই দাম-বন্ধন লীলার আলোচনায় মনে হয়, কৃষ্ণ যেমন তাঁর মায়া-শক্তির দ্বারা জগৎকে বাঁধতে পারেন এবং কৃপা-শক্তির দ্বারা সেই বন্ধন মোচনও করতে পারেন, সেইরকম ভগবানের বাৎসল্য-প্রেমময় ভক্ত প্রেম-কোপের দ্বারা কৃষ্ণকেও বাঁধতে পারেন আবার প্রেমানুগ্রহের দ্বারা কৃষ্ণের বন্ধনও মোচন করতে পারেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, এই প্রেমই পরম পুরুষার্থ। প্রেমাধীন কৃষ্ণ এবং প্রেমময় ভক্ত—এঁদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

২০

ফল বিক্রয়িণীর ফলদান

মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং উপস্থিত সাধু-মহাত্মাদের মনকে ভগবানের মধুর বাল্যলীলা প্রচেষ্টায় একেবারে নিমজ্জিত করার জন্যই যেন শুকদেব কৃষ্ণের আরও কয়েকটি বাল্যলীলার বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন গোপী, যাঁরা মা যশোদার সমবয়স্কা এবং বাৎসল্যময়ী, তাঁরা কখনও কখনও কৃষ্ণকে বলতেন—যদি নাচ তবে নাড়ু দেব—এইভাবে তাঁরা কৃষ্ণকে উৎসাহিত করতেন এবং কৃষ্ণও তখন প্রাকৃত বালকের মতো নাচতেন; আবার কখনও বা পুতুল-নাচের মতো, সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো, গোপীদের বশীভূত হয়ে যেন কিছু না বুঝেই কৃষ্ণ মুগ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান ও নৃত্য করতেন।

রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি সকল যজ্ঞেরই যিনি একমাত্র অর্চনীয়, ইন্দ্রাদি দেবতারা যাঁকে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে আরাধনা করেন, সেই সর্বারাধ্য ভগবান কৃষ্ণরূপে বাৎসল্য-ভাবময়ী গোপীদের কাছে সামান্য নাড়ু চাইছেন—যেন নাড়ু তিনি কখনও দেখেন নি, কখনও খান নি! এই হচ্ছে ভগবানের ভক্তবাৎসল্য—ভক্তদের আনন্দ-সাগরে ভাসাবার জন্যই তাঁর নাড়ুর প্রতি এমন লোভ। গোপীদের বাৎসল্য-প্রেমে ভগবান এমনই বাঁধা পড়েছেন যে, তাঁদের ইচ্ছামত, কৃষ্ণ কখনও উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, কখনও নৃত্য করেন, আবার কখনও বা গোপীদের কথামত নানা ফাই-ফরমাশ খাটেন।

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে জানেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য মাত্রই কেবল বোঝেন; তাঁরা তাঁর মাধুর্যের খবর রাখেন না; আবার ভক্তের কাছে ভগবান নিজের ভক্তাধীনতা দেখাবার জন্য নানা বাল্যলীলা করেন; এতে মাধুর্য রসের ভক্তেরা পরম আনন্দ লাভ করেন।

ভগবান যেমন সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, তেমনি তিনি সর্ব মাধুর্যময়। ভগবান তাঁর ছয়টি মহাশক্তি—ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য—এই ছয়টি মহাশক্তির দ্বারা সকলকে বশীভূত করে রেখেছেন। আবার তিনি

তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির দ্বারা সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করেন বলে তিনি সর্ব মাধুর্যময়। ঐশ্বর্য-জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তেরা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য দেখেই মুগ্ধ; তাঁরা ভগবানের মাধুর্যের খোঁজ রাখেন না। আবার যারা সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবের ভক্ত তারা ভগবানের মাধুর্য-রসেই মশগুল হয়ে থাকেন; ভগবানের ঐশ্বর্য তাদের চোখেও পড়ে না। ভগবানের মাধুর্য-রসে আকৃষ্ট হয়ে গোপীরা চোখের সামনে কৃষ্ণের বহুবিধ ঐশ্বর্য-লীলা দেখেছেন; পূতনা বধ, শকটাসুর বধ, যমলার্জুন ভঞ্জন, কালীয় দমন, গোবর্ধন ধারণ—এই সব দেখেও, তারা কৃষ্ণকে ভগবান বলে বুঝতে পারেন নি; কৃষ্ণ তাদের কাছে সামান্য শিশুমাত্র এবং প্রাকৃত শিশুর মতোই তারা কৃষ্ণকে বশে রেখে তার লালন-পালন, আদর-যত্ন করেছেন। বিশ্ব ভুবনে ভগবান সর্বত্র সকলকে বশে রাখেন; কেবলমাত্র মাধুর্য-ধাম বৃন্দাবনে তিনি নিজে ভক্তদের বশে থেকে লীলা করেন এবং তাদের আনন্দ-সাগরে ডুবিয়ে রাখেন। ঐশ্বর্য-জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তেরা ভগবানের মাধুর্য দেখতে পায় না; আবার মাধুর্য-নিষ্ঠ ভক্তেরা ভগবানের ঐশ্বর্য-ভাবে অন্ধ। ভগবানের মাধুর্য-লীলায় তিনি নন্দ-যশোদার অসহায় শিশুতে রূপান্তরিত হয়েছেন; মা যশোদা তাঁকে শাসন করছেন, দড়ি দিয়ে বাঁধছেন; এ কি ভাবা যায়? যাঁর কৃপা-কটাক্ষে জীবের ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়, সেই তাঁকেই মা যশোদা বাঁধছেন! এই হচ্ছে মাধুর্য-প্রেমের ঘনীভূত রূপ। এই প্রেমের কাছে ভগবান ছোট হয়ে ভক্তের আজ্ঞাবহ হন; আর এই অবস্থায় ভক্ত আনন্দসাগরে হাবুডুবু খেতে থাকেন।

ব্রজধামে সকলেই কম বেশি মাধুর্য-ভাবের সাধক। দাম-বন্ধন লীলায় যশোদার মাধুর্য-ভাব এবং কৃষ্ণের প্রেমাধীনতার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও তো সেখানে বহু লোক ছিলেন যারা গোপ জাতীয় নয়, যারা নীচকুল জাত। শুকদেব এই বার এইরকম একজন নীচ বংশজাত স্ত্রীলোকের মাধুর্য-ভাব মাত্র দুইটি শ্লোকে বর্ণনা করেছেন ঃ

ক্রীণীহি ভো ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্বফলপ্রদঃ ॥ ১০-১১-১০॥

নন্দ-ভবনের পাশে রাজপথ থেকে 'ফল কিনবে গো'—এইরকম শব্দ শুনে অচ্যুত, যিনি কখনো নিজের ঐশ্বর্য থেকে বিচ্যুত হন না, সেই সর্বফল-প্রদাতা কৃষ্ণ ফল পাবার জন্য তাড়াতাড়ি এক মুঠো ধান নিয়ে ফলওয়ালির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কৃষ্ণের খেলার সাথীরা তখন পর্যন্ত নন্দ-ভবনে এসে পৌঁছায়নি এবং মা যশোদাও গৃহকর্মে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণ উঠানে রাখা ধান নিয়ে একা একাই খেলা করছিলেন। সেই সময় 'ফল কিনবে গো'—এই আওয়াজ শুনেই কৃষ্ণ ফল পাবার জন্য এক মুঠো ধান নিয়ে রাস্তায় গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ফলওয়ালিকে বললেন—আমি তোমার ফল নেব।

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্।
ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ ॥ ১০-১১-১১ ॥

মুঠো করে তাড়াতাড়ি ধান নিয়ে যাবার সময় কৃষ্ণের আঙুলের ফাঁক দিয়ে ধান-গুলো পড়ে গেল। ফলওয়ালি তখন কৃষ্ণের শূন্য হাত ফলে ভরে দিল। হঠাৎ ফলওয়ালি দেখলে যে, তার ফলের ঝুড়ি নানাবিধ রত্নে পূর্ণ হয়ে গেছে।

শুকদেব মাত্র দুইটি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে কৃষ্ণ ও ফলওয়ালির কথা বলেছেন; কিন্তু শুকদেবের বর্ণনায় যেসব কথা উহ্য থেকে গেছে রসিক ভক্তেরা তা এইভাবে বর্ণনা করেছেন—কৃষ্ণকে দেখে তাঁর সুমধুর কথা শুনে ফলওয়ালি এক অদ্ভুত ভাবাবেশে এক অননুভূত আনন্দের আবেশে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়ল। কৃষ্ণের সামনে ফলের ঝুড়ি নামিয়ে হেসে বললে—ফল তো নেবে; কিন্তু ফলের কি দাম দেবে? কৃষ্ণ হাতের মুঠো খুলে দেখালেন; হাতে করে ধান নিয়ে আসার সময় কৃষ্ণের ছোট ছোট আঙুলের ফাঁক দিয়ে প্রায় সব ধানই পড়ে গেছে; মাত্র দু-একটি ধানই হাতে লেগে রয়েছে। এই দেখে ফলওয়ালি বললে—দু-একটি ধান দিয়ে তো এই সব ফল কেনা যাবে না; সুতরাং ফলের বদলে তুমি আমায় কি দেবে বল? শিশুকৃষ্ণের সাথে কথা বলে ফলওয়ালি এক অদ্ভুত আনন্দের আবেশে মেতে উঠল। কৃষ্ণ বললে—আমাকে তো সবাই এমনিতেই সব কিছু দেয়; দামের জন্য তো কেউ কিছু বলে না। আমার মা, আমাদের প্রতিবেশীরা আমাকে কত ক্ষীর ননী মাখন খেতে দেয়; তারা তো প্রতিদানে কিছু চায় না; তবে তুমি দাম চাইছ কেন? কৃষ্ণের কথা শুনে তাঁকে দেখে ফলওয়ালির এক অদ্ভুত ভাবান্তর হলো; তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল; তার ভিতরের সুপ্ত বাৎসল্য-ভাব যেন জেগে উঠল। ফলওয়ালি বললে—তুমি যেমন ক্ষীর ননী খাবার জন্য তোমার মাকে মা বলে ডাক, তাঁর কোলে ওঠ,

সেইরকম তুমিও একবার আমাকে মা বলে ডাক, একবার আমার কোলে ওঠ ; তাহলে আমার সমস্ত ফলই তোমায় দেব, চিরদিন তোমার মায়ের দাসী হয়ে থাকব। ফলওয়ালির ফলের উপর কৃষ্ণের অত্যন্ত লোভ হয়েছে ; তাই ভাবলেন—ওকে একবার মা বলে ওর কোলে উঠলে যদি ও এতগুলি ফল আমায় দেয়, তবে ওকে একবার মা বলতে এবং ওর কোলে উঠতে দোষ কি ? ও তো আমাকে আমার মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে না; তার উপর ও তো আমার মার দাসী হতেই চাইছে; সুতরাং ওকে মা বলে ওর কোলে উঠলে কোন দোষ হবে না। এইভাবে চিন্তা করে কৃষ্ণ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে যে কেউ কোথাও নেই; এই সুযোগে সে ফলওয়ালিকে মা বলে ডেকে তার কোলে উঠে তাকে কৃতকৃতার্থ করলেন। এদিকে কৃষ্ণের মুখে মা ডাক শুনে তাকে কোলে পেয়ে ফলওয়ালি আনন্দের আতিশয্যে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল; হবেই তো। যাঁকে এক মুহূর্ত ধ্যানে দর্শন করার জন্য কত মুনিঋষিরা যুগ যুগ ধরে তপস্যা করেন, সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে ফলওয়ালি নিজের বুকের কাছে পেয়েছে; সুতরাং আনন্দে তাকে দিশেহারা হতেই হবে; শুধু কি তাই? বাকি জীবনটাই তার এক অনির্বচনীয় স্মৃতির আনন্দে ভেসে চলবে। যাই হোক, ফলওয়ালির সেই উচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হলে কৃষ্ণ তার কোল থেকে নেমে দুই হাত পেতে বললেন—এবার আমায় ফল দাও। ফলওয়ালি আনন্দে আত্মহারা হয়ে, তার ঝুড়ি উজাড় করে সমস্ত ফল কৃষ্ণের হাতে দিয়ে দিল। ফল নিয়ে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন; আর ফলওয়ালি এক দৃষ্টিতে কৃষ্ণের চলার দিকে চেয়ে রইল। কৃষ্ণ তার চোখের আড়াল হতেই ফলওয়ালির সামনে থেকে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল কৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি, তাঁর ফল চাওয়া, তাঁর মা বলে ডাকা এবং তাঁর কোলে ওঠা। এই সব চিন্তায় বিভোর হয়ে ফল-ওয়ালি যেন এক দিব্য বাৎসল্য-ভাবে দিশেহারা হয়ে চলতে লাগল; কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—কিছুরই ঠিক নাই। হঠাৎ তার মনে হলো, তার শূন্য ঝুড়িটা যেন খুব ভারি বোধ হচ্ছে; ঝুড়ি নামিয়ে দেখলে যে, তার শূন্য ঝুড়িটা নানাবিধ মণিমাণিক্যে পূর্ণ হয়ে গেছে! ফলওয়ালি আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—এ আবার কি ! আমি বন-বাসিনী; আমার ঝুড়িতে এত ধনরত্ন কোথা থেকে এল? সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের উদয় হলো;

অনুভব করলে যে স্বয়ং বালরূপী ভগবানই তার সাথে এইভাবে খেলা করেছেন। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—হে হৃদয়সুন্দর! আমি গরিব, জ্ঞানহীন; ফল বিক্রি করে জীবন ধারণ করি; তাই মোহের বশে তোমার কাছেও ফলের দাম চেয়েছিলাম; তাই কি তুমি তুচ্ছ মণিরত্ন দিয়ে আমায় ফাঁকি দিতে চাইছ? কিন্তু তা তো আমি আর কিছুতেই হতে দেব না; তুমি যখন একবার আমায় মা বলে ডেকে আমার কোলে উঠেছ, তখন তো আর আমি তোমায় ছাড়তে পারব না—প্রাণ গেলেও না। তুমি যদি আমার কথা না শোন, তবে তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তার পা ধরে কাঁদব, যেন তিনি আমায় তার দাসী করে রাখেন। তাহলে তোমাদের অঙ্গনের এক পাশে দাঁড়িয়ে তোমার মধুর বাল্যলীলা দেখে জীবন সার্থক করব। এইভাবে চিন্তা করতে করতে ফলওয়ালির হৃদয় তখন ভক্তি এবং বৈরাগ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল; সে তখন রত্নপূর্ণ ঝুড়িটি ফেলে দিয়ে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হয়ে, বেহুঁশের মতো কোথায় চলে গেল—তার আর কোন খবর পাওয়া গেল না।

রবীন্দ্রনাথের (খেয়া) কৃপণ কবিতায় রয়েছে—এক ভিখারি ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে; এমন সময় সে দেখলে কোন এক মহারাজা রথে চড়ে যাচ্ছেন। ভিখারি ভাবলে—আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন; মহারাজা কত ধনধান্য রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে যাবেন; তাতেই আমার ভিক্ষার ঝুলি ভরে যাবে; আজ আর আমায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে না। সহসা মহারাজা ভিখারির সামনে এসে, একটু হেসে, হাত পেতে বললেন—তুমি আমায় কিছু দাও। ভিখারি লজ্জায় মাথা নিচু করে তার ঝুলি থেকে একটি চাল মহারাজের হাতে দিল। ঘরে ফিরে ভিখারি দেখলে, তার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে একটি সোনার দানা রয়েছে। তখন সে ভাবলে—

> দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে—
> এখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভ'রে,
> তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে।

এখানে ভিখারির ধনের আকাঙ্ক্ষা ছিল; তাই প্রাণভরে সে রাজাধিরাজকে নিজের সব কিছু দিতে পারে নি—দিয়েছিল মাত্র একটি তণ্ডুল কণা; পরে ঐ ধনাকাঙ্ক্ষার জন্যই তার ক্ষোভ হয়েছিল—তখন যদি ঝুলি উজাড় করে

মহারাজকে দিতাম! এদিকে ফলওয়ালি ভালবেসে তার ঝুড়ি উজাড় করে বাল-কৃষ্ণকে ফল দিয়েছিল—এতে তার কিছুমাত্র ধনাকাঙ্ক্ষা ছিল না। সুতরাং সে যখন দেখলে যে, তার ঝুড়ি ধনরত্নে পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন সে ভাবলে—এ সব দিয়ে আমি কি করব? আমি তো ধনরত্ন চাই নি, চেয়েছিলাম শুধু তোমাকেই। তাই ফলওয়ালি ঐ সব ধনরত্ন ফেলে দিয়ে বোধ হয় তাঁরই সন্ধানে চলে গেল। জগতের লোক ধনরত্ন চায় কিন্তু জগতের যিনি অধীশ্বর তাঁকে চায় না। সাধারণ মানুষ জগতের ঐশ্বর্য ভোগ করতে চায়, আর ভক্ত চায় ভগবানের মাধুর্য সম্ভোগ করতে।

ফলওয়ালি যে কোথায় গেল, ভাগবতকার তার সম্বন্ধে আর কিছু বলেন নি। কিন্তু রসিক পণ্ডিতেরা তো অত সহজে ছাড়বেন না; তাদের অনুসন্ধিৎসা—ফলওয়ালির অন্তিম গতি কি হলো? তাদের ধারণা এবং তা যুক্তিসংগতও বটে—পূতনা রাক্ষসী বিষ-মিশ্রিত স্তন পান করিয়ে কৃষ্ণকে বধ করতেই এসেছিল; কিন্তু কৃষ্ণ তাকে দুর্লভ ধাত্রীগতি প্রদান করেছিলেন। ক্রূর পূতনা রাক্ষসীরই যদি এই অবস্থা হয় তবে যে ফলওয়ালিকে কৃষ্ণ মা বলে ডেকে তার কোলে উঠেছিলেন এবং স্বহস্তে তার ফল গ্রহণ করেছিলেন, তাকে কি তিনি বঞ্চিত করতে পারেন? পূতনা রাক্ষসীর দেহটাই ছিল কৃষ্ণ-সেবার বাধক ; তাই কৃষ্ণ পূতনার দেহটা বিনাশ করে তাকে যথাযোগ্য বাৎসল্য-প্রেমোচিত দেহ দান করে তাঁর সেবাধিকার দিয়েছিলেন। ফলওয়ালি সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণ-সেবার যোগ্য না হলেও কৃষ্ণের স্পর্শে সে যে সোনা হয়ে গেছে; সুতরাং ব্রজধামের মহা মহা সাধু-মহাত্মাদের মতো ফলওয়ালিও কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে, নিরন্তর কৃষ্ণ-দর্শনের তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে ব্রজের পথে ঘাটে কৃষ্ণনাম করতে করতে অন্তিমে কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করবে—এতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

২১

ব্রজবাসীদের গোকুল থেকে বৃন্দাবনে আগমন এবং কৃষ্ণের গোচারণ-লীলা

গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে।
নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্যমমন্ত্রয়ন্ ॥ ১০-১১-২১ ॥

শুকদেব বললেন—একদিন গোপবৃদ্ধেরা গোকুলে রাক্ষস ও অসুরদের নানা প্রকার উৎপাত হচ্ছে দেখে ব্রজরাজের সভায় গিয়ে কিসে ব্রজের মঙ্গল হয়, সেই বিষয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন।

তাদের মধ্যে গোপরাজ নন্দের বড় ভাই উপানন্দ, যিনি বয়সে সকলের বড় এবং জ্ঞান-বৃদ্ধও বটে, তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন—তোমরা যদি এই রাজ্যের মঙ্গল চাও, তাহলে যত শিগ্গির সম্ভব এখান থেকে বাসস্থান উঠিয়ে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা কর। যদিও জানি গোকুল আমাদের জন্মস্থান, আমাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে বসবাস করেছেন, তবুও বলব এখানে আর আমাদের থাকা উচিত নয়; কারণ এখানে শিশুদের অনিষ্টকারী অসুরদের উপদ্রব প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। আমরা তো বৃদ্ধ হয়েছি; সুতরাং নিজেদের জন্য ভাবি না; শিশুরাই এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ; সুতরাং অসুরদের উৎপাতে যদি শিশুদের কোন অনিষ্ট হয়, তাহলে রাজ্য, ধন, সম্পত্তি—এ সবই বৃথা হয়ে যাবে। ঐ যে ব্রজরাজ নন্দের কোলে নীলমণি সদৃশ শিশুটি বসে আছে, সেই তো আমাদের সকলের মন মুগ্ধ করেছে এবং সে-ই সমস্ত ব্রজবাসীর প্রাণ। ভেবে দেখ, এর উপর দিয়ে কত বিপদ গেছে; পূতনা রাক্ষসী, শকটাসুর, তৃণাবর্ত, যমলার্জুন—এত বিপদেও যে এর কোন অনিষ্ট হয় নি, তার একমাত্র কারণ হলো এই যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অকপটে নারায়ণের সেবা করেছিলেন; তারই জন্য তিনি কৃপা করে বার বার এই শিশুটিকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং আমাদের আর কাল বিলম্ব না করে যত শিগ্গির সম্ভব এই স্থান ত্যাগ করে যাওয়াই উচিত।

অনেক দিন থেকেই আমি গোকুল ত্যাগের কথা ভাবছিলাম এবং আমাদের স্থায়ী বসবাসের জন্য একটি উপযুক্ত জায়গারও অনুসন্ধান করছিলাম। এখান থেকে কিছু দূরেই একটি অতি মনোরম বন আছে; বৃন্দা দেবী সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী; সেই জন্য ঐ বনকে বৃন্দাবন বলা হয়। যমুনা নদীর তীরে সেই জায়গা নানা ফলফুল এবং বৃক্ষলতায় শোভিত; সেখানে বড় বড় দীঘি এবং গোবর্ধন পর্বতের শোভা অতি মনোরম; সেখানে কোমল তৃণাচ্ছাদিত অতি বিস্তৃত মাঠ রয়েছে, যা আমাদের গোচারণের জন্য একান্ত দরকার; সর্বোপরি আমাদের সকলেরই বংশ বৃদ্ধি হবার জন্য গোকুলে আর স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তাই ভাবছি, বৃন্দাবন সব দিক থেকেই অতুলনীয় এবং সেখানে কোনরকম বিপদের আশঙ্কা নেই। সুতরাং এই বিপদসংকুল গোকুল ত্যাগ করে, যত শিগ্‌গির সম্ভব আমাদের বৃন্দাবনে চলে যাওয়াই উচিত।

উপানন্দের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে সকলেই তার কথা সমর্থন করলেন এবং গোকুল থেকে বাসস্থান উঠিয়ে নিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে বসবাস করার জন্য তোড়জোড় পড়ে গেল। ব্রজের গোপেরা বহু গরুর গাড়ি জোগাড় করে তার মধ্যে সংসারের নিত্য ব্যবহার্য জিনিস বোঝাই করলেন। স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে তারা সকলে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, মঙ্গল-ধ্বনি করতে করতে পরম আনন্দে বৃন্দাবনের পথে যাত্রারম্ভ করলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপনায়কেরা এই যাত্রাপথের তদারকি করতে লাগলেন, যাতে কারও কোন অসুবিধা না হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা কৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা স্মরণ করে ভাবতে লাগলেন—এবার তারা বৃন্দাবনে নির্বিঘ্নে কৃষ্ণের লালন-পালন করতে পারবেন। যশোদা ও রোহিণী, কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে একই শকটে আরোহণ করে কখনো রাম-কৃষ্ণের সাথে কথালাপে আবার কখনো কৃষ্ণের বাল্যলীলা কীর্তনে উৎফুল্ল হয়ে বনপথ দিয়ে বৃন্দাবনের দিকে চলতে লাগলেন। ব্রজবাসীদের সবারই মন সর্বক্ষণ কৃষ্ণে নিবদ্ধ; তারা সর্বদা কৃষ্ণের কথা বলেন, তাঁর বাল্যলীলা কীর্তন করেন, কৃষ্ণের মঙ্গল কামনা করেন। এই ভাবে তারা সকলে যমুনার তীরে এসে পৌঁছুলেন। এই বার যমুনা পার হতে হবে।

জীব গোস্বামী তাঁর 'গোপাল চম্পূ' গ্রন্থে ব্রজবাসীদের গোকুল থেকে বৃন্দাবনে আসার অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। নন্দ প্রভৃতি গোপেরা যখন যমুনার তীরে এসেছেন, তখন যমুনার শোভা দেখে তারা বলাবলি করছেন

—আহা! অপর পারের বৃন্দাবনের বনসমূহের প্রতিবিম্ব পড়ে সূর্যতনয়া যমুনার কি অপূর্ব শোভাই না হয়েছে! যমুনার জলে বৃন্দাবনের ছায়া পড়েছে—তা দেখে মনে হচ্ছে যমুনা যেন বিচিত্র চিত্রাবলী শোভিত পট্টবস্ত্র ধারণ করে রয়েছেন।

সমর্থ গোপেরা এবার কাশ, শর, বাঁশ প্রভৃতি দিয়ে ভেলা তৈরি করে, যমুনার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত জুড়ে দিলেন এবং তার উপর দিয়ে সকলে যমুনা পার হয়ে বৃন্দাবনে এসে উপনীত হলেন। বৃন্দাবনের শোভা দেখে, হরিণ, ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি শুভ-সূচক পশু-পাখিদের দেখে এবং তাদের ডাক শুনে কৃষ্ণ-বলরামের আনন্দ যেন ধরে না। তাঁরা পায়ে হেঁটে কখনো বা অতি প্রিয় গোপদের কাঁধে চড়ে যেতে লাগলেন। কৃষ্ণ-বলরামের আনন্দ দেখে সকলেই তখন আনন্দে আত্মহারা! ক্রমে ক্রমে তারা 'বৎসক্রীড়ন' নামক যমুনার ঘাট থেকে 'সাট্টীকর' নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন; এই সাট্টীকর গ্রামেই গোপদের স্থায়ী বাসস্থান ঠিক হলো।

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! বৃন্দাবন, গোবর্ধন এবং যমুনা পুলিনের শোভা দেখে রাম-মাধব পরম আনন্দিত হলেন।

গোপরাজ নন্দ অপরাপর গোপদের সাথে যখন গোচারণে যান, তখন বলরাম ও কৃষ্ণ দুজনেই তাদের অনুগমন করেন। কিছুদূর যাবার পর নন্দ মহারাজ দুই ভাইকে দুই কোলে নিয়ে চলতে থাকেন এবং গাছপালা, পশুপক্ষী প্রভৃতির বিষয়ে দুই ভায়ের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে পরম আনন্দ অনুভব করেন। কখনো বা দুই ভাই নন্দের কোল থেকে নেমে গরুর পালের দিকে যাবার জন্য জিদ করতে থাকেন। তাঁদের এই গো-প্রীতি এবং গোচারণে যাবার আগ্রহ দেখে সকলে মিলে ঠিক করলেন যে, সমবয়সী বালকদের সাথে কৃষ্ণ-বলরামকে ছোট ছোট বাছুরদের দেখাশোনা এবং চারণে নিযুক্ত করা হোক।

কৃষ্ণ-বলরাম বেণু, বেত্র, শৃঙ্গ, কন্দুক প্রভৃতি জিনিস নিয়ে বিচিত্র পোশাকে ভূষিত হয়ে শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি বয়স্যদের সাথে নন্দালয়ের কাছেই গোবৎস-চারণ করতে আরম্ভ করলেন।

গোচারণে যাবার আগে মা যশোদা সযত্নে কৃষ্ণ-বলরামকে স্নান করিয়ে বিচিত্র পোশাক ও অলঙ্কারে সাজিয়ে ভাল করে খাইয়ে দিতেন; তারপর

শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি কৃষ্ণের সমবয়সীরা এলে মা যশোদা তাদের সাথে কৃষ্ণ-বলরামকে বৎস-চারণে যেতে দিতেন। গোষ্ঠে গিয়ে দুই ভাই অপরাপর বালকদের সাথে নানা প্রকার খেলায় মেতে উঠতেন। শুকদেব কৃষ্ণ-বলরামের খেলার অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎকৃত্রিমগোবৃষৈঃ॥ ১০-১১-৩৯॥

কৃষ্ণ-বলরাম কখনো বেণু বাজান, কখনো গুলতি দিয়ে বেল, আমলকী প্রভৃতি দূরে ছুঁড়ে দেন; কখনো পায়ে নূপুর পরে নৃত্য করেন, আবার কখনো বা গোবৃষ সেজে ষাঁড়ের মতো গর্জন ও পরস্পর যুদ্ধ করেন। কখনো বা ময়ূর, হাঁস, বানর প্রভৃতির চিৎকার অনুকরণ করেন। এইভাবে তাঁরা প্রাকৃত বালকের মতো খেলা করতেন।

কখনো কখনো কৃষ্ণ খেলায় অপর বালকদের কাছে হেরে গিয়ে পালিয়ে যান; এতে অপর বালকদের কি আনন্দ! এ কি সম্ভব, না ভাবা যায়! অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি সর্বময় কর্তা, তিনি প্রাকৃত বালকের মতো খেলা করছেন, আবার খেলাতে হেরেও যাচ্ছেন! কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কথা ভাবতে গেলে আর এই মধুর খেলা জমবে না; তাই গোপবালকেরা সখ্য-ভাবে কৃষ্ণকে তাদেরই খেলার সাথী বলে জেনেছেন—তারা তাঁকে ভগবান বলে জানেন না; কৃষ্ণও এই কৈশোর লীলায় মেতে সখাদের কাছে তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য কখনও প্রকাশ করেন না। অপ্রাকৃতের প্রাকৃত লীলা তাই এত মধুর!

ধীরে ধীরে গোপবালকদের গোচারণের পরিধি বাড়তে থাকে। একদিন কৃষ্ণ-বলরাম বন্ধুদের সাথে যমুনার তীরে গোচারণ করছিলেন। সেই সময় এক অসুর তাদের বধ করার জন্য বাছুরের রূপ ধরে বাছুরের দলে এসে মিশে গেল। কৃষ্ণ কিন্তু বাছুর-রূপী অসুরের চালাকি বুঝে ফেলেছেন; ইঙ্গিতে দাদা বলরামকে জানিয়ে ধীরে ধীরে তিনি দৈত্যের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অচ্যুত বালক হলেও যিনি নিজের ষড়ৈশ্বর্য থেকে কখনও বিচ্যুত হন না, সেই কৃষ্ণ হঠাৎ বাছুর-রূপী দৈত্যের লাঙ্গুল সহ পেছনের পা ধরে শূন্য মার্গে ঘুরিয়ে তার প্রাণ নাশ করলেন। এই না দেখে গোপবালকেরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে কৃষ্ণের প্রশংসা করতে লাগলেন।

আর একদিন গোচারণ করতে করতে কৃষ্ণ বক-রূপী এক মহাসুরকে বধ করলেন। বালকদের কাছে বকাসুর বধের কথা শুনে গোপগোপীরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলাবলি করতে লাগলেন—কি আশ্চর্য! এখন পর্যন্ত কতবারই না এই বালকের মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু বালকের কিছু হলো না; বরং যারা বালকের অনিষ্ট করতে এসেছিল তাদেরই ঘোর অনিষ্ট হলো; সম্ভবত এরা পূর্বে বহু জীবের অনিষ্ট করেছিল। সর্বজ্ঞ শিরোমণি গর্গাচার্য কৃষ্ণের নামকরণের সময় তো আমাদের বলেই ছিলেন—নন্দের এই পুত্রটি নারায়ণের মতো গুণ বিশিষ্ট; ঋষির কথা কি মিথ্যা হতে পারে? নারায়ণই একে সব সময় রক্ষা করছেন; আবার নারায়ণ যাকে রক্ষা করেন, তার কি কখনও কোন অনিষ্ট হতে পারে? এইভাবে নন্দ প্রভৃতি গোপেরা কৃষ্ণ-বলরামের কথা বলাবলি করে পরম আনন্দ লাভ করেন; তাই সংসারের দুঃখ তাদের স্পর্শও করতে পারে না। সাধারণ মানুষ এই দেহকেই 'আমি' এবং মায়িক সংসারকেই 'আমার' বলে মনে করে দুঃখ পায়। যাঁরা কৃষ্ণের সেবার জন্য সংসার করেন এবং কৃষ্ণের প্রতি মমতা করেন, তাঁরা সংসার-বিষয়ে মমতা রহিত হয়ে কৃষ্ণ-কথায় পরম আনন্দে দিন অতিবাহিত করেন। এদিকে গোপবালকেরা প্রত্যেক দিনই কৃষ্ণ-বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোচারণে এসে নানা প্রকার খেলা করেন। শুকদেব গোপবালকদের খেলার আর একটি মনোজ্ঞ ছবি এঁকেছেন ঃ

কেচিদ্বেণুন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ ১০-১২-৭॥

কোন বালক বেণু বাজায়, কেউ শিঙ্গা ফোঁকে, কেউ বা ভ্রমরের মতো গুন্ গুন্ শব্দ করে, আবার কেউ বা ময়ূরের মতো নৃত্য করে; কোন কোন বালক জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে হাত-পা ছুঁড়ে মুখ-ভঙ্গি করে প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥
১০-১২-১১॥

জ্ঞানযোগ এবং অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা জ্ঞানী এবং যোগীরা যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ বলে জেনেছেন, দাস্যাদি ভক্তেরা যাঁকে পরমেশ্বর

বলেন এবং মায়ার দ্বারা মোহিত ব্যক্তিরা যাঁকে সামান্য বালক মাত্র মনে করে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে অশেষ পুণ্য-নিকেতন-স্বরূপ গোপ-বালকেরা এইভাবে খেলা করতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করছিলেন, তখন বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সেই সময় সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সখ্যভাবের চরম সীমার কথায় রামানন্দ উপরোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

জ্ঞানী এবং যোগীরা যাঁকে ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ পরম পুরুষ বলে জেনেছেন, দাস্য ভক্তেরা যাঁকে স্বয়ং ভগবান বলে অনুভব করেছেন এবং মায়ামুগ্ধ জীবেরা যাঁকে সাধারণ বালক বলে মনে করে, সেই পরমাত্ম-স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে গোপবালকেরা এইভাবে সখার মতো খেলা করেছেন; এদের কি আর পুণ্যের শেষ আছে! চৈতন্যদেব শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেছিলেন —এহোত্তম—অতি চমৎকার!

শুকদেব বলছেন—বহু জন্মের কৃচ্ছ্র-সাধনার ফলে যাদের চিত্ত একাগ্র হয়েছে, এমন যোগীরাও যাঁর চরণরেণু লাভ করতে সমর্থ হয় না, সেই সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যারা সর্বদা থেকেছেন, খেলা করেছেন—আহা! সেই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব!

যেসব ভক্ত ভগবানকে সর্ব-নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান বলে মনে করেন, কিংবা যেসব ভক্ত নিজেকে ভগবানের দাস বলে মনে করেন, তাদের মনে ভগবানের ঐশ্বর্য-ভাব বিশেষরূপে প্রকটিত থাকে; তাই তারা ভগবানের মাধুর্যের সন্ধান পান না। অপর দিকে, প্রেমবান ভক্তেরা নিজেদের ভাব অনুযায়ী কেউ সখা, কেউ পুত্র, কেউ প্রাণবল্লভরূপে ভগবানকে গ্রহণ করে তাঁর লীলা-মাধুর্য আস্বাদন করেন। প্রেমবান ভক্তেরা কখনো কখনো ভগবানের ঐশ্বর্য দেখলেও সেদিকে মন দেন না; কৃষ্ণের মুখের মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখেও যশোদার বাৎসল্যভাবের হ্রাস হয়নি; গোপবালকেরা বকাসুর, বৎসাসুর বধ দেখেও কৃষ্ণকে সখা বলে গ্রহণ করতে একটুও সংকোচ বোধ করেন নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুদ্ধ প্রেমবান ভক্তেরা ভগবানের মাধুর্য পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে সমর্থ হন। ব্রজবাসীরা সবাই কৃষ্ণের সাথে বিভিন্ন ভাবে—কেউ পুত্ররূপে, কেউ সখারূপে, কেউ প্রাণবল্লভরূপে, শুদ্ধ প্রেমে সংবদ্ধ; সুতরাং ব্রজবাসীরাই জগতে শ্রেষ্ঠ, তাদের সৌভাগ্যের পরিমাপ করা যায় না।

২২

অঘাসুর বধ, ব্রহ্মা-মোহন ও কৃষ্ণস্তুতি

শুকদেব শ্রীভগবানের বাল্যলীলা কথা বলছেন। একদিন অঘ নামে এক মহাসুর গোপবালকদের সাথে কৃষ্ণের মধুর গোচারণ লীলা দেখে ক্রোধে হিংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠল। এই অঘাসুর ছিল পূতনা রাক্ষসী এবং বকাসুরের ছোট ভাই; সে ভাবল—এই কৃষ্ণই আমার বোন পূতনা এবং ভাই বকাসুরকে বধ করেছে; সুতরাং আজ আমি একে বধ করে আমার বোন এবং ভায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেব। এইভাবে চিন্তা করে সেই অঘাসুর পর্বত-প্রমাণ দেহ এবং পর্বত গহ্বরের মতো মুখবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড অজগর সর্পের রূপ ধারণ করে গোপবালকদের চলার পথে পড়ে রইল। উদ্দেশ্য গোপবালকেরা অঘাসুরের হাঁ-করা মুখ দেখে ভাববে যে, এটা একটা বিরাট গিরিগহ্বর মাত্র; কৃষ্ণের সাথে যেই তারা এই গহ্বর-রূপী অঘাসুরের মুখে ঢুকবে, অমনি সে মুখ বন্ধ করে তাদের বধ করবে। এদিকে দূর থেকে গোপবালকেরা পর্বতাকৃতি বিরাট অজগর সাপকে দেখে বৃন্দাবনেরই এক গহ্বর-বিশিষ্ট পর্বত মনে করে, খেলতে খেলতে সেই গহ্বরের ভিতর, অজগরের মুখ-বিবরে প্রবেশ করল। অঘাসুর দেখল যে, গোপবালকেরা তার হাঁ-করা মুখের ভিতর প্রবেশ করেছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ তো এখনও প্রবেশ করে নি। আর কৃষ্ণকে বধ করার জন্যই তো সে এই ফাঁদ পেতেছে; সুতরাং তখনই মুখ বন্ধ না করে সে কৃষ্ণের অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে দূর থেকে দেখেই কৃষ্ণ অঘাসুরের এই মতলব বুঝে ফেলেছেন; কিন্তু গোপবালকেরা যে বারণ করার আগেই অঘাসুরের মুখ-বিবরে প্রবেশ করে গেছে। কৃষ্ণ তাই এই খল প্রকৃতি অঘাসুরকে বধ করে সরলমতি গোপবালকদের রক্ষা করার জন্য নিজেও অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করলেন এবং নিজের শরীরকে অত্যন্ত স্থূল করে অঘাসুরের শ্বাস-নালী বন্ধ করে দিলেন; এতেই অঘাসুরের মৃত্যু হলো। ভগবান তখন তাঁর অমৃতবর্ষী দৃষ্টির দ্বারা মৃতপ্রায় গোপবালকদের সজীব করে তাদেরই সাথে অঘাসুরের মুখ-বিবর থেকে বেরিয়ে এলেন।

এদিকে স্বর্গ থেকে দেবতারা কৃষ্ণের এই অচিন্ত্য অসুর-মারণ এবং শিষ্টের পালনরূপ লীলা দেখে আনন্দে তাঁর জয়গান করতে লাগলেন। দেবতাদের

জয়গান শুনে ব্রহ্মা তখন বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণের পরমাদ্ভুত মানুষী-লীলা দেখে বিস্ময়ে এবং আনন্দে আত্মহারা হলেন। কৃষ্ণকে একটু পরীক্ষা করার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাল্যলীলার মাধুর্য আরও বিশেষভাবে আস্বাদন করার জন্য ব্রহ্মা তখন এক ফন্দি করলেন। ব্রহ্মা ভাবলেন—ভগবান যখন বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির স্তবস্তুতিতে পরিতুষ্ট হন, তখন তাঁর মধ্যে অপরিসীম ঐশ্বর্যেরই স্ফুরণ হয়; সেখানে কিন্তু ভগবানের মাধুর্যের প্রকাশ হয় না। ভগবান যখন মায়াকে অবলম্বন করে মানুষের মতো হয়ে মানুষের সঙ্গে লীলা করেন, তখনই কেবল তাঁর মাধুর্যের স্ফুরণ হয়; অর্থাৎ ভগবান যখন তাঁর ঈশ্বরীয় ভাব ভুলে মুগ্ধ-প্রায় হয়ে মানুষী-লীলা করেন, তখনই তাঁর মাধুর্যের প্রকাশ হয়। ব্রহ্মা ঠিক করলেন, কৃষ্ণের কাছ থেকে গোবৎস ও গোপবালকদের সরিয়ে নিলে তিনি মুগ্ধবৎ কি রকম ব্যবহার করেন, তাঁর সেই মাধুর্য-লীলা একবার প্রাণভরে দেখতে হবে।

অঘাসুর বধের পর কৃষ্ণ তাঁর সখাদের বললেন—আমাদের খাবার সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে; আমরা সবাই ক্ষুধার্ত হয়েছি; সুতরাং এস, আমরা সকলে এই সুন্দর যমুনা-পুলিনে বসে খেয়ে নিই এবং বাছুররাও যমুনার জল পান করে সামনের তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করুক। কৃষ্ণের কথায় সায় দিয়ে গোপ-বালকেরা আনন্দে কৃষ্ণকে মাঝখানে বসিয়ে এবং নিজেরা তাঁকে ঘিরে বসে খেতে আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণ ও গোপবালকেরা একে অপরকে নিজের নিজের আনীত খাবারের আস্বাদন করিয়ে হাসতে হাসতে এবং অপরকে হাসাতে হাসাতে খেতে লাগলেন।

সকল যজ্ঞের যিনি অগ্রভাগ গ্রহণ করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলায় মত্ত হয়ে ডান হাতে দই-মাখা ভাতের গ্রাস এবং বাঁ হাতে লবণ, আদা প্রভৃতি নিয়ে সখাদের সাথে পরম আনন্দে খাচ্ছেন। ব্রহ্মা তখন এই পরমাদ্ভুত দৃশ্য দেখে তাঁর ফন্দি অনুযায়ী কৃষ্ণ এবং গোপবালকদের আনন্দের আতিশয্যে অন্যমনস্ক দেখে মায়া বিস্তার করে গোবৎসদের স্থানান্তরিত করলেন। কিছুক্ষণ পরে গোপবালকেরা যখন দেখলেন যে, গোবৎসদের আর দেখা যাচ্ছে না, তখন তারা একটু ভয় পেয়ে বলতে লাগলেন—আরে! বাছুররা সব গেল কোথায়? কৃষ্ণ তখন তাদের শান্ত করে বললেন—সখারা, তোমরা খেতে

থাক; আমি এখনই গোবৎসদের খুঁজে আনছি—এই বলে তিনি দই-মাখা ভাতের গ্রাস হাতে করেই বাছুরদের খোঁজে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ বনে বনে খুঁজেও বাছুরদের না পেয়ে কৃষ্ণ যমুনা-পুলিনে ফিরে এলেন; কিন্তু এখানে এসেও গোবৎসদের তো পেলেনই না, আবার তাঁর সখাদেরও দেখতে পেলেন না। ভাবলেন—এরাই বা সব গেল কোথায়? কৃষ্ণ তখন আবার তাদের বনে বনে অন্বেষণ করতে লাগলেন। এই অবস্থায় সাধারণ একটি শিশুর যা হয়, কৃষ্ণেরও হয়ত তা-ই হয়েছিল; বন্ধু ও বাছুরদের হারিয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন; হয়ত বা তাঁর চোখের কোণে এক ফোঁটা জলও দেখা গেছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্বনিয়ন্তা সর্বজ্ঞ হয়েও মায়াকে অবলম্বন করেই লীলা করেন; সুতরাং সাধারণ মানুষের মতোই তিনি বাল্যলীলা করছেন। বহুক্ষণ পরে গোবৎস ও গোপবালকদের কোথাও খুঁজে না পেয়ে যখন তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, তখন হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ সবই ব্রহ্মার কীর্তি!

কৃষ্ণ তখন বাৎসল্য-প্রেমময়ী গাভী ও গোপীদের এবং তাঁর বাল্যলীলা দর্শনেচ্ছু ব্রহ্মার আনন্দ বর্ধনের জন্য নিজেই অসংখ্য গোবৎস এবং গোপবালকদের রূপ ধারণ করলেন। আগে বাছুর এবং গোপবালকেরা যে যেভাবে আহার, বিহার, মাতাপিতার সঙ্গে ব্যবহার করতেন, গোবৎস এবং গোপবালক রূপধারী কৃষ্ণও ঠিক সেই সেই ভাবেই আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন।

তখন সর্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোবৎস এবং গোপবালকের রূপ ধারণ করে আত্মস্বরূপ গোপবালকদের দ্বারা, আত্মস্বরূপ গোবৎসদের বন থেকে ফিরিয়ে এনে, আত্মস্বরূপ গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করতে করতে যথারীতি ব্রজে ফিরে এলেন।

সবই কৃষ্ণ। গোবৎস, গোপবালক—সবই কৃষ্ণ। ব্রজবাসীরা কিন্তু এসব কিছুই বুঝতে পারেননি; তারা জানতেই পারেন নি যে, শ্রীকৃষ্ণই তাদের সন্তান ও গোবৎসদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন। সুতরাং ব্রজবাসীরা এবং গাভীরা প্রতিদিনের মতোই নিজ নিজ সন্তানদের আদরযত্ন করতে লাগলেন। এতদিন পর্যন্ত গোপীরা এবং গাভীরা তাদের সন্তানদের ভালবাসতেন ঠিকই; কিন্তু আজ যেন সেই ভালবাসার আকর্ষণ তাদের কাছে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে। গোপরমণীরা এত দিন গোষ্ঠ-প্রত্যাগত কৃষ্ণকেই

প্রথম আদর-আলিঙ্গন করে, পরে নিজ নিজ সন্তানদের কোলে করে ঘরে নিয়ে যেতেন। আজ তারা প্রথমেই নিজ নিজ সন্তানকে আদর আপ্যায়ন করে ঘরে নিয়ে গেলেন। উপনিষদে রয়েছে—পতির নিমিত্ত পতি প্রিয় হয় না, পুত্রের নিমিত্ত পুত্র প্রিয় হয় না; আত্মার জন্যই এক ব্যক্তি অপরের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। সেই পরমাত্মাই নর বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং গোপীরা ও গাভীরা তাদের সন্তান-রূপী কৃষ্ণকে পেয়ে, তাদের প্রতি যে অনেক বেশি আকর্ষণ অনুভব করবেন—এটাই তো স্বাভাবিক।

ব্রজের বাৎসল্য-প্রেমবতী গোপীরা এবং গাভীরা কৃষ্ণকে নিজের নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন ঠিকই। কিন্তু তাতে তাদের তেমন আনন্দ হতো না; তাদের মনোগত বাসনা ছিল—কৃষ্ণ যদি আমার গর্ভজাত সন্তান হতো! শ্রীকৃষ্ণ ঠিক করলেন যে, ব্রহ্মার মনোবাসনা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রজের গোপী এবং গাভীদের সন্তান হয়ে তাদেরও মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। আমরা কথায় বলি—এক ঢিলে দুই পাখি মারা; শ্রীকৃষ্ণ এখানে এক ঢিলে তিন পাখি মারলেন—ব্রহ্মা, গোপী এবং গাভীদের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোপবালক ও গোবৎস সেজে, নিজের সঙ্গেই নিজে প্রায় এক বৎসর ধরে খেলা করলেন।

এদিকে ব্রজের গোবৎস ও গোপবালকদের অপহরণ করে ব্রহ্মা সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মানুষের হিসেবে প্রায় এক বৎসর পরে ফিরে এসে দেখলেন যে, কৃষ্ণ ঠিক আগের মতোই গোবৎস ও গোপবালকদের নিয়ে খেলা করছেন! ব্রহ্মা এও দেখলেন যে, তাঁর মায়ার প্রভাবে অপহৃত গোবৎস ও গোপবালকেরা মায়া-নিদ্রায় ঠিক সেইভাবেই অচেতন হয়ে রয়েছে। ব্রহ্মা তখন মহা সমস্যায় পড়লেন; তিনি বুঝতে পারছেন না—কৃষ্ণের সঙ্গে যেসব বাছুর ও গোপবালকেরা রয়েছে, তারা কে, কোথা থেকে এল? কৃষ্ণকে মায়ামুগ্ধ করতে এসে ব্রহ্মা নিজেই এখন কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। হঠাৎ ব্রহ্মা দেখলেন যে, সমস্ত গোবৎস ও গোপবালক—সবাই কৃষ্ণ মূর্তিতে অবস্থান করছেন—সবাই ঘনশ্যাম বর্ণ এবং পীতবেশধারী।

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ১০-১৩-৪৭ ॥

ব্রহ্মা দেখছেন—গোবৎস এবং গোপবালক—সবাই চতুর্ভুজ—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করে রয়েছেন; সবাই হার, কুণ্ডল ও বনমালায় পরিশোভিত। ব্রহ্মা ভাবলেন—এই যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ শ্রীকৃষ্ণের মায়ার দ্বারা বিধৃত হয়ে রয়েছে; এই যে আমি, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, এই আমিও তাঁরই মায়ার অন্তর্গত; তাঁর কাছে আমি নিতান্তই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর।

এই অত্যাশ্চর্য দর্শনের পর ব্রহ্মার মন, বুদ্ধি, প্রাণ যেন স্তিমিত হয়ে গেল; তিনি নির্বাক হতচেতন হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখলেন—অদ্বয় অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ডান হাতে দই-মাখা ভাতের গ্রাস নিয়ে মুগ্ধ বালকের মতো গোবৎস ও গোপবালকদের অন্বেষণ করছেন। এক বৎসর পূর্বে গোবৎস ও গোপবালকদের অপহরণ করার পর ব্রহ্মা এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন।

চতুর্মুখ ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর হংসবাহন থেকে নেমে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জোড় হাতে বালক-রূপী পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন ঃ

হে বিচিত্র লীলাময়! আপনি ভক্তের মনোরথ পূরণ, অসুর-মারণ, ভূভার-হরণ, ধর্মস্থাপন এবং আমার সৃষ্ট জগৎকে পালন করার জন্য মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি নানা রূপে বার বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। আপনি সাধারণভাবে সকলের দৃষ্টির সামনে লীলা করলেও কেউ-ই আপনার মহিমা জানতে পারে না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ১০-১৪-৩ ॥

হে অজিত ! আপনার স্বরূপ, ঐশ্বর্য, মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না; সুতরাং সাধনার দ্বারা আপনাকে বশীভূত করা সম্ভব নয়; তাই আপনি অজিত। আপনার স্বরূপ, ঐশ্বর্য, মহিমা প্রভৃতির বিচার না করে যাঁরা আপনার ভক্তদের অনুগত হয়ে তাঁদের মুখে আপনার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির কথা শোনেন এবং সেইসব পালন করে জীবনধারণ করেন, তাঁদের অসাধ্য কিছু নেই।

আপনি ত্রিজগতে কারও বশীভূত না হলেও আপনার এইরকম ভক্তেরা কিন্তু আপনাকে বশীভূত করে থাকেন।

এখানে ভক্তের মহিমার কথা বলা হলো; ভগবান একমাত্র ভক্তের বশ্যতাই স্বীকার করেন। ব্রহ্মার মনের ভাব হয়ত এই ছিল যে—আমি সৃষ্টি কর্তা, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, আপনার কাছে এসেছি; আমার দিকে আপনি একবার ফিরেও তাকাচ্ছেন না; আর এই সব জ্ঞানহীন ব্রজের বালকদের জন্যই আপনার সবটা মনপ্রাণ পড়ে রয়েছে ; এরাই আপনাকে যথার্থ বশীভূত করেছেন।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্ বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
১০-১৪-৮॥

যে ব্যক্তি আপনার অনুগ্রহের দান মনে করে নিজকৃত কর্মফল, সুখে-দুঃখে অবিচল থেকে ভোগ করেন এবং কায়মনোবাক্যে আপনার চরণে শরণাগত হন, সে-ই আপনার চরণ সেবার অধিকারি হয়।

হে প্রভু ! অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির কাছে অতি তুচ্ছ, সেইরকম আমিও আপনার কাছে অতি তুচ্ছ। কিন্তু অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে অনন্ত, সর্বকারণের কারণ, সর্বনিয়ন্তা এবং সর্বমায়াধীশ আপনাকে আমার মায়ায় মুগ্ধ করে, আমার ক্ষমতা জাহির করতে চেয়েছিলাম; আপনি আমাকে নিজের ভৃত্য মনে করে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত বিশ্বচরাচর জলে মগ্ন হলে, আপনি তখন শেষ-শয্যায় শয়ন করেন এবং আপনার নাভি-কমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। সুতরাং আমি আপনার সাক্ষাৎ পুত্র; অতএব আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

আপনি আমাকে যে মায়াবৈভব দেখিয়েছেন, তা অতি আশ্চর্য। আমি প্রথমে আপনাকে গোপবালকদের সঙ্গে পরম আনন্দে মুগ্ধবৎ বনভোজন করতে দেখেছিলাম; তারপর আমি আপনার গোবৎস ও গোপবালকদের মায়ামুগ্ধ করে স্থানান্তরিত করে দেখলাম যে, আপনি মুগ্ধ, সাধারণ বালকের মতো বনে বনে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তারপর দেখলাম যে, আপনি নিজেই গোবৎস ও গোপবালকদের রূপ ধারণ করে নিজের সাথেই পরম

আনন্দে গোষ্ঠলীলা করছেন। দেখতে দেখতে সেই সব গোবৎস এবং গোপবালকেরা প্রত্যেকেই তমালবর্ণ, চতুর্হস্ত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী মূর্তিতে বন আলোকিত করে অবস্থান করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সেই সব মূর্তিও অন্তর্হিত হয়ে গেল; আর এখন আমার সামনে আপনাকে পূর্বের সেই গোপবালকরূপে—হাতে দই-মাখা ভাতের গ্রাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। আপনার কৃপায় এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনিই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল তত্ত্ব ; আপনি এক হয়েও অনন্তরূপে প্রকাশিত হন। গুরুকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে যাঁরা আপনাকে সকল আত্মার আত্মস্বরূপ বলে ধারণা করতে পারেন, তাঁরা অনায়াসেই এই মায়ামোহ-পূর্ণ সংসার-সাগর অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

হে সর্বব্যাপিন্! যাঁরা আপনার কৃপায় বিবেক লাভ করেছেন, তাঁরা পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে ছাড়া আর সব কিছুই পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে আপনারই শরণাগত হন। এই লীলায় আপনার করুণা, ভক্তবাৎসল্য, প্রেমাধীনতা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, আর কোন লীলাতেই এই রকমটি হয়নি। আপনি কৃপা করে আমাকে আপনার মহামহিমা দর্শন করিয়ে ধন্য করেছেন।

তাই বলছি—আমার যেন এই জন্মেই কিংবা অন্য কোন জন্মে এই মহাভাগ্য হয়, যাতে আমি আপনার ব্রজবাসীদের চরণ-সেবার অধিকারি হতে পারি।

হে বিভো! অনাদি কাল থেকেই লোকে আপনার জন্য যজ্ঞাদি করে আসছে; কিন্তু কোন প্রকার যজ্ঞই আপনার তৃপ্তি বিধান করতে পারেনি। কিন্তু এখানে এসে দেখছি আপনি অসংখ্য গোবৎস ও গোপবালকের মূর্তি ধারণ করে, পরম আনন্দে ব্রজের গো এবং গোপীদের স্তন পান করছেন। আহা! ব্রজবাসী, গো এবং গোপীরাই ধন্য!

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ১০-১৪-৩৪ ॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বলছেন—সর্ববেদ এবং বেদোক্ত সাধনার দ্বারা যাঁর চরণধূলির অনুসন্ধান করা হয়, সেই ভগবান মুকুন্দ যাঁদের জীবন-স্বরূপ, সেই ব্রজবাসীদের মধ্যে যে-কোন এক জনের চরণধূলি যে জন্মে লাভ করা যায়, সেই জন্মকেই আমি ব্রহ্মজন্ম থেকেও সৌভাগ্যপ্রদ বলে মনে করি।

এখানে ব্রহ্মা নিজের অহমিকাকে একেবারে মুছে ফেলে বলছেন—আপনাকে পাবার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না; মহাভাগ্যবান্ এই ব্রজবাসীদের চরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ করতে পারলেই আমি কৃতকৃতার্থ হব। যেদিন আমার সেই সৌভাগ্য হবে, সেই দিনটি আমার কাছে এই ব্রহ্মজন্ম থেকেও মহাপুণ্যময় বলে মনে হবে।

হে প্রভু ! এই জগতে কেউ যদি আপনার মহিমা জেনে থাকেন, তাহলে তাঁর সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। তবে আমি জানি যে, আপনার মহামহিমার এক বিন্দুও আমার শরীর-মন-বাক্যের বিষয়ীভূত নয় অর্থাৎ শরীর-মন দিয়ে আপনাকে জানতে পারি না, বাক্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করতে পারি না ! আপনি অচিন্ত্য অনির্বচনীয়।

হে কৃষ্ণ ! আপনি সকলের অন্তরের ভাবই জানেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আপনাতেই অধিষ্ঠিত এবং আপনিই জগতের প্রভু। অতএব আমার মনের ভাবও আপনি জানেন; সুতরাং আমি আর আপনার কী স্তুতি করব? এবার আমায় অনুমতি দিন, আমি স্বস্থানে গমন করি। আপনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলের পূজ্য; আমি যেন সারা জীবন আপনার শ্রীচরণে প্রণত থাকতে পারি।

এইভাবে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে তিন বার তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মৌন সম্মতি নিয়ে ব্রহ্মালোকে চলে গেলেন। কৃষ্ণও তখন তৃণভক্ষণরত গোবৎসদের নিয়ে যমুনা-পুলিনে সখাদের কাছে এলেন।

কৃষ্ণ বন ভোজনে রত গোপবালকদের ছেড়ে গোবৎসদের খুঁজে আনতে গিয়েছিলেন; এর মধ্যে প্রায় এক বছর কেটে গেছে; কিন্তু কৃষ্ণের মায়ার প্রভাবে কৃষ্ণ-সখাদের মনে হলো যে, কৃষ্ণ অতি অল্প সময়ই বাছুরদের খুঁজে আনার জন্য তাদের কাছ থেকে দূরে থেকেছেন।

কৃষ্ণকে আসতে দেখে গোপবালকেরা বললেন—সখা! তুমি তো খুব শিগ্‌গিরই বাছুরদের খুঁজে এনেছ। তুমি তো এখন পর্যন্ত এক গ্রাস অন্নও মুখে দাও নি; সুতরাং এস এস, আমাদের মাঝখানে বসে তুমি মনের আনন্দে ভোজন কর।

সেদিন ভোজন ও গোষ্ঠলীলা শেষ করে যথারীতি গোপবালকেরা কৃষ্ণকে নিয়ে আনন্দে নৃত্য-গীতাদি করতে করতে ব্রজে ফিরে এসে নিজ নিজ মাতা-পিতাকে বললেন, নন্দ-যশোদার পুত্র কৃষ্ণ আজ বনে এক প্রকাণ্ড সর্প বধ করেছে এবং তার কবল থেকে আমাদের সকলকে রক্ষা করেছে। যদিও প্রায় এক বছর আগে অঘাসুর বধ হয়েছিল, তবুও কৃষ্ণ-মায়ার বশে তারা এক বছর আগের ঘটনা আজকে ঘটেছে বলে অভিহিত করলেন।

২৩

কালীয়-দমন

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ! কোন এক সময় বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ বলরামকে ছাড়াই গোপবালকদের নিয়ে যমুনার তীরে এলেন। তখন একে গ্রীষ্মকাল, তার উপর প্রচণ্ড রোদে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে গোপবালক এবং পশুরা কালীয় নাগের বিষে দূষিত যমুনার জল পান করে সেখানেই মৃতবৎ পড়ে রইল।

যমুনার পাশেই তখন এক সুবৃহৎ হ্রদ ছিল এবং সেই হ্রদে বহুদিন থেকেই কালীয় নামে এক মহাবিষধর সর্প সদলবলে বাস করত। ঐ সাপের বিষে হ্রদের জল বিষপূর্ণ ছিল; ফলে কেউ ঐ জল পান করত না; সম্ভবত ঐ সময় দেশে অতিবৃষ্টির ফলে হ্রদের জল উপচিয়ে কিছুটা যমুনার জলে মিশেছিল বলে হ্রদের কাছাকাছি যমুনার জলও কিছুটা বিষাক্ত হয়েছিল। যমুনার এই বিষাক্ত জল পান করেই কৃষ্ণ-সখারা এবং গরুবাছুরেরা মৃতবৎ পড়ে ছিল। কৃষ্ণ তাঁর অমৃত-বর্ষী দৃষ্টির দ্বারা তাদের পুনর্জীবিত করলেন।

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ ॥ ১০-১৬-১ ॥

যমুনার জল কালীয় নাগের বিষে দূষিত হয়েছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সর্বঐশ্বর্য-নিকেতন সেই তিনি যমুনার জলকে বিষমুক্ত করার জন্য কালীয় নাগকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করলেন।

এই শ্লোকে শুকদেব 'কৃষ্ণ' শব্দ তিনবার ব্যবহার করেছেন; কৃষ্ণ নাম শুকদেব এবং পরীক্ষিৎ দুই জনেরই অতি প্রিয়; তাই সুযোগ পেলেই শুকদেব এই প্রিয় নামটি ভাগবতে বার বার ব্যবহার করেছেন। যমুনার আর এক নাম কৃষ্ণা; কৃষ্ণ নামের সাথে যমুনার একটা সাদৃশ্য থাকায় কৃষ্ণের কিছু গুণ যমুনাতেও থাকা উচিত; তাছাড়া বৃন্দাবন হচ্ছে কৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি; এমন

পবিত্র স্থানে বিষাক্ত জল থাকা একেবারেই উচিত নয়; তাই কৃষ্ণ ঠিক করলেন যে, কালীয় নাগকে বৃন্দাবন থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

ভগবানের প্রত্যেকটি কাজই শত্রু মিত্র সবারই কল্যাণ সাধন করে। কালীয় নাগকে হ্রদ থেকে সরিয়ে কৃষ্ণ একদিকে যেমন যমুনার জলকে বিশুদ্ধ করে কালীয় হ্রদকে মহাতীর্থে পরিণত করলেন, অপর দিকে তেমনি কালীয় নাগের কোপন স্বভাব এবং গর্ব দূর করে তাকে ভগবানের ভক্তে রূপান্তরিত করলেন।

গোপাল চম্পূ গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী বলেছেন যে, কালীয় নাগকে দমনের সংকল্প করে কৃষ্ণ গোপবালকদের বললেন—দুষ্ট কালীয় নাগ যমুনার পাশে এই হ্রদে বাস করছে। কালীয় নাগের বিষের এমনই জ্বালা যে, হ্রদের চারদিকে কোন গাছ-পালাই বাঁচতে পারে না; এমন কি পাখিরা এই হ্রদের উপর দিয়ে উড়তে গেলে বিষের জ্বালায় তখনই তাদের মৃত্যু হয়। হ্রদের তীরে এই যে পুরানো কদম গাছটি দেখছ, এ কিন্তু দিব্যি বেঁচে আছে; এর কারণ হলো, গরুড় যখন অমৃত-ভাণ্ড নিয়ে নাগলোকে যাচ্ছিল, তখন এই কদম গাছে সে একটু বিশ্রাম করেছিল ; সেই সময়কার অমৃত স্পর্শেই গাছটি এখনও বেঁচে আছে। আমার মনে হয় এই কদম গাছের কোটরে এখনও কিছুটা অমৃত রয়েছে; আমি তাই এই কদম গাছে উঠে খুঁজে দেখব সেই অমৃত পাওয়া যায় কি না। তোমরা ততক্ষণ এই বিষপূর্ণ হ্রদের কাছে না থেকে বরং দূরে গিয়ে গোচারণ কর।

শ্রীধর স্বামী এই কদম গাছের সম্বন্ধে তাঁর টীকায় বলেছেন যে, ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ এই কদম গাছে আরোহণ করে কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দেবেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য হবে বলেই কালীয় নাগের বিষও ঐ কদম গাছের কোন ক্ষতি করতে পারে নি; ভবিষ্যতেও যারা ভগবানের কৃপা লাভ করবেন, তাদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

কালীয় নাগের অতি উগ্র বিষে হ্রদের জল বিষাক্ত হয়েছে দেখে দুষ্টের দমনকারী কৃষ্ণ তখন কটিদেশে শক্ত করে কাপড় বেঁধে এবং বাহুতে তাল ঠুকে কদম গাছে আরোহণ করলেন এবং গাছের উঁচু ডাল থেকে বিষপূর্ণ হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণের পতনে হ্রদের জল প্রচণ্ড বেগে আলোড়িত

হতে লাগল এবং তার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ পরম আনন্দে সাঁতার প্রভৃতি জল-ক্রীড়া করতে লাগলেন।

পাড়ে দাঁড়িয়ে গোপবালকেরা তখন আনন্দে কৃষ্ণের এই জল-খেলা দেখতে লাগলেন। এদিকে নিজের বাসভবনে এইরকম উৎপাত হচ্ছে দেখে কালীয় নাগ ভাবল—আমার এই হ্রদে এসে উৎপাত করতে পারে এমন সাহস ত্রিভুবনে কারুর আছে বলে তো জানি না! সামান্য জীবের কি কথা, দেবতারাও হ্রদের বিষ-বাষ্পের জন্য এখানে আসতে পারে না। তবে হ্যাঁ, একমাত্র গরুড় আমাকে নির্জিত করতে পারে বটে; তাহলে কি গরুড়ই এখানেও আমার সঙ্গে বিরোধ করতে এসেছে? এইভাবে চিন্তা করে কালীয় নাগ তার কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে লাগল। এদিকে কৃষ্ণের যথেচ্ছ জলক্রীড়া, পদসঞ্চালন, জলবাদ্য ইত্যাদিতে হ্রদের জলে এমন আলোড়ন হতে লাগল যে, কালীয় তার বাসভবনে আর স্থির থাকতে পারল না। দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখে কালীয় তার শত ফণা বিস্তার করে ক্রোধে অধীর হয়ে ছুটে এসে বার বার কৃষ্ণকে দংশন করতে লাগল। তারপর সাপেরা যেমন করে কালীয় নাগও তার নিজের বিশাল শরীর দিয়ে কৃষ্ণের আপাদমস্তক জড়িয়ে নাগপাশের ভয়ঙ্কর বেষ্টনীতে কৃষ্ণের দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করার চেষ্টা করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ তখন খেলার ছলে কালীয় নাগের বেষ্টনে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। এদিকে যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ-সখারা এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে, কেউ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন, কেউ বা ছুটে গিয়ে ব্রজবাসীদের খবর দিলেন।

এদিকে তখন ব্রজধামে নানা অমঙ্গলসূচক ঘটনা—ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বামাঙ্গ কম্পন প্রভৃতি হতে লাগল। এই দেখে ব্রজবাসীরা বুঝলেন যে, ব্রজে কোন ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঘটতে যাচ্ছে। কৃষ্ণই যাদের প্রাণ, তাদের কাছে ব্রজের অমঙ্গল মানেই কৃষ্ণের জীবন-সংশয়। সুতরাং তারা সকলে শোকে দুঃখে অধীর হয়ে কৃষ্ণের দর্শনের লালসায় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে যমুনার পারে এসে উপস্থিত হলেন।

ব্রজবাসীরা দূর থেকে দেখলেন যে, কৃষ্ণ কালীয় নাগের শরীরে বেষ্টিত হয়ে হ্রদের মধ্যে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন; হ্রদের তীরে গোপবালকেরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আর গরুবাছুরেরা চারিদিকে চিৎকার করছে। এই

দেখে ব্রজবাসীরা সবাই অত্যন্ত দুঃখিত এবং মোহগ্রস্ত হলেন। মোহগ্রস্ত বলা হলো এই জন্য যে, ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের এত সব ঈশ্বরীয় লীলা দেখেও এখন তারা কৃষ্ণের বিপদাশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়েছেন—এটাই তাদের মোহ। কৃষ্ণ-জননী যশোদাকে পাগলের মতো হ্রদের জলে নামতে দেখে তার সমবয়সী গোপীরা কাঁদতে কাঁদতে ব্রজপ্রিয়কথা—কৃষ্ণের পূতনাবধ প্রভৃতি লীলাকথা বলে যশোদাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন এবং সকলে কৃষ্ণের মুখের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থেকে যেন মৃতবৎ অবস্থান করতে লাগলেন।

হ্রদের তীরে সবাই বিহ্বল হয়ে রয়েছেন—কেউ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ গুণগান করে বিলাপ করছেন, কেউ বা বেহুঁশের মতো পড়ে রয়েছেন। এদের মধ্যে একমাত্র বলরাম, যিনি শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় মূর্তি এবং কৃষ্ণের মহাপ্রভাবের কথা জানেন, তিনি তখন স্থির হয়ে সকলকে প্রবোধ দিতে লাগলেন এবং কৃষ্ণগত-প্রাণ নন্দ প্রভৃতি গোপদের কালীয় হ্রদে নামতে বারণ করলেন।

এদিকে কালীয় নাগের বেষ্টনের মধ্যে থেকেই কৃষ্ণ দেখলেন যে, হ্রদের তীরে তারই অতি প্রিয় ব্রজজনেরা তার এই অবস্থা দেখে অতি দুঃখে কাঁদছেন, কেউ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন আবার কেউ বা তাকেই সাহায্য করার জন্য হ্রদে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন। কৃষ্ণ তখন তার প্রিয়জনদের শান্ত করার ইচ্ছায় সর্প-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তার শরীরকে স্ফীত করতে লাগলেন। এতে কালীয় নাগের মরণাধিক যন্ত্রণা হতে লাগল এবং সে তখন কৃষ্ণকে ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অসংখ্য ফণা বিস্তার করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কৃষ্ণকে দংশন করার চেষ্টা করতে লাগল। তখন গরুড় যেমন বিষধর সর্পের চারিদিকে ঘুরতে থাকে, কৃষ্ণও তখন সেই ভয়ঙ্কর কালীয় নাগের চারিদিকে খেলার ছলে ঘুরতে লাগলেন। কালীয় নাগও তখন কৃষ্ণকে দংশন করার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার চারিদিকে ঘুরতে লাগল।

এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংস-
মানম্য তৎ-পৃথুশিরঃ-স্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্দ্ধরত্ননিকর-স্পর্শাতিতাম্র-
পাদাম্বুজোঽখিল-কলাদি-গুরুর্ননর্ত ॥ ১০-১৬-২৬ ॥

কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর কৃষ্ণ এবং কালীয় একে অপরের চারিদিকে ঘুরতে থাকলে কালীয় নাগ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন কৃষ্ণ বাঁ-হাতে কালীয়ের ফণা নিচু করে তার সুবিস্তীর্ণ মস্তকের উপর উঠে পড়লেন। কালীয় নাগের মাথায় যে-সব মণি ছিল তার প্রভায় কৃষ্ণের অরুণ চরণযুগল আরও রক্তিমাভ হয়ে উঠল এবং সমস্তরকম নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যার যিনি গুরু, সেই কৃষ্ণ তখন কালীয় নাগের মাথার উপর নৃত্য করতে লাগলেন। কালীয় নাগের মস্তকস্থিত মণির প্রভায় কৃষ্ণের রক্তাভ চরণ আরও বেশি উদ্ভাসিত হয়েছিল। মণির প্রভায় যেমন কৃষ্ণের চরণ উজ্জ্বল হয়েছিল, সেই রকম কৃষ্ণের চরণের জ্যোতিতে কালীয় নাগের মাথার মণিসকল আরও বেশি সুন্দর হয়েছিল। কৃষ্ণচরণোদ্ভাসিত কালীয় নাগের মস্তকে কৃষ্ণ তখন অতি মনোহর নৃত্য করতে লাগলেন।

শতফণাবিশিষ্ট কালীয় নাগের যে-সব ফণা কৃষ্ণের চরণস্পর্শে তখনও নত হয় নি, কৃষ্ণ নৃত্যের ছলে পদাঘাত করে সেই সব উদ্ধত ফণাকে বিনম্র করলেন। কালীয় নাগ তখন মৃতপ্রায় হয়ে চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগল; তার মুখ এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। কৃষ্ণের চরণস্পর্শে কালীয় নাগের দুষ্টবুদ্ধি এবং অপরকে হিংসা করবার প্রবৃত্তি দূর হলো।

কালীয় নাগ ভাবল—আগে জানতাম একমাত্র গরুড় ছাড়া আমার মতো শক্তিধর জগতে আর কেউ নেই ; কিন্তু এখন দেখছি , যিনি সামান্য বালকরূপে আমার মাথার উপর নৃত্য করছেন, তিনি আমার চেয়ে হাজার গুণ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী; তিনি নৃত্যের ছলে সামান্য পদতাড়নেই আমার শতফণা ভগ্ন করেছেন; তিনি যদি ক্রুদ্ধ হয়ে সবেগে আমায় আঘাত করতেন, তাহলে আমার যে কি অবস্থা হতো তা আমি ভাবতেও পারি না। সুতরাং বুঝেছি এ সামান্য বালক নয়—সাক্ষাৎ নারায়ণ! কালীয় নাগের আরও মনে হলো যে, তার পত্নীরা কৃষ্ণ-ভক্ত; তারা কতবার কালীয়কে কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলাকথা বলে কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে বলেছে ; কিন্তু শক্তিমদে মত্ত হয়ে সে তখন তাদের কথা শোনে নি। কালীয় নাগ এখন পত্নীদের কথা স্মরণ করে নিজের মস্তকোপরি বালককে সর্বনিয়ন্তা, পুরাণ-পুরুষ স্বয়ং ভগবান বলে স্থির জেনে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিল।

কৃষ্ণের পদচালনে তখন কালীয়ের মৃত্যুদশা উপস্থিত। মুখ ফুটে এই কথাটি বলারও ক্ষমতা নেই—হে প্রভু ! আমি তোমার হলাম, তোমার চরণে আশ্রয় নিলাম। সুতরাং মনে মনেই কালীয় নাগ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় প্রার্থনা করল। অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালীয়র মনের ভাব বুঝে তার অনেক জন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি দূর করে তার প্রতি প্রসন্ন হলেন।

এদিকে তীরে অবস্থিত ব্রজবাসীদের কাছে কালীয় নাগের মাথার উপর কৃষ্ণের নৃত্য পরম মনোহর হলেও কালীয়র কাছে কিন্তু তা মৃত্যুতুল্য ছিল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এবার নৃত্য বন্ধ করে অতি লঘুভাবে কুসুম-সদৃশ চরণ কালীয় নাগের মাথায় রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত, সেই কৃষ্ণের গুরুভারে কালীয় নাগ অত্যন্ত পীড়িত এবং তার ফণাসমূহ ভগ্ন-প্রায় হয়েছে দেখে কালীয়-পত্নীরা পতির জীবনাশঙ্কায় অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে আলুথালু বেশে সন্তানদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে, তাঁর স্তব করতে লাগলেন। নাগপত্নীদের এই কৃষ্ণস্তুতি ভক্তি এবং জ্ঞানের চরম সীমা বলা যেতে পারে। ভাগবতে যে-সব সুন্দর স্তব-স্তুতি রয়েছে, নাগপত্নীদের এই কৃষ্ণস্তুতি তার মধ্যে অন্যতম।

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিং-স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টে-র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥
১০-১৬-৩৩ ॥

নাগপত্নীরা বলছেন—এই মহাপরাধী কালীয়র প্রতি আপনি যে দণ্ড বিধান করেছেন, তা ঠিকই হয়েছে; কারণ দুষ্টের দমনের জন্যই তো আপনার দেহধারণ; শত্রু এবং নিজের পুত্রের প্রতি আপনি সমভাবাপন্ন; দুষ্কৃতকারীদের কল্যাণের জন্য, তাদের চরণাশ্রয়ে আনার জন্যই আপনি তাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

কালীয় নাগ কত অপরাধই না করেছে ! (১) সে আপনার ভক্ত গরুড়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, (২) সে আপনার বাল্যলীলাস্থলে এসে যমুনার জলকে বিষযুক্ত করেছে, (৩) যমুনার পাড়ের গাছ-পালাকে দগ্ধ করেছে, (৪) আপনার সখাদের এবং গরুবাছুরদের বিষের জ্বালায় কষ্ট দিয়েছে এবং (৫) সর্বোপরি সে বার বার আপনাকে দংশন করেছে। আপনি দুষ্টের দমন

এবং শিষ্টের পালনের জন্য বার বার মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এবারও আপনি ঐ একই উদ্দেশ্যে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন। সুতরাং কালীয়র প্রতি দণ্ড-বিধান করা আপনার উপযুক্ত-ই হয়েছে।

সকলের উপরই আপনার সমভাব হলেও পৃথ্বী গর্ভজাত নরকাসুর অপরের উপর অত্যাচার করত বলে আপনি তাকে বধ করেন; আবার আপনার পরম শত্রু হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ আপনার পরম ভক্ত! সুতরাং কালীয়র নিগ্রহ যুক্তিযুক্তই হয়েছে এবং এতে সকলেরই মঙ্গল হবে। আপনার পদ-প্রহারে কালীয় সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, আপনার চরণাশ্রয় লাভ করে, মহাভক্তে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং কালীয়কে দণ্ড দিয়ে আপনি তার প্রতি মহা অনুগ্রহ-ই করেছেন।

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্বং নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্মোঽথবা সর্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্বজীবঃ ॥
১০-১৬-৩৫ ॥

নাগপত্নীরা বলছেন—জানি না, এই কালীয় পূর্ব জন্মে অভিমানশূন্য হয়ে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, এমন কী তপস্যা করেছিল অথবা ধর্মের অনুষ্ঠান করেছিল, যার জন্য আপনি সর্বাত্মা হয়েও এর উপর এত প্রসন্ন হয়েছেন!

ভগবান কালীয়র মাথায় পদাঘাত করে তাকে তো প্রায় শেষ করেই দিয়েছেন; নাগপত্নীরা এতে কালীয়র প্রতি ভগবানের কৃপা কোথায় দেখলেন? সেই কথাই বলা হচ্ছে ঃ

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥
১০-১৬-৩৬॥

আপনার চরণ ধুলার স্পর্শের অধিকার পাবার জন্য আপনারই প্রেয়সী লক্ষ্মীদেবী সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে বহুকাল ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। হে দেব! আপনার সেই পরম দুর্লভ লক্ষ্মী-বাঞ্ছিত শ্রীচরণ স্পর্শের অধিকার এই কালীয় কোন্ পুণ্যের ফলে লাভ করল, তা আমরা বুঝতে পারি না।

শুদ্ধ ভক্তের প্রতি আপনি সুপ্রসন্ন—তা আমরা জানি; কিন্তু এই কালীয় তো কখনও আপনার ভক্ত ছিল না ; তবুও সে আপনার শ্রীচরণ নিজ শিরে ধারণ করেছে। কোন্ পুণ্যের ফলে তার এমন সৌভাগ্য হলো? ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ এঁরা সকলেই আপনাকে লাভ করেছেন সন্দেহ নেই; কিন্তু কালীয়র মতো কেউ তো আপনার শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করতে সমর্থ হয় নি। (১) মহাপ্রলয়ের সময় অনন্তদেব নিজের শরীরকে আপনার শয্যার জন্য প্রস্তুত করলে আপনি 'শেষশায়ী' রূপে লক্ষ্মীর কোলে নিজের শ্রীচরণ রেখে শয়ন করেন। এত করেও অনন্তদেব আপনার শ্রীচরণ লাভ করতে পারেন নি; (২) আপনার নাভি-কমল থেকে ব্রহ্মার উদ্ভব; তিনিও আপনার চরণ-স্পর্শের অধিকার পান নি; (৩) অন্যের আর কি কথা! আপনারই প্রেয়সী লক্ষ্মীদেবী নারায়ণরূপে আপনার চরণ সেবা করেন; তিনিও কৃষ্ণরূপে আপনার চরণ সেবার অধিকার লাভের জন্য বৃন্দাবনে তপস্যা করেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী যদিও জানতেন যে, স্বরূপত নারায়ণ এবং কৃষ্ণ অভিন্ন, তবুও কৃষ্ণের মাধুর্যের আকর্ষণে লক্ষ্মীদেবী তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু লক্ষ্মীর সেই কামনা পূর্ণ করেন নি; তিনি লক্ষ্মীকে চরণসেবার অধিকার না দিয়ে স্বর্ণরেখা রূপে তাঁর বক্ষে স্থান দিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শের অধিকার লাভ একান্তই দুর্লভ ; সেই দুর্লভ সম্পদ কালীয় নাগ কি করে লাভ করল?

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥
১০-১৬-৩৭ ॥

আপনার চরণে শরণাগত একান্ত ভক্তেরা স্বর্গলোক, পৃথিবীর আধিপত্য, ব্রহ্মপদ, পাতালের আধিপত্য, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কিংবা মুক্তি প্রার্থনা করেন না।

যারা ভগবানের কাছে স্বর্গলোক, পৃথিবীর আধিপত্য, পাতালের আধিপত্য, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কামনা করেন তারা সেই সব লাভ করেন বটে, কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হলেই তাদের আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। সুতরাং বিবেকবান ভক্ত কখনই এসব চায় না। তবে হ্যাঁ, মুক্তি চাইলে জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল একেবারে কেটে যাবে বটে কিন্তু ভক্তেরা মুক্তি চায় না; তারা কেবল ভগবানের সেবা

করতেই চায়। আপনার যারা শরণাগত, তাদের কাছে ব্রহ্মপদও তুচ্ছ; ভগবানে শরণাগতি লাভই জীবের সর্বসিদ্ধিপ্রদ; তাই বলছি, কালীয়র এই শরণাগতি লাভ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। একমাত্র আপনার কৃপাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

দেহাভিমানী ব্যক্তিরা, যারা সংসারে আবদ্ধ হয়ে আছে, তারা যদি আপনার চরণ সেবার ইচ্ছামাত্রও করে তাহলে সর্ববিধ সম্পদ তাদের লাভ হয়। শরণাগতি ছাড়া আপনার চরণ সেবার অধিকার লাভ করা যায় না। এই শরণাগতির জন্যই তমোভাবাপন্ন কোপন-স্বভাব এই সর্পরাজ কালীয় আপনার শ্রীচরণ লাভ করেছে।

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ১০-১৬-৩৯ ॥

নাগপত্নীরা বলছেন—আপনি স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ আপনি অচিন্ত্য, মন, বুদ্ধির অগোচর এবং সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ; সকলের হৃদয়ে আপনি অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করলেও আপনি সর্বব্যাপী। আপনি হচ্ছেন সকল ভূতের, আকাশাদির আশ্রয়স্বরূপ; সৃষ্টির পূর্বেও আপনি ছিলেন অর্থাৎ আপনিই সকলের আদি; আপনি সর্বকারণের কারণ এবং আপনিই কারণাতীত। আপনাতেই জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় হয় কিন্তু তাতে আপনার কোন পরিবর্তন হয় না; সর্বকারণের কারণ হয়েও আপনি নির্লিপ্ত । এই রকম যে বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং মন, বুদ্ধির অগোচর আপনি—সেই সর্বাত্মক আপনাকে আমরা প্রণাম করি।

জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ ॥ ১০-১৬-৪০॥

আপনি জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে পূর্ণ; আপনার মধ্যে স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নেই এবং আপনি অনন্ত শক্তিশালী। আপনি প্রাকৃত গুণরহিত, নির্বিকার এবং প্রকৃতির প্রবর্তক। আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ১০-১৬-৪৫ ॥

আপনিই বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ মূর্তিতে

অবস্থান করেন এবং আপনিই এঁদের মূল স্বরূপ; অতএব হে যদুনায়ক! হে ভক্ত পরিপালক ! আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

নাগপত্নীরা ভগবানের অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির কথায় বলছেন—আপনি মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি বহু মূর্তিতে লীলা করেছেন, আবার আপনিই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে বিরাজ করেন। আপনি এক হয়েও বহু, নির্গুণ হয়েও অনন্ত গুণময়।

অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ॥ ১০-১৬-৫১ ॥

পিতা যেমন তার পুত্রের অপরাধ অন্তত একবার ক্ষমা করেন, সেই রকম আপনি পালন কর্তা, আপনারই সৃষ্টি করা এই কালীয় নাগের অপরাধ আপনার ক্ষমা করা উচিত। হে শান্তমূর্তি ! কালীয়নাগ একে তামস প্রকৃতির, তার উপর আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ; সুতরাং আপনার ক্ষমার পাত্র।

অনুগৃহ্ণীষ্ব ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিপ্রাণঃ প্রদীয়তাম্ ॥
১০-১৬-৫২॥

হে ভগবন্! হে পরম দয়াল! কালীয়র মৃত্যু সময় উপস্থিত হয়েছে; তাকে ক্ষমা করুন; আমরা একে সর্পকুলে জন্মেছি, তার উপর স্ত্রীজাতি ; সুতরাং সাধুদের অনুগ্রহের পাত্র; আপনি কৃপা করে আমাদের পতির প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন।

নাগপত্নীরা বলছেন—আপনার বিষয়ে কালীয়র কোন জ্ঞান নেই ; তার উপর সে তমোগুণ প্রধান সর্পকূলে জন্মেছে; সুতরাং তার প্রকৃতি অনুযায়ীই সে অন্যায় করেছে; কিন্তু আপনি তো তার মস্তকে শ্রীচরণ রেখেছেন; সুতরাং সে তো আপনার ভক্ত হয়েই গেছে ; মুক্তি তার অবধারিত। সর্পদেহে সে অপরাধ করেছে , তার জন্য আপনি যদি তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেন, তবে তার বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। পরম অমঙ্গল হবে আমাদেরই, যারা ছোট কাল থেকেই আপনার ভক্ত। কালীয়র অবর্তমানে আমাদের যে কি গতি হবে তা কে জানে! হয়ত কোন মহাসর্প জোর করে আমাদের অধিকার করবে; তখন

হয়ত আমরা আপনার ভজনেও বঞ্চিত হব। তাই বলছি, আপনি কৃপা করে কালীয়কে ক্ষমা করলে আমাদেরই প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হবে। আপনি আর্তের আশ্রয়; আমরা আর্ত আপনার শরণাপন্ন, কালীয়র প্রাণদান করে আমাদের রক্ষা করুন।

বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥ ১০-১৬-৫৩ ॥

হে প্রভু! আমরা আপনার দাসী; এখন আমাদের কি করা উচিত, তাই বলুন। যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার আদেশ পালন করে, তারা সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হয়।

নাগপত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে কালীয় নাগের প্রাণ ভিক্ষা করে পরিশেষে বললেন—আমাদের অন্তরের প্রেরণায় আমরা এতক্ষণ যা বললাম, তাতে আমাদের যথার্থই কল্যাণ হবে কি না, জানি না। তাই বলছি—আপনি কৃপা করে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলুন, যাতে আমাদের মঙ্গল হবে; আপনার আদেশ পালনকেই আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করি।

নাগপত্নীদের ভক্তি এবং যুক্তিপূর্ণ কথায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত খুশি হলেন।

শুকদেব বললেন—নাগপত্নীরা এইভাবে ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করলে, তিনি তখন পদাঘাতে ভগ্ন-মস্তক এবং মূর্ছিত-প্রায় কালীয়র মস্তক থেকে নেমে দাঁড়ালেন। কালীয় নাগ তখন ধীরে ধীরে তার জীবনীশক্তি লাভ করে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জোড় হাতে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগল ঃ

বয়ং খলাঃ সহোৎপত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ।
স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্গ্রহঃ ॥ ১০-১৬-৫৬ ॥

হে নাথ! হে সর্বেশ্বর! আমরা জন্ম থেকেই খল প্রকৃতির, তমোভাবাপন্ন এবং কোপন-স্বভাবের; জীবের পক্ষে স্বভাবকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন এবং এই স্বভাব থেকেই যা চিরস্থায়ী নয়, সেই রকম 'দেহ গেহ' কে 'আমি আমার' বলে মনে করে জীব মায়ায় মোহিত হয়।

হে বিশ্বপিতা! আপনারই এই সৃষ্ট জগতে আমরা অতি কোপন-স্বভাব সর্প হয়ে জন্মেছি এবং আপনারই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে রয়েছি। সুতরাং আপনার

কৃপা ছাড়া, নিজের শক্তিতে কেমন করে আপনার মায়াকে অতিক্রম করব? এ যে একেবারেই অসম্ভব।

ভবান্ হি কারণং তত্র সর্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ।
অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্বিধেহি নঃ ॥ ১০-১৬-৫৯ ॥

আপনি সকলের স্বভাবই জানেন; আপনি সকলের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা; আপনিই এই মায়ার বন্ধনের এবং মুক্তির কারণ; সুতরাং আপনাকে বলার আর কি থাকতে পারে! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ , যা আপনার ইচ্ছা, তা-ই করুন।

কালীয় নাগ বলছে— আপনি বিশ্বস্রষ্টা এবং বিশ্বনিয়ন্তা; যাকে যে ভাবে যে স্বভাবের করেছেন, তাকে সেই ভাবে সেই স্বভাব অনুযায়ীই চলতে হবে। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় জন্মাই নি; আপনি আমাদের তমোভাবাপন্ন এবং পরদ্রোহী করেই সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং আমাদের সাধ্য কি, আমাদের স্বভাবকে অতিক্রম করি! স্বভাবকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না; এমন কি আপনিও আপনার স্বভাবকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সেইজন্য আমি আমার স্বভাব অনুযায়ী আপনাকে ভুলে, 'দেহ-গেহাদি' নিয়ে মত্ত হয়ে ছিলাম; আর আপনি আপনার কারুণ্য-স্বভাবের জন্য আমার গর্ব চূর্ণ করে আমাকে পদে স্থান দিয়েছেন।

আপনি আমাদের সৃষ্টি করে আমাদের মধ্যে বিষ দিয়েছেন; এখন আমরা অমৃত কোথায় পাব? আপনার ভক্তেরা, অশেষ গুণ-সম্পন্ন; তারা আপনার পূজা করেন, সকলের মঙ্গল কামনা করেন; কিন্তু আপনি আমাদের সর্বদোষের আকর করে সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং হিংসা, ক্রোধ, অপরের ক্ষতি করা প্রভৃতি ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কি থাকবে? আপনি আমাদের যা দিয়েছেন আমি তা-ই আপনাকে দিয়েছি; এতে আপনি তুষ্ট অথবা রুষ্ট যাই হোন, তাতে আমার কিছু বলার নেই, করারও নেই; আপনার যা-ইচ্ছা, তা-ই করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন গিরিশবাবুর থিয়েটারে গেছেন; সেদিন গিরিশবাবু নেশার ঝোঁকে ঠাকুরকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করে একরকম তাড়িয়েই দিলেন। যারা সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন, তারা গিরিশবাবুর ব্যবহারে

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ঠাকুরকে বললেন—আপনি আর কখনও ঐ মাতালটার কাছে যাবেন না। পরদিনও দক্ষিণেশ্বরে ঐ কথাই হচ্ছিল। এমন সময় রামবাবু দক্ষিণেশ্বরে আসতেই ঠাকুর পূর্ব দিনের ঘটনা বিবৃত করে বললেন—রাম, তুমি কি বল? রামবাবু বললেন—দেখুন, কালীয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল—প্রভু, তুমি আমায় বিষ দিয়েছ, এখন আমি অমৃত কোথায় পাব? তুমি যা দিয়েছ তাই দিয়েই তো তোমার অভ্যর্থনা করেছি। রামবাবুর কথা শুনে ঠাকুর বললেন—তবে চল তোমার গাড়িতেই একবার গিরিশের কাছে যাই। এদিকে গিরিশবাবুর নেশা কাটতেই তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে আহারাদি ত্যাগ করে কাঁদছিলেন। ঠাকুরকে হঠাৎ অযাচিতভাবে আসতে দেখে গিরিশ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাতর স্বরে বললেন—আজ যদি তুমি না আসতে তাহলে বুঝতাম যে, নিন্দা স্তুতিতে তোমার এখনও সমজ্ঞান হয় নি, তুমি এখনও পরমহংস নামের যোগ্য নও। এখন বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই; আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি তোমায় ছাড়ছি না। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে? কৃষ্ণ অবতারে যা ঘটেছিল, ভিন্ন পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ অবতারেও তা-ই ঘটল! গিরিশবাবু সেদিন ঠাকুরকে কালীয়নাগের মনের ভাবই ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন।

> ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্যমানুষঃ।
> নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মাচিরম্
> স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী ॥ ১০-১৬-৬০ ॥

শুকদেব বললেন—কালীয় নাগের ভক্তিপূর্ণ কথা শুনে এবং তার আত্মসমর্পণের ভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ, যিনি *কার্যমানুষঃ*—জগতের হিতের জন্য দেহধারণ করেছেন তিনি বললেন—হে কালীয় ! আমার এই লীলাভূমিতে তোমার আর থাকা উচিত নয়। তুমি অবিলম্বে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে তোমার পূর্বের বাসস্থান সমুদ্রে চলে যাও। এই যমুনা নদীর জল এবং তীরের গাছপালা, ফলফুল আমার অতি প্রিয় ব্রজবাসীরা এবং গবাদি পশুরা উপভোগ করুক।

এই শ্লোকে ভগবানকে বলা হয়েছে *কার্যমানুষঃ*—ভগবান দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনরূপ কার্যের জন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হন; তাই তিনি

কার্যমানুষ; অথবা যিনি স্বয়ং ভগবান হয়েও মানুষের মতো বাল্য লীলাদি-রূপ কার্য করেন, তিনি কার্যমানুষ; কিংবা যাঁর লীলাদি কার্য দেখে সাধারণ মানুষ প্রেম, ভক্তি লাভ করে যথার্থ 'মানুষ' পদবাচ্য হতে পারে তিনিই কার্যমানুষ।

যাই হোক শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—এই কালীয় হ্রদে আমি তোমার সাথে যে লীলা ব্যবহার করেছি—তোমাকে বিষমুক্ত করে তোমার বহু জন্মের ভগবৎ বিমুখতা দূর করে, তোমাকে আমার আপন করে নিয়েছি— এই সব কথা যারা এখানে এসে স্মরণ করবে এবং এই মহাতীর্থের জলে স্নান তর্পণাদি করবে, তারাও সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তি লাভ করবে।

শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে বললেন—হে কালীয়! তুমি যার ভয়ে সমুদ্র মধ্যস্থিত তোমার বাসস্থান রমণক দ্বীপ ছেড়ে এই হ্রদে এসে বাস করছিলে, সেই গরুড় তোমার মাথায় আমার পদচিহ্ন দেখে আর তোমার উপর কোন অত্যাচার করবে না। তুমি পূর্বে বিরাট মহাসমুদ্রে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে বাস করছিলে; গরুড়ের ভয়েই তুমি বৃন্দাবনের এই ক্ষুদ্র হ্রদে এসে বসবাস করছ। এতে একদিকে যেমন তোমার অসুবিধা হচ্ছে, অন্যদিকে তোমার সান্নিধ্যে আমার ব্রজজনদেরও অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং তুমি তোমার পূর্বের বাসস্থান সমুদ্রে গিয়ে আবার পূর্বের মতো স্বচ্ছন্দে বিহার কর; ভয় নেই, গরুড় আর তোমায় হিংসা করবে না। তোমার মাথায় আমার পদচিহ্ন দেখে, গরুড় তোমাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলে জেনে তোমার সমাদরই করবে। আমি যাকে অভয় দিয়েছি, তার ক্ষতি কে করতে পারে?

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! অতি অদ্ভুত-কর্মকারী লীলাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কালীয় নাগ সর্altবিধ ভয় থেকে মুক্ত হয়ে পত্নীদের সাথে পরম যত্নে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। তারা দিব্যবস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি শ্রদ্ধার্ঘ্য-রূপে নিবেদন করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে রমণক দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করল। এইভাবে নরদেহধারী লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যমুনা হ্রদের জল বিষমুক্ত হয়ে পরম মধুর অমৃত তুল্য হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি লীলার মধ্যেই তাঁর অপার করুণা প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া তাঁর সমস্ত লীলাই স্বমহিমায় এবং নূতনত্বে উজ্জ্বল। শকটাসুর, অঘাসুর,

বকাসুর, ধেনুকাসুর প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু বরণ করে কৃষ্ণেই বিলীন হয়েছিল। একমাত্র পূতনা ছাড়া অপর কেউ-ই কৃষ্ণের সেবাধিকার লাভ করেনি। পূতনাও রাক্ষসীদেহ ত্যাগ করে গোলোকে উপযুক্ত ধাত্রী-দেহ লাভ করে কৃষ্ণের সেবাধিকার পেয়েছিল। কিন্তু কালীয় নাগের প্রতি কৃষ্ণের কি অপার করুণা! অনন্ত জীবনের কুসংস্কার ও পাপরাশি দূর করে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে এই সর্পদেহেই পরম ভক্তে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তার মস্তকে শ্রীচরণ স্থাপন করে, কালীয়-মস্তক চির-অলঙ্কৃত করেছিলেন। অন্য কোন মহাভক্তের জীবনেই ভগবানের এই রকম কৃপা-বৈভবের প্রকাশ হয়নি।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর স্তবমালা গ্রন্থে লিখেছেন—হে কালীয় নিগ্রহকারিন্! আপনার কালীয় দমন লীলায়, কালীয় সর্প নিগৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু তাতেই আপনার নিগ্রহ কার্য শেষ হয়ে যায় নি। কালীয় থেকেও কুটিল এবং বিষময় আমার মন-রূপ মহাসর্প আমার হৃদয়-হ্রদে বাসা করেছে এবং বাসনা-রূপ শত ফণা বিস্তার করে সর্বদাই আস্ফালন করছে। কালীয় যেমন তার বিষযুক্ত দন্ত ও স্বভাবসিদ্ধ কুটিল গমনে সর্বদাই অপরের অনিষ্ট করত, সেইরকম আমার মন-রূপ মহাসর্পও বহুবিধ ভোগেচ্ছা-রূপ বিষদন্ত এবং অপরের অনিষ্ট চিন্তারূপ কুটিল গতিতে সর্বদাই পরের ক্ষতি করে যাচ্ছে। অতএব হে পরমবিক্রমশালিন্ ! আপনি যেমন বিচিত্র তাণ্ডবে কালীয়র শত ফণা ভগ্ন করে তাকে নির্জিত করেছেন এবং মাথায় আপনার চরণচিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছেন, সেইরকম আমার মন-রূপ মহাসর্পের শত বাসনার ফণা ভগ্ন করুন এবং মন-রূপী মহাসর্পের মাথায় আপনার চরণচিহ্ন অঙ্কিত করে আমায় চির কৃতার্থ করুন। আসল কথা, আমার চিরচঞ্চল মনকে শান্ত করে সেখানে আপনার পাদপদ্মের প্রতিষ্ঠা করুন।

শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন লীলা শ্রবণান্তে এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আর কি হতে পারে ?

২৪
রাসলীলা (ক)

একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—রাধাকৃষ্ণ মান আর না মান, ঐ টানটুকু লও। অর্থাৎ ভগবানের উপর শ্রীরাধার যে তীব্র অনুরাগ ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, সেই অনুরাগকে জীবনের আদর্শ কর। কথাটা হচ্ছে এই যে, ভগবানকে ভালবাসতে হবে, তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করতে হবে। একমতে আছে যে, গোপীরা পূর্ব জন্মে ঋষি ছিলেন; ভগবানকে পতিভাবে সেবা করবার জন্য তাঁরা বৃন্দাবনে গোপী হয়ে জন্মেছিলেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাঁরা সকলেই ছিলেন বিশেষ উচ্চ অধিকারিণী। ভক্তিশাস্ত্রে যত রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা আছে, গোপীরা রাসলীলাতে সে-সবের চরম অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ভগবানকে পতিভাবে আলিঙ্গন করে, তাঁর সঙ্গে নৃত্যগীতাদি করে গোপীরা যে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়েছিলেন, পরমহংস শিরোমণি শুকদেব সেই অমৃতময়ী কথাই রাসলীলাতে বর্ণনা করেছেন।

এখন 'রাস' কাকে বলে? গান-বাজনার সাথে যদি অসংখ্য নর্তকী একজন নটের সাথে মণ্ডলাকারে নৃত্য করে, তবেই তাকে 'রাসনৃত্য' বলা হয়। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব লীলা, স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত রাসনৃত্য করতে সক্ষম নয়।

রাসলীলা ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী লীলা হলেও এতে প্রাকৃত রসের, জাগতিক স্ত্রীপুরুষের মিলন-রসের সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের কোন জিনিস বুঝতে হলে, জাগতিক জিনিস দিয়েই বুঝতে হবে; তাছাড়া আমাদের বোঝবার আর কোন উপায় নেই। যেমন পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা জগতের সব কিছু অনুভব করে থাকি; কিন্তু আমাদের যদি শত ইন্দ্রিয় থাকত, তাহলে জগৎকে ভিন্নরূপে অনুভব করতাম। সেইরকম রাসলীলাকে যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিচার করি, তখন তার মধ্যে শৃঙ্গার রসের কথা দেখতে পাই। আসলে কিন্তু এর মধ্যে জাগতিক ভাবের লেশমাত্রও নেই। রাসলীলা হচ্ছে মুক্তিদায়িনী; ভক্তি এবং মুক্তি

রসই এই লীলার একমাত্র রস। তাছাড়াও মনে রাখা দরকার যে, আজন্ম সংসার-বিরাগী পরমহংস শিরোমণি শুকদেব এই লীলার কথা বলছেন মহারাজ পরীক্ষিৎকে, যাঁর কয়েকদিন পরেই মৃত্যু হবে; আর সেখানে উপস্থিত রয়েছেন অসংখ্য মুনি-ঋষিরা। ভোগের খরিদ্দার সেখানে কেউ ছিল না। সুতরাং ঐ পরিস্থিতিতে জাগতিক ভোগ-বিলাসের কথা কে-ই বা বলবে আর কে-ই বা তা শুনবে! ব্রহ্মর্ষি শুকদেব এই রাসলীলা বর্ণনা করবার পর শেষ কথা বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা যে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলবে অথবা শুনবে, সে হৃদ্‌রোগজনিত কাম থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করবে। এই প্রাপ্তি কি কখনও জাগতিক ভোগ-বিলাসের আলোচনায় লাভ করা সম্ভব?

রাসলীলার ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী প্রথমেই বলেছেন—ব্রহ্মাদি দেবতাদের পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে কামদেবের মনে এতই গর্ব হয়েছিল যে, সে নিজেকে ত্রিলোক-বিজয়ী বলে ভাবতে থাকে। মদনকে অবশ্য প্রশ্ন করা যায়—কেন? মদন-ভস্মের কথা কি ভুলে গেলে? উত্তরে মদনদেব হয়ত বলবেন—হাঁ, হরকোপানলে একবার আমি ভস্মীভূত হয়েছিলাম বটে; কিন্তু সেখানে শক্তির পরীক্ষা তো হয় নি। ধ্যান, জপ ইত্যাদি তো মদন-যুদ্ধের উপযুক্ত পরিবেশ নয়। শিব ধ্যান করছিলেন; হঠাৎ আমায় ভস্ম করে দেন। তাছাড়া আমার পঞ্চশরে শিব কামার্ত হন নি বটে, কিন্তু আমাকে তিনি উপেক্ষাও করতে পারেন নি। আমার বাণের প্রভাবে তিনি ধ্যানভ্রষ্ট এবং ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। সুতরাং শিবই কেবল আমার গর্ব হরণ করেন নি; আমার পঞ্চবাণে তারও যোগীশ্বরত্বের গর্ব চূর্ণ হয়েছিল। মদনের এই ত্রিলোক-বিজয়ী গর্ব চূর্ণ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় অসংখ্য গোপী পরিবৃত হয়ে এবং নিরালায় মাত্র একজন গোপীর সেবা করে যে অপার্থিব লীলা করেছিলেন, তাতে মদনের পূর্ণ পরাভব ঘটে। যে-মদন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করে, রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ সেই মদনকে মোহিত করেছিলেন। তাই শ্রীধর স্বামী বলেছেন — যদি কেউ বিভিন্ন কামনা-বাসনার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে চাও, তাহলে গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত মদনমোহনের চরণে শরণাগত হও এবং শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে রাসলীলা—মদনমোহন লীলার স্মরণ কর।

প্রশ্ন করা যেতে পারে—ভগবানের এই কাম-বিজয় লীলার উদ্দেশ্য কি?

একটি উদ্দেশ্য—মদনের গর্ব চূর্ণ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—পৃথিবীর প্রায় সকলেই কোন না কোন কাম্য বস্তু ভোগের জন্য লালায়িত। সুতরাং সর্বতোভাবে নিষ্কাম অতি দুর্লভ। যারা ভোগের কামনা ত্যাগ করেছেন, তারা অষ্টসিদ্ধির কামনা অথবা মুক্তির কামনা করে থাকেন। তাই কামের হাত থেকে প্রায় কারও নিস্তার নেই। কিন্তু যে ভক্ত সর্বতোভাবে নিষ্কাম হতে চায়, তার উপায় কি? সে কার শরণাগত হবে? দেবতাদের শরণ নিয়ে লাভ নেই কারণ তারা নিজেরাই কামের বশীভূত। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় গোপীদের সাথে বিহার করে দেখালেন যে, অজেয় কামকে জয় করতে হলে রাসবিহারীর চরণে শরণাগতিই একমাত্র উপায়।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১০-২৯-১॥

শুকদেব বললেন—শ্রীভগবান ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ হয়েও মল্লিকা প্রভৃতি শারদীয় কুসুমে সুশোভিত এই রাত্রি সমাগত দেখে, নিজের অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করে গোপীদের সাথে বিহার করতে ইচ্ছা করলেন।

রাসলীলার প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দই হলো 'ভগবান'। ভগবান কে? ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি মহাশক্তি যাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান তিনিই ভগবান। রাসলীলার প্রথমেই 'ভগবান' শব্দ ব্যবহার করে শুকদেব যেন ইঙ্গিত করছেন যে, এইটি সাধারণ লীলা নয়; এইটি ভগবানের অপার্থিব প্রেমময় লীলা; কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত ঐশী শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত মাধুর্য দিয়ে এই লীলা করেছেন।

এই শ্লোকের আসল কথা হলো—ভগবানও বিহার করতে ইচ্ছা করলেন। ভগবান, যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, আনন্দস্বরূপ, তাঁর আবার ইচ্ছা হবে কেন? তাঁর আনন্দ কি অপর কোন কিছুর উপর নির্ভর করে? তা হলে যে তিনি অপূর্ণ হয়ে যাবেন। ভগবান হচ্ছেন আনন্দস্বরূপ। ভক্তেরা ভগবানকে পেয়ে আনন্দ লাভ করেন, আর ভগবান নিজেকে বিতরণ করে আনন্দ পান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেমময়ী গোপীদের স্বরূপানন্দের আস্বাদন করাতে ইচ্ছা করলেন; ভক্তদের আনন্দদান করেই ভগবানের আনন্দ—এই তাঁর স্বভাব।

গোপীরা তো বহুদিন থেকেই শ্রীকৃষ্ণের সাথে বিহার করতে ইচ্ছা করছিলেন। গোপীদের কাত্যায়নী ব্রত, কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অতুলনীয় অনুরাগ দেখে, শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আগামী পূর্ণিমা রাত্রিতে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। সেইজন্য শ্লোকে 'ভগবানও' বিহার করতে ইচ্ছা করলেন—বলা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে—এই যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করবার ইচ্ছা করলেন, এটি কি কেবল গোপীদের মনোবাসনা পূরণের জন্য, না এতে তাঁরও আকাঙ্ক্ষা ছিল? যদি রাসলীলায় ভগবানের নিজের কোন ইচ্ছা না থাকত, কেবল গোপীদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই করতেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ইচ্ছা, অভিনয়ের মতো হয়ে যেত; তাহলে শ্লোকে আত্মনেপদ ব্যবহার না করে পরস্মৈপদ ব্যবহার করা হতো; অর্থাৎ রন্তুং *মনশ্চক্রে*—বিহার করতে ইচ্ছা করলেন, না বলে রন্তুং *মনশ্চকার*—গোপীদের বিহার করাতে ইচ্ছা করলেন।

এইরকম একটি প্রশ্ন ভাগবতেই রয়েছে। শুকদেব আত্মারাম, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হয়েও ব্যাসদেবের কাছে ভাগবত শুনলেন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভাগবত শোনালেন; কিন্তু কেন? তিনি তো আত্মারাম, নিজের আনন্দে সদাই পূর্ণ; আনন্দের জন্য তাঁর তো কোন কিছুরই দরকার হয় না। তাঁর ভাগবত-কথা শোনারও দরকার ছিল না এবং পরীক্ষিৎকে বলারও দরকার ছিল না। তবুও তিনি ভাগবত-কথা শুনলেন এবং অপরকে শোনালেন; কিন্তু কেন? উত্তরে বলা হয়েছে—ভগবান শ্রীহরির এমনই কোন বিশেষ গুণ আছে যে, আত্মানন্দে বিভোর মুনি-ঋষিরা, সকল প্রকার বিধি-নিষেধের পার হয়েও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন। কোন কারণ, কোন প্রয়োজন না থাকলেও তাঁরা শ্রীহরির ভজনা করেন। সেইরকম এখানেও, ভগবান নিত্যতৃপ্ত, আপ্তকাম, নির্বিকার, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হয়েও গোপীদের সাথে বিহার করলেন, কারণ গোপীদের প্রেমে, ভক্তিতে এমনই কোন অনির্বচনীয় গুণ আছে, যাতে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের সাথে বিহার করতে ইচ্ছা করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ষড়ৈশ্বর্য শক্তির দ্বারা জগতে সব কিছু অসম্ভবও সম্ভব করতে পারেন; সুতরাং আবার এই শ্লোকেরই অন্তিম শব্দ—যোগমায়াকে

আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করতে ইচ্ছা করলেন—বলার সার্থকতা কোথায়? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ভগবান যদি নিজে তাঁর ষড়ৈশ্বর্য শক্তির প্রকাশ করে রাসলীলা করতেন, তাহলে এই লীলার এত মাধুর্য হতো না এবং তিনি নিজেও আত্মহারা হয়ে এই লীলা করতে পারতেন না। গোপী-প্রেমে আত্মহারা হয়ে ভগবান যখন যা ইচ্ছা তা-ই করেছেন। যোগমায়া-শক্তি সেই সমস্ত ঘটনার সামঞ্জস্য করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সমস্ত ব্রজমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল; কিন্তু কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ গোপীরাই সেই আহ্বান শুনে কৃষ্ণের কাছে ছুটে এসেছিলেন। রাসলীলায় বহু ঘটনার মধ্যেই অলৌকিকত্ব রয়েছে। এই সমস্তই যোগমায়ার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমস্ত অঘটন ঘটাবার জন্য যদি কৃষ্ণকেই মনোনিবেশ করতে হতো, কিংবা তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে হতো, তা হলে তিনি আত্মহারা হয়ে গোপীদের প্রেমাস্বাদন করতে পারতেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া শক্তিকে আশ্রয় করে তাঁর উপর সমস্ত অঘটন ঘটাবার দায়িত্ব দিয়ে নিজে রাসলীলার মাধুর্য আস্বাদন করেছেন।

রাসলীলার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা করে কত লোক যে কত রকমের সংশয়, আপত্তি, মতবাদের উত্থাপন করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। রাসলীলা হচ্ছে নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সাথে মদনমোহনের মিলনোৎসব। চৈতন্যঘন প্রেমময় জ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাথে ভক্তি-স্বরূপা গোপীদের মিলন মহোৎসব —পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন। আবার এও বলা যায় যে, রাসলীলা হচ্ছে ভক্ত-ভগবানের আত্মসমর্পণের কাহিনী। ভক্ত রাসলীলায় একান্তভাবে ভগবানকে পেলেন এবং ভগবানও ভক্তের ইচ্ছায় ভক্তের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। সুতরাং রাসোৎসব হচ্ছে ভক্ত-ভগবানের সুমধুর অনির্বচনীয় মিলন উৎসব।

ভগবান দুর্বাসাকে বলেছিলেন—ভক্তেরা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তারাই আমার আত্মা। সুতরাং গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তাঁরই অংশ। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন আলাদা নয়, সেইরকম শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীরা পৃথক্ নয়; কেবল লীলা-বিলাসের জন্য বিভিন্ন দেহে লীলা করেছেন। শ্রীচৈতন্য অবতারে একইদেহে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা লীলা করেছেন; আবার শ্রীকৃষ্ণ অবতারে দুই দেহে রাধা ও কৃষ্ণ রূপে লীলা করেছেন; অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সাথে খেলা করেছেন। এই কথাটি রাসলীলায় বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ—তাঁর থেকে আলাদা নয়।

কথাটা হলো এই যে, চিন্ময় সর্বশক্তিমান প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের অর্থাৎ মানুষকে ভালবাসার জন্য বিহার করতে ইচ্ছা করলেন। ভক্তের কাছে এই তত্ত্বই হচ্ছে পরম তত্ত্ব এবং এর মধ্যেই রয়েছে মনুষ্য-জীবনের চরম সফলতার ইঙ্গিত। রাসলীলায় দেখা যায় যে, ভগবানকে ভালবাসলে তিনি সেই ভালবাসা গ্রহণ করেন এবং নিজেও ভালবাসেন। সুতরাং কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীদের হৃদয়ের সুরের সাথে যদি কোন সাধক তার হৃদয়ের সুর মেলাতে পারেন, তাহলে তিনিও রাসলীলাকে যথার্থভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবেন সন্দেহ নেই।

প্রেমপূর্ণ সেবার দ্বারা ভগবানকে আনন্দ দেবার জন্য গোপীদের উৎকণ্ঠা যখন চরমে পৌঁছেছে, সেই সময় ভক্তের বাসনা পূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেবা গ্রহণ করবার জন্য ইচ্ছা করলেন। তাঁর ইচ্ছার সাথে সাথেই সমস্ত পরিবেশ রাসলীলার উপযুক্ত রূপ ধারণ করল। পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমস্ত ব্রজধাম আলোকিত হয়েছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের আহ্বান করবার জন্য মধুর স্বরে বাঁশী বাজালেন। ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধিকারী সেই বাঁশী শুনে কৃষ্ণই যাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছেন সেই গোপীরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে একে অপরকে কৃষ্ণাভিসারের কথা না জানিয়েই ছুটে চললেন সেই প্রেমময়ের কাছে।

ভগবান তো আমাদের সব সময়ই ডাকছেন; কিন্তু আমরা তাঁর আহ্বান শুনতে পাই না; তার কারণ, শোনবার মতো আমরা তৈরি হইনি। মন যে পরিষ্কার নয়। লোহাতে কাদা মাখানো থাকলে চুম্বকে টানে না। কাদা ধুয়ে দিলেই চুম্বকে টেনে নেয়। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধও এইরকম। দেহাভিমান ত্যাগ করে শুদ্ধ হতে পারলেই ভগবানের আকর্ষণ বোঝা যাবে—তাঁর বাঁশী শোনা যাবে।

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ ১০-২৯-৫ ॥

ঐ সময় কোন গোপী গো-দোহন করছিলেন। কৃষ্ণের বেণুরব শোনা-মাত্র তিনি গো-দোহন ত্যাগ করেই চললেন কৃষ্ণের কাছে। কেউ দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, কেউ বা গোধূম রান্না করছিলেন। চুলা থেকে সেগুলো নামাবারও তাঁদের সময় হলো না; ঐগুলি সেই সেই অবস্থায় রেখেই ছুটে চললেন। এখানে ভগবানের আহ্বানে গোপীদের কাম্যকর্ম ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥
১০-২৯-৬॥

কোন গোপী আত্মীয়-স্বজনদের পরিবেশন করছিলেন, কেউ বা শিশুদের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, কেউ বা পতিসেবা করছিলেন, আবার কোন গোপী আহার করছিলেন। এঁরা সকলেই আপন আপন কর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে ছুটে গেলেন।

ভগবানের আহ্বান শুনে স্ত্রীলোকের পরমধর্ম যে পতিসেবা, তাও এঁরা ভুলে গেলেন। দেহধারণের ইচ্ছাও এঁরা ত্যাগ করেছেন; তাই না খেয়েই চলে গেলেন। এঁরাই ভগবানের নিত্যসিদ্ধা পরিচারিকা। ভোজন ত্যাগ করে আচমন না করেই গিয়েছিলেন; এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভগবানে আবিষ্টচিত্ত ভক্তদের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার থাকে না।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ১০-২৯-৭ ॥

কোন গোপী চন্দন দিয়ে অঙ্গরাগ করছিলেন; কেউ শরীর মার্জন করছিলেন আবার কেউ বা চোখে অঞ্জন লাগাচ্ছিলেন; এমন সময় ভগবানের আহ্বান এল—'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো / আকুল করিল মন প্রাণ'—তাই তাঁরা সব কিছু ছেড়ে চললেন কৃষ্ণের কাছে। তাড়াতাড়িতে তাঁদের বস্ত্র অলংকার সব এলোমেলো হয়ে গেল; অর্থাৎ কেউ পরিধেয় বসন উত্তরীয় করেছেন, উত্তরীয় বসন পরিধান করেছেন, কানের অলঙ্কার নাকে লাগিয়েছেন ইত্যাদি।

ভগবানের জন্য এখানে লজ্জা ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। ভক্তের হৃদয়

হচ্ছে ভগবানের বৈঠকখানা; যার হৃদয় যত বেশি পরিষ্কার অর্থাৎ বাসনা কামনা কম, ভগবানের প্রকাশ সেখানেই তত বেশি। গোপীদের হৃদয় ছিল সংসার-শূন্য; তাই ভগবানের আহ্বানে তাঁদের সংসারের যাবতীয় জিনিস—ধর্মাধর্ম বিচার, শুদ্ধাশুদ্ধ বোধ, লৌকিক ব্যবহার, দেহাভিমান—সব তুচ্ছ হয়ে গেল।

গোবিন্দ গোপীচিত্ত অপহরণ করেছিলেন; তাই পতি, পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধুরা নিবারণ করলেও তাঁরা নিবৃত্ত হলেন না। কয়েকজন গোপী কিন্তু আপন আপন পতি, পিতা প্রভৃতির প্রতিবন্ধে রাসস্থলে যেতে পারলেন না। তাঁরা তখন গৃহমধ্যে থেকেই চক্ষু মুদ্রিত করে কৃষ্ণের ধ্যানে একেবারে ডুবে গেলেন।

গোপীদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী ছিল—নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। যাঁরা অনাদি কাল থেকে নিত্যই শ্রীভগবানের সাথে মিলিত রয়েছেন, সাধনের দ্বারা গোপীদেহ প্রাপ্ত হন নি, তাঁরা নিত্যসিদ্ধা নামে প্রসিদ্ধ; যেমন শ্রীরাধা, ললিতা প্রভৃতি। আবার ত্রেতাযুগে যখন রামচন্দ্র সীতাদেবীর সাথে দণ্ডকারণ্যে বাস করছিলেন, সেই সময় সেখানে কিছু গোপাল-উপাসক ঋষি ছিলেন। তাঁরা সীতাদেবীর মতো তাঁদের ইষ্টদেবতার সেবা করতে বাসনা করেছিলেন। এঁরাই পরে ব্রজধামে গোপীদেহে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন; তাই এঁরা হলেন সাধনসিদ্ধা। আবার এই সাধনসিদ্ধাদের মধ্যে দুইটি ভাগ ছিল। একদল নিত্যসিদ্ধাদের সমবয়স্কা এবং তাঁদের সাথে সখিভাবে আবদ্ধ। এঁরা নিত্যসিদ্ধাদের সংস্পর্শে এসে ভগবানের উপর নির্মল ভালবাসা লাভ করেছিলেন। সুতরাং নিত্যসিদ্ধাদের মতো এঁদেরও পতি এবং আত্মীয়-স্বজনের উপর মমতা ছিল না। এঁরাই আত্মীয়, বন্ধুর নিবারণ উপেক্ষা করে কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন। নিত্যসিদ্ধাদের কোন বাধাই হয়নি। আর যাঁরা বয়োধিকা তাঁদের নিত্যসিদ্ধাদের সাথে সখিত্ব না হওয়াতে ভগবানের উপর নির্মল প্রেম জন্মেনি; সেইজন্য আত্মীয়স্বজনের উপর তাঁদের কিছুটা মমতা ছিল; এঁরাই রাসস্থলে যেতে না পেরে গৃহমধ্যে থেকেই কৃষ্ণের ধ্যানে একেবারে ডুবে গেলেন। ভাগবতকার দেখিয়েছেন যে, জাগতিক বিষয়ে কিছুমাত্র মমতা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন—সূতার মধ্যে একটুও ফেঁসো থাকলে সুচে পরানো যায় না।

যাঁরা রাসস্থলে যেতে পারলেন না, তাঁরা গভীর ধ্যানের মধ্যে কৃষ্ণের বিরহ-জনিত দারুণ দুঃখ ভোগ করার ফলে তাঁদের সমস্ত সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হয়ে গেল। আবার হৃদয়মধ্যে ধ্যানেতেই কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাঁরা যে পরম সুখ অনুভব করলেন, তাতেই তাঁদের সঞ্চিত পুণ্যও ক্ষীণ হয়ে গেল। এই ভাবে একই সঙ্গে তাঁদের সঞ্চিত পাপ এবং সঞ্চিত পুণ্য—দুটোই নষ্ট হয়ে যাওয়াতে তাঁদের প্রারব্ধ কর্মেরও ক্ষয় হয়েছিল; এর ফলে সেই সব গোপীরা তখনই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গুণময় দেহ ত্যাগ করে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলিত হলেন।

এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিজের কাছে সমাগত দেখে কৌতুকময় বাক্যে তাঁদের বিহ্বল করার জন্য বলতে লাগলেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যে সাধককে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। ভগবান গোপীদের মনোভাব পরীক্ষা করে দেখতে চান—গোপীদের কাছে ভগবানই বড় না সংসারের আকর্ষণ বড়। ভাগবতকার দশটি শ্লোকে কৃষ্ণের পরিহাস-বাক্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এর প্রত্যেকটি শ্লোকে নিবারণ ও অনুমোদন—দুইরকম অর্থ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিবারণ করে ব্রজে ফিরে যেতে বলছেন। তিনি নানা ছলে তাঁদের নিবারণ করলেও, অন্তরে তাঁদের আগমন অনুমোদনই করেছেন।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্ ॥ ১০-২৯-১৮ ॥

হে ভাগ্যবতীগণ! তোমাদের আগমন শুভ হয়েছে তো? বল তো তোমাদের কি প্রিয় কাজ করব? ব্রজের মঙ্গল তো? তোমাদের এখন এখানে আসার কারণই বা কি হতে পারে?

ভগবান নিজেই আহ্বান করেছেন, আবার নিজেই জিজ্ঞাসা করছেন তাঁদের আসবার কারণ! বাইরে থেকে শুধু রহস্যই মনে হচ্ছে। কিন্তু অনুমোদন অর্থে ভগবান বলছেন—আমি বাঁশী বাজিয়ে তোমাদের আহ্বান করা মাত্র তোমরা এখানে শুভাগমন করেছ, এতে ভালই হয়েছে। বহুজন্মের সুকৃতির ফলে আমাকে এইভাবে লাভ করা যায়। সুতরাং তোমরা ভাগ্যবতী; তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। তোমাদের আগমনেই ব্রজের মঙ্গল সূচিত হয়েছে; এখন বল কি করে তোমাদের খুশি করব।

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১০-২৯-১৯ ॥

নিবারণ অর্থে কৃষ্ণ বলছেন যে, রাত্রি অতি ভয়ঙ্কর সময়, তার উপর হিংস্র জন্তুরা সব এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সময় স্ত্রীলোকের এখানে থাকা উচিত নয়; অতএব তোমরা শিগ্‌গির ব্রজে ফিরে যাও।

ভগবানকে পাবার জন্য ভক্ত যখন নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়, তখনই তাঁকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ তাই গোপীদের পরীক্ষা করে বলছেন—আমার জন্য তোমরা নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে এখানে এসেছ কেন? দেখছ না, এই বন অতি ভয়ঙ্কর। অনুমোদন অর্থে কৃষ্ণ বলছেন—পূর্ণচন্দ্রে শোভমান এই মনোরম রাত্রি অঘোররূপা—চন্দ্রের আলোয় অন্ধকার দূর হয়েছে; সুতরাং এই বন ভয়ঙ্কর-দর্শন নয় এবং *অঘোর সত্ত্বনিষেবিতা*—অহিংস্র প্রাণিগণে সমাকুল। বৃন্দাবনের ভাবই এই যে, এখানে প্রাণীরা পরস্পর মিত্রভাবে বাস করে । সুতরাং এখানকার জীবজন্তুরা ভীতিপ্রদ নয়। অতএব *ন প্রতিযাত ব্রজং*—ব্রজে ফিরে যেও না, আমার কাছেই অবস্থান কর, কারণ তোমাদের মতো ভগবৎপ্রাণা সাধিকারাই আমার সান্নিধ্য পাবার যোগ্য।

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥ ১০-২৯-২০ ॥

নিবারণ অর্থে কৃষ্ণ বলছেন—তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিরা নিশ্চয়ই তোমাদের অনুসন্ধান করছে; আত্মীয়-স্বজনদের মনে ভয় উৎপাদন করো না; তাদের সন্তোষ বিধান করাই সকলের কর্তব্য, বিশেষত স্ত্রীলোকের পক্ষে।

কৃষ্ণ এখানে গোপীদের কর্তব্য ভঙ্গের ভয় দেখালেন; ভাবটা এই যে, তিনি দেখতে চান গোপীদের কাছে লৌকিক ব্যবহারই বড়, না ভগবান বড়। অনুমোদন অর্থে বলছেন—মাতা, পিতা প্রভৃতি তোমাদের না দেখে অন্বেষণ করছে না; কেন না তোমরা তো তাদের উপেক্ষা করেই চলে এসেছ। সুতরাং বন্ধুদের কাছ থেকে ভয় পেয়ো না—এখন এখানেই থাক।

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্ ॥ ১০-২৯-২১ ॥

কৃষ্ণের কাছ থেকে বার বার ব্রজে ফিরে যাবার কথা শুনে গোপীরা ভাবছেন—যাঁর জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এলাম, এখন তিনিই কি না আমাদের ফিরে যেতে বলছেন! এই ভেবে গোপীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ রহস্য করে বলছেন ঃ

নানা কুসুমে সমাকীর্ণ, পূর্ণচন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত এবং যমুনার মৃদুমন্দ বাতাসে কম্পমান লতাপল্লবের দৃশ্য অতি মনোরম; তা তোমাদের এই মনোরম বন-শোভা তো দেখা হলো; এইবার ব্রজে ফিরে যাও।

অনুমোদন অর্থে বলছেন—বৃন্দাবনের শোভা এমনিতেই মনোহর; তার উপর এই পূর্ণিমার রাত্রি, চারিদিকে যমুনার জল, মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। এ সবই সাধকের মনকে ভগবৎ-ভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তার উপর আমি এখানে রয়েছি; সুতরাং আর ব্রজে ফিরে যেও না।

তদ্যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥ ১০-২৯-২২ ॥

নিবারণ অর্থে কৃষ্ণ বলছেন—তোমরা অবিলম্বে ব্রজে ফিরে গিয়ে পতিদের সেবা কর; তাছাড়া গোবৎস এবং শিশুরা যে কাঁদছে; সুতরাং তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে শিশুদের দুধ পান করাও এবং গাভীদের দোহন কর।

অনুমোদন অর্থে বলছেন—ভগবানই তো সর্বজগতের পতি; সেই পরমপতি যখন তোমাদের কাছেই রয়েছেন তখন তাকে ফেলে পার্থিব পতির সেবা করতে যাওয়া তো উচিত নয়; আর ভেবো না, গোবৎস এবং শিশুরাও কাঁদছে না; সুতরাং তোমাদের ব্রজে ফিরে যাবার কোনই দরকার নেই।

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ ॥ ১০-২৯-২৩ ॥

গোপীদের প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যই যেন কৃষ্ণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করে তাদের আরও ক্ষোভিত করে তুললেন। তিনি বললেন

—আপনারা যদি আমার প্রতি স্নেহে আকৃষ্ট হয়েই এসে থাকেন, তবে ভালই করেছেন, সন্দেহ নেই; কেন না জীব মাত্রই আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

এখানে গোপীদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাবার জন্য যেন কৃষ্ণ তাঁদের 'আপনারা' বলে সম্বোধন করলেন। অতি প্রিয়জনকে কেউ 'আপনি' বলে না; এতে সম্মান থেকে আঘাতই বেশি করা হয়।

অনুমোদন অর্থে বলছেন—আমার প্রতি তোমাদের যে প্রীতি রয়েছে, তাতেই আকৃষ্ট হয়ে তোমরা এখানে এসেছ; সুতরাং তোমাদের আগমন সমুচিতই হয়েছে ; বিশেষত সকল প্রাণীই আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে ; অতএব তোমাদের মতো ভগবৎ-প্রাণারা যে আমার কাছে আসবে, এ তো বলাই বাহুল্য।

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্ ॥ ১০-২৯-২৪ ॥

নিবারণ অর্থে কৃষ্ণ বলছেন—হে কল্যাণীগণ! অকপটে নিজ নিজ পতি, আত্মীয়-স্বজন এবং সন্তান-সন্ততির প্রতিপালনই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম; সুতরাং তোমরা ব্রজে ফিরে গিয়ে সেই ধর্মেরই আচরণ কর।

অনুমোদন অর্থে বলছেন—তোমরা ব্রজবালা; সুতরাং অকপটে স্বামী ও আত্মীয়ের সেবা এবং সন্তান প্রতিপালন করা তোমাদের পক্ষে 'পরধর্ম', নিজের ধর্ম নয়; সাধারণের ধর্মানুষ্ঠান তোমাদের জন্য নয়। আমার বিষ্ণুত্ব এবং তোমাদের বৈষ্ণবীত্বের জন্য আমার ভজনাই তোমাদের স্বকীয় ধর্ম।

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ১০-২৯-২৫ ॥

নিবারণ অর্থে কৃষ্ণ বলছেন—পতি যদি অপাতকী হয়, তাহলে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের অভিলাষী স্ত্রীরা দুঃশীল, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, অসমর্থ, রোগী অথবা দরিদ্র পতিকেও ত্যাগ করবে না।

অনুমোদন অর্থে বলছেন—আমি জগৎপতি এবং তোমরাও আমাকে পতিরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছ। শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুযায়ী যখন দুঃশীল,

দুর্ভাগ্য, দরিদ্র এবং রোগগ্রস্ত পতিকেও ত্যাগ করা নিষেধ, তখন ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ, সর্বদোষশূন্য পরমপতি আমাকে ত্যাগ করে কি করে ব্রজে ফিরে যাবে? সুতরাং তোমরা এখানে আমার কাছেই অবস্থান কর।

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ ১০-২৯-২৬ ॥

কৃষ্ণ বলছেন—কুলনারীর উপপতির সংসর্গ, স্বর্গ-প্রাপ্তির প্রতিকূল, যশোনাশক, তুচ্ছ, কষ্টদায়ক, ভয়াবহ এবং সর্বত্র নিন্দিত।

অনুমোদন অর্থে বলছেন—'উপপতি' অর্থাৎ যে স্ত্রীর সমীপে পতি বর্তমান, সেই স্ত্রীকে উপপতি বলে; তার যে ভাব, সেই ভাবকে বলা হচ্ছে 'ঔপপত্য'। সুতরাং ঔপপত্য বলতে সাংসারিক পতির সান্নিধ্য বোঝাচ্ছে। পরমার্থ দৃষ্টিতে কৃষ্ণই পরমপতি; সুতরাং তাঁর সেবা করাই কর্তব্য, পার্থিব পতির সেবা কষ্টসাধ্য।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ১০-২৯-২৭ ॥

কৃষ্ণ বলছেন—আমার কথা-শ্রবণ, রূপ-দর্শন, ধ্যান এবং নাম-সংকীর্তনে যে তন্ময়তা ও অনুরাগ জন্মে, আমার কাছে থাকলে সে-রকমটি হয় না; অতএব তোমরা গৃহে ফিরে যাও।

অনুমোদন অর্থে বলছেন—আমার কাছে থাকলে আমার প্রতি যে ভাবোদয় হয়, সেই রকমটি শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও কীর্তনে হয় না। তাই বলছি *ন প্রতিযাত গৃহান্*—গৃহে আর ফিরে যেও না।

কৃষ্ণের এই সব মোহ উৎপাদক কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি দেখতে চান গোপীরা তাঁকে কতটা ভালবাসে। ভগবানকে ভালবেসে ভক্তের মনের অবস্থা কি রকম হয়, গোপীদের হৃদয়ের যথার্থ ভাবটা কি, তা-ই জানবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ঐ সব কথা বলেছেন। গোপীরা তাঁর কথার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে না পেরে নিবারণ-মূলক অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ভাবলেন—তাহলে তো আমরা সত্যই তাঁর সেবার যোগ্য নই ; তারই জন্য তিনি আমাদের উপেক্ষা করছেন। যাঁর জন্য পতিকূল, ধর্ম, লোকলজ্জা

এমন কি নিজেদের জীবন পর্যন্ত তুচ্ছ করে এসেছি, সেই তিনিই কি না আমাদের উপেক্ষা করছেন! এই অবস্থায় মানুষের দুঃখ রাখবার আর জায়গা থাকে না। গভীর মর্মান্তিক দুঃখে তাঁরা তখন ভাবছেন—এখন কি করব? ব্রজে ফিরে যাব, না যমুনায় প্রাণ বিসর্জন দেব?

শুকদেব বললেন—গোবিন্দের মুখে এই দারুণ অপ্রিয় কথা শুনে, গোপীরা ভগ্ন-মনোরথ ও বিষণ্ণ হলেন; তাঁদের চিন্তার সীমা পরিসীমা রইল না।

শুকদেব এর পর দুইটি শ্লোকে গোপীদের দুঃখের কথা বর্ণনা করেছেন। তা শুনে মনে হয় যে, গোপীদের কথা ভেবে তাঁদের দুঃখে তিনি নিজেও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। সাধকেরা জানেন ভগবৎ-বিচ্ছেদের কী মর্মান্তিক জ্বালা! তাই শুকদেব ঐ ভাবে গোপীদের দুঃখের বর্ণনা করেছেন! হৃদয় সংক্ষুব্ধ না হলে ঐ রকম বর্ণনা করা সম্ভব হয় না।

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্য-
দ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্ত্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্ ॥ ১০-২৯-২৯ ॥

শোকের আবেগে গোপীদের উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়তে লাগল এবং সেই উষ্ণ নিঃশ্বাসে তাঁদের সুন্দর অধর মলিন হয়ে গেল; নয়ন জলে তাঁদের চোখের কাজল ধুয়ে বুক ভেসে যেতে লাগল। তাঁরা তখন অধোবদনে নিরুত্তরে পা দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগলেন। অসহ্য দুঃখে মানুষের এমন অবস্থাই হয়; তখন আর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না; কেবল চোখ দিয়ে জলই পড়তে থাকে।

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভ গদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ১০-২৯-৩০ ॥

কৃষ্ণানুরক্তা গোপীরা, যাঁরা ভগবানের জন্যই সমস্ত বাসনা-কামনা ত্যাগ করেছেন, তাঁরা প্রিয়তমের মুখে এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে, চোখের জল মুছে কিঞ্চিৎ কোপবশে গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন।

গোপীরা ভাবলেন—এই শরীর তো আর থাকবে না; কৃষ্ণগত-প্রাণা আমাদের যখন তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন আর কি অবলম্বন করে বেঁচে থাকব? সুতরাং যাবার আগে আমাদের হৃদয়ের কথা তাঁকে বলে যাই। কৃষ্ণ তো এইটিই চাইছিলেন; তিনি যে ভক্তহৃদয়-কথা শ্রবণ-লোভী। শ্রীরাধিকার ভগবৎ-প্রেম এবং তাঁর হৃদয়ের ভাব প্রত্যক্ষ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবান ভক্তের হৃদয়কথা শুনতে ভালবাসেন।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ১০-২৯-৩১ ॥

গোপীরা বললেন—হে প্রাণবল্লভ! আমরা সমস্ত বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করেছি; সেই আমাদের এমন নিষ্ঠুর কথা বলা তো তোমার উচিত নয়। আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন মুমুক্ষুদের আশ্রয় দেন, সেই-রকম তুমিও আমাদের মনোরথ পূরণ কর।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে সাক্ষাৎ ভগবান বোধেই আশ্রয় নিয়েছেন। ইন্দ্রিয়-সুখ তুচ্ছ না হলে ব্রহ্মানুভূতি হয় না—এই তো শ্রুতির সিদ্ধান্ত। গোপীরা সবিগ্রহ পরব্রহ্মকে পাবার আশা করেছেন; তাই বলছেন—আমরা সর্ব বিষয় ত্যাগ করেই তোমার চরণ আশ্রয় করেছি।

যৎ পত্যপত্য-সুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ১০-২৯-৩২ ॥

হে কৃষ্ণ! বুঝলাম ধর্মশাস্ত্রে তুমি দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়েছ। তুমি বললে যে, পতি-পুত্র, সুহৃদ-বর্গের সেবা করা স্ত্রীজাতির স্বধর্ম। বেশ, আমরা তা মেনে নিলাম। কিন্তু তুমিই তো ঈশ্বর; অতএব তোমার ঐ উপদেশের বিষয়ও তো তুমি অর্থাৎ তোমার সেবাতেই সকলের সেবা সিদ্ধ হয়; কারণ তুমিই না নিখিল দেহধারীর আত্মা।

তুমি প্রত্যেক জীবদেহে চৈতন্যরূপে রয়েছ; অতএব পতির মধ্যেও তুমি, পুত্রের মধ্যেও তুমি, সুহৃদ-বর্গের মধ্যেও তুমি। সুতরাং তোমার সেবা করলেই পতি, পুত্র, সুহৃদ্-বর্গের সেবা আপনা-আপনিই হয়ে যাবে। আবার শ্রুতিতেও রয়েছে পতির নিমিত্ত পতি প্রিয় হয় না; আত্মার জন্যই পতি প্রিয় হয়ে থাকে। সেই পরমাত্মাই তুমি, বিগ্রহধারণ করে এসেছ।

কৃষ্ণ লৌকিক ধর্ম, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী গোপীদের পতি-পুত্রের সেবা করতে বলেছিলেন। গোপীরা উল্‌টে কৃষ্ণকেই সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব শুনিয়ে দিলেন। কৃষ্ণকে ধর্মের দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলে কটাক্ষ করে, তাঁদের গায়ের ঝালও কিছুটা মিটিয়ে নিলেন।

গোপীরা প্রার্থনা করে বলছেন—তুমি সকলের আত্মস্বরূপ; সুতরাং নিত্যপ্রিয়। সেইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তোমাকেই প্রীতি করে থাকেন। পতি-পুত্রাদি কেবল দুঃখ-দায়ক; তাদের কাছ থেকে আত্যন্তিক সুখ লাভ হয় না; সুতরাং তাদের প্রয়োজন নেই। হে কমললোচন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমাকে পাবার জন্য আমরা এতদিন ধরে আশা করে আছি; সে আশা তুমি ধূলিসাৎ করে দিও না।

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা ॥ ১০-২৯-৩৪ ॥

আমাদের যে মন পূর্বে আনন্দের সাথে গৃহকার্যে নিযুক্ত থাকত, তুমি আমাদের সেই মনকে অপহরণ করেছ। যে হাত দিয়ে গৃহকর্ম করতাম, সে হাতও তোমা কর্তৃক অপহৃত হয়েছে; কারণ তুমিই তো হৃষীকেশ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। আমাদের পা তোমার চরণ-প্রান্ত ছেড়ে এক পাও নড়তে চাইছে না; তবে বল তো কেমন করে ব্রজে ফিরে যাব? আর মনকে এখানে ফেলে রেখে ব্রজে গিয়েই বা কি করব?

হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্য দৃষ্টি দেখে এবং সুমধুর বাঁশী শুনে অন্তর্যামী তোমাকে পাবার জন্য আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়েছে। আমাদের এই ব্যাকুলতা দূর করে তুমি আমাদের গ্রহণ কর; যদি তা না কর, তবে

তোমারই বিরহানলে আমাদের এই দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমরা ধ্যানযোগে এই শরীর ত্যাগ করে তোমারই চরণপ্রান্তে উপনীত হব।

ভগবানের উপর কতটা ভালবাসা হলে মানুষ তাঁকে না পেয়ে শরীর ত্যাগের কথা ভাবতে পারে! গোপীদের কাছে কৃষ্ণ ছাড়া আর সব কিছুই নিষ্ফল। তাই তাঁরা ভাবছেন যে, এই শরীরে যদি ভগবান-লাভ না হয়, তবে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব ধ্যানে শরীর ত্যাগ করে ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করাই শ্রেয়।

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ কৃতেঽন্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ১০-২৯-৩৭ ॥

গোপীদের মধুরভাবে কৃষ্ণসেবা করতে দেখে লক্ষ্মীদেবীও নারায়ণকে ঐ-ভাবে পাবার জন্য বৃন্দাবনে তপস্যা আরম্ভ করেন। তপস্যার কারণ শুনে ভগবান বললেন যে, ঐশ্বর্যের সাথে কোনরকম সম্পর্ক থাকলে গোপীভাবে ভগবৎ সেবা সম্ভব নয়। গোপীরা ধনজন সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন; তাই না আমায় লাভ করেছেন। কিন্তু তুমি হচ্ছ নিখিল সম্পদের অধীশ্বরী; অতএব গোপীভাব তোমার জন্য নয়। কিন্তু তোমার এই তপস্যাও বিফলে যাবে না; তুমি সুবর্ণরেখারূপে আমার বক্ষে অবস্থান করবে। সেই অবধি লক্ষ্মী সুবর্ণ-রেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল অধিকার করে আছেন।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে গোপীরা বলছেন—ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁর কৃপা-কটাক্ষ লাভের জন্য সদাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, সেই লক্ষ্মীদেবী তোমার বক্ষে স্থান পেয়েও সপত্নী তুলসীর সাথে ভক্তসেবিত তোমার চরণরেণু প্রার্থনা করেন। আমরাও তোমার চরণসেবার অধিকার প্রার্থনা করি।

গোপীরা আরও বলছেন—তোমার কুন্তল শোভিত গণ্ডস্থল, সুধামিশ্রিত অধর, সহাস্য দৃষ্টি, অভয়প্রদ বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীর আনন্দদায়ক বক্ষঃস্থল দেখে আমরা তোমার দাসী হতে এসেছি।

জগতের লোক প্রভুত্ব করতেই চায়; দাসত্ব কেউ চায় না। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিজের ইষ্টের সেবায় যে সুখ—যে আনন্দ পাওয়া যায় তেমনটি আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥ ১০-২৯-৪১ ॥

গোপীরা প্রার্থনা করছেন—আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন সুরলোকের পালক, সেইরকম ব্রজবাসীদের ভয় এবং বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ। অতএব হে আর্তবন্ধু! হে দীননাথ! আমাদের সন্তপ্ত বক্ষে এবং মস্তকে তোমার করপদ্ম অর্পণ করে আমাদের মনস্তাপ দূর কর।

প্রেমমার্গের যারা সাধক, পুরুষ হলেও তাদের গোপীদের অবস্থাই হয়। শ্রীরাধার ভাবে শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণের জন্য পাগল হয়েছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, মীরাবাঈ ভক্ত রূপ গোস্বামীর সাথে একবার দেখা করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বিবাগী রূপ গোস্বামী স্ত্রীলোক বলে মীরাবাঈয়ের সাথে দেখা করেন নি। তাতে মীরাবাঈ বলেছিলেন—রূপ দেখছি এখনও পুরুষ হয়েই আছে; অতএব আমিও তার সাথে দেখা করতে চাই না। ভক্তিশাস্ত্রে বলে যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি। অতএব পুরুষাভিমান থাকতে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না।

শুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ নিজের আনন্দে নিজেই পূর্ণ; আনন্দের জন্য তাঁর অপর কোন কিছুরই দরকার হয় না। সেই তিনি গোপীদের এই কাতরোক্তি ও প্রার্থনা শুনে দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের সাথে বিহার করলেন।

ভক্তগণের অভীষ্টদায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রফুল্লমুখী গোপীবৃন্দে পরিবৃত হয়ে নক্ষত্র-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করতে লাগলেন।

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥ ১০-২৯-৪৪ ॥

শতশত গোপীবৃন্দের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ তখন বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে গোপীদের সাথে বন অলঙ্কৃত করে বিচরণ করতে লাগলেন। গোপবালারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলাদি বর্ণনা করে গান আরম্ভ করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। যমুনার পারে সুশীতল বালুকার উপর যেখানে ছোট ছোট ঢেউগুলি ভেঙে পড়ছে এবং কমল গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়েছে, সেই অতি মনোরম স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে বিহার করলেন। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে হাত ধরাধরি করে, কাউকে আলিঙ্গন করে, কারও সাথে মধুর আলাপ এবং সহাস্য কটাক্ষপাত করে, তাঁদের ভগবৎ-ভাব বৃদ্ধি করিয়ে নৃত্যগীতাদি করতে লাগলেন।

গোপীরা তখন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এইভাবে আদর ও সম্মান লাভ করে গর্ব অনুভব করলেন এবং প্রত্যেকেই নিজেকে পৃথিবীর সকল রমণীর প্রধান বলে মনে করতে লাগলেন।

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১০-২৯-৪৮ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপীদের সৌভাগ্য-জনিত মান ও গর্ব দূর করবার জন্য এবং তাঁদের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছায় সেখানেই অন্তর্হিত হলেন।

ভগবানকে এইভাবে হারিয়ে গোপীরা তখন একেবারে দিশেহারা হয়ে, ভগবৎ-চিন্তায় সম্পূর্ণ তন্ময় হয়ে গেলেন। ভগবৎ বিচ্ছেদের এই দারুণ ব্যথা—এই তন্ময়তা নিয়েই ভাগবতকার এই অধ্যায় এখানেই শেষ করেছেন।

২৫
রাসলীলা (খ)

পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে আদর ও সম্মান লাভ করে গোপীদের মনে হয়েছিল যে, তারাই জগতে শ্রেষ্ঠ—তাদের মতো গুণবতী ভাগ্যবতী আর কেউ নেই। ভগবান গোপীদের মনের গর্ব ও অভিমানের কথা জানতে পেরে তাদেরই মঙ্গলের জন্য সেখানেই অন্তর্হিত হলেন।

মন এক সঙ্গে দুইটি জিনিস চিন্তা করতে পারে না। গোপীরা যতক্ষণ পর্যন্ত 'দেহ-গেহ' ভুলে কৃষ্ণেই আবিষ্ট ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা কৃষ্ণের দর্শন পাচ্ছিলেন; কিন্তু মন যখনই নিজ নিজ দেহে নেমে এল, তখনই তাঁরা কৃষ্ণকে ভুলে গেলেন; সুতরাং কৃষ্ণও তখনই তাঁদের কাছ থেকে অদৃশ্য হলেন। এই কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবানকে এক মনে ডাকতে হবে তখন অন্য চিন্তা করলে চলবে না।

মন ভগবানে বিলীন না হলে, মনে প্রাণে সম্পূর্ণ পবিত্র না হলে, রাসলীলার ভাব বোঝা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ এই গোপীপ্রেমের বিষয়ে বলেছেন—প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড়ো দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত শুদ্ধ জিনিস যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টাই করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না চিত্ত সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। ....কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত এই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই বিদ্যমান; এখানে গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই; সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে

থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ—একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্ব প্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের মতো দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়।*

পূর্ব অধ্যায়ে গোপীদের ভগবৎ বিচ্ছেদের কথা বলতে বলতে শুকদেব নিজেও এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তখনই আর কিছু বলতে পারলেন না। ভাগবতের বর্ণনায় রয়েছে যে, ভাগবত-কথা বলতে বলতে শুকদেব মাঝে মাঝে ভগবৎ-প্রেমে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। তখন উপস্থিত মুনি ঋষিরা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের নাম-কীর্তন করতেন। তাতেই ধীরে ধীরে শুকদেবের মন আবার বাহ্যজগতে ফিরে আসত এবং তিনি আবার ভাগবত-কথা বলতে শুরু করতেন।

শুকদেব কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গোপীদের অবস্থা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন ঃ

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥ ১০-৩০-১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হলে যূথপতি গজেন্দ্রের অদর্শনে হস্তিনীদের যে অবস্থা হয়, ভগবানকে হারিয়ে গোপীরা সেইরকম দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। গোপীরা তখন জগৎকে ভুলেছেন নিজেদেরও ভুলেছেন; তাঁদের একমাত্র জিজ্ঞাসা—'কৃষ্ণ কোথায়'?

গত্যানুরাগ-স্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈ-র্মনোরমালাপ-বিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ॥
১০-৩০-২ ॥

কৃষ্ণের সুললিত গতি, সুবিমল হাস্য, অকপট অনুরাগ, সানুরাগ নিরীক্ষণ, আনন্দদায়ক আলাপ প্রভৃতি নানা প্রকার বিহার এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যবহারে গোপীচিত্ত আকৃষ্ট হয়েছিল; তাই তাঁরা তখন তন্মনস্কা কৃষ্ণমনা হয়ে কৃষ্ণের আচরণসমূহের অনুকরণ করতে লাগলেন। তাঁরা তখন অন্তরে বাহিরে

* স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—পঞ্চম খণ্ড—ভারতীয় মহাপুরুষগণ।

কৃষ্ণভাবে পূর্ণ; তাঁদের চলন, বলন, হাসি প্রভৃতি কৃষ্ণের মতো হতে লাগল এবং 'আমিই কৃষ্ণ'—এই বলে পরস্পর পরিচয় দিতে লাগলেন; তাঁরা তখন নিজেদের পৃথক্ সত্তা একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন।

গভীর ভালবাসায়, প্রগাঢ় প্রেমে এইরকম অবস্থাই হয়ে থাকে। জাগতিক জীবনেও দেখা যায় যে, প্রিয়জনের কথা চিন্তা করতে ভাল লাগে। কেউ কেউ সেইসময় চিন্তা করতে করতে আপন মনেই হাসে, আবার আপন মনেই কাঁদে; আবার কেউ বা প্রিয়জনের চিন্তায় এতই তন্ময় হয়ে যায় যে, সে তখন নিজেই প্রিয়জনের কাজের অনুকরণ করতে থাকে; সুতরাং অপরের কাছে ধরা পড়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর শ্রীসারদাদেবীর সময় সময় এইরকম ভাব হতো; তখন তিনি এমন-ভাবে কথা বলতেন কিম্বা এমনভাবে পান খেতেন, যা দেখে লোকের মনে হতো যে, তিনি ঠাকুরেরই অনুকরণ করছেন। তিনি তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবে একেবারে বাহ্যহারা হয়ে যেতেন। যখনই আমরা কোন বিষয় গভীর-ভাবে চিন্তা করি, তখনই তাতে তন্ময় হয়ে যাই। কোন একটি বিষয়ে চিন্তা স্থায়ী হলেই তাকে সমাধি বলা হয়। কৃষ্ণের চিন্তা করে গোপীদের এই ভাব-সমাধির অবস্থার কথা এরপর বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্ ।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥
১০-৩০-৪ ॥

গোপীরা তখন সকলে মিলে পাগলের মতো উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ-গান করতে করতে বন থেকে বনান্তরে সেই প্রেমময়ের সন্ধান করতে লাগলেন। যিনি সমস্ত জগতের অন্তরে এবং বাহিরে বিদ্যমান, যিনি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, গোপীরা সেই পরমপুরুষের সন্ধান, বনের গাছপালাকে জিজ্ঞাসা করে ফিরছেন!

গোপীদের কিসের এত আর্তি? তাঁরা তো ইচ্ছা করলেই সমাধি যোগে সেই পরম পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন; কিন্তু তা হবার নয়; তাঁরা যে চান তাঁদের সেই শ্যামরূপ, সেই প্রিয়তমের সাথে বিহার করতে। সুতরাং তাঁদের আর পাগল হতে বাকি কি! ভক্তিশাস্ত্রে বলে যে, ভগবানের জন্য

ঐভাবে পাগল হতে না পারলে, তাঁকে পাওয়া যায় না। গোপীরা উচ্চৈঃস্বরে বন থেকে বনান্তরে কৃষ্ণগুণ গান করে ফিরছেন—উদ্দেশ্য কৃষ্ণনামের সম্মোহন শক্তিতে তাঁরা তাঁকে আকর্ষণ করে আনবেন এবং নিজেদের আর্তির কথাও গানের মাধ্যমে তাঁকে জানাবেন।

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥ ১০-৩০-৫ ॥

সামনে কয়েকটি উঁচু গাছ দেখে গোপীরা ভাবলেন যে, এরা সব মহাবৃক্ষ; বহুদূর পর্যন্ত এদের দৃষ্টি প্রসারিত; সুতরাং এরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখে থাকবে। এই আশা করে বৃক্ষদের জিজ্ঞাসা করলেন—হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে বট! নন্দনন্দন সপ্রেম দৃষ্টি সঞ্চারে আমাদের মন হরণ করে পালিয়েছেন; তোমরা কি তাঁকে দেখেছ? এই সব গাছদের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে গোপীরা অপেক্ষাকৃত ছোট ফুলের গাছ—কুরুবক, অশোক, নাগকেশর, চম্পক প্রভৃতি গাছদের সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন—কৃষ্ণকে কি তোমরা দেখেছ?

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রৎ-দৃষ্টস্তেঽতি-প্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ১০-৩০-৭॥

হে সৌভাগ্যবতী গোবিন্দচরণপ্রিয় তুলসি! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রিয়; তারই জন্য তিনি অলিগণের সাথে তোমারই মালা কণ্ঠে ধারণ করে থাকেন। তিনি কোন্ পথ দিয়ে গিয়েছেন, তুমি দেখেছ কি?

তুলসীর কাছ থেকেও কোন উত্তর না পেয়ে গোপীরা ফুলভারে আনত ছোট ছোট গাছের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মালতি, মল্লিকে, জাতি, যূথিকে! মাধব করস্পর্শের দ্বারা তোমাদের আনন্দ বর্ধন করে গেছেন; তাই তোমাদের আজ এই অপূর্ব ফুল-সাজ। সুতরাং বলে দাও তিনি কোন্ দিকে গেছেন। বিভিন্ন গাছের কাছ থেকেও কোন উত্তর না পেয়ে গোপীরা ভাবলেন—একে তাকে কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই; কৃষ্ণ যেখানেই থাকুন, পৃথিবীতে তো নিশ্চয়ই রয়েছেন; সুতরাং এবার সরাসরি পৃথিবীকেই জিজ্ঞাসা করা যাকঃ

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎ-পুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
অহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০-৩০-১০ ॥

হে পৃথিবী! বল দেখি তুমি কী তপস্যা করেছিলে, যার জন্য তুমি কেশবের চরণস্পর্শ লাভ করেছ? তারই জন্য তুমি পরমানন্দে দূর্বাঘাসে রোমাঞ্চিত হয়েছ। বল তো, কৃষ্ণের চরণস্পর্শেই কি তোমার এই রোমাঞ্চ? অথবা বামন অবতারে যখন বলিরাজকে ছলনা করে এক পা দিয়েই তিনি সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডল আচ্ছাদন করেছিলেন কিংবা তারও আগে বরাহরূপী বিষ্ণুর আলিঙ্গনেই কি তোমার এই রোমাঞ্চ ?

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১০-৩০-১৪ ॥

এইভাবে কৃষ্ণ-বিরহে কাতরা গোপীরা পরিশ্রান্ত হয়ে ভগবৎ-অন্বেষণে অসমর্থ হয়ে পড়লেন; তখন তাঁরা কৃষ্ণাত্মিকা হয়ে, কৃষ্ণে তন্ময় হয়ে নিজেদেরই কৃষ্ণ বলে ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণের পূতনাবধাদি বাল্যলীলার অনুকরণ করতে লাগলেন।

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্ ॥ ১০-৩০-১৫॥

কোন গোপী পূতনার আচরণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণের অনুকরণকারী কোন এক গোপী তাঁর স্তনপানে রত হলেন। কেউ বালকৃষ্ণের মতো রোদন করতে করতে শকটাসুরের অনুকরণকারী অপর এক গোপীকে পদাঘাত করলেন।

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্॥ ১০-৩০-২০ ॥

কৃষ্ণের আচরণকারী কোন এক গোপী বললেন—তোমরা ঝড় বৃষ্টির জন্য আর ভয় পেয়ো না; আমিই তোমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করব। এই দেখ তোমাদের জন্য গোবর্ধন পর্বত ধারণ করছি—এই বলে তিনি নিজের উত্তরীয় বস্ত্র এক হাতে তুলে ধরলেন।

অপর একজন গোপী কালীয় নাগের অনুকরণ করলে, কৃষ্ণের অনুকরণকারী গোপী, তাঁর মাথার উপর উঠে বললেন—হে দুষ্ট কালীয়! তুই এখনই এই হ্রদ থেকে চলে যা; দুষ্টের দণ্ড বিধানের জন্য আমি অবতীর্ণ হয়েছি।

যশোদার মতো আচরণকারী কোন গোপী বললেন—কৃষ্ণ আমার দধিভাণ্ড ভেঙে মাখন চুরি করেছে; আজ একে উদূখলে বেঁধে রাখব—এই বলে কৃষ্ণ-ভাবিনী কোন গোপীকে, উদূখলের মতো আচরণকারী অপর এক গোপীর সঙ্গে নিজের মালা দিয়ে বেঁধে দিলেন। যিনি কৃষ্ণের অনুকরণ করছিলেন, সেই গোপী ভীত হয়ে নিজের হাত দিয়ে চক্ষু আচ্ছাদন করে ভয়ের অনুকরণ করলেন।

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥ ১০-৩০-২৪ ॥

ব্রজবালারা এইভাবে কৃষ্ণগুণ কীর্তন এবং তাঁর লীলার অনুকরণ করে আবার বৃন্দাবনের তরু-লতাদের কৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা করতে করতে বনের এক জায়গায় গিয়ে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন।

শুকদেব ভগবানের বাস্তব লীলার কথা বলছেন; সুতরাং গোপীরা প্রত্যক্ষ চরণচিহ্ন-ই দেখেছিলেন। অদ্বৈতবাদীদের কাছে যিনি নির্গুণ নিরাকার পরমাত্মা, সেই তিনিই গোপীদের কাছে বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র কোথাও কোথাও ভক্তি-হিমে অবতার রূপ ধারণ করেন। যদি এখনও কেউ ভগবানের জন্য গোপীদের মতো কাঁদতে পারেন, তবে তিনিও গোপীদের মতোই ভগবানের পদচিহ্ন দেখতে পাবেন। জগতের কাছে এই আশার কথা প্রচারের জন্যই ভগবানের এই লীলাখেলা।

গোপীরা তখন ঐ সকল পদচিহ্নের সাহায্যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করতে করতে অদূরেই কৃষ্ণের পায়ের ছাপের সাথে আর একজন গোপীর পদচিহ্ন দেখে দুঃখিত হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন ঃ

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ১০-৩০-২৮ ॥

এই গোপী, যাঁর পায়ের চিহ্ন এখানে রয়েছে তিনি যথার্থই শ্রীভগবানের আরাধনা করেছেন; সেইজন্যই শ্রীহরি আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে সানন্দে এঁকেই একান্তে নিয়ে এসেছেন।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই গোপীই ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠা। ভাগবতে কোথাও শ্রীরাধা কিংবা অন্য কোন গোপীর নামোল্লেখ নেই। শ্লোকে রয়েছে *অনয়ারাধিতো নূনং*—এই গোপী কর্তৃক ভগবান যথার্থই রাধিত, আরাধিত হয়েছেন। 'রাধিত' শব্দ থেকে শ্রীরাধার নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই বিশেষ গোপী, যাঁকে শ্রীকৃষ্ণ একান্তে নিয়ে এসেছিলেন, ভাবলেন—আমিই সমস্ত রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ; কারণ কৃষ্ণ আর সকলকে ত্যাগ করে একমাত্র আমারই অনুবর্তন করেছেন।

শ্রীরাধার ভগবৎ-প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ। সেইজন্য অপর গোপীদের মনে দেহাভিমান এলেও, তিনি কিন্তু ভগবানেই নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন; সুতরাং ভগবান থেকে তাঁর বিচ্যুতি হয় নি। ভগবান লোক শিক্ষার জন্য লীলা করতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং ভগবানের ইচ্ছাতেই কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধিকার হৃদয়েও আত্মাভিমান এল; তার মন কৃষ্ণকে ছেড়ে নিজের দেহে এল; তিনিও কৃষ্ণভক্তির মূল মন্ত্র ভুলে নিজেকেই শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে লাগলেন। অতএব কৃষ্ণও তখন শ্রীরাধার কাছ থেকে অন্তর্হিত হলেন। কৃষ্ণের অন্তর্ধানের সাথে সাথেই শ্রীরাধা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন—হে নাথ ! তুমি কোথায়? আমি তোমার দাসী; দয়া করে একবার দেখা দাও।

এদিকে অপর সব গোপীরা যাঁরা কৃষ্ণের অন্বেষণ করছিলেন, তাঁরা হঠাৎ কাছেই দেখলেন যে, তাদেরই প্রিয় সখি শ্রীরাধা প্রিয়-বিচ্ছেদে কাতর হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। সখীদের সেবায় শ্রীরাধার জ্ঞান ফিরলে গোপীরা তাঁরই মুখে মাধবের কাছে সমাদর লাভ এবং নিজের দুর্ব্যবহার-বশত অপমানের কথা শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। গোপীরা তখন শ্রীরাধাকে নিয়ে যতদূর পর্যন্ত জ্যোৎস্না পেলেন, ততদূর পর্যন্ত বনের মধ্যে প্রবেশ করে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করলেন।

শ্রীরাধা বললেন—আমরা তো বহুক্ষণ ধরেই তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম;

কিন্তু তিনি যদি দয়া করে দেখা না দেন, তবে কে তাঁর দেখা পাবে? আমরা যতই তাঁকে বনের মধ্যে গিয়ে খুঁজব, ততই তিনি বনের আরও গভীরে চলে যাবেন; ফলে অন্ধকারে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে অথবা পায়ে কাঁটা ফুটে তাঁর কষ্ট হতে পারে। কৃষ্ণের আনন্দের জন্য—তাঁর সেবার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। তিনি যদি আমাদের কষ্ট দিয়ে আনন্দ পান, তাহলে না হয় আমরা সারা জীবনই তাঁর বিরহ-দুঃখ সহ্য করব। এই অন্ধকারে বনে বনে খুঁজে তাঁর আর কষ্টের কারণ হতে চাই না। তিনি মনের আনন্দে লুকিয়ে থাকুন; আর আমরা বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ে এই বনপ্রান্তে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

তন্মনস্কাস্তদালাপা-স্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ১০-৩০-৪৩ ॥

গোপীরা তখন কৃষ্ণে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করে তন্ময় হয়ে, তাঁরই গুণগান করতে করতে নিজ নিজ দেহ এবং গৃহের কথা ভুলে গেলেন।

কৃষ্ণ-ভাবিনী গোপীরা কৃষ্ণের আগমন আকাঙ্ক্ষায় তখন সকলে আবার যমুনার তীরে ফিরে এসে একত্রে কৃষ্ণবিষয়ক গান করতে লাগলেন। গোপীরা জানেন কৃষ্ণ-গুণকীর্তনই কৃষ্ণলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। পূর্বে এই যমুনার তীরেই কৃষ্ণের সাথে তাঁদের মিলন হয়েছিল। তাই গোপীদের আশা —যদি তিনি দয়াপরবশ হয়ে আবার তাঁদের এখানে দর্শন দেন। গোপীরা সমস্ত ভোগসুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে যমুনার তীরে গভীর রাত্রিতে একত্রিত হয়ে ভগবৎ-দর্শনের জন্য কৃষ্ণগুণানুকীর্তন এবং অবিশ্রান্ত রোদন করে চলেছেন; তাঁদের অবস্থা দেখলে পাষাণও গলে যায়। এই গোপী-ভাবই, এই তীব্র আর্তিই ভগবান লাভের পূর্বাভাষ। ব্রহ্মর্ষি শুকদেব গোপীদের এই অবস্থার কথাই বর্ণনা করেছেন গোপী-গীতাতে।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥
১০-৩১-১॥

গোপীরা বলছেন—হে প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ ! তুমি এখানে জন্মেছ বলেই এই ব্রজধাম সমস্ত পুণ্যভূমির শীর্ষস্থানীয় এবং সর্ব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রীদেবী

লক্ষ্মী স্বয়ং এখানে বিরাজ করছেন। ব্রজে সবাই সুখে আছে; কিন্তু কি দুর্দৈব! তোমারই জন্য যারা জীবন ধারণ করে রয়েছে, সেই গোপীরা এই রাত্রিতে বনে বনে তোমারই অন্বেষণ করে মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। অতএব হে দয়িত, আমাদের প্রার্থনা শোন—দয়া করে দেখা দাও।

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্-বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥
১০-৩১-৩ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি তো বার বার ব্রজবাসীদের নানা বিপদ থেকে রক্ষা করেছ। কালীয় হ্রদের বিষময় জলপানে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে, অঘাসুর, ঝড় বৃষ্টি, বজ্রপাত, বৃষাসুর, ময়পুত্র ব্যোমাসুর প্রভৃতি সকল প্রকার বিপদ থেকে আমাদের বার বার রক্ষা করেছ; সুতরাং এখন আমাদের উপেক্ষা করে বধ করছ কেন?

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥
১০-৩১-৪ ॥

হে সখা! আমরা বুঝেছি, তুমি যশোদার পুত্র নও ; তুমি হচ্ছ সর্ব প্রাণীর বুদ্ধি-সাক্ষী। ব্রহ্মা বিশ্বপালনের জন্য তোমার আরাধনা করলে, তুমি সকলের অন্তরাত্মা হয়েও যদুকুলে জন্মেছ। বিশ্ব-পালনের জন্যই তোমার অবতরণ; সুতরাং সকলের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হয়ে তোমারই ভক্তদের উপেক্ষা করা তো তোমার উচিত নয়।

গোপীদের মধ্যে ভাবের তারতম্য ছিল। কোন কোন গোপী, যাঁরা কৃষ্ণের অদর্শনে অভিমান করেছিলেন, তাঁরা বলছেন—অপরের সামান্য দুঃখ দেখলেও যাঁর হৃদয় দয়ার্দ্র হয়, সেই যশোমতীর গর্ভে তোমার জন্ম হয় নি। তা যদি হতো, তাহলে মায়ের গুণ কিছুটা অন্তত তোমার মধ্যে থাকত; সজাতীয়া আমাদের দুঃখ দেখে নিশ্চয়ই তোমার দয়া হতো। অতএব আমাদের মনে হয়, তুমি সর্বান্তর্যামী; কারণ একমাত্র অন্তর্যামীই জীবের দুঃখ দেখেও তাদের মধ্যে আনন্দে বাস করতে পারেন; তুমি উদাসীন শিরোমণি; তোমার আবির্ভাবের কারণও আমরা বুঝতে পারি না। ব্রহ্মা তাঁর নিজের সৃষ্টি রক্ষার

জন্য *বিশ্বগুপ্তয়ে*—জগতে গুপ্তভাবে থাকার জন্য তোমার প্রার্থনা করেছিলেন; কেন না তুমি প্রকাশিত থাকলে, তোমাকে ভক্তি করে জীবকুল উদ্ধার হয়ে যাবে; তাহলে ব্রহ্মার সৃষ্টিই যে লয় হয়ে যাবে। সুতরাং ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছিলেন—পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তুমি গুপ্তভাবে থাকবে, যাতে কেউ তোমায় ঈশ্বর বলে জানতে না পারে।

প্রণতদেহিনাং পাপকর্শনং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥
১০-৩১-৭ ॥

গোপীরা বলছেন—হে কৃষ্ণ ! তোমার পাদপদ্ম প্রণতজনের পাপনাশক; তুমি গোচারণকালে গবাদি পশুর অনুগমন করে থাক; লক্ষ্মীদেবী তোমারই শ্রীচরণ আশ্রয় করেছেন এবং ঐ চরণই তুমি কালীয় নাগের মাথায় রেখেছ। প্রার্থনা করি, তোমার ঐ চরণ আমাদের বুকে রেখে আমাদের হৃদগত কামানল দূর কর।

এই হচ্ছে মহাভাবের অবস্থা; এই অবস্থায় সাধকের শরীরে অসহ্য জ্বালা হয়। সাধনার সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীরেও এইরকম জ্বালা হতো। এই জ্বালার উপশমের জন্য গোপীরা ভাবছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শেই হয়ত এই জ্বালা দূর হবে।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥
১০-৩১-৯ ॥

গোপীরা বলছেন—তোমার কথারূপ অমৃত সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবের প্রাণ-স্বরূপ এবং তোমার কথা পাপনাশক। তোমার কথা শ্রবণমাত্রই জীবের মঙ্গল হয়; তাই ব্রহ্মাদি তত্ত্বদর্শীরা তোমার কথাকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে যারা তোমার কথা কীর্তন করেন, তারা নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে বহু দান করেছিলেন; সেই সুকৃতির ফলেই তোমার কথাকীর্তনে তাদের রুচি হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন পুরীতে বাস করছিলেন, সেই সময় সেখানকার রাজা প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন।

সে বছর রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু যথারীতি রথের সামনে নৃত্য-কীর্তনাদি করে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং শ্রীমতীর ভাবে বিভোর হয়ে পাশের একটি বাগানে গিয়ে অর্ধবাহ্য অবস্থায় শুয়েছিলেন। সেই সময় রাজা প্রতাপ রুদ্র রাজবেশ ত্যাগ করে বৈষ্ণবের বেশে মহাপ্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর পদসেবা করতে করতে এই গোপীগীতা আবৃত্তি করছিলেন। চৈতন্যদেব একে গোপীভাবে তন্ময়; তার উপর গোপীগীতা শুনে তিনি আনন্দের আতিশয্যে বার বার বলতে লাগলেন—থেমো না, আরও বল, আরও বল। রাজা যখন 'তব কথামৃতং' শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন, তখন মহাপ্রভু আর স্থির থাকতে পারলেন না; আনন্দে লাফিয়ে উঠে রাজাকে আলিঙ্গন করে বললেন—তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন / মোরে কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন।

কোন কোন গোপী '*তব কথামৃতং*' শ্লোকের অর্থ একটু অন্যরকমভাবে অনুভব করেছেন। তাঁরা বলছেন যে, তোমাকে কাছে পেয়ে যদি তোমার কথা শোনা যায়, তা হলেই সেই কথা অমৃত সমান; নইলে কথা মৃতং—সেই কথাই মৃত্যু-স্বরূপ, মহা অনর্থকারী। তোমার কথাই আমাদের মেরে রেখেছে; কারণ তোমার কথা তপ্ত *জীবনং*—তোমাকে পাবার জন্য জীবনকে উত্তপ্ত করে তোলে। পুরাণাদি গ্রন্থে যে ভগবানের কথার মহিমা বলা হয়েছে, তা আর কিছুই নয়, কবিদের অতিরঞ্জন মাত্র। ব্রহ্মাদি কবিদের স্বভাবই এই যে, তাঁরা অতি সাধারণ জিনিসকে অসাধারণ বলে প্রচার করেন; আসলে তোমার কথা ঐরকম বর্ণনা মাত্র। তবে হাঁ, তোমার কথা পাপনাশক বটে; কেন না আমাদের মতো যারা তোমার কথা শুনবে অথবা কীর্তন করবে, তোমাকে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের মতোই তারাও দুঃখ ভোগ করবে; আর এই দুঃখ ভোগেই তাদের সঞ্চিত পাপসমূহ ক্ষয় হয়ে যাবে। অতএব বোঝা গেল তোমার কথা মঙ্গলস্বরূপ তো নয়-ই বরং দুঃখপ্রদ। যারা তোমার স্তাবক, তারাই কেবল তোমার কথাকে মঙ্গলময় বলে দেশে দেশে কীর্তন করে থাকেন। তারা ভূরিদ—মহা প্রাণঘাতক, লোকেদের কেবল দুঃখ দিয়েই বেড়ান। তোমাকে পাবার আশা নিয়ে আমরা আরও কিছু সময় বেঁচে থাকতে চাই; সুতরাং তোমার কথা রূপ মৃত্যুর আমাদের এখন প্রয়োজন নেই—তোমাকেই আমরা চাই।

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥
১০-৩১-১১॥

তুমি যখন গোচারণের জন্য ব্রজ হতে বনে চলে যাও, তখন কঠিন শিলা এবং কণ্টকে তোমার সুকোমল চরণে ব্যথা লাগবে—এই ভেবেই আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। তুমি সর্বদাই আমাদের দুঃখ দিয়ে থাক। প্রিয়জনদের দুঃখ দেওয়াই হচ্ছে তোমার স্বভাব। কি মিলন, কি বিরহ—সব অবস্থাতেই তুমি আমাদের ক্ষোভের কারণ। দিনের বেলায় যখন তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াও, তখন তোমার অদর্শনে ব্রজবাসীদের ক্ষণার্ধ সময়ও এক যুগ দীর্ঘ বলে মনে হয়। আবার দিনান্তে যখন তুমি ব্রজে ফিরে আস, তখন তোমার কুটিল কুন্তল-শোভিত শ্রীমুখ আমরা অপলক নয়নে দেখতে চাই। কিন্তু হায়! সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিশ্চয়ই নির্বোধ! নইলে কেন তিনি আমাদের চোখে পলক সৃজন করে নিমেষের জন্যও আমাদের কৃষ্ণ দর্শনের বিরোধী হলেন!

হে অচ্যুত! আমাদের এখানে আসার কারণ তুমি জান। তোমার বেণু-গীতে আকৃষ্ট হয়ে আমরা পতি, পুত্র এবং বন্ধুদের উপেক্ষা করেই তোমার কাছে এসেছি; আর তুমি এই অবস্থায় আমাদের ত্যাগ করে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ! তাই বলছি তুমি শঠ! রাত্রিকালে স্বয়মাগত রমণীকে কে পরিত্যাগ করতে পারে?

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥
১০-৩১-১৮ ॥

হে কৃষ্ণ! ব্রজবাসীদের দুঃখ দূর করতে এবং জগতের মঙ্গল বিধান করতে তোমার অবতরণ। তোমাকে পাবার আশায় তোমারই স্বজন—আমাদের মন অত্যন্ত পীড়িত হয়েছে; এই পীড়ার ঔষধ তুমি জান; সুতরাং কার্পণ্য পরিহার করে সেই হৃদ্‌রোগ-নাশক এবং জীবনদায়ী ঔষধ যৎ-কিঞ্চিৎ আমাদের দান কর, দর্শন দিয়ে আমাদের বাঁচাও।

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১০-৩১-১৯ ॥

ব্রজদেবীরা এতক্ষণ পর্যন্ত কেবল কৃষ্ণের অদর্শনে নিজেদের দুঃখের কথা বলেই তাঁর কাছে আকুল প্রার্থনা করছিলেন। এখন তাঁদের মনে হলো যে, বন-ভ্রমণে নিশ্চয়ই কৃষ্ণের চরণে ব্যথা লাগছে। তাই এবার নিজেদের কথা ভুলে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

হে প্রিয়! পদ্মের চেয়েও নরম তোমার শ্রীচরণ আমরা অতি সন্তর্পণে হৃদয়ে ধারণ করি, পাছে আমাদের কঠিন বুকে তোমার পায়ে ব্যথা লাগে ; আর তুমি কি না সেই অতি কোমল চরণ নিয়ে এই রাত্রিতে কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ! তীক্ষ্ণ কণ্টক ও পাষাণাদিতে তোমার পায়ে নিশ্চয়ই কত না কষ্ট হচ্ছে—এই ভেবেই আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি; কারণ তুমিই আমাদের আয়ু , আমাদের জীবন। সুতরাং বনভ্রমণে বিরত হয়ে এবার আমাদের কাছে এস।

২৬
রাসলীলা (গ)

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১০-৩২-১॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণ-দর্শনের উৎকণ্ঠায় গোপীরা এইভাবে কৃষ্ণগান এবং নানাপ্রকার বিলাপ করতে করতে সুস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

প্রশ্ন করা যায় যে, কান্নার শব্দ তো শ্রুতি-সুখকর হয় না; তবে যে এখানে গোপীদের কান্নাকে মধুর বলা হলো? এর উত্তর এই যে, জাগতিক কাম্য বস্তুর জন্য যে কান্না তা-ই শ্রুতিকটু, সুতরাং অবাঞ্ছনীয়; কিন্তু যিনি নিত্যপ্রিয় পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অদর্শনে যে কান্না তা কখনও শ্রুতিকটু হতে পারে না, বরং সুমধুর; অতএব বাঞ্ছনীয়।

ভগবানের বিরহে ভক্তের যে দুঃখ, ভগবানকে পাবার যে আর্তি সেই দুঃখ—সেই আর্তি-ই ভক্তের কাছে পরম আনন্দদায়ক। বাইরে থেকে ভক্তের এই অবস্থাকে দুঃখময় বলে মনে হলেও তার নিজের অন্তরে তখন আনন্দময়ের চিন্তায় পরম আনন্দই হতে থাকে। ভগবানের জন্য এই বিরহ-ব্যাকুলতা সাধকের পরম কাম্য। বিরহ-ব্যাকুলতা যত তীব্র, ভগবৎ উপলব্ধিও তত গভীর হয়। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সাধকের এই অবস্থাকে 'তপ্ত ইক্ষু চর্বণ' বলা হয়েছে। গরমে মুখ জ্বলে যায় কিন্তু মিষ্টত্বের জন্য ছাড়াও যায় না।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১০-৩২-২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন বনমালা এবং পীতাম্বর ধারণ করে হঠাৎ গোপীদের সামনে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণকে এখানে বলা হয়েছে 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথ'—মদনদেব সকলেরই মনে মোহ উৎপাদন করে থাকে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ দেখে

মদন নিজেই মোহিত হয়ে গেল; তাই কৃষ্ণ হলেন মদনমোহন। এই মদনমোহন রূপেই কৃষ্ণ গোপীদের সামনে আবির্ভূত হলেন।

রাসলীলার প্রথমেই বলা হয়েছে যে, এই লীলায় কামের গন্ধও নেই। প্রকৃত রাসলীলার সময় হয়েছে; তাই কামদেব যে রূপের কাছে মুগ্ধ হয়ে কাম ভুলে যায়, শ্রীকৃষ্ণ সেই মদনমোহনরূপে রাসমণ্ডলে উপস্থিত হলেন। সেই রূপ দর্শনে কামের ক্রিয়া একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। মদন হচ্ছে মায়িক রাজ্যের ব্যাপার; অনাবৃত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হলে কামদেবও তন্ময় হয়ে যায়। গোপীরা আজ কৃষ্ণের সেই পরম আনন্দমূর্তির দর্শন পেয়েছেন; সুতরাং সেখানে কামের স্থান কোথায়?

প্রিয়তম কৃষ্ণকে সহসা তাদের সামনে আবির্ভূত দেখে গোপীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সকলে এক সঙ্গে উঠে পড়লেন—যেন মৃতদেহে সহসা প্রাণের সঞ্চার হলো। এইবার পাঁচটি শ্লোকে গোপীদের আচরণের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের ব্যবহার থেকে গোপীদের হৃদয়ের ভাবের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। রাসমণ্ডলে শত শত কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীরা ছিলেন; সকলের কথা তো পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বলা সম্ভব নয়; তাই শুকদেব সংক্ষেপে সাত জন প্রধান গোপীর পরিচয় দিয়েছেন। প্রেমরূপী গোপীদের মধ্যে প্রেমের তারতম্য ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা প্রেমের দুইটি বিভাগ করেছেন —তদীয়তাময় এবং মদীয়তাময়। 'আমি ভগবানের, সুতরাং আমি ভগবানের অধীন'—এইরকম যে ধারণা তাকে তদীয়তাময় প্রেম বলে। 'ভগবান আমার, সুতরাং তিনি আমার অধীন'—এইরকম ভাবের নাম মদীয়তাময় প্রেম। গোস্বামী প্রভুপাদেরা ঠিক করেছেন যে মদীয়তাময় প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

> কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
> কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনভূষিতম্ ॥ ১০-৩২-৪ ॥

কৃষ্ণকে দেখে কোন গোপী আনন্দে যুক্তকরে তাঁর কর ধারণ করলেন। বিনয় ও নম্রতার ভাব দেখিয়ে ইনি তদীয়তাময় প্রেমের পরিচয় দিলেন। গোস্বামী প্রভুপাদেরা সিদ্ধান্ত করেছেন—ইনি চন্দ্রাবলী।

কোন গোপী কৃষ্ণের চন্দন-চর্চিত বাহু নিজের স্কন্ধদেশে স্থাপন করলেন। এঁর মধ্যে তদীয়তাময় ও মদীয়তাময়—দুই ভাবেরই মিশ্রণ রয়েছে। ইনি শ্যামলা।

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বূলচর্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥ ১০-৩২-৫ ॥

কোন গোপী অঞ্জলিপুটে কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বূল গ্রহণ করলেন। ইনি শৈব্যা।

অপর একজন সন্তপ্ত গোপী নিজের বুকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ করলেন। ইনি পদ্মা।

একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সংদষ্টদশনচ্ছদা ॥ ১০-৩২-৬ ॥

অপর একজন গোপী প্রণয়কোপে অধীর হয়ে দাঁত দিয়ে অধর দংশন করে তীব্র কটাক্ষ করে যেন কৃষ্ণকে তাড়না করতে লাগলেন।

ইনি সর্ব গোপী-শ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকা। এঁর পূর্ণ-মদীয়তাময় ভাব। এঁর বিশ্বাস কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের নই ; সুতরাং কৃষ্ণের কাছে আমার যাবার দরকার নেই; কৃষ্ণ আমার কাছে আসুক। তাই চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণের কাছে দেখে অভিমানে তীব্র কটাক্ষ করলেন।

অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥ ১০-৩২-৭ ॥

অপর কোন এক গোপী অনিমেষ নয়নে কৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করতে লাগলেন। সাধু মহাত্মারা যেমন ভগবানের চরণকমল দর্শন করেও তৃপ্ত হয় না, সেইরকম ইনিও তৃপ্ত হতে পারলেন না। ইনি কৃষ্ণের কাছেও গেলেন না আবার দীনতাও দেখালেন না। ইনি শ্রীরাধার সমভাবাপন্না সখি ললিতা।

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥ ১০-৩২-৮ ॥

কোন গোপী নেত্ররন্ধ্র দিয়ে কৃষ্ণকে হৃদয়ে এনে, চোখ বুঁজে যোগীর মতো পরমানন্দ লাভ করলেন। এঁর আচরণ ললিতা সখির মতো। ইনি বিশাখা।

মুমুক্ষু জীবেরা ঈশ্বর অথবা ভক্ত-সঙ্গ লাভ করে যেমন সংসার-তাপ

পরিহার করেন, সেইরকম কৃষ্ণ-দর্শনের আনন্দে পরিতৃপ্ত হয়ে গোপীরা বিরহ-জনিত সন্তাপ দূর করলেন।

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ঈশ্বর যেমন ঐশ্বর্যাদিময় নিজ শক্তির দ্বারা শোভিত হন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ শোকশূন্য গোপীবৃন্দে পরিবৃত হয়ে অনন্ত শোভার আকর হয়েছিলেন।

যমুনার তীরে যেখানে চন্দ্রের আলোতে রাত্রির অন্ধকার দূর হয়েছিল, যেখানে যমুনার ছোট ছোট ঢেউ এসে পারের বালুসমূহকে সুশীতল করে দিয়েছিল এবং যেখানে কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের গন্ধে দিক্‌সমূহ আমোদিত হয়েছিল, কৃষ্ণ সেই পরম মনোরম স্থানে গোপীদের নিয়ে এলেন।

কৃষ্ণদর্শনের আনন্দে গোপীদের মনস্তাপ দূর হয়েছিল। শ্রুতির লক্ষ্য যে পরব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপ কৃষ্ণকে পেয়ে গোপীদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি হলো। তাঁরা তখন আত্মবন্ধু কৃষ্ণকে বসবার জন্য নিজ নিজ উত্তরীয় বসন বিছিয়ে দিলেন।

গোপীরা কৃষ্ণের অপ্রিয় আচরণে কুপিত হয়েছিলেন; তাই এখন তাঁরা কৃষ্ণের শ্রীচরণ নিজেদের ক্রোড়ে নিয়ে সম্মর্দন করতে করতে প্রণয়কোপে বলতে লাগলেন ঃ

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ॥ ১০-৩২-১৬ ॥

গোপীরা বললেন—হে কৃষ্ণ! সংসারে এমন কিছু লোক আছে যাদের ভালবাসলে, তারাও ভালবাসে। কেউ কেউ আছে তাদের ভাল না বাসলেও তারা কিন্তু ভালবাসে। আবার এমন লোকও আছে তাদের ভালবাসলেও তারা ভালবাসে না এবং না ভালবাসলেও ভালবাসে না। তুমি এই বিষয়টি ভালভাবে আমাদের বুঝিয়ে দাও; অর্থাৎ এদের মধ্যে তুমি কোন্ শ্রেণীর তা বল।

কৃষ্ণ গোপীদের একেবারে অসহায় অবস্থায় রেখে বহুক্ষণ ধরে কাঁদিয়েছেন। প্রিয়জন যদি অযথা কষ্ট দেয়, তাহলে অভিমান তো হবেই ; তাই এইবার কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে বেশ দুটো শক্ত কথা শুনিয়ে দেবার ইচ্ছায় এমনভাবে প্রশ্ন করলেন যাতে কৃষ্ণ নিজের দোষ নিজের মুখেই স্বীকার করতে বাধ্য হন।

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে ।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বাত্মানং তদ্ধি নান্যথা ॥ ১০-৩২-১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে সখিরা! যারা পরস্পর পরস্পরের ভজনা করে, তাদের আচরণ স্বার্থপূর্ণ; তারা নিজেরাই নিজেদের ভালবাসে। ঐরকম ভালবাসায় বন্ধুত্বও নেই, ধর্মও নেই; কারণ সে ভালবাসা কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। সুতরাং বুঝতেই পারছ আমি ঐ দলের মধ্যে নেই।

গোপীদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—দয়ালু ব্যক্তি এবং মাতাপিতা ভজনা না করলেও ভজনা করে। ঐরকম ভালবাসায় ধর্ম এবং সৌহার্দ দুই-ই আছে।

দয়ালুর দয়া সত্ত্ব গুণাত্মক; অপরের দুঃখ দেখে দয়ালু ব্যক্তির কষ্ট হয়, তাই সে নিঃস্বার্থভাবে সেই দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমি যে ত্রিগুণের অতীত আনন্দস্বরূপ। সুতরাং অন্যের দুঃখে আমার আনন্দের ব্যাঘাত হয় না; অথচ আমি দয়া করে থাকি। আর মাতাপিতার স্নেহ কেবল নিজের সন্তানের জন্য; কিন্তু আমার স্নেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত। আমার দয়া কোন নিমিত্তের অপেক্ষা করে না, তাই তো আমি দয়াময়।

গোপীদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—যারা আত্মারাম অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিশূন্য অথবা আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ, যারা অকৃতজ্ঞ আর যারা গুরুদ্রোহী—এই চার শ্রেণীর লোক ভালবাসলেও ভালবাসে না।

কৃষ্ণ বললেন—যারা আত্মারাম তারা নিজের আনন্দে সদাই অন্তর্মুখী হয়ে থাকে; বাইরের কোন জিনিস তাদের নজরে আসে না। আমি আত্মারাম বটে কিন্তু সর্বক্ষণ ব্রহ্মাণ্ডের সকলের অন্তর-বাহির দেখছি; সুতরাং আত্মা-রামদের সাথে আমার মিল নেই। যারা আপ্তকাম, তাদের বহির্দৃষ্টি থাকলেও কিছুই করবার ইচ্ছা থাকে না; তাই কাউকেই ভালবাসতে পারে না। আমিও আপ্তকাম; কিন্তু ভক্তের ইচ্ছা আমাকে জোর করে ইচ্ছা করায়। সুতরাং আপ্তকামদের সাথেও আমার মিল নেই। অকৃতজ্ঞদের মধ্যে আমি গণ্য নই; কারণ ভক্তের ভজন অনুসারে আমি ফলপ্রদান করে থাকি। আর যারা গুরুদ্রোহী, সেই পাষণ্ডদের সাথে আমার তুলনা কি করে সম্ভব? আমি যে পাষণ্ড দলনকারী। কৃষ্ণ এখানে দেখালেন যে, ভাল হোক্ মন্দ হোক্ মানব-

প্রকৃতির সাথে তাঁর মিল নেই—তিনি সৃষ্টিছাড়া। গোপীরা যে বাক্‌জালে কৃষ্ণকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, তিনি তা থেকে মুক্ত হলেন।

কৃষ্ণ আরও বললেন—হে সখিরা! দরিদ্র লোক দৈবলব্ধ ধন হারালে যেমন অপর সমস্ত কিছু ভুলে কেবল সেই ধনের কথাই চিন্তা করে, সেই-রকম ভক্তেরা যাতে সমস্ত জগৎ ভুলে নিরন্তর আমারই চিন্তায় ডুবে থাকতে পারে, সেইজন্যই আমি ভক্তদের একবার দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হই।

কৃষ্ণ বললেন—হে অবলাগণ! তোমরা আমার জন্য লোকাচার, শাস্ত্রাচার এবং আত্মীয়-স্বজন সব কিছু ত্যাগ করেছ। আমিও তোমাদের ত্যাগ করে কোথাও যাই নি; কেবল আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য অদৃশ্য-ভাবে থেকে তোমাদের দেখছিলাম এবং বিলাপ শুনছিলাম। তোমরা আমার প্রিয়জন; আমিও তোমাদের প্রিয়; সুতরাং আমার প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের উচিত নয়।

> ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
> যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥
> ১০-৩২-২২॥

হে সখিরা! তোমরা দুশ্ছেদ্য সংসার-সম্বন্ধ ছিন্ন করে নিষ্কামভাবে ভগবান-রূপে আমাকেই একমাত্র ভজনা করেছ। তোমাদের এই সদাচারের ঋণ আমি দেবতাদের পরমায়ু পেলেও শোধ করতে পারব না। অতএব তোমরা নিজগুণে আমার ঋণ পরিশোধ করে নিও।

ভক্ত এবং ভগবানের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। ভক্ত না থাকলে ভগবানের করুণার কথা, তাঁর মহিমার কথা জগতে কে প্রচার করত? ভক্ত ও ভগবান, দুই জনেই দুই জনের ঋণে চির-আবদ্ধ। কৃষ্ণ যেমন বলছেন—চির জীবনেও তোমাদের সদাচারের ঋণ শোধ করতে পারব না, ঠিক সেইভাবেই গোপীরাও হয়ত বলবেন—হে করুণাময়! তোমার অসীম কৃপার জন্য আমরা চিরজীবন তোমার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত গোপীরা তাঁরই মুখে এমন প্রাণ-মাতানো কথা শুনে সমস্ত বিরহজনিত দুঃখ ত্যাগ করলেন।

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০-৩৩-৩ ॥

রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক দুই দুই গোপীর মাঝখানে অবস্থান করে তাঁদের কণ্ঠ ধারণ করলেন। তখন প্রত্যেক গোপীই মনে করেছিলেন—কৃষ্ণ আমার কাছেই আছেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার প্রভাবে অসংখ্য কৃষ্ণে পরিণত হয়ে মণ্ডলাকারে অবস্থিত প্রত্যেক গোপীর পাশেই অবস্থান করেছিলেন। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিজের কাছে দেখে আনন্দের আতিশয্যে, তিনি যে দুই পাশেই আছেন, তা আর চিন্তা করলেন না।

সেই রাসোৎসব দেখবার জন্য দেবতারা সস্ত্রীক শত শত বিমানে চড়ে এলেন। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি এবং দুন্দুভি বাজতে লাগল। গন্ধর্বেরা আপন আপন পত্নীদের সাথে ভগবানের পবিত্র মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন।

রাসমণ্ডলে তখন অসংখ্য কৃষ্ণ এবং শত শত ব্রজবালার বলয়, নূপুর এবং কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ হতে লাগল।

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ১০-৩৩-৬ ॥

রাসমণ্ডলে ভগবান দেবকীনন্দন স্বর্ণবর্ণা গোপীদের মাঝে নীলকান্ত মণির মতো শোভা পেতে লাগলেন। এখানে গোপীদের মাঝে কৃষ্ণের বর্ণনা করা হয়েছে। সোনার মণি দিয়ে মালা গেঁথে যদি তার মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত মণি দেওয়া হয়, তাহলে সেই মালার অপূর্ব শোভা হয়। সেইরকম গোলাকার রাসমণ্ডলে স্বর্ণবর্ণা গোপীদের মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণেরও অতি অপরূপ শোভা হয়েছিল।

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ১০-৩৩-৭॥

কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজবালারা চুল এবং কটিদেশের কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিয়ে, পদবিন্যাস, করচালন ও সহাস-ভ্রূভঙ্গি সহকারে কৃষ্ণ গুণগান করতে লাগলেন; নৃত্য করতে করতে তাঁদের বক্ষঃস্থলের বসন শিথিল হলো, গণ্ডস্থলে কুণ্ডল দুলতে লাগল এবং মুখকমলে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। ঐ সময় তাঁরা কৃষ্ণের পাশে পাশে থেকে, মেঘমণ্ডলে চপলার মতো শোভা পেতে লাগলেন।

আগের শ্লোকে গোপীদের মাঝে কৃষ্ণের শোভা বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে অসংখ্য কৃষ্ণের মাঝে গোপীদের শোভা বর্ণনা করা হলো। তাৎপর্য একই। যদি গোপীদের মাঝে কেবল কৃষ্ণের সৌন্দর্যই বলা হতো, তাহলে বর্ণনার অঙ্গহানি হতো; কারণ এই লীলা সাধকদের ধ্যানের বিষয়; তাই কৃষ্ণের মাঝে মাঝে তাঁর শক্তি গোপীদেরও বর্ণনা করা হলো।

গোপীরা স্বভাবতই আনন্দপ্রিয় এবং তাঁদের কণ্ঠস্বরও ছিল অতি মধুর। তাঁরা কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে অধিকতর আনন্দিত হয়ে নৃত্য করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে গান করতে লাগলেন; তাঁদের গানে বিশ্বসংসার পরিব্যাপ্ত হলো।

এইবার ভাগবতকার প্রধান প্রধান গোপীদের বিলাস বর্ণনা করছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে সাতটি সুরের উল্লেখ আছে; তার মধ্যে ষড়জ হচ্ছে একটি।

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ১০-৩৩-৯ ॥

কোন গোপী কৃষ্ণের সাথে অতি মধুর স্বরে ষড়জাদি সুরে আলাপ, গান করলেন, ঐ আলাপ অবিমিশ্র অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ হওয়াতে কৃষ্ণ খুশি হয়ে 'সাধু সাধু' বলে তাঁর প্রশংসা করলেন। ইনি বিশাখা। আর একজন গোপী ঐ বিশুদ্ধ ষড়জাদি আলাপ ধ্রুব তালের সাথে করলেন; তা শুনে কৃষ্ণ আরও প্রীত হয়ে সেই গোপীর অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। ইনি ললিতা।

কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১০-৩৩-১০ ॥

রাসনৃত্যে ক্লান্ত হয়ে কোন গোপী বাহু দিয়ে পার্শ্বস্থিত কৃষ্ণের স্কন্ধ ধারণ করলেন। পরিশ্রমে তাঁর বলয় ও মল্লিকার মালা বিগলিত হয়ে পড়েছিল। ইনি শ্রীরাধা।

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ ১০-৩৩-১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শরীর স্বভাবতই পদ্মগন্ধযুক্ত। কোন গোপী আপন স্কন্ধস্থিত চন্দন-চর্চিত কৃষ্ণ-বাহু আঘ্রাণ করে রোমাঞ্চিত হয়ে বার বার চুম্বন করতে লাগলেন। ইনি শ্যামলা।

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত-কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাত্তাম্বূলচর্বিতম্ ॥ ১০-৩৩-১২ ॥

নৃত্যবশত চঞ্চল কুণ্ডলের প্রভায় কোন গোপীর কপোল সমুজ্জ্বল হয়েছিল। তিনি কৃষ্ণের কপোলে আপন কপোল সংলগ্ন করলেন; ভগবান তাঁর মুখে চর্বিত তাম্বুল প্রসাদ প্রদান করলেন। ইনি শৈব্যা।

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥
১০-৩৩-১৩॥

কোন ব্রজবালা নূপুর ও মেখলাধ্বনির সাথে নৃত্য এবং গান করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পার্শ্বস্থ কৃষ্ণের করকমল আপন হৃদয়ের উপর স্থাপন করলেন। এঁরা হলেন চন্দ্রাবলী ও পদ্মা।

এইভাবে অন্যান্য গোপীরাও নিজের নিজের ভাব অনুসারে কৃষ্ণের সাথে বিহার করতে লাগলেন। ব্রজসুন্দরীরা লক্ষ্মীর একান্ত প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ বাহু দিয়ে তাঁদের গলা জড়িয়ে ধরায় গোপীরা পরম আনন্দ অনুভব করে তাঁর গুণগান করতে লাগলেন।

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ-স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥
১০-৩৩-১৬॥

বালক যেমন আপন প্রতিবিম্ব ছায়ার সাথে খেলা করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইরকম আলিঙ্গন প্রণয় নিরীক্ষণ করগ্রহণ এবং হাস্য সহকারে ব্রজসুন্দরীদের সাথে খেলা করলেন।

পাছে ভগবানের এই পরম পবিত্র লীলা শ্রবণ করে মানুষের মনে জাগতিক

ভাবের উদয় হয়—এই আশঙ্কায় শুকদেব কৌশলে এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের স্বরূপ দেখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন বালক যেমন নিজের প্রতিবিম্বের সাথে খেলা করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেইরকম আপন শক্তি-স্বরূপা গোপীদের সাথে খেলা করেছেন। শুকদেব স্পষ্টই বললেন যে, বালক ও তার প্রতিবিম্বের মতো শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীরা আলাদা নয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ কোন নারীর সাথে বিহার করেন নি; তিনি তাঁর নিজের শক্তির সাথেই খেলা করেছেন।

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১০-৩৩-১৮॥

দেবস্ত্রীরা বিমান থেকে গোপীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের এইরকম ক্রীড়া দেখে, তাঁরাও ভগবানকে পাবার কামনায় মোহিত হলেন। চন্দ্র এই লীলা দর্শন করে নক্ষত্রাদির সাথে পরম বিস্মিত হয়ে নিজের গতির কথা ভুলে গেলেন। ফলে সেই রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়েছিল।

মহাদেব কন্দর্পকে ভস্ম করে তার প্রভাব থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পকে না মেরে তাকে মোহিত করেই অনাসক্তভাবে ব্রজবালাদের সাথে বিহার করেছিলেন। ভগবানের এই অনাসক্ত কামগন্ধহীন লীলা দেখে স্বর্গের দেবীরাও মোহিত হয়েছিলেন; ভগবানের এই মদন-দলন লীলা দেখে তাঁদেরও হৃদয়স্থিত মদন মোহিত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হয়েও যত গোপী তত কৃষ্ণ হয়ে বিহার করেছিলেন। বহুক্ষণ নৃত্য-গীতাদিতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কৃপাময় ভগবান নিজের করকমল দিয়ে গোপীদের মুখ মুছিয়ে দিলেন।

পরিশ্রান্ত গজরাজ যেমন শৈলসেতু বিদারিত করে হস্তিনীদের সাথে জলমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্লান্তি দূর করবার জন্য গোপীদের সাথে যমুনার জলে প্রবেশ করলেন। ব্রজবালারা তখন সহাস্যে চতুর্দিক থেকে জল ছিটিয়ে কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করলেন। আকাশ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে ভগবানের স্তবগান করতে লাগলেন। সত্যসংকল্প ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অনুরক্ত ব্রজবালাদের সাথে শরৎকালের চন্দ্রালোকিত সুদীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করলেন।

রাসলীলার বর্ণনা এখানেই শেষ হলো। এই বর্ণনা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করলেন—হে ব্রহ্মন্! সমস্ত জগতের যিনি নিয়ন্তা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরক্ষা এবং অধর্মের নাশের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন; তিনি ধর্মের উপদেষ্টা, কর্তা এবং রক্ষক হয়ে এইরকম ধর্ম-বিরুদ্ধ পরস্ত্রী-সংসর্গ কেন করলেন?

রাসলীলার বর্ণনার মধ্যেই শুকদেব এই বিষয়ের আলোচনা করেছেন; কিন্তু মানুষের মন অত্যন্ত সন্দেহ-প্রবণ। তাই ভগবানের উপর কোনরকম সন্দেহ পোষণ করে মানুষ যাতে পাপের ভাগী না হয়, তার জন্য মহাপ্রাণ পরীক্ষিৎ আবার এই প্রশ্ন তুললেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরীক্ষিতের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না; জগতের লোকের কল্যাণের জন্যই তাঁর এই জিজ্ঞাসা।

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ॥ ১০-৩৩-২৯ ॥

শুকদেব বললেন—ঈশ্বরের মধ্যে ধর্মের ব্যতিক্রম ও দুঃসাহস দেখা যায়, কিন্তু অগ্নি যেমন সর্বভোজী হয়েও অপবিত্র হয় না, সেইরকম তেজস্বী পুরুষের ধর্ম-ব্যতিক্রম দোষের হয় না।

এখানে তেজস্বী মানে কর্তৃত্বাভিমানরহিত ব্যক্তি। কিন্তু যাদের দেহাভিমান আছে, যারা ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র, তারা কখনো মনেও ঐরূপ আচরণের চিন্তা করবে না। সাগরমন্থনের বিষ একমাত্র মহাদেবই পান করেছিলেন; অপরে ঐ বিষ স্পর্শ করলেও বিনষ্ট হতো। সেইরকম দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মূঢ়তার বশে ঐরকম আচরণ করলে নিজেই বিনষ্ট হবে।

মহাপুরুষেরা যা করতে বলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে তা করাই মঙ্গলকর। মহাপুরুষদের যেসব কাজ তাঁদের উপদেশের অনুরূপ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইসব কাজই করবে। মহাপুরুষদের সব কাজের অনুকরণ করা মূঢ়তার লক্ষণ। মহাদেবের মতো যদি কেউ বিষপান করে, তাহলে তার ধ্বংস অবধারিত। হে মহারাজ! নিরহঙ্কার পুরুষের সদাচরণেও পুণ্য নেই আবার বাহ্যত অসদাচরণেও পাপ নেই। সুতরাং 'তেজীয়সাং' তেজস্বী পুরুষ বলতে নিরহঙ্কার পুরুষ কর্তৃত্বাভিমানরহিত ব্যক্তি, যার 'আমি আমার' বোধ নেই, এমন লোককেই বুঝতে হবে।

শুকদেব আরও বললেন—যাঁর পদরজ আস্বাদনে তৃপ্ত হয়ে মুনিঋষিরা যোগবলে সমস্ত বন্ধন ছেদন করে, স্বেচ্ছাচার করলেও আর বদ্ধ হন না, সেই লীলাবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায়?

যাঁকে আশ্রয় করে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়, তাঁর নিজের আবার বন্ধন কেমন করে সম্ভব হতে পারে? ঈশ্বর-তত্ত্ব বোঝাবার জন্য কত শাস্ত্র, কত ভাষ্য, কত টীকা-টিপ্পনীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যে মতভেদ, সে মতভেদই রয়ে গেছে। আসল কথা হলো এই যে, ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝতে হলে সর্ব প্রথমেই চাই বিশ্বাস। যার বিশ্বাস হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, তার কাছে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা এক মুহূর্তেই হয়ে যায়।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ এব ক্রীড়নদেহভাক্ ॥

১০-৩৩-৩৪ ॥

যিনি গোপী, তাঁদের পতি এবং সর্বদেহধারী জীবমাত্রেরই অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করেন, তিনিই লীলাবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন; সুতরাং তাঁর পরও নেই পরদারও নেই; তিনিই সব হয়েছেন। বাইরের দৃষ্টিতেই কৃষ্ণ ও গোপীদের বিহার; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে আপন জীব-রূপা প্রকৃতির সাথে পরমাত্মার মিলন—নিজের সাথেই নিজে খেলা করছেন। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়েই জীবাত্মার সাথে খেলা চলছে। এইজন্যই শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকার প্রথমেই বলেছেন—রাসলীলায় শৃঙ্গার রসের কথা কেবল ছলমাত্র; আসলে এই লীলা মুক্তি প্রদায়িনী।

অনুগ্রহ করবার জন্যই ভগবান নরদেহ ধারণ করে এমন সব চিত্তাকর্ষক লীলা করেন, যাতে মানুষ সেইসব লীলার কথা শুনে, ধ্যান করে ভগবৎ-পরায়ণ হতে পারে।

গোপীদের পতিরা কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হয়ে আপন আপন স্ত্রীদের নিজেদের কাছেই দেখেছিলেন; সুতরাং তারা কৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করেননি। শ্রীকৃষ্ণের সাথে সেই সুদীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করে গোপীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কেন পরস্ত্রীর সাথে বিহার করলেন? উত্তরে শুকদেব নানা কথার উত্থাপন করে দেখালেন যে, কৃষ্ণ পরস্ত্রীর সাথে বিহার করেন নি; তিনি নিজের সাথেই নিজে খেলা করেছেন, যেমন বালক তার প্রতিবিম্বের সাথে খেলা করে। এই বিষয়ে সর্বকালের সকল মানুষের সন্দেহ দূর করবার জন্য শুকদেব বললেন ঃ

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ১০-৩৩-৩৯॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গোপীদের সাথে ভগবান বিষ্ণুর এই রাসলীলা শ্রবণ অথবা কীর্তন করেন, তিনি অচিরেই কাম-নামক উৎকট হৃদ্‌রোগ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন।

আধ্যাত্মিক জীবন লাভেপ্সু ব্যক্তির পক্ষে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে!

২৭

কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা গমন

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা প্রায় শেষ হয়ে এল। মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কেন মথুরার পিতৃগৃহ ছেড়ে ব্রজে গিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের মধ্যেই পরীক্ষিৎ ইঙ্গিতে বলেছিলেন—যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, সেই শ্রীকৃষ্ণ যে কংসের ভয়ে মথুরা ছেড়ে ব্রজে যান নি, তা আমি জানি; শুনেছি ব্রজধামে তিনি তাঁর মুকুন্দ নাম সার্থক করেছিলেন; মু অর্থাৎ মুক্তি সুখ, কু অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়, এমন ভগবৎপ্রেম যিনি দান করেন, তিনিই মুকুন্দ। সুতরাং ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ এমন কী লীলাখেলা করেছিলেন, যার রস আস্বাদন করে ব্রজবাসীরা ভগবৎপ্রেমে সর্বদাই বিভোর থাকতেন? সেই অপার্থিব ব্রজপ্রেমের কথা আমাদের বলুন।

ভক্তিপথে ভগবানকে লাভ করার জন্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি ভাবের কথা রয়েছে। শান্ত এবং দাস্য ভাবের কথা অনেক জায়গাতেই রয়েছে; কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কথা তেমন বিশেষ পাওয়া যায় না। শুকদেব এই তিনটি ভাবের কথা, এইসব ভাবের সাধকদের কথা এবং তাদের ভাবের পূর্ণ পরিণতির অবস্থা ব্রজলীলায় বিশেষভাবে বলেছেন।

সখ্যভাবে সিদ্ধ কৃষ্ণ-সখাদের সম্বন্ধে বলতে বলতে শুকদেব নিজেই বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন ঃ

জ্ঞানী এবং যোগীরা যাঁকে ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ, পরমপুরুষ বলে জেনেছেন, দাস্য-ভক্তেরা যাঁকে স্বয়ং ভগবান বলে অনুভব করেছেন এবং মায়ামুগ্ধ জীবেরা যাঁকে সাধারণ বালক বলে মনে করেছিল, সেই পরমাত্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে যেসব গোপবালকেরা সখার মতো খেলা করেছিলেন — তাদের কি আর পুণ্যের অন্ত আছে?

নন্দ-যশোদার বাৎসল্যভাবের কথা শুনতে শুনতে মহারাজ পরীক্ষিৎ মোহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ১০-৮-৪৬ ॥

হে ব্রহ্মর্ষি! নন্দমহারাজ এমন কী মহাতপস্যা করেছিলেন এবং মহা-ভাগ্যবতী যশোদাই বা এমন কী সুকৃতি করেছিলেন, যার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর স্তনপান করেছিলেন?

আর মধুরভাবময়ী গোপীদের ভাব এবং অবস্থা চাক্ষুষ দেখে, মহাভক্ত এবং পরমজ্ঞানী কৃষ্ণের একান্ত সচিব উদ্ধব নিজেকে তাঁদের কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলে মনে করে বলেছিলেন—এই বৃন্দাবনে গোপীদের পদধূলিতে পবিত্রীকৃত গুল্ম লতা ওষধি প্রভৃতির মধ্যে যে-কোন একটি হয়েও যদি আমি জন্মগ্রহণ করতে পারি, তাহলে নিজেকে মহাভাগ্যবান বলে মনে করব; কারণ আমি তখন গোপীদের চরণরেণু লাভ করতে সমর্থ হব।

শ্রীকৃষ্ণ সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাবে সিদ্ধ তাঁর আপনজন, ব্রজবাসীদের সাথে অপার্থিব মনোরম লীলা করে তাঁদের আনন্দসাগরে ভাসিয়ে, নিজেও সেই আনন্দের আস্বাদন করেছেন। কিন্তু আর কতদিন তিনি তাঁর মুষ্টিমেয় প্রেমাস্পদ আপনজনদের নিয়ে পরম আনন্দে কাটাবেন? নিজেরই প্রতিজ্ঞার কথা কি তিনি ভুলে গেলেন? ক্ষীরোদসাগর তীরে ব্রহ্মাদি দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, স্বয়ং তিনি অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদের বিনাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করবেন। এদিকে যে অসুরদের অত্যাচারে প্রজারা 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ছে; বসুদেব-দেবকী কংস-কারাগারে দুঃসহ কষ্টে কৃষ্ণের আগমনের আশায় দিন গুণছেন; দেবকীর হৃদয়ভেদী মূক আহ্বান হৃদয়েই গুমরাতে থাকে—কবে তুমি আসবে! সুতরাং কৃষ্ণই বা আর কতদিন আত্মগোপন করে ব্রজের আনন্দে বিভোর থাকবেন?

ত্রিকালদর্শী নারদমুনি জানতেন যে, কংসের পাপের মাত্রা পূর্ণ না হলে ভগবান আসবেন না; সুতরাং জগতের মঙ্গলের জন্য কংসের পাপের মাত্রা যাতে তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয়, তার জন্য নারদমুনি উপায় চিন্তা করে একদিন কংসের কাছে এসে বললেন—ওহে কংস! তোমার তো মনে আছে, দেবকীর বিবাহের দিন আকাশবাণী হয়েছিল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোমার মৃত্যুর কারণ হবে। কিন্তু অষ্টম গর্ভের সন্তান বলে যাকে তোমার হাতে দেওয়া হলো সে ছিল একটি কন্যা! তুমি তাকে আছাড় মারতেই সে

তোমার হাত থেকে আকাশে উঠে গিয়ে অষ্টভুজা দেবীমূর্তি ধারণ করে বলেছিল—তোমার প্রাণহন্তা জন্মগ্রহণ করেছেন; এ সবই তুমি জান। যা জান না তাই এখন তোমায় বলছি; দেবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যা হয় নি, পুত্রই হয়েছিল; বসুদেব সেই রাত্রেই নবজাত পুত্রটিকে নন্দালয়ে নিয়ে গিয়ে যশোদার পাশে রেখে যশোদার কন্যাটিকে এনে তোমায় দিয়েছিল। এদিকে দেবকীর পুত্রটি যশোদার পুত্ররূপে পরিচিত হয়ে গোকুলে লালিতপালিত হতে লাগল; ক্রমে সেই পুত্রটিই তোমার অনুচর রাক্ষস ও অসুরদের—পূতনা, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতিকে বধ করেছে। নারদের কাছে এই সব কথা শুনে কংস তখনই বসুদেবকে বধ করতে উদ্যত হলো। নারদ তখন কংসকে বুঝিয়ে বললেন—বসুদেবকে বধ করে তোমার লাভটা কি হবে? তোমার আসল শত্রু তো বসুদেব নয়—কৃষ্ণ; সুতরাং কৃষ্ণের সম্বন্ধে কি করবে, তা-ই আগে ঠিক কর।

নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ।
জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্ববন্ধ সহ ভার্যয়া ॥ ১০-৩৬-১৯ ॥

দেবর্ষি নারদ বসুদেবকে বধ করতে নিষেধ করলে কংস তখন বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ-বলরামকেই তার মৃত্যুর কারণ জেনে, বসুদেবকে দেবকীর সাথে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করল।

দেবর্ষি নারদ চলে যাবার পর কংস তার মন্ত্রীদের ডেকে বলল—আমি নিশ্চিত জেনেছি, বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ-বলরাম নন্দব্রজে বাস করছে। তারাই আমার মৃত্যুকারক; সুতরাং তাদের মথুরায় এনে তোমরা মল্লক্রীড়ার ছল করে তাদের বধ করবে। এই উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে ধনুর্যজ্ঞের ব্যবস্থা কর; যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে মল্ল খেলার জন্য সুন্দর মঞ্চ তৈরি কর, যাতে প্রজারাও এই মল্লযুদ্ধ দেখতে পারে। তাছাড়া মল্লভূমির প্রবেশ দ্বারে আমার অতি প্রিয় কুবলয়াপীড় নামের মদমত্ত হস্তীটিকে রেখে দেবে, যাতে কৃষ্ণ-বলরাম মল্লভূমিতে প্রবেশ করার আগেই ঐ হাতিটি তাদের বধ করতে পারে। যদি কোন রকমে তারা ঐ হাতিকে এড়িয়ে মল্লভূমিতে প্রবেশও করে, তবে হে চাণূর! হে মুষ্টিক! তোমরা কাছাকাছিই থাকবে; তোমাদের মতো শক্তিমান এবং মল্লক্রীড়ায় পারদর্শী জগতে আর কেউ নেই; সুতরাং ঐ শিশু দুটিকে তোমরা অনায়াসেই বধ করতে পারবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কংস যখন তার পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করল, তখন কংসের অত্যাচারে ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতি বংশের লোকেরা মথুরা ছেড়ে বিভিন্ন দেশে গিয়ে গোপনে বসবাস করতে লাগলেন; তাদের মধ্যে কয়েকজন শুভদিনের আশায়, কংসের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে মথুরাতেই বাস করছিলেন; অক্রূর ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

এই অক্রূরকে সম্মান করে কংস বলল—হে অক্রূর ! ভোজ এবং বৃষ্ণি বংশে তোমার মতো হিতাকাঙ্ক্ষী আমার আর কেউ নেই ; সুতরাং তোমার উপরেই একটি বিশেষ কাজের ভার দিতে চাই।

তুমি শিগ্‌গির নন্দব্রজে গিয়ে বসুদেবের দুই পুত্র—কৃষ্ণ-বলরাম, যারা ওখানেই রয়েছে, তাদের রথে করে এখানে নিয়ে আসবে। তাছাড়া ধনুর্যজ্ঞে দুধ দই ক্ষীর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দরকার হবে; সুতরাং নন্দ প্রভৃতি গোপদেরও ঐ সব জিনিস নিয়ে আসার জন্য যথাযোগ্য নিমন্ত্রণ করবে।

কংস তখন প্রাণ খুলে অক্রূরকে বলল—আসল কথা কি জান? কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় এনে আমি তাদের বিনাশ করব। তাদের বধ করার পর বসুদেব ও তার অনুচরদের সবাইকে আমি হত্যা করব। তারপর রাজ্য-কামুক আমার বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে বধ করে আমি নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করব। আমার মনের কথা এবং কার্যপ্রণালী তোমায় বললাম। তুমি এখন কৃষ্ণ-বলরামকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে এবং মথুরার শোভা দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে সত্বর এখানে নিয়ে এস।

অক্রূর ছিলেন মহাভক্ত; তিনি নিজের ভাব গোপন করে কৃষ্ণদর্শনের জন্য মথুরায় অবস্থান করছিলেন। সেই অক্রূর কংসের আদেশে যখন রথারোহণে ব্রজে যাচ্ছিলেন, তখন স্বভাবতই তিনি কৃষ্ণ-দর্শনের আশায় মনে মনে ভাবতে লাগলেন ঃ

কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্‌দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্ ॥ ১০-৩৮-৩ ॥

অক্রূর ভাবছেন—আমি এমন কী শুভ কাজ করেছি অথবা এমন কি সুকঠিন তপস্যা করেছি, কিংবা মহাভক্ত-রূপ যোগ্য পাত্রে এমন কি দান

করেছি, যার ফলে ব্রহ্মাদিরও যিনি ঈশ্বর সেই শ্রীকেশবের আজ দর্শন লাভ হবে?

এখন আমি নিশ্চিতরূপে বুঝেছি যে, আমার অশুভ কর্ম সকল বিনষ্ট হয়েছে এবং আজ আমার জন্ম সার্থক হলো; কারণ যোগীরা যাঁর শ্রীচরণ ধ্যান করেন, আজ আমি সাক্ষাৎভাবে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতে পারব।

অক্রূর ভাবছেন—কি আশ্চর্য! যে কংস ভুলেও কখনো কারও হিতাচরণ করে না, সেই কংস আজ আমার পরম মঙ্গল, সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার একমাত্র উপায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে! কংস-প্রেরিত হয়ে আজ আমি কৃষ্ণ-চরণে প্রণত হয়ে আমার জীবনকে সার্থক করব। ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁর চরণ বন্দনা করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, ঋষি-মুনিরা এবং ভক্তেরা যাঁর শ্রীচরণ পূজা করেন, গোপীকাদের কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত সেই শ্রীচরণ আজ আমি দর্শন করব। আমার কি সৌভাগ্য! ভক্ত অক্রূর তার ইষ্টদেবতা সর্বলোকপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যাচ্ছেন; তার কি আর ভাবনা, উৎকণ্ঠার শেষ আছে! অক্রূর আনন্দে বিহ্বল হয়ে রথে বসে বসেই শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করছেন—আজ আমি নিশ্চয়ই তাঁকে দর্শন করতে পারব। কেন অক্রূরের এই নিশ্চয় জ্ঞান হলো? অক্রূর দেখলেন বনের কিছু হরিণ তার রথের পাশে ঘোরাঘুরি করছে; এই মঙ্গলসূচক দৃশ্য দেখে অক্রূর ভাবলেন—হরিণেরা যখন আমাকে প্রদক্ষিণ করছে, তখন আজ নিশ্চয়ই আমার কৃষ্ণ-দর্শন হবে। আহা! কৃষ্ণের কুঞ্চিত কেশপাশে ঈষৎ আবৃত কপোল এবং নাসিকা কি সুন্দর! অরুণাভা-যুক্ত হরিণের মতো বিশাল সুন্দর নয়ন দিয়ে তিনি যখন সহাস্যে তাকান তখন তা কতই না মনোহর হয়! জগতের ভার দূর করার জন্য যিনি স্বেচ্ছায় দেহধারণ করেছেন, সেই সর্বলাবণ্য-নিকেতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করেও কি আমার চক্ষুদ্বয় চিরকৃতার্থ হবে না? অর্থাৎ ভগবানকে দর্শন করার পর জগতের আর কোন কিছুই আমার দর্শনীয় থাকবে না। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবেন, এই চিন্তার আনন্দেই অক্রূর বিভোর হয়ে ভাবছেন, অখিলরসামৃত মূর্তি, আনন্দঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে আজ আমার চক্ষু সার্থক হবে।

অক্রূর তন্ময় হয়ে ভাবছেন—আমি যখন সত্যই তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত

হব, তখন আমি কিভাবে তাঁকে সম্বোধন করব? আমরা যখন কোন বহু সম্মানিত লোকের সাথে দেখা করতে যাই তখন আগে থেকেই ভাবতে থাকি, কিভাবে তাঁকে সম্মান দেখাব, কিভাবে তার সাথে প্রথম কথা বলব ইত্যাদি। অক্রূর ভাবছেন—শ্রীকৃষ্ণকে দেখামাত্র আমি রথ থেকে নেমে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ব এবং তাঁর সখাদের প্রণাম করব।

সাধক তাঁর ইষ্টের ধ্যানের সময় এই সব চিন্তাই করতে থাকে— আমার ইষ্টদেব করুণাঘন মূর্তিতে আমাকে কৃপা করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন; আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি তাঁর বরপ্রদ হস্ত আমার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করবেন ইত্যাদি।

অপ্যঙ্ঘ্রি মূলে পতিতস্য মে বিভুঃ
শিরস্যধাস্যন্নিজহস্ত-পঙ্কজম্।
দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা
প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাম্ ॥ ১০-৩৮-১৬ ॥

অক্রূর ভাবছেন—আমি যখন সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করব তখন তিনি সর্বব্যাপী হলেও কৃষ্ণরূপে যে হাত দিয়ে তিনি সংসারক্লিষ্ট জীবদের অভয় দেন, সেই হাত আমার মাথায় রাখবেন; কারণ আমি তাঁরই শরণাকাঙ্ক্ষী।

যদিও আমি কংসের দূত হয়ে যাচ্ছি এবং কংস দুরভিসন্ধি করেই আমাকে পাঠাচ্ছে , তবুও তিনি আমার প্রতি রাগ করবেন না; কারণ তিনি যে সর্বান্তর্যামী, সকলের অন্তরের ভাবই জানেন; সুতরাং আমার মনের কথাও তাঁর অজানা নয়। জগতে আর কেউ না জানলেও তিনি তো জানেন যে, বাইরে আমি শত্রুভাবাপন্ন কংসের দূত হয়ে এলেও অন্তরে অন্তরে আমি তাঁরই ভক্ত; সুতরাং তিনি আমার প্রতি রাগ করতেই পারেন না; তিনি যে ভক্তবৎসল। ভগবান তার উপর বিরূপ হবেন না, এইটি স্থির জেনেও অক্রূরের তৃপ্তি হচ্ছে না; তাই তিনি ভাবছেন—শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে পরম বন্ধু, তাঁর আত্মীয় এবং তাঁরই একান্ত দাস্য-ভক্ত বলে তাঁর বিশাল বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করেন, তবে সেই মুহূর্তে আমার শরীর মন পবিত্র হয়ে আমার সকল কর্ম-বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে।

রথে যেতে যেতেই অক্রূর অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছেন।

ভাবছেন—আমি যখন তাঁকে প্রণাম করব, তখন মহাকীর্তিকারী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যখন 'হে অক্রূর', 'হে তাত' বলে সম্বোধন করবেন, তখন আনন্দে আমি আর আমাতে থাকব না; তখন আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হবে—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, আমার আনন্দ দেখে যা, আমার জন্ম সার্থক হয়েছে, দেখে যা।

এতক্ষণ অক্রূর কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাই ভাবছিলেন, এবার তাঁর বলরামের কথা মনে হলো; তাই তিনি ভাবলেন—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ যদুকুলশ্রেষ্ঠ, বলরাম আমাকে তাঁর পদপ্রান্তে পতিত দেখে স্বহস্তে তুলে আলিঙ্গন করে ঘরের ভেতর নিয়ে যাবেন। সেখানে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে আমাকে আপ্যায়িত করে আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কংসের আচরণ সম্বন্ধে আমায় জিজ্ঞাসা করবেন। অক্রূর এই ভাবে বৃন্দাবনে আসতে আসতে সমস্ত রাস্তাই শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব সৌন্দর্য তাঁর অশেষ গুণাবলী এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের চিন্তায় আনন্দে বিভোর হয়ে রইলেন।

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্বফল্কতনয়োঽধ্বনি।
রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্যশ্চাস্তগিরিং নৃপ ॥ ১০-৩৮-২৪॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ! শ্বফল্ক-পুত্র অক্রূর এইভাবে সমস্ত পথ কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর থেকে যখন গোকুলে এসে উপস্থিত হলেন তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পায়ের তলায় যে-সব অলৌকিক চিহ্ন—ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ইত্যাদি রয়েছে—সেই সব চিহ্নে শোভিত শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ছাপ গোকুলের রাস্তার উপর অক্রূর দেখতে পেলেন।

তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ প্রেম্নোর্দ্ধরোমাশ্রু-কলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেম্বচেষ্টত প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি ॥
১০-৩৮-২৬॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখে অক্রূর তখন প্রেম-পুলকিত দেহে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে, আহা! এইগুলি আমার প্রভুর চরণচিহ্ন—এই বলে রাস্তার সেই চরণচিহ্নের উপরই গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

মানুষের সকল দম্ভ অহমিকা দূর না হলে ভগবানের দর্শন হয় না; অক্রূর সারাটা রাস্তা ভগবানের চিন্তা করতে করতে এসেছেন; এই ভগবৎ চিন্তার

ফলে তাঁর হৃদয় পবিত্র হয়েছিল এবং কৃষ্ণের দর্শনের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। হয়ত তখনও তাঁর মনে কিছুটা অহমিকা ছিল—আমি কংসের দূত হয়ে কৃষ্ণের কাছে যাচ্ছি। রাস্তায় কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখে অক্রূর ভাবে বিহ্বল হয়ে, সেই চরণচিহ্নের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। এতে অক্রূরের সমস্ত মোহ-কালিমা দূর হলো, ভগবানের পায়ে তাঁর আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হলো। সুতরাং ভগবৎ-দর্শনের আর দেরি কি?

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ ॥ ১০-৩৮-২৮ ॥

এর পর অক্রূর ব্রজের গোদোহন স্থানে যেতেই শরৎকালীন প্রস্ফুটিত কমল-সদৃশ নয়নে শোভিত পীত বসন পরিহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং নীলাম্বরধারী বলরামকে দর্শন করলেন। অক্রূর দেখলেন—এঁরা দুজনেই কিশোর বয়স্ক, এক জনের শ্যামবর্ণ আর একজনের শ্বেতবর্ণ; দুই জনেই দীর্ঘ বাহু, প্রসন্ন বদন এবং পরম সুন্দর। অক্রূর আরও দেখলেন যে, তাঁরা ছোট বড় বহু বনমালা পরে রয়েছেন।

শুকদেব বলছেন—হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম নিজেদের অসাধারণ তেজে সন্ধ্যার অন্ধকার দূর করে ইন্দ্রনীল পর্বত এবং সুবর্ণ-খচিত রৌপ্য পর্বতের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। অক্রূরের প্রথম কৃষ্ণ-দর্শন; সুতরাং আনন্দে স্নেহ-বিহ্বল চিত্তে অক্রূর তখন তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে কৃষ্ণ-বলরামের চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হলেন। সেই পরম মুহূর্তে অক্রূরের কি অবস্থা হলো?

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদ-বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠাৎ স্বাখ্যানে নাশকন্নৃপ ॥ ১০-৩৮-৩৫॥

ভগবৎদর্শনের সর্বগ্রাসী আনন্দে অক্রূরের চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় প্রেমাশ্রু পড়তে লাগল, দেহ রোমাঞ্চিত হলো এবং তীব্র ব্যাকুলতার জন্য তিনি নিজের পরিচয়ও দিতে পারলেন না।

আমেরিকার দুই মহিলা সিস্টার কৃস্টিন এবং মিসেস ফাঙ্কি স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বক্তৃতা শুনে স্বামীজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু স্বামীজীর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তারা প্রায় দেড় বছর

স্বামীজীর কোন সংবাদ পান নি। হঠাৎ এক বন্ধুর কাছে জানলেন যে, স্বামীজী তখন প্রায় ৫০০ মাইল দূরে সহস্র দ্বীপোদ্যানে রয়েছেন। পরদিনই সকালে তাঁরা স্বামীজীর কাছে শিক্ষালাভের সংকল্প নিয়ে রওনা হলেন। রাস্তায় সারাটা দিন কেটে গেল; যখন তাঁরা সহস্র দ্বীপোদ্যানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে ; অন্ধকার রাত, একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে এবং তাঁরা নিজেরা অত্যন্ত ক্লান্ত। সারাটা দিনই তাঁরা স্বামীজীর কথা ভেবেছেন; নিজেরা মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন , স্বামীজীকে প্রথম দেখবার পর তাঁরা কি বলবেন। অবশেষে তাঁরা যখন সত্যই স্বামীজীর সামনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁরা যেসব কথা স্বামীজীকে বলবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তা সব ভুলে গেলেন। একজন হঠাৎ বলে উঠলেন—আজ যদি যীশুখ্রীস্ট বেঁচে থাকতেন, তাহলে যেভাবে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে চাইতাম, ঠিক সেই ভাবেই আমরা আপনার কাছে এসেছি। স্বামীজী অত্যন্ত করুণাপূর্ণ নয়নে তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার যদি যীশুখ্রীস্টের মতো ক্ষমতা থাকত, তা হলে এই মুহূর্তে তোমাদের মুক্ত করে দিতাম। সারাটা দিন স্বামীজীর কাছে আসা পর্যন্ত মহিলা দুইটির মনের যে ভাব হয়েছিল, তার সঙ্গে অক্রূরের মনের ভাবের কিছুটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের আনন্দে অক্রূরের প্রেমাশ্রু পড়তে লাগল, শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হলো এবং মুখ স্বতঃই বন্ধ হয়ে গেল। যাঁকে পেলে সকল রকমের চাওয়া পাওয়া শেষ হয়ে যায়, সেই সর্বারাধ্য ভগবানকে সম্মুখে পেয়ে ভক্ত তখন নিজেকেও ভুলে যায়।

অক্রূরের মনের ভাব ও কি উদ্দেশ্যে সে এসেছে জেনে প্রণত-বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর চক্রচিহ্ন-যুক্ত হাত দিয়ে অক্রূরকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। অক্রূর যে কংসের আদেশে কৃষ্ণ-বলরামকে বধ করবার জন্য মথুরায় নিয়ে যেতে এসেছে, সর্বান্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা জানেন। তবুও অক্রূরকে কৃপা করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অভয়প্রদ বাহুর দ্বারা পরম আদরে অক্রূরকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। নিজের কাছে টেনে নিলেন—বলার অর্থ হলো এই যে, কৃষ্ণ যেন বললেন—এখন তুমি আমার হলে; কংস থেকে তোমার আর কোন ভয় থাকবে না। আত্মীয়তার সম্পর্কে অক্রূর ছিলেন কৃষ্ণের পিতৃব্য, কৃষ্ণের গুরুজন। কিন্তু

অক্রূর ছিলেন ভগবানের দাস্য-ভক্ত; সুতরাং অক্রূরের ভাব অনুযায়ীই ভগবান তাঁর সাথে ব্যবহার করলেন।

মহামনা বলরামও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গন করে, তাঁর হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে যথোচিত সমাদর ও অতিথি সৎকার করলেন। বলরাম অক্রূরকে পা ধোবার জল, বসবার আসন, মুখ ধোবার জল প্রভৃতি দিয়ে তাঁর সেবা করে অক্রূরের আনন্দবর্ধন করলেন। কৃষ্ণ-বলরামের সাদর ব্যবহারে এবং মাধুর্যপূর্ণ অতিথিসৎকারে অক্রূর ভুলেই গেলেন যে, এঁরা সাক্ষাৎ ভগবান; এঁদের সম্বন্ধে তখন অক্রূরের মনে ঈশ্বরীয় ভাব থাকলে, তিনি তাঁদের কাছ থেকে হয়তো ঐ রকম সেবা গ্রহণ করতে পারতেন না; অথবা ভক্ত চিরদিন ভগবানের ইচ্ছাই মেনে নেয় ; এখানেও অক্রূর, কৃষ্ণ-বলরামের ইচ্ছা জেনেই তাঁদের সমাদর এবং সেবা গ্রহণ করেছিলেন।

অক্রূর মথুরা থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যার পর নন্দব্রজে এসে পৌঁছেছেন; সারাটা দিন তাঁর কিছু খাওয়া হয় নি এবং তিনি পরিশ্রান্তও হয়েছিলেন। সুতরাং ক্লান্তি দূর হলে খাওয়া শেষ করে তিনি যখন সুখাসনে বসেছেন, তখন নন্দ মহারাজ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে অক্রূর! ধর্মদ্বেষী, পাপিষ্ঠ কংস বেঁচে থাকতে তোমরা কি করে তার রাজত্বে বাস করছ ? পশু বধকারী যেমন নিজের স্বার্থের জন্যই পশুপালন করে এবং সময়মত তাদের হত্যা করে, সেইরকম এই দুরাত্মা কংস, তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমাদের প্রতিপালন করছে বটে, কিন্তু যে-কোন সময়েই তোমাদের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। তার তো দয়া-মায়া বলে কিছু নেই।

যোঽবধীৎস্বস্বসুস্তোকান্ ক্রোশন্ত্যা অসুতৃপ্ খলঃ।
কিন্নুস্বিৎ তৎপ্রজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে ॥ ১০-৩৮-৪২॥

যে কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেরই আদরের ক্রন্দন-পরায়ণা ভগ্নী দেবকীর সন্তানদের একে একে নিজের হাতে বধ করেছে, তার সম্বন্ধে আর কি বলব! সে কেবল নিজের ভোগ-সুখ এবং অপরের হিংসা করতেই জানে; সুতরাং তার কাছ থেকে স্নেহ, প্রীতি আশাই করা যায় না। এ হেন স্বার্থান্বেষী ক্রূর কংসের তোমরা প্রজা; সুতরাং মথুরাবাসীদের এবং তোমাদের আর কি কুশল প্রশ্ন করব! তোমরা যে সুখে নেই, একথা বলাই বাহুল্য।

মহারাজ নন্দের এইরকম সমবেদনাপূর্ণ মধুর কথায় অক্রূর অত্যন্ত আনন্দিত হলেন; ভাবলেন—তার নন্দ-ব্রজে আসা সার্থক হয়েছে; তার সমস্ত পথশ্রম দূর হলো।

শ্রীকৃষ্ণ এইবার অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ।
অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধুনামনমীবমনাময়ম্ ॥ ১০-৩৯-৪ ॥

হে তাত ! হে সৌম্য! তোমার এখানে আসতে কোন কষ্ট হয় নি তো? তোমাদের সব মঙ্গল তো? আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলে সুস্থ শরীরে মঙ্গলমত রয়েছে তো?

এর পরেই কৃষ্ণ বলছেন—কংস যেখানে নামেই মাত্র মাতুল, আসলে সে বংশের কলঙ্ক এবং সে যেখানে রাজা, সেখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রজাদের সম্বন্ধে কি আর কুশল জিজ্ঞাসা করব? কৃষ্ণ আরও বললেন—হায়! আমারই জন্য আমার নিরপরাধ মাতাপিতাকে কতই না দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে ! আমারই জন্য তাঁদের ছয়টি পুত্রের মৃত্যু হয়েছে এবং আমারই জন্য তাঁরা এখন কারাগারে অতি কষ্টে কোনরকমে বেঁচে আছেন। আপনার মতো যারা আমার আত্মীয়, আমি তাদের কথাই ভাবছিলাম। আজ আপনি নিজেই এখানে এসেছেন, ভালই হলো; এখন বলুন—আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ; কোথায় কি হচ্ছে , তিনি সবই জানেন; তবে আজ যে বড় তিনি কংসের অত্যাচারের কথা—তাঁর মা বাবার দুঃখের কথা ভাবছেন? এর কারণ হলো এই যে, তিনি ঠিকই করে ফেলেছেন ব্রজের আনন্দের হাট ভেঙে এবার তাঁকে জগতের কল্যাণের জন্য—ধর্মস্থাপনের জন্য—বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে হবে। এদিকে কংসের পাপের মাত্রাও পূর্ণ হয়ে এসেছে—সে এখন কাল-কবলিত; সুতরাং অক্রূরকে উপলক্ষ করে তিনি তাঁর কর্ম-পন্থা ঠিক করলেন।

কৃষ্ণের প্রশ্ন শুনে অক্রূর তখন কংসের ষড়যন্ত্রের কথা—কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় নিয়ে গিয়ে বধ করবার কথা বিস্তৃতভাবেই বললেন। অক্রূরের কথা শুনে কৃষ্ণ-বলরাম একটু হাসলেন এবং নন্দবাবাকে এই সব কথা না বলে

শুধু বললেন যে, কংস ধনুর্যজ্ঞ করবে এবং সেখানে দুধ দই ক্ষীর প্রভৃতি নিয়ে সকলকে যেতে হবে। সেই অনুযায়ী পরদিন সকালে নন্দ প্রভৃতি গোপেরা মথুরায় যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্ ॥ ১০-৩৯-১৩ ॥

এদিকে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্য অক্রূর এসেছেন—এই কথাটা রাষ্ট্র হতেই কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণই যদি তাদের ছেড়ে চলে যান, তবে তারা আর কি নিয়ে, কেমন করে বেঁচে থাকবেন! কৃষ্ণের বিরহে তাদের যে মরণাধিক যন্ত্রণা হবে, তাতেই তো তাদের দেহান্ত হবে। কৃষ্ণের আশু বিরহের চিন্তায় গোপীদের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত করুণ। কৃষ্ণের জন্য এই আর্তি, ভগবানকে না পাবার মর্মান্তিক দুঃখ চিরকাল ভক্ত-জনকে ভগবৎ অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছে। কৃষ্ণকে গোপীরা কখনো ঈশ্বরভাবে, আবার কখনো প্রাণপ্রিয় রূপে দেখতেন। কিন্তু মজা হলো এই যে, ভগবানের ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য একই সঙ্গে আস্বাদন করা যায় না। গোপীরা মুখ্যত মধুরভাবের সাধিকা; সুতরাং মধুরভাবের অবস্থায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব গোপীদের কাছে তেমন প্রকাশিত হতো না।

অক্রূর পরদিন সকালে কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে মথুরায় যাবেন—এই কথা শুনে কোন গোপীর হৃদয়োত্থিত বিরহাগ্নির উত্তাপে তাঁর মুখশ্রী ম্লান হয়ে গেল। গোপীদের মধ্যে ভাবের তারতম্য ছিল; সুতরাং কৃষ্ণের আশু বিচ্ছেদের চিন্তায় বিভিন্ন গোপীদের ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি হয়েছিল। কোন গোপী তখন কৃষ্ণের ধ্যানে ডুবে গিয়ে জীবন্মুক্তের মতো ইহলোক অথবা নিজের দেহ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলেন না—তাঁদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সকল স্তব্ধ হয়ে গেল। কোন কোন গোপীর মনে কৃষ্ণের সাথে তাঁদের রাসক্রীড়া, সপ্রেম কথাবার্তা, হাস্য-পরিহাস প্রভৃতি মধুর স্মৃতি জেগে উঠতে তাঁরা একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন; তাঁদের চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁরা খেদোক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন।

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ১০-৩৯-১৯ ॥

গোপীরা বলছেন—হে বিধাতা! বুঝতে পারছি তোমার মধ্যে দয়ার লেশমাত্রও নেই; তুমি বন্ধুত্ব এবং ভালবাসার দ্বারা দেহীদের মিলন ঘটিয়ে দাও; কিন্তু সেই মিলনের সুখ আস্বাদনের আগেই তুমি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ এনে দাও; সুতরাং তোমার এইরকম ব্যবহার নিতান্তই বালক-তুল্য নিষ্ফল এবং নিরর্থক; জানি না, কেন তুমি এইরকম কর। আমরা জানি যে, কৃষ্ণের সঙ্গ লাভের যোগ্য আমরা নই; তবুও তুমিই আমাদের মিলন ঘটালে। যদি মিলনই ঘটালে তবে এত তাড়াতাড়ি বিচ্ছেদ করিয়ে আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছ কেন? তাই বলছি দয়া বলে তোমার কিছু নেই।

গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করে বলছেন—আমরা যারা তোমারই জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে তোমার দাসী হয়েছি, সেই তাদের তুমি ত্যাগ করে যাচ্ছ; বুঝলাম, বিধাতার মতো তোমারও দয়ার লেশমাত্র নেই।

গোপীরা দুঃখ করে বলছেন—হায়! আজ আমরা এখানে কৃষ্ণের বিরহে কেঁদে সারা হচ্ছি; অপর দিকে মথুরাতে বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি বংশের লোকেরা বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি-নৈপুণ্য কৃষ্ণের মুখমণ্ডল দর্শন করে তাদের নয়নের মহামহোৎসব করবে। অক্রূরের কথায় গোপীরা বলছেন—যিনি আমাদের মতো দুঃখসন্তপ্ত অবলাদের কোনরকম আশ্বাস কোনরকম সান্ত্বনা না দিয়ে আমাদেরই প্রাণপ্রিয়কে মথুরায় নিয়ে যাচ্ছেন তার নাম 'অক্রূর' না হয়ে 'ক্রূর' হওয়াই উচিত ছিল।

অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো রথং
তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং
দৈবঞ্চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে ॥ ১০-৩৯-২৭॥

গোপীরা বলছেন—দেখ, দেখ, সকল রকমের কোমলতা পরিহার করে কৃষ্ণ কেমন অবিচলিত চিত্তে রথের উপর গিয়ে বসলেন; আমাদের দিকে

একবার ফিরেও তাকালেন না! গোপেরাও কৃষ্ণের রথের পেছনে পেছনে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি করছে; গোপবৃদ্ধেরাও কৃষ্ণকে যেতে কোনরকম বাধা দিচ্ছেন না। বুঝলাম কৃষ্ণ এবং দৈব—দুই-ই আজ আমাদের প্রতিকূল। এস, এস, আর চুপ করে থাকার সময় নেই ; আমরাই গিয়ে কৃষ্ণকে মথুরা-যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করি।

যস্যানুরাগ-ললিত-স্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোক-পরিরম্ভণ-রাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥ ১০-৩৯-২৯ ॥

গোপীরা একে অপরকে সম্বোধন করে বলছেন—রাসস্থলে আমরা কত সুদীর্ঘ রাত্রি কৃষ্ণের সাথে নৃত্যগীতাদি লীলাবিলাস করে কাটিয়েছি; তাঁর অনুরাগপূর্ণ মিষ্টি হাসি, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি মনোমুগ্ধকর খেলায় সেই দীর্ঘ রাত্রি আমরা এক মুহূর্তের মতো অতিবাহিত করেছি। হায়! সেই কৃষ্ণকে ছেড়ে আমরা কেমন করে এই দুঃখ-সাগর পার হব? এইসব কথা বলতে বলতে গোপীরা মনোব্যথায় কাঁদতে লাগলেন।

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥
১০-৩৯-৩১ ॥

কৃষ্ণে আসক্তপ্রাণা গোপীরা তখন বিরহে কাতর হয়ে লজ্জা ত্যাগ করে হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! বলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। কি মিনতি, কি আবেগ, কি ব্যাকুলতা নিয়েই না গোপীরা কৃষ্ণকে ডাকছেন! তাঁদের ডাকে বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাসও যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

কৃষ্ণ যে গোপীদের হৃদয়-বেদনার গুরুত্ব বোঝেন নি অথবা তাঁদের প্রতি তাঁর করুণার উদ্রেক হয় নি, তা নয়; কিন্তু তাঁর নিজের অবতরণকে সার্থক করার জন্য যে তাঁকে যেতেই হবে; সুতরাং আর তো এখানে তাঁর থাকা চলে না। গোপীরা এইভাবে আর্তস্বরে হৃদয়-নিংড়ানো ভাষায় ক্রন্দন করতে থাকলেও অক্রূর কিন্তু সূর্য ওঠার সাথে সাথেই সন্ধ্যা-বন্দনাদি সেরে রথ ছেড়ে দিলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপেরাও কংসের ধনুর্যজ্ঞের জন্য দুধ দই প্রভৃতি নিয়ে কৃষ্ণের পেছনে পেছনেই যেতে লাগলেন।

কৃষ্ণ গোপীদের অত্যন্ত সন্তপ্ত দেখে, দূতের মারফত শিগ্‌গিরই আসব, বলে গোপীদের সান্ত্বনা দিলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত রথের পতাকা এবং ধুলা দেখা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত গোপীরা পুতুলের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

কৃষ্ণজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, তাঁর মাধুর্যলীলা, তাঁর ব্রজলীলা শেষ হয়ে গেল।

তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ॥ ১০-৩৯-৩৭॥

কতক্ষণ গোপীরা এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তা তাঁরা নিজেরাও বুঝতে পারেননি। কৃষ্ণের রথ যখন তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, তখন তাঁদের সম্বিৎ ফিরে এল। কৃষ্ণ ফিরে আসবে—এইরকম কোন আশা আর নেই দেখে গোপীরা তখন ব্রজে ফিরে গিয়ে প্রিয়তম কৃষ্ণের লীলাকথা শুনে এবং গান করে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের দুঃখ দূর করে দিন রাত্রি অতিবাহিত করতে লাগলেন।

ভগবানকে পেতে হলে নিরন্তর তাঁর স্মরণ মনন করতে হবে। বহু জীবনের পুণ্যফলে তাঁকে পাবার জন্য যদি কখনো তীব্র আর্তি, তাঁকে না পাবার জন্য যদি প্রচণ্ড দুঃখ হয়, তবে সেই আর্তি, সেই দুঃখ অপনোদনের একমাত্র ওষুধই হচ্ছে তাঁর নাম-কীর্তন এবং লীলা-শ্রবণ। সুতরাং ভগবানের কথা শোনা এবং তাঁর লীলা চিন্তা করাই হচ্ছে ভক্তের একমাত্র পাথেয়। এই পাথেয় নিয়েই গোপীরা বাকি সারাটা জীবন কাটিয়েছেন।

২৮
কংস বধ

কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্য অক্রূর আগের দিন সন্ধ্যায় বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভোর হতেই অক্রূর বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ-বলরামকে সঙ্গে নিয়ে মথুরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথিমধ্যে যমুনার তীরে রথ থামিয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম যমুনার জলে হাত পা ধুয়ে এবং জল পান করে তীরের বৃক্ষছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার রথে গিয়ে বসলেন। অক্রূর তখন তাঁদের অনুমতি নিয়ে যমুনায় স্নান-আহ্নিক করলেন। সেই সময় অক্রূরের একটি দিব্য দর্শন হলো ; তিনি জলের মধ্যে কৃষ্ণ-বলরামের যুগল-মূর্তি দর্শন করলেন। অক্রূর তখন ভাবলেন—কৃষ্ণ ও বলরামকে তো দেখে এলাম রথেই রয়েছেন; তবে তাঁরাই আবার যমুনার জলের মধ্যে কেমন করে এলেন? জল থেকে উঠে অক্রূর দেখলেন যে, তাঁরা আগের মতোই রথের উপর বসে আছেন। অক্রূর ভাবলেন—জলের মধ্যে আমি যে কৃষ্ণ-বলরামকে দেখলাম, তবে কি তা মিথ্যা? সন্দেহ দূর করার জন্য অক্রূর আবার যমুনার জলে ডুব দিতেই এবার জলের মধ্যে তাঁর বৈকুণ্ঠ দর্শন হলো। অক্রূর তখন ভক্তিবিনম্র চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন ঃ

নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো ॥ ১০-৪০-৩০ ॥

হে বাসুদেব! হে সর্বভূতের আশ্রয়! আমি আপনাকে প্রণাম করি। ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, হে হৃষীকেশ ! আমি আপনাকে বার বার প্রণাম করি। হে প্রভু ! আমি আপনার শরণাগত! আমাকে এই সংসারের মায়া থেকে রক্ষা করুন।

যমুনার জলে স্নানাদি এবং শ্রীভগবানের স্তুতি করে অক্রূর অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে রথে ফিরে এসে আবার রথ চালাতে লাগলেন। অবশেষে

তাঁরা অপরাহ্নকালে মথুরার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছালেন। এদিকে নন্দ প্রভৃতি গোপেরা অন্য পথে আগেই সেখানে এসে পৌঁছে কৃষ্ণ-বলরামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

অক্রূর তখন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—আপনি, বলরাম, গোপগণ এবং বন্ধু-বান্ধবেরা যারা এসেছেন, তারা সবাই আমার গৃহে চলুন। কৃষ্ণ বললেন—আমি আগে যদুকুলদ্রোহী কংসকে বধ করে মাতাপিতার শৃঙ্খল মুক্ত করব এবং যাদবদের বসবাসের সুব্যবস্থা করব তারপর আমরা তোমার গৃহে যাব। তাছাড়া আমরা যদি এখনই তোমার গৃহে যাই, তাহলে কংস তোমার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারে; ভাববে তুমি আমাদের সাথে ষড়যন্ত্র করছ। আমরা এখন এখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পরে মথুরার শোভা এবং ঐশ্বর্য দেখে বেড়াব; সুতরাং তুমি এখন নিজের গৃহে ফিরে যাও। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অক্রূর মথুরাপুরীতে প্রবেশ করে প্রথমে কংসকে নিজের কাজের সম্বন্ধে সমস্ত নিবেদন করলেন।

সেই দিনই বিকালে কৃষ্ণ, বলরাম এবং গোপদের সঙ্গে নিয়ে মথুরার সৌন্দর্য দেখবার জন্য মথুরায় প্রবেশ করলেন। রাজপথ দিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম যখন যাচ্ছেন, তখন পুরস্ত্রীরা তাঁদের দেখবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন; তাদের সেই প্রবল উৎকণ্ঠার কথা শুকদেব অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

> কাশ্চিদ্‌বিপর্যগ্‌-ধৃতবস্ত্রভূষণা বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেষ্বথাপরাঃ।
> কৃতৈকপত্র শ্রবণৈক নূপুরা নাঙ্‌ক্ত্বা দ্বিতীয়ন্ত্বপরাশ্চ লোচনম্ ॥
> ১০-৪১-২৫ ॥

কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখবার জন্য মথুরার রমণীদের উৎকণ্ঠা এমনই তীব্র হয়েছিল যে, তাদের কোন দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না; কেউ কেউ তাদের বস্ত্র এবং আভরণ উলটো করে পরিধান করেই চললেন; কেউ কেউ আবার হাতের বালা, কানের অলঙ্কার প্রভৃতির মধ্যে একটি মাত্র পরিধান করে অর্থাৎ এক হাতে বালা এবং এক কানে অলঙ্কার পরেই কৃষ্ণ-দর্শনে গেলেন; আবার কেউ বা এক পায়ে নূপুর এবং এক চোখে কাজল পরেই কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটলেন।

কৃষ্ণ তখন গজেন্দ্র গমনে সহাস্য দৃষ্টির দ্বারা মথুরাবাসিনীদের নয়নের আনন্দ বিধান করে তাদের মন হরণ করলেন। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কৃষ্ণ তো এই প্রথম মথুরায় এলেন; সুতরাং তাঁকে দেখবার জন্য মথুরার রমণীদের এইরকম তীব্র ঔৎসুক্যের কারণ কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণের রূপ, গুণ ও পরাক্রমের কথা মথুরাবাসীরা বহুবার শুনেছেন; বৃন্দাবন থেকে মথুরা তো বেশি দূরে নয়; সুতরাং বার বার কৃষ্ণের অপার্থিব রূপ, অনন্ত গুণ এবং অসুরবিজয়ী পরাক্রমের কথা শুনে শুনে মথুরাবাসিনীরা তাঁর প্রতি মনে মনেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'না দেখে নাম শুনে কানে / মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো'। এখন কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করে এবং কৃষ্ণের সহাস্য দৃষ্টির দ্বারা সম্মানিত হয়ে মথুরাবাসিনীরা পরম আনন্দ লাভ করলেন। তারা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলেন ঃ

উচুঃ পৌরা অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ।
যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ ॥ ১০-৪১-৩১ ॥

মথুরাবাসিনীরা বলছেন—ব্রজের গোপীরা কি মহা তপস্যাই না করেছিল, যার ফলে তারা মানুষের পরম আনন্দদায়ী কৃষ্ণ-বলরামকে সর্বদা দর্শন করে থাকে।

মথুরাবাসীদের আনন্দবর্ধন করে কৃষ্ণ-বলরাম যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক তন্তুবায় তাঁদের কাছে এসে পরম আনন্দে নানাবিধ সুন্দর বস্ত্রের দ্বারা তাঁদের পোযাক তৈরি করে দিলেন; এক মালাকর এসে ভক্তিভরে তাঁদের প্রণাম করে সুগন্ধি ফুলের অতি অপরূপ মালা তৈরি করে কৃষ্ণ-বলরামকে পরিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাদের অভিলষিত বর প্রদান করলেন।

কংস অক্রূরকে পাঠিয়েছিল কৃষ্ণ-বলরামকে ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে মল্লক্রীড়ায় যোগ দেবার জন্য নিয়ে আসতে। তাই তাঁরা মথুরাবাসীদের কাছে ধনুর্যজ্ঞশালার কথা জিজ্ঞাসা করে সেখানে গিয়ে ইন্দ্রধনুর মতো এক অতি অদ্ভুত বিশাল ধনু দেখতে পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ ধনুটি গ্রহণ করতে উদ্যত হলে ধনু-রক্ষকেরা তাঁকে বাধা দিল; কিন্তু কৃষ্ণ তাদের উপেক্ষা করে অবলীলাক্রমে সেই বিশাল ধনুটি তুলে নিয়ে তাতে জ্যা রোপণ করে আকর্ষণ করলেন। কৃষ্ণের প্রচণ্ড

আকর্ষণে বিশাল ধনুটি ভয়ঙ্কর শব্দে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে, মাঝখান থেকে ভেঙে গেল। তখন ধনু-রক্ষীরা এবং কংসের সৈন্যরা চারদিক থেকে ছুটে এসে কৃষ্ণ-বলরামকে মারবার জন্য ঘিরে ফেলল। কৃষ্ণ-বলরাম ধনুকের ভাঙা অংশ দুইটি দিয়েই তাদের সকলকে বধ করে আবার রাজপথে ফিরে এসে নগরের শোভা দেখতে লাগলেন—যেন কিছুই হয় নি। মথুরাবাসীরা কৃষ্ণ-বলরামের অপার্থিব শক্তি, তেজ, সৌন্দর্য এবং প্রগল্‌ভতা দেখে, তাঁদের দুইজনকে কোন শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে মনে করলেন।

সেই বিশাল ধনু দ্বিখণ্ডিত হলে তার ভয়ঙ্কর শব্দে স্বর্গ, পৃথিবী এবং দিক্ সকল পূর্ণ হলো। ঐ ভীষণ শব্দ শুনে কংস অত্যন্ত ভীত হয়ে ভাবল—এইবার তার মৃত্যু সন্নিকট হয়েছে।

এদিকে কৃষ্ণ-বলরাম যখন স্বেচ্ছায় নগর ভ্রমণ করছিলেন সেই সময় সূর্য অস্তমিত হলো; তখন তাঁরা গোপগণে পরিবৃত হয়ে নগরের উপকণ্ঠে যেখানে গরুর গাড়িগুলি রেখেছিলেন, সেইখানে ফিরে এসে অপর গোপদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

অবনিক্তাঙ্ঘ্রিযুগলৌ ভুক্ত্বা ক্ষীরোপসেচনম্।
ঊষতুস্তাং সুখং রাত্রিং জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্ষিতম্ ॥ ১০-৪২-২৫ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম তখন হাত পা ধুয়ে দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন ভোজন করলেন। কংস কি করতে চাইছে, তার বদমতলবের বিষয় জেনেও, কৃষ্ণ-বলরাম সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করলেন। তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে, কাল বিনা আয়াসেই কংস নিহত হবে; ঐ সম্বন্ধে চিন্তার কিছু নেই; সুতরাং সেই রাত্রি কৃষ্ণ-বলরাম সুখ-নিদ্রায় কাটালেন।

অপর সকলের কিন্তু সেই রাত্রি সুখনিদ্রায় কাটল না। নন্দ মহারাজ এবং তার সমবয়সী বাৎসল্য-পরায়ণ ব্রজবাসীরা ভাবছেন—আজ বিকেলে কৃষ্ণ ধর্নুভঙ্গ করেছে এবং কংসের বহু সৈন্য বধ করেছে; সুতরাং কংস ক্রুদ্ধ হয়ে কাল যে কি করবে তা কে জানে। তাছাড়া কৃষ্ণ-বলরাম নিতান্তই শিশু; কাল মল্লযুদ্ধে দেশের শ্রেষ্ঠ মল্লবীরেরা সব আসবে; তাদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম কেমন করে মল্লযুদ্ধ করবে? এই সব দুশ্চিন্তায় নন্দ মহারাজ ও তার সঙ্গীদের সেই রাত্রিতে ঘুম হলো না।

অপর দিকে ধনুর্ভঙ্গের শব্দ শুনে কংসের মনে হয়েছিল—এইবার বুঝি আমার মৃত্যু আসন্ন; তার উপর রক্ষীরা খবর দিয়েছিল যে, কংস-প্রেরিত সৈন্যদের কৃষ্ণ-বলরাম খেলার ছলে সকলকেই বধ করেছে। এইসব শুনে ভয়ে কংস সে রাত্রি আর ঘুমাতে পারল না; তন্দ্রা এবং জাগরণের মধ্যে নানা দুঃস্বপ্ন দেখে এবং দুশ্চিন্তা করে সেই রাত্রি কংস ছটফট করে কাটাতে লাগল।

মথুরাবাসী, যারা সেদিন বিকেলে কৃষ্ণ-বলরামকে প্রথম দর্শন করেছিল, তাদের পক্ষেও কৃষ্ণ-বলরামের অপার্থিব সৌন্দর্য, মাধুর্য-পূর্ণ সহাস্য দৃষ্টি এবং অমিত বিক্রমের কথা ভোলা সম্ভব ছিল না; প্রতি মুহূর্তেই যে তাদের মনে কৃষ্ণ-বলরামের ছবি ফুটে উঠছিল; সুতরাং তারা ঘুমাবেন কেমন করে? যারা পর দিনের মল্লক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারা মল্লক্রীড়ার ব্যবস্থাপনায় এতই ব্যস্ত যে, তাদের পক্ষেও সেই রাত্রিতে ঘুমানো সম্ভব ছিল না। আর যারা মল্লবীর, তারা পর দিনের মল্লযুদ্ধের চিন্তা এবং তার পরিণতির বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করতে না পেরে ছটফট করেই রাত্রি কাটাল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মথুরাতে সেই রাত্রি এক মাত্র কৃষ্ণ-বলরামই নিরুদ্বেগে সুখে নিদ্রায় কাটিয়েছিলেন, যদিও তাঁদের বধের জন্যই কংসের এই মল্লক্রীড়ার আয়োজন! প্রসঙ্গত এখানে একটি কথা বলা যেতে পারে; সম্ভবত এই রাত্রিটিই ছিল কৃষ্ণের জীবনের শেষ রাত্রি, যখন তিনি নিরুদ্বেগে, সুখনিদ্রায় কাটাতে পেরেছেন। পরদিন থেকেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজ্য শাসনের ভার, প্রজা পালনের দায়িত্ব, আত্মীয়-স্বজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মথুরা এবং দ্বারকা রক্ষা করা প্রভৃতি গুরু দায়িত্ব নিশ্চয়ই তাঁকে কখনও আর নিরুদ্বেগে ঘুমাতে দেয় নি।

রাত্রি প্রভাত হলে মল্লক্রীড়া আরম্ভ হলো; তূরী, ভেরী প্রভৃতি বাদ্য বাজতে লাগল। কংসের সভাসদ, পুরবাসী প্রভৃতি সকলে নিজের নিজের আসনে গিয়ে বসলেন; কংস নিজেও তার জন্য বিশেষভাবে তৈরি অতি উচ্চ সুন্দর মঞ্চে গিয়ে উপবেশন করলেন।

শুকদেব বললেন, হে শত্রুদমনকারী পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণ ও বলরাম প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে মল্লবীরদের চিৎকার এবং দুন্দুভির উচ্চশব্দে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মল্লভূমির প্রবেশ পথে কুবলয়াপীড় নামক অতি

বৃহৎ হস্তীকে দেখে কৃষ্ণ মাহুতকে বললেন—ওহে মাহুত! এই হাতিকে সরিয়ে আমাদের ভিতরে যেতে দাও; দেরি করো না; নাহলে এই হাতির সঙ্গে তোমাকেও আজ যমালয়ে পাঠিয়ে দেব। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে মাহুত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কালান্তক-সদৃশ হাতিকে কৃষ্ণের দিকে চালিত করল। কৃষ্ণ তখন সেই মদমত্ত হাতির সাথে কিছুক্ষণ খেলা করলেন।

পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্।
বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া ॥ ১০-৪৩-৮ ॥

গরুড় যেমন সাপের লেজ ধরে দূরে টেনে নিয়ে যায়, সেইরকমভাবে কৃষ্ণ সেই অতি বলবান হাতির লেজ শক্ত করে ধরে, তাকে একশত হাত দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ ঐ মদমত্ত হাতির সাথে যুদ্ধ-খেলা খেলে কৃষ্ণ হাতির একটি দাঁত উৎপাটিত করে, ঐ দাঁত দিয়েই হাতি এবং তার মাহুতকে বধ করলেন। মহাবলশালী বলরামও হাতির দ্বিতীয় দাঁতটি উৎপাটন করে নিলেন।

শুকদেব বলছেন—হে রাজন্! কৃষ্ণ-বলরাম তখন কয়েকজন গোপের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, গজদন্তরূপ উৎকৃষ্ট আয়ুধ হস্তে মল্লভূমিতে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণের সমস্ত শরীর হস্তিরক্তে রঞ্জিত, বদনকমলে স্বেদবিন্দু শোভা পাচ্ছে এবং হাতির দাঁত স্কন্ধে স্থাপন করে তিনি মল্লভূমিতে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণের এই অদ্ভুত রূপ ও অপার্থিব শক্তি দেখে মল্লভূমিতে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মনের কি অবস্থা হলো? বিভিন্ন লোক তাদের মনের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে সেই সময় কৃষ্ণকে দেখেছিল।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ॥
১০-৪৩-১৭ (পূর্বার্ধ) ॥

মল্লবীরদের কাছে কৃষ্ণকে বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো; মানুষের কাছে তিনি নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীলোকদের কাছে মূর্তিমান কন্দর্প এবং গোপদের কাছে তিনি পরম আত্মীয় বলে প্রতিভাত হলেন; অসৎ রাজাদের কাছে তিনি তাদের শাসনকর্তা এবং নিজের মাতাপিতার কাছে কৃষ্ণকে স্নেহাস্পদ শিশু বলে মনে হলো।

মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং।
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥
১০-৪৩-১৭ (উত্তরার্ধ) ॥

বলরামের সাথে কৃষ্ণকে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করতে দেখে ভোজরাজ কংসের মনে হলো স্বয়ং মৃত্যু উপস্থিত হয়েছেন; অজ্ঞদের নিকট দেহাত্মাভিমানী বিরাট পুরুষ; যোগীদের কাছে তিনি পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদের নিকট কৃষ্ণকে পরম দেবতা বলে মনে হলো। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন রূপে কৃষ্ণকে দর্শন করলেন।

শুকদেব বলছেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই উত্তম পুরুষ কৃষ্ণ-বলরামকে দেখে মঞ্চস্থিত নগরবাসীদের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারা তাদের নয়নের দ্বারা কৃষ্ণ-বলরামের বদনের সৌন্দর্য-সুধা বার বার পান করেও তৃপ্ত হতে পারলেন না; অর্থাৎ সর্বাকর্ষক, অখিল সৌন্দর্যের আধার, এই রূপ তো তারা আর কখনও দেখে নি; তাই রঙ্গদর্শনার্থী সকলে অপলক নয়নে কৃষ্ণ-বলরামকে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাদের মনে পড়ে গেল যে, লোকমুখে তারা কৃষ্ণ-বলরামের অপরূপ সৌন্দর্য এবং অপার্থিব গুণ ও শক্তির কথা বহুবার শুনেছেন। এখন তারা কৃষ্ণ-বলরামের সম্বন্ধে যে যা শুনেছেন, সেইসব কৃষ্ণ-লীলা-কথা একে অপরকে বলতে লাগলেন। একজন বললেন—এই যে কৃষ্ণ এবং বলরাম এঁরা দুই জনেই সাক্ষাৎ ভগবান, নারায়ণের অংশে বসুদেবের পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই যে কৃষ্ণ, ইনিই দেবকীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং বসুদেব কর্তৃক গোপনে নন্দালয়ে নীত হন। এতকাল গুপ্ত-ভাবে নন্দালয়ে বাস করে, এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। ইনিই পূতনা রাক্ষসী এবং তৃণাবর্ত দৈত্যকে বধ করেছেন। ইনিই যমলার্জুন বৃক্ষ উৎপাটিত করেছেন; ইনিই কালীয় নাগকে দমন করেছেন এবং ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করে এক সপ্তাহ-কাল গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন।

অয়ঞ্চাস্যাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ।
প্রলম্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ ॥ ১০-৪৩-৩০ ॥

আর এই যে শ্রীমান, পরম সুন্দর, কমললোচন বলরামকে দেখছ, ইনি

কৃষ্ণের অগ্রজ। এই বলরামই প্রলম্বাসুর, বৎসাসুর, বকাসুর প্রভৃতিকে বধ করেছেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম সম্বন্ধে লোকে সত্য, মিথ্যা, যে যা শুনেছে, সে তা-ই অপরকে বলে যেতে লাগল। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে বৎসাসুর এবং বকাসুরকে বলরাম বধ করেছেন; কিন্তু আসলে বৎসাসুর এবং বকাসুরকে কৃষ্ণই বধ করেছিলেন—বলরাম নয়। এইভাবে মল্লযুদ্ধ দেখতে এসে দর্শনার্থীরা কিছুটা সময় কৃষ্ণ-বলরামের প্রসঙ্গে আলোচনা করে আনন্দে কাটালেন।

এইবার মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হবে। মহামল্ল চাণূর তখন কৃষ্ণ-বলরামকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কৃষ্ণ বললেন—মল্লযুদ্ধের নিয়মই হলো এই যে, সমানে সমানে বাহুযুদ্ধ হবে; আমরা বালক মাত্র। সুতরাং আমাদের সমবয়সীদের সঙ্গেই আমরা বাহুযুদ্ধ করব—তোমাদের সঙ্গে নয়।

ন বালো ন কিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ।
লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ ॥ ১০-৪৩-৩৯ ॥

চাণূর বলল—হে কৃষ্ণ! তোমরা বালকও নও, কিশোরও নও; শক্তিতে তোমরা বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে কুবলয়াপীড় হস্তীকে তুমি বধ করেছ, সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করত; সুতরাং তোমাদের মতো শক্তিমানের পক্ষে আমাদের মতো বলশালীদের সঙ্গেই যুদ্ধ করা উচিত। অতএব এস, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং বলরাম মুষ্টিকের সাথে বিক্রম প্রকাশ করুক।

মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হলো। কৃষ্ণ ও বলরাম অনন্তশক্তি এবং অনন্ত ঐশ্বর্যযুক্ত; তাঁরা ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তেই প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারেন; কিন্তু নরলীলায় মানুষের অনুকরণে দর্শনার্থীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য কিছুক্ষণ ধরে তাঁরা মল্লবীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। যখন মল্লক্রীড়া চলছিল, তখন কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি স্নেহশীলা কোন কোন মহিলা দর্শনার্থী, যারা কৃষ্ণ-বলরামের স্বরূপ জানে না, তারা দুঃখ করে বলতে লাগল—এটা কি আর একটা মল্লযুদ্ধ ? মল্লযুদ্ধে সমান শক্তিশালীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়; এখানে দেখছি দুইটি কোমল সুকুমার বালকের সঙ্গে লৌহবৎ শক্ত এবং পর্বত-সদৃশ বিশাল দেহধারী দুই মল্লবীরের যুদ্ধ হচ্ছে। এইরকম নিয়ম-বহির্ভূত বিষম মল্লযুদ্ধ হওয়াই উচিত নয়। রাজারই তা বারণ করা উচিত; কিন্তু এখানে কংস

নিজেই এই অন্যায় যুদ্ধের ব্যবস্থা করেছে; যেখানে অন্যায় অধর্মাচরণ করা হয়, সেখানে ক্ষমতা থাকলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে; নইলে সেই স্থান ত্যাগ করবে। এই তো ধর্মের বিধান। মথুরাবাসিনীদের এইসব কথা শুনে বাৎসল্য ভাবাপন্ন গোপেরা কৃষ্ণ-বলরামের অনিষ্টাশঙ্কায় একেবারে বিহ্বল হয়ে দুঃখ করতে লাগলেন—হায়! অক্রূর সব জেনেও কেন এদের বৃন্দাবন থেকে এখানে নিয়ে এল? আর নন্দবাবাই বা কেন ওদের মথুরায় আসতে দিলেন?

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মথুরাবাসিনীরা এইভাবে কথাবার্তা বলতে থাকল। কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি স্নেহবশত তাদের আতঙ্ক এবং সেইসব কথা শুনে নন্দ প্রভৃতির চরম মানসিক দুশ্চিন্তার কথা জানতে পেরে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আর খেলা না করে শত্রুবধ করতে সংকল্প করলেন। কৃষ্ণ তখন প্রবল বেগে চাণূরের দুই হাত আকর্ষণ করে অতি বেগে ঘোরাতে ঘোরাতেই তাকে বধ করলেন। বলরামও সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করলে মুষ্টিক রক্ত বমি করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। চাণূর ও মুষ্টিক নিহত হয়েছে দেখে অপর যেসব মল্লবীরেরা কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল, দুই ভাই তখন অনায়াসেই তাদের সকলকে বধ করলেন। বাকি মল্লবীরেরা প্রাণরক্ষার জন্য ভয়ে পালিয়ে গেল। মল্লভূমি তখন মল্লশূন্য দেখে কৃষ্ণ কি করলেন? শুকদেব ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্রীড়ার পরেই কৃষ্ণের চাপল্যের এক অতি অপরূপ ছবি এঁকেছেন। কৃষ্ণ মহাশক্তিধর হলে কি হবে, আসলে তো তিনি বালক মাত্র; সুতরাং বালকের চপলতা প্রকাশ পেয়ে গেল।

গোপান্ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসৃজ্য বিজহ্রতুঃ।
বাদ্যমানেষু তূর্যেষু বল্গন্তৌ রুতনূপুরৌ ॥ ১০-৪৪-২৯ ॥

মহারাজ কংস উচ্চ মঞ্চে বসে মল্লক্রীড়া দেখছেন; চারদিকে মথুরার বিশিষ্ট লোকেরা বসে রয়েছে এবং মল্লক্রীড়ার জন্য তূরী ভেরী সব বাজছে; এই পরিস্থিতিতে শব্দায়মান নূপুরধারী কৃষ্ণ-বলরাম মঞ্চে উপবিষ্ট সমবয়সী গোপবালকদের আর্কষণ করে, তাদের সাথে আলিঙ্গনাদি করে নির্ভয়ে সেখানেই বয়স্যদের সাথে বিচরণ করতে লাগলেন।

একমাত্র কংস ছাড়া কৃষ্ণ-বলরামের এই সব অতিমানুষী কার্য দেখে

উপস্থিত সকলেই 'সাধু সাধু' বলে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগল। সকলেই এখন বুঝে নিয়েছে যে, এঁদের সামনে কংস কিছুই নয়; সুতরাং তারা সকলে কংস-ভয় থেকে মুক্ত হলো।

চাণূর মুষ্টিক এবং অন্যান্য মল্লবীরেরা সবাই কৃষ্ণ-বলরামের হাতে নিহত হয়েছে; বাকি মল্লবীরেরা সব ভয়ে পালিয়েছে। কংসের মল্লভূমি মল্লশূন্য, আর সেই মল্লভূমিতে কৃষ্ণ-বলরাম সখাদের সঙ্গে নেচে খেলে বেড়াচ্ছেন!

এ কি সহ্য করা যায়!

কংস তখন ভয়ে এবং ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে তূরী, ভেরী প্রভৃতি বাদ্য বন্ধ করতে বলে অনুচরদের আদেশ দিলেন—বসুদেবের পুত্র এই দুর্বৃত্ত কৃষ্ণ-বলরামকে এখনই নগর থেকে বের করে দাও, গোপদের ধনসম্পত্তি অপহরণ করে দুর্মতি নন্দকে শৃঙ্খলিত কর; অত্যন্ত অসৎ এবং দুরাত্মা বসুদেবকে এখনই বধ কর এবং শত্রুর পক্ষপাতী আমার পিতা উগ্রসেনকেও শিগ্‌গিরই হত্যা কর। এই ছিল কংসের শেষ আদেশ!

কংস বলল—কৃষ্ণ বলরামকে নগর থেকে বের করে দাও; কারণ মল্ল-যুদ্ধে কাউকে বধ করা নিষিদ্ধ; কিন্তু এরা সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে অনেক মল্লবীরকে বধ করেছে; সুতরাং এরা দুর্বৃত্ত; দুর্বৃত্তের স্থান আমার রাজ্যে নেই। এই গোপরাজ নন্দ হচ্ছে আমার শত্রু বসুদেবের বন্ধু এবং সে বসুদেবের দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরামকে তার নিজের গৃহে পালন-পোষণ করছে; অবশ্য নন্দ ওদের বসুদেবের পুত্র না জেনেই পালন করেছে; সেইজন্য নন্দকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তার সম্পত্তি লুট করে তাকে কারাগারে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছি। এই বসুদেব অত্যন্ত কপট, সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তার পুত্রদের আমার হাতে অর্পণ করবে; কিন্তু সে তা না করে তার অষ্টম পুত্রটিকে গোপনে নন্দালয়ে রেখে, যশোদার কন্যাকে নিয়ে এসে আমাকে দিয়েছিল। সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী কপট; এইরকম অসৎ দুষ্কৃতকারীকে বধ করাই হচ্ছে বিধান। আর আমার পিতা উগ্রসেন, সে অত্যন্ত রাজ্যলোভী এবং শত্রুর পক্ষপাতী। সুতরাং তাকেও হত্যা করতে হবে। শয়তান যখন কোন অন্যায় কাজ করে, তখন সেও ঐ অন্যায় কাজের একটা যুক্তি বের করে নেয়।

কংসের এই দুর্বিনীত ব্যবহার এবং নন্দ বসুদেবের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য এবং শাস্তিমূলক আদেশ শুনে কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, লাফ দিয়ে অতি উচ্চ মঞ্চে যেখানে কংস বসেছিল সেখানে উঠে গেলেন।

প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎকিরীটং নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ।
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ ॥
১০-৪৪-৩৭ ॥

পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বতন্ত্র পুরুষ এবং বিশ্বের আশ্রয়স্থল, সেই কৃষ্ণ তখন কংসের চুলের মুঠি ধরে উচ্চ মঞ্চ থেকে তাকে নিচে মল্লভূমিতে নিক্ষেপ করে নিজেও কংসের উপর লাফিয়ে পড়লেন। সেই সময়ই কংসের মাথার মুকুট খসে পড়ল। বিশ্বম্ভর, যিনি সমস্ত বিশ্বের ভার বহন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের গুরু ভারে ক্লিষ্ট হয়ে কংসের তখনই মৃত্যু হলো।

কংসের মৃত্যুর পর তার কোন কোন পত্নী বিলাপ করে বলেছিল—হে নাথ! নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রতি তুমি অতি ভীষণ উৎপীড়ন করেছ; তারই জন্য আজ তোমার এই দশা হলো। যারা প্রাণীদের অনিষ্টাচরণ করে, তাদের কি কখনও মঙ্গল হতে পারে? এই কৃষ্ণই সর্বভূতের উৎপত্তি এবং লয়ের কারণ এবং ইনিই সর্বভূতের রক্ষক; সুতরাং এঁর অবজ্ঞাকারী ব্যক্তির কখনও সুখ হয় না। তুমি কৃষ্ণকে শুধু অবজ্ঞাই কর নি; বার বার তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করেছ; তাঁর মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছ; যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা, তাঁর সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করে কেউ কি সুখ লাভ করতে পারে? সেইজন্যই আজ তোমার এই অবস্থা হলো।

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! কৃষ্ণ কংসের পত্নীদের সান্ত্বনা দিয়ে যথাবিধি কংস এবং অপর সকলের দেহ সৎকার করালেন।

মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ।
কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাস্পৃশ্যপাদয়োঃ ॥ ১০-৪৪-৫০ ॥

এর পর কৃষ্ণ ও বলরামের প্রথম কাজই হলো বসুদেব-দেবকীর শৃঙ্খল মুক্ত করা। তাঁরা তখন কারাগারে গিয়ে মাতা-পিতার বন্ধন মোচন করে তাদের চরণে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম করলেন।

বসুদেব-দেবকীর তখন কি অবস্থা! কংস বধ হয়েছে, তাঁদের শৃঙ্খল মোচন হয়েছে এবং সর্বোপরি তাঁরা বহু বছর পরে, তাঁদের সর্বক্ষণের চিন্তার ধন কৃষ্ণ-বলরামকে একেবারে কাছে পেয়েছেন; তবুও তাঁরা কৃষ্ণ-বলরামকে পুত্রস্নেহে জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারলেন না।

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ১০-৪৪-৫১॥

বসুদেব ও দেবকী চরণ বন্দনাকারী দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরামকে ঈশ্বর বলে বুঝতে পেরে শঙ্কিত হয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করতে পারলেন না। তাঁরা শুধুই জোড় হাত করে দুই পুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। বসুদেব ও দেবকীর মনে পড়ে গেল, কংস-কারাগারে কৃষ্ণের জন্মের পর ভগবান তাঁদের চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে দর্শন দিয়েছিলেন এবং ভগবানেরই নির্দেশে বসুদেব শিশু কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রেখে এসেছিলেন। এর পর বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-বলরামের কত অলৌকিক ব্যবহার এবং অসুর-মারণাদি কত ঘটনাই তাঁরা শুনেছেন। তার উপর কৃষ্ণ ও বলরামকে বসুদেব-দেবকী এতদিন পর্যন্ত পুত্রভাবে কাছে পান নি; দূর থেকে কেবল তাঁদের ঈশ্বরীয় মহিমার কথাই শুনেছেন। সুতরাং এই প্রথম মিলন-মুহূর্তে বসুদেব ও দেবকীর মনে স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি ভগবৎ-ভাবেরই উদয় হয়েছিল; তাঁদের দেখে এবং কাছে পেয়েও পুত্রভাবের উদয় হয় নি; ফলে তাঁরা কৃষ্ণ-বলরামের সামনে ভক্তি-শ্রদ্ধায় জোড় হাত করেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

কৃষ্ণ বুঝলেন যে, বসুদেব ও দেবকীর মনে তাঁদের প্রতি এখন পুত্রভাব নেই, একমাত্র ঈশ্বরভাবই রয়েছে; তাই কৃষ্ণ ইচ্ছা করলেন যে, বসুদেব-দেবকীর মনে এখন পুত্রভাবেরই স্ফুরণ হোক এবং তিনি যোগমায়া বিস্তার করে তাঁদের মনকে পুত্রভাবে ভাবিত করে তুললেন।

ভগবান সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। পূর্বে বসুদেব-দেবকী ভগবানকে পুত্রভাবে পাবার জন্য তীব্র তপস্যা করেছিলেন; ভগবান তাঁদের বাসনা পূর্ণ করে তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন; কেবলমাত্র তাঁদের পুত্র রূপে জন্মেছেন বলেই তো আর তাঁদের বাৎসল্য-ক্ষুধা তৃপ্ত হবে না; তাই তাঁদের বাৎসল্য-প্রেমকে জাগিয়ে তুলে কৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীকে দিয়ে পুত্রভাবে সেবা করিয়ে নিয়ে তাঁদের এতদিনের অতৃপ্ত বাৎসল্য-ক্ষুধা তৃপ্ত করলেন।

বসুদেব ও দেবকীর মনকে বাৎসল্যভাবে আকৃষ্ট করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের বললেন—হে মাতঃ, হে পিতঃ! আমরা আপনাদেরই পুত্র; আমাদের জন্য আপনারা এতদিন সর্বদাই উৎকণ্ঠিত ছিলেন; ছোট বয়সে সন্তানদের লালন-পালন করে মা-বাবার যে সুখ হয়, সেই সুখে আপনারা বঞ্চিত হয়েছেন; এটা আমাদের পক্ষেও দুর্ভাগ্যের বিষয়। মাতা-পিতার গৃহে লালিত-পালিত হয়ে শিশুরা যে আনন্দ পেয়ে থাকে, আমরা সেই আনন্দ পাই নি; এদিক থেকে আমরা হতভাগ্য; তাছাড়া আমরা আপনাদের পুত্র হয়েও আপনাদের কোন সেবা করতে পারি নি; এটাও আমাদের পক্ষে কম দুঃখের কথা নয়। এই শরীর, মাতাপিতা থেকেই উৎপন্ন হয় এবং তাদেরই দ্বারা পালিত পোষিত হয়। সেই মাতাপিতার ঋণ অপরিশোধ্য; যারা সমর্থ হয়েও মাতা-পিতার সেবা এবং জীবনধারণের ব্যবস্থা করে না, তারা মহা হতভাগ্য। এতদিন আমরা কংসের ভয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং আমাদের কোন সামর্থ্যও ছিল না; তাই আপনাদের কোন সেবাই করতে পারি নি; সুতরাং আপনারা কৃপা করে আমাদের ক্ষমা করুন।

ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা।
মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্ ॥ ১০-৪৫-১০ ॥

শুকদেব বললেন, মায়ামনুষ্য কৃষ্ণ-বলরামের এই অতি মধুর কথা শুনে তাঁদের প্রতি বসুদেব-দেবকীর যে ভগবৎ-ভাব ছিল তা তিরোহিত হলো এবং বাৎসল্যভাবে তাঁরা তখন ভরপুর হয়ে উঠলেন; কৃষ্ণ-বলরামকে তাঁরা সস্নেহে কোলে টেনে নিয়ে পরম আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাঁরা কোন কথাই বলতে পারলেন না। মা বাবার এই অপরিসীম আনন্দ দেখে কৃষ্ণ-বলরামও পরম আনন্দ লাভ করলেন।

কৃষ্ণ তাঁর মাতামহ , কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কৃষ্ণের আত্মীয়-স্বজনেরা যাঁরা কংসের ভয়ে মথুরা ত্যাগ করে দূরদেশে গিয়ে বসবাস করছিলেন, কৃষ্ণ তাঁদের মথুরায় এনে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণ-বলরামের দ্বারা রক্ষিত হয়ে মথুরাবাসীদের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হলো; তাদের সকল সন্তাপ দূর হলো। এইভাবে মথুরাবাসীদের সর্বপ্রকার

সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে, কৃষ্ণ-বলরাম নন্দবাবার কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—হে পিতঃ, আপনি এবং মা যশোদা অত্যন্ত স্নেহে নিজেদের শরীর থেকেও অধিক যত্নে আমাদের লালন-পালন করেছেন। পরিত্যক্ত শিশুদের যারা নিজের পুত্রের মতো পালন করেন, তারাই শিশুর মাতাপিতা; মাতাপিতার স্নেহ ভালবাসা আমরা আপনাদের কাছে থেকেই পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছি।

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥ ১০-৪৫-২৩॥

আপনারা সকলে এখন ব্রজে ফিরে যান; যদিও জানি আমাদের প্রতি স্নেহবশত আমাদের ছেড়ে যেতে এবং আমাদের বিচ্ছেদে আপনাদের খুবই কষ্ট হবে। আমরা এখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে আপনাদের দেখতে যাব। ব্রজধামে যেতে যদি আমাদের কিছু দেরিও হয়, তবুও আপনারা ব্যাকুল হবেন না। আমাদের মনপ্রাণ জানবেন আপনাদেরই কাছে ব্রজে পড়ে থাকবে; এখানে কেবল কর্তব্যের অনুরোধেই আমাদের থাকতে হবে। নন্দবাবাকে এইভাবে সান্ত্বনা দিয়ে এবং নন্দবাবা, মা যশোদা এবং অপরাপর ব্রজবাসীদের জন্য প্রচুর বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম তাঁদের সমাদর করলেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর সারার্থদর্শিনী টীকায় বলেছেন যে, নন্দ মহারাজ তখন ভাবলেন—সত্যই এরা বসুদেবের পুত্র; সেই বসুদেব এখন বিপদ-মুক্ত হয়ে এত বছর পরে নিজের পুত্রদের কাছে পেয়েছেন; সুতরাং তার পক্ষে এখন পুত্রদের ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়; অতএব কৃষ্ণ ও বলরাম এখন বসুদেব-দেবকীর গৃহে তাঁদের স্নেহচ্ছায়াতেই থাকুক। কৃষ্ণ-বলরামের বিচ্ছেদে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হলেও বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা আমরা না হয় সেই অসহ্য দুঃখ কোনরকমে সহ্য করব; কিন্তু আমার আবাল্য বন্ধু বসুদেব এবং দেবকীর যেন আর কোন দুঃখ না হয়; তারা সুখে আনন্দে থাকুক। কৃষ্ণ-বলরাম যদি আমার সঙ্গে ব্রজে যায়, তাহলে আমার মহা আনন্দ হবে সন্দেহ নেই ; কিন্তু বসুদেব-দেবকীর যে মহাদুঃখ হবে। তারা মুখে না বললেও মনে মনে হয়ত বিলাপ করে বলবে—কংস আমাদের ছয় ছয়টি পুত্রকে বধ করেছে, যে দুটি জীবিত আছে, তাদেরও নন্দ ব্রজধামে

নিয়ে গেল; সুতরাং নন্দ আজ আমার সখা নয়, সে আজ আমার কাছে দ্বিতীয় কংস। নন্দ মহারাজ ভাবছেন—আমার প্রিয় সখা বসুদেব যদি এইসব ভাবে, তবে আমার এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ-বলরামের কি কখনো মঙ্গল হতে পারে? এইসব চিন্তা করে এবং কৃষ্ণ-বলরামের স্নেহপূর্ণ মিষ্ট কথায় নন্দ মহারাজ কিছুটা শান্ত হলেন। যথাসময়ে পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন এবং আশীর্বাদ করে নন্দ মহারাজ অশ্রুপূর্ণ নয়নে সঙ্গীদের সাথে ব্রজধামে ফিরে গেলেন।

এতদিন পর্যন্ত কৃষ্ণ-বলরামের ক্ষত্রিয়োচিত কোন সংস্কারই হয় নি। তাঁরা নন্দগোপের পুত্র বলেই পরিচিত ছিলেন এবং গোপবালকদের সঙ্গে গোচারণ করেই কাটিয়েছেন, লেখাপড়ার কোন সুযোগও হয় নি। এইবার বসুদেব পুত্রদের উপনয়ন সংস্কার করিয়ে আচার্য সন্দীপনি মুনির কাছে শিক্ষার জন্য অবন্তীপুরে পাঠালেন। সেখানে কৃষ্ণ-বলরাম শ্রদ্ধাভক্তির সাথে গুরুর সেবা করে, তাঁর কাছ থেকে বেদ, সংহিতা, তর্ক, রাজনীতি প্রভৃতি সকল রকম বিদ্যাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিগত করলেন। তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে দেখে গুরু আশীর্বাদ করে বললেন—হে বীর পুত্রদ্বয়! তোমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের পবিত্রকারী কীর্তি জগতে বিঘোষিত হোক এবং তোমরা যে বিদ্যা শিক্ষা করেছ, তা সর্বদা তোমাদের মধ্যে স্ফুরিত হোক। শিষ্যের কাছে গুরুর এই আশীর্বাদ অমোঘ।

গুরুর আশীর্বাদ মাথায় করে কৃষ্ণ-বলরাম তখন মথুরায় ফিরে এলেন।

২৯

উদ্ধবের ব্রজে গমন (ক)

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাদের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে মথুরায় ফিরে এসেছেন। দীর্ঘদিন পরে তাঁদের দেখে তাঁদের কাছে পেয়ে বসুদেব-দেবকী, আত্মীয়-স্বজন এবং মথুরাবাসীরা সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। সমস্ত মথুরা যেন উৎসব-সাজে সজ্জিত হয়েছে। এই উৎসব-মুখর পরিস্থিতিতে যাঁকে কেন্দ্র করে এই আনন্দোৎসব, সেই কৃষ্ণের মনে যেন কোথায় একটা বিষাদের ছায়া পড়ে রয়েছে। রাজ্য-শাসন মাতা-পিতার সেবা, আত্মীয়-স্বজনদের দেখাশোনা, মথুরাবাসীদের সঙ্গে সৌজন্য প্রকাশ—সবই তিনি করে যাচ্ছেন; কিন্তু মনে যেন তাঁর আনন্দ নেই; আনন্দময়ের নিরানন্দ!

কৃষ্ণ ভাবছেন—আজ মথুরাবাসীরা সবাই আনন্দে মেতে আছে; কিন্তু আমার বৃন্দাবন আজ আমারই জন্য নিরানন্দময়। আমি যখন সেখানে থাকতাম, তখন সমস্ত ব্রজভূমিতে যেন আনন্দের প্লাবন বয়ে যেত; আমার বিহনে আজ আমার পিতামাতা নন্দ-যশোদা, আমার প্রাণের সখারা, গোপীরা, অপর ব্রজবাসীরা—সবাই আমার বিরহে কষ্ট পাচ্ছে। তার উপর গুরুগৃহে বাস করবার জন্য দীর্ঘদিন তারা আমার কোন সংবাদই পায় নি; আমি তো জানি যে, আমিই তাদের জীবন-সর্বস্ব; আমাকে কাছে পেলে তারা আনন্দে নিজেদের সত্তা পর্যন্ত ভুলে যায়; আবার আমার বিহনে তারা জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৃন্দাবন থেকে আসার সময় গোপীদের খবর পাঠিয়েছিলাম যে, শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। কংসবধের পর নন্দবাবা যখন দুঃখিত মনে ব্রজে ফিরে যাচ্ছেন তখন তাঁকেও বলেছিলাম—মথুরায় আত্মীয়-স্বজনদের সুব্যবস্থা করে ব্রজের জ্ঞাতিদের দেখতে যাব। বহুদিন কেটে গেল, অথচ সে কথা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। অন্তর্যামী কৃষ্ণের মনে আজ ব্রজবাসীদের কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের দুঃখ বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। ভক্তের দুঃখে আজ ভগবান বিচলিত হয়েছেন; সুতরাং তাঁর অনন্যশরণ ভক্তের দুঃখের একটা প্রতিকার করতেই হবে—কিন্তু কেমন করে?

কৃষ্ণের পক্ষে এখন ব্রজে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কংস বধের পর কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ কৃষ্ণের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে; জরাসন্ধ ১৭ বার মথুরা আক্রমণ করেছিল; সুতরাং মথুরা ছেড়ে কোথাও যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ২/৩ দিনের জন্য যে বৃন্দাবনে যাবেন, তাও যুক্তিযুক্ত নয়; কারণ জরাসন্ধ গুপ্তচর মারফত টের পেয়ে যাবে যে, কৃষ্ণের পালিত মাতাপিতা এবং তার বাল্য সখা-সখীরা বৃন্দাবনে রয়েছে এবং তাদের প্রতি কৃষ্ণ অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ; সুতরাং আর কোন কারণ না থাক, শুধুমাত্র কৃষ্ণের মনে কষ্ট দেবার জন্যই জরাসন্ধ যদি বৃন্দাবন আক্রমণ করে ছারখার করে, তবে যে গোপদের রক্ষা করার কোন উপায়ই থাকবে না। তাছাড়া কৃষ্ণ জানেন যে, বসুদেব-দেবকী কখনই তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে অনুমতি দেবেন না। বসুদেব-দেবকী জানেন যে, নন্দ-যশোদার প্রতি কৃষ্ণের তীব্র আকর্ষণ; কৃষ্ণের খেলার সাথীরা সবাই বৃন্দাবনে রয়েছে; তাদের প্রতি কৃষ্ণের ভালবাসা এবং কৃষ্ণের প্রতি তাদের স্নেহাকর্ষণ কিংবদন্তির মতো এখনো ঘরে ঘরে গীত হচ্ছে। এই অবস্থায় কৃষ্ণ যদি একবার বৃন্দাবনে যায়, তবে তার পক্ষে সেখান থেকে ফেরা সম্ভব নাও হতে পারে; সুতরাং বসুদেব-দেবকী কখনও কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে যেতে অনুমতি দিতে পারবেন না। আর মা-বাবার অনুমতি ছাড়া কৃষ্ণের পক্ষেও বৃন্দাবনে যাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হতে পারে কৃষ্ণ না হয় বৃন্দাবনে না-ই গেলেন; বৃন্দাবনের গোপদের যদি মথুরায় এনে রাখেন, তবে তো নন্দ-যশোদা এবং সখা-সখীদের সাথে নিত্যই তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে? কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কারণ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ হচ্ছেন কারও শিশুপুত্র, কারও খেলার সাথী কারও নৃত্যগীতাদি রাসলীলার সঙ্গী; আর মথুরায় কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম দেবতা—সবারই শ্রদ্ধার পাত্র। তাছাড়া বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোপ বেশ, তিনি সেখানে বনমালা পরিহিত এবং বংশীধারী; কৃষ্ণের এই সাজ পোশাক ছাড়া বৃন্দাবনবাসীরা সুখী হবে না; কিন্তু মথুরায় কৃষ্ণ রাজবেশধারী। মথুরার লোকেরা কৃষ্ণের বৃন্দাবনী বেশ পছন্দ করবে না। একই জায়গায় মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য—বৃন্দাবনের ভাব এবং মথুরার ভাব থাকতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৃন্দাবনবাসীদের মথুরায় এনে রাখাও সম্ভব নয়।

কৃষ্ণের বৃন্দাবনে ফিরে না যাবার কারণ জানা গেল। কিন্তু ব্রজবাসীদের এই দুরন্ত কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের দুঃখের অন্তত কিছুটা উপশমের তো উপায় করতে

হবে; নইলে তারা যে মারা পড়বে। কৃষ্ণ নিজে যেতে পারছেন না বটে কিন্তু তাঁর সংবাদ দিয়ে কাউকে তো ব্রজে পাঠাতে পারেন; এটা অন্তত মন্দের ভাল; কিন্তু কাকে পাঠাবেন? এমন লোক পাওয়া তো খুবই মুস্কিল। কৃষ্ণ ঠিক করলেন যে, এই দৌত্য কার্যে তাঁরই প্রিয়সখা উদ্ধব, যিনি সুরগুরু বৃহস্পতির শিষ্য, মহাবুদ্ধিমান এবং বৃষ্ণি বংশীয়দের প্রধান পরামর্শদাতা— সেই উদ্ধবই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তাই কৃষ্ণ একদিন নিরালায় উদ্ধবকে ডেকে তার দুই হাত ধরে অতি স্নেহ স্বরে বললেন ঃ

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥ ১০-৪৬-৩ ॥

হে সৌম্য প্রিয়দর্শন উদ্ধব! তুমি ব্রজধামে গিয়ে আমাদের পিতামাতা নন্দ-যশোদার সন্তোষ বিধান কর আর আমার বিচ্ছেদে গোপীরা যে ভীষণ মনঃকষ্টে রয়েছে আমার সংবাদ দিয়ে তাদের সেই মনঃকষ্ট দূর কর।

কৃষ্ণ জানেন, যে কাজে তিনি উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাচ্ছেন সে কাজটা অত্যন্ত কঠিন। ব্রজবাসীদের কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া একমাত্র কৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু তা যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন এমন একজনকে পাঠাতে হবে, যে কৃষ্ণের একান্ত প্রিয় সখা, অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং কৃষ্ণ-হৃদয়ের কথা সবই জানেন। তবেই তিনি ব্রজবাসীদের অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারবেন। উদ্ধব ছিলেন কৃষ্ণের পিতৃব্য দেবভাগের পুত্র; সুতরাং সম্পর্কে কৃষ্ণের ভাই পরম আত্মীয়; উদ্ধব ছিলেন কৃষ্ণেরই প্রায় সমবয়সী, দেখতেও অনেকটা কৃষ্ণেরই মতো; উদ্ধবের সৌম্য চেহারা এবং শান্ত ব্যবহারে সকলেই প্রাণে শান্তি অনুভব করে ; তাছাড়া উদ্ধব পরম জ্ঞানী—দেশ, কাল, পাত্র বুঝে যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে বিশেষ পটু; সুতরাং দৌত্য কার্যের পক্ষে আদর্শ। কিন্তু যে কাজে উদ্ধবকে পাঠানো হচ্ছে তা তো কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়; এ যে হৃদয়ের কথা; বিশেষ করে গোপীদের জন্য কৃষ্ণ-হৃদয়ের নিষ্কাম প্রেমের বার্তা। কৃষ্ণ-হৃদয়ের এই নিগূঢ় কথা উদ্ধবও এত দিন জানতেন না। এ কথা কি যাকে তাকে যখন তখন বলা যায়?

কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—আমার সংবাদ দিয়ে ব্রজবাসীদের বিশেষ করে গোপীদের আমার বিচ্ছেদজনিত দুঃখ দূর কর। কী সেই সংবাদ, যা শুনলে তাঁরা শান্তি পাবেন?

প্রথম—কৃষ্ণ নিজের সংবাদ দেবার জন্য এবং ব্রজবাসীদের সংবাদ জানবার জন্য দূত পাঠিয়েছেন; অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁদের ভুলে যাননি, এটি-ই বড় কথা; এইটি জানলেই ব্রজবাসীদের দুঃখ অনেকটা প্রশমিত হবে।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ কুশলে আছেন; ব্রজবাসীদের কাছে এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কিছু হতে পারে না—কৃষ্ণ কুশলে আছেন।

তৃতীয়—কৃষ্ণ আবার ব্রজে আসবেন, এই সংবাদ ব্রজবাসীদের মনে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একটা আশা জাগিয়ে রাখবে এবং তাতেই তাঁদের দুঃখ কিছুটা লাঘব হবে।

চতুর্থ—ব্রজবাসীরা যেমন কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, কৃষ্ণও তেমনি ব্রজবাসীদের জন্য ব্যাকুল। এই সংবাদটি ব্রজবাসীদের পরম কাম্য; সুতরাং তাঁদের কাছে পরম সান্ত্বনাপ্রদ। তাই আশা, উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণের সংবাদ পেলে ব্রজবাসীদের দুঃখ কিছুটা লাঘব হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে। কৃষ্ণ পিতামাতা এবং গোপীদের সান্ত্বনা দেবার কথাই বলেছেন। কিন্তু ব্রজের উপানন্দ প্রভৃতি অপর বাৎসল্য-পরায়ণ গোপদের কথা এবং শ্রীদাম প্রভৃতি কৃষ্ণ সখাদের কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁরাও তো কৃষ্ণ-বিরহে কাতর ; কিন্তু তাঁদের সান্ত্বনা দেবার জন্য একটি কথাও তো কৃষ্ণ বললেন না? এর উত্তরে গোস্বামী প্রভুপাদেরা বলেছেন—বাৎসল্য-ভাব পরায়ণ অপর ব্রজবাসীদেরও সান্ত্বনা দেবার কথা, নন্দ-যশোদার জন্য প্রেরিত সান্ত্বনা বাক্যের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধরে নিতে হবে। কৃষ্ণ-সখাদের বেলায় কিন্তু তা নয়। কৃষ্ণ-সখাদের ধারণা যে, কৃষ্ণ মথুরা থেকে এসে নিত্যই তাদের সাথে খেলা করেন; অতএব তাদের অন্তরে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ নেই। অতএব সান্ত্বনা দেবারও দরকার নেই; বরং সান্ত্বনা দিতে গেলে উলটো বিপত্তি হতে পারে; সান্ত্বনা দিতে গেলেই তাদের মনে সন্দেহ হতে পারে—কৃষ্ণ যে আমাদের সাথে নিত্য খেলা করে যায়, তবে কি তা মিথ্যা, আমাদের মনের ভ্রম? অতএব এদের সান্ত্বনা না দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ সান্ত্বনা দেওয়া।

কৃষ্ণের মনে উদ্ধবকে দূত করে পাঠাবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল; উদ্ধব ছিলেন কৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং তার জন্য উদ্ধবের মনে একটু অহঙ্কারও

ছিল। কৃষ্ণ দেখলেন যে, উদ্ধবের এই ভক্তির অহঙ্কার দূর করতে হবে, নইলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হবে। উদ্ধবের ছিল জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি; আর গোপীদের ছিল সর্বস্ব-উৎসর্গীকৃত নিষ্কাম জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি। এই গোপী-প্রেমের কথা উদ্ধবের জানা ছিল না; আর জানা থাকবেই বা কেমন করে? প্রেমের এইরকম নজির তো আর কোথাও নেই। তাই কৃষ্ণের ইচ্ছা—এই গোপীপ্রেম কি এবং তার সমর্থ সাধিকারা কেমন, তা উদ্ধব একবার ব্রজে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসুক; এতে উদ্ধবের লাভই হবে।

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ॥ ১০-৪৬-৪॥

কৃষ্ণ বলছেন—গোপীদের মন আমাতেই সমর্পিত ; আমিই তাদের প্রাণ; আমারই জন্য তারা জাগতিক ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করেছে। তারা আমাকে তাদের প্রিয়তম আত্মা বলে জেনে মনের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়েছে। জগতে যারা আমাকে পাবার জন্য ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ-প্রাপ্তি-কারক ধর্মানুষ্ঠান পর্যন্ত ত্যাগ করে, আমি তাদের সুখী করে থাকি; অর্থাৎ তারা আমাকেই লাভ করে। গোপীদের মন কৃষ্ণেই সমর্পিত, কৃষ্ণই তাদের প্রাণ। মনের কাজই হচ্ছে সংকল্প-বিকল্প, কামনা-বাসনা ইত্যাদি। এ সবই যদি কৃষ্ণে সমর্পিত হয়, তবে মন বলতে তো গোপীদের আর কিছু থাকে না; যা থাকে, তা শুধু কৃষ্ণের সুখ-কামনা এবং কৃষ্ণের সুখ বিধান করা; এ ছাড়া গোপীদের আর কোন বৃত্তিই ছিল না; নিজের বলতে তাদের কিছুই ছিল না; সবই কৃষ্ণের ।

গোস্বামী প্রভুপাদেরা গোপীদের এই অবস্থার—'মন্মনস্কা মৎপ্রাণা'-র আর একটি সুন্দর অর্থ করেছেন। কৃষ্ণ বলছেন, মন্মনস্কা অর্থাৎ আমার (কৃষ্ণের) মন যাদের মধ্যে; মৎপ্রাণা অর্থাৎ আমার (কৃষ্ণের) প্রাণ যাদের মধ্যে, সেই গোপীরা; অর্থাৎ কৃষ্ণের মনপ্রাণ গোপীদের কাছে সমর্পিত; একদিকে যেমন কৃষ্ণই হচ্ছেন গোপীদের মনপ্রাণ অপর দিকে গোপীরাই হচ্ছেন কৃষ্ণের মনপ্রাণ; গোপীরা যেমন কৃষ্ণ ছাড়া কিছু জানে না, কৃষ্ণও তেমনি গোপীদের ছাড়া আর কিছু জানেন না।

কৃষ্ণ বলছেন—গোপীরা 'মন্মনস্কা'; সুতরাং দৈহিক ভোগ সুখে তাদের মন নেই; তারা 'মৎপ্রাণা'; অতএব নিজের আত্মাকে পর্যন্ত তারা সমর্পণ করেছে; শুধু তাই নয়, তারা আমারই জন্য লোকধর্ম, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ, বৈদিক ধর্ম সব কিছু ত্যাগ করে শুদ্ধ প্রেমের দ্বারা কান্তভাবে আমারই ভজনা করেছে। গীতায় 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—বলে যে উপদেশ আছে তার দৃষ্টান্ত কিন্তু গীতায় নেই; একমাত্র গোপীদের জীবনেই এই আদর্শের সম্যক্ প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রশ্ন হতে পারে—মনের দ্বারা গোপীরা কৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হয়েছেন; তা হলে গোপীদের কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ জনিত শোক কেমন করে হতে পারে? এর উত্তর হলো এই যে, গোপীরা যখন অন্তর্মনা হয়ে থাকেন তখন অন্তরে কৃষ্ণকে পেয়ে তাঁরা পরম আনন্দে ডুবে থাকেন; কিন্তু মন যখন বহির্জগতে ফিরে আসে তখন কৃষ্ণকে কাছে না পেয়ে কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হয়ে ছটফট করতে থাকেন। এখানে কৃষ্ণ উদ্ধবকে গোপীদের স্বরূপের কথাই বললেন।

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥ ১০-৪৬-৫ ॥

কৃষ্ণ আরও বললেন—হে উদ্ধব! আমি তাদের প্রিয় হতেও প্রিয়তম; সেই আমি এখন তাদের কাছ থেকে দূরে রয়েছি; তাই তারা আমার চিন্তা করতে করতে বিরহ জনিত উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাদের অবস্থার কথা চিন্তা করে আমিও অভিভূত হয়ে পড়ি।

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥ ১০-৪৬-৬ ॥

কৃষ্ণ বলছেন—ব্রজ থেকে যেদিন মথুরায় আসি সেদিন মদগত-চিত্তা গোপীদের বলে পাঠিয়েছিলাম যে, শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। আমার সেই কথায় বিশ্বাস করে আমার প্রত্যাগমনের আশায় তারা অতি কষ্টে জীবন ধারণ করে রয়েছে।

উদ্ধব! বেশির ভাগ সময়ই গোপীরা অন্তর্মনা হয়ে, মূর্ছাবস্থায় কাটায়; সেই সময় তারা অন্তরে আমাকে লাভ করে বটে, কিন্তু মন বাহ্য জগতে ফিরে এলেই আমার অদর্শনে তারা মরণাধিক যন্ত্রণা বোধ করে। এই অবস্থায়

তারা হয়ত আর বেশি দিন বাঁচবে না; এখন কোনরকমে আমার প্রত্যাগমনের আশায় জীবন ধারণ করে রয়েছে।

উদ্ধব মনে করতে পারেন—আমার প্রভু কৃষ্ণ গোপীদের জন্য এত উতলা হচ্ছেন কেন? এর উত্তরে কৃষ্ণ গোপীদের স্বরূপ স্পষ্ট করেই বললেন। 'মদাত্মিকা' গোপীরা যে আমারই আত্মা, আমারই স্বরূপ-শক্তি; সুতরাং তারা আমা থেকে যে অভিন্ন; কেবল লীলা-বিলাসের জন্য বিভিন্ন দেহ ধারণ করে রয়েছে মাত্র।

কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—এমন যে মৎপ্রাণা গোপীরা যাদের কাছে একমাত্র আমি ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই, সেই গোপীদের তুমি আমার কথা বলে সান্ত্বনা দিও। গোপীরা কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে কাতর; সুতরাং কৃষ্ণ-কথাই তাদের দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়; ভগবৎ-বিরহ-কাতর জীবনে কৃষ্ণ-কথাই অমৃত স্বরূপ—'তব কথামৃতং তপ্ত জীবনম্'—সুতরাং হে উদ্ধব! তুমি তাদের আমার কথা বলবে—বলবে কৃষ্ণ তোমাদের ভোলেন নি; তোমরা যেমন তাঁর জন্য কাতর, তিনিও তেমনি তোমাদের জন্য ব্যাকুল। মথুরায় কর্তব্য শেষ করে তিনি আবার ব্রজে ফিরে আসবেন; সুতরাং তোমরা তাঁর জন্য আর উতলা হয়ো না। এই ছিল গোপীদের জন্য কৃষ্ণের সন্দেশ বার্তা।

উদ্ধব আশ্চর্য হয়ে কৃষ্ণের কথা শুনছেন, আর অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন; ভাবছেন—কৃষ্ণের মাথার উপর দিয়ে কত বিপদই না গেছে; কিন্তু কখনও তো তাঁকে বিচলিত হতে দেখি নি; আর আজ কৃষ্ণ নিজেই বলছেন; গোপীরা হচ্ছে মৎপ্রাণা, আমিই তাদের প্রাণ এবং তারাই আমার প্রাণ! আমি সর্বদাই এদের জন্য ব্যাকুল! যিনি সদা নির্বিকার, যিনি সদাই অবিচলিত তাঁর এই ব্যাকুলতা! আর যাদের জন্য তিনি অন্তরে অন্তরে এত ব্যাকুল, তাদেরই সান্ত্বনা দেবার জন্য আমায় পাঠাচ্ছেন! উদ্ধব ভাবছেন—পারব কি এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে? আবার ভাবছেন—তিনিই তো সকলের কর্তা; সুতরাং. বুঝেই আমাকে পাঠাচ্ছেন।

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্তুরাদৃতঃ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ১০-৪৬-৭ ॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইসব বলার পর উদ্ধব সানন্দে প্রভুর সংবাদ নিয়ে নন্দগোকুলে যাবার জন্য রথে আরোহণ করলেন। উদ্ধব যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন তখন সূর্য অস্তমিত; গরুরা সব গোশালায় প্রবেশ করেছে এবং তাদের খুরোত্থিত ধুলায় উদ্ধবের রথ আচ্ছন্ন হয়ে গেল; সুতরাং গোকুলবাসীরা উদ্ধবের রথ দেখতে পেলেন না। ক্রমে উদ্ধবের রথ নন্দভবনের সামনে এসে উপস্থিত হলো।

তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্।
নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চয়ৎ ॥ ১০-৪৬-১৪ ॥

উদ্ধবকে সমাগত দেখে নন্দরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এগিয়ে এসে কৃষ্ণের অতি প্রিয় সেবককে আলিঙ্গন করলেন; যেন কৃষ্ণ স্বয়ং এসেছে মনে করে নন্দরাজ পাদ্য অর্ঘ ইত্যাদি দিয়ে উদ্ধবের অভ্যর্থনা করলেন।

কৃষ্ণ যতদিন ব্রজে ছিলেন, ততদিন নন্দভবনে সব কিছুই অফুরন্ত ছিল; কিন্তু যেদিন তিনি মথুরায় চলে গেলেন সেদিন থেকে ব্রজপতির গৃহেরও সব কিছুই যেন চলে গেল। নন্দরাজের গৃহ পরিষ্কার হয় না, রন্ধনশালায় রান্না হয় না; উনানগুলিতে অযত্নে মাকড়সা জাল বুনেছে; কার জন্য যশোদা রান্না করবেন? কৃষ্ণ চলে যাবার সাথে সাথেই, তাঁদেরও আহারনিদ্রা, সাজসজ্জা যেন সবই বন্ধ হয়ে গেছে। নন্দ-যশোদার এই অবস্থা দেখে কয়েকজন প্রতিবেশী যত্ন করে এঁদের সামান্য কিছু খাইয়ে যেত; এইভাবেই কৃষ্ণ-বিহনে নন্দ-যশোদা কোনরকমে বেঁচে ছিলেন।

আজ উদ্ধবকে দেখে এবং কৃষ্ণই তাকে পাঠিয়েছেন জেনে নন্দরাজ বহুদিন পরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উদ্ধবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যেন তিনি কৃষ্ণকেই আলিঙ্গন করছেন। উদ্ধব এসেছে নন্দভবনে; তাকে খাওয়াতে হবে; কিন্তু রান্নার পাট যে বহুদিন আগেই উঠে গেছে! নন্দরাজের অবস্থা দেখে কোন প্রতিবেশী সামান্য একটু পায়েস রান্না করে এনে দিলেন। উদ্ধব তাতেই খুশি হলেন। এর পর উদ্ধব সুখাসনে উপবেশন করলে নন্দরাজ এলেন মথুরার সংবাদ জানতে; সংবাদ মানেই কৃষ্ণের সংবাদ; কৃষ্ণই তাঁদের জীবনসর্বস্ব; কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন চিন্তাই নন্দরাজের মনে স্থান পায়

না; সুতরাং কৃষ্ণের সংবাদ শোনার জন্যই তাঁর হৃদয় আকুলি-বিকুলি করছে। নন্দরাজ ভাবলেন—প্রথমেই কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়ত অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়বেন; তখন আর কোন কথাই শোনা এবং বলা সম্ভব হবে না। তাই নন্দরাজ প্রথমে উদ্ধবকে প্রশ্ন করলেন ঃ

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ।
আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥ ১০-৪৬-১৬ ॥

হে উদ্ধব! তোমরা সর্বদা কৃষ্ণের সঙ্গে থেকে তার সেবা করছ; সুতরাং তোমরা মহাভাগ্যবান! প্রশ্ন করি—আমাদের সখা শূরপুত্র বসুদেব কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বন্ধুগণে পরিবৃত হয়ে পুত্রদের সাথে কুশলে আছে তো ?

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেন পাপ্মনা।
সাধূনাং ধর্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা ॥ ১০-৪৬-১৭॥

সেই পাপমতি কংস সাধু এবং ধর্মশীল যদুবংশীয়দের সর্বদা হিংসা করত; বহু সৌভাগ্যের ফলে সেই কংস নিজের পাপে তার ভাই এবং অনুচরদের সাথে নিহত হয়েছে। কংসের কথায় স্বাভাবিকভাবেই কংস-হন্তা কৃষ্ণের কথা এসে গেল। নন্দরাজ আর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারলেন না; হৃদয়ভরা আকুতি নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥
১০-৪৬-১৮॥

হে উদ্ধব ! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—কৃষ্ণ কি আমাদের কথা, তার মার কথা স্মরণ করে? তার ব্রজের সখাদের এবং গোপ-গোপীদের অকৃত্রিম ভালবাসার কথা কি সে মনে রেখেছে? সে কি আমাদের সব ভুলে গেছে? যেসব গরুদের নিয়ে সে বনে বনে বিচরণ করত এবং তার মধুর বংশীধ্বনি শুনে ছুটে এসে তার মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থাকত, তাদের কথা কি সে স্মরণ করে? ইন্দ্রের বজ্র এবং বাত-বৃষ্টি থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্য যে গোবর্ধন পর্বতকে সাত দিন নিজের হাতের উপর রেখেছিল, সেই গোবর্ধন পর্বতের কথা কি সে মনে রেখেছে?

আর কৃষ্ণ নিজেই যে ব্রজধামের নাথ, সেই ব্রজের কথা কি তার একবারও মনে হয় না?

নন্দরাজ ভাবলেন—এসব কথা অবশ্য কৃষ্ণের মনে নাও থাকতে পারে; কারণ কংসের মৃত্যুর পর জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করতে পারে, এই আশঙ্কা রয়েছে। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা, যারা কংসের অত্যাচারে মথুরা ছেড়ে পালিয়ে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনা, রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করা, আত্মীয়-স্বজনদের সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি কতই না গুরুদায়িত্ব আমার ঐ শিশু কৃষ্ণের উপর রয়েছে! যার মাথার উপর এত দায়িত্ব তার তো নিজের শরীরের উপরই নজর দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না; সুতরাং আমাদের কথা ভুলে যাওয়া তার কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। একটু চুপ করে থেকে নন্দরাজ আবার বলতে আরম্ভ করলেন—তবে কি জান, বৃন্দাবন থেকে যাবার সময় সে কথা দিয়েছিল যে, শিগ্‌গিরই আবার আসবে। কংস-বধের পর সে আমাকেও বলেছিল যে, আত্মীয়-স্বজনদের সুব্যবস্থা করে সে আমাদের দেখতে ব্রজে আসবে। আচ্ছা উদ্ধব! সেই সময় কি এখনও হয় নি? তাকে দেখতে না পেয়ে আমাদের বুক যে ফেটে যাচ্ছে! হায় কি কষ্ট!

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্।
তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্ বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্ ॥ ১০-৪৬-১৯ ॥

গোবিন্দ তার স্বজনদের দেখবার জন্য কি একবার ব্রজে আসবে না? হায়! আমরা কবে তার সুন্দর নাসিকাযুক্ত পদ্মের মতো অপরূপ মুখমণ্ডল এবং তার সহাস্য নয়ন আবার দর্শন করব?

দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ॥ ১০-৪৬-২০ ॥

কৃষ্ণ আমাদের দাবানল, ঝড়বৃষ্টি, বৃষাসুর, কালীয় নাগ প্রভৃতি দুরতিক্রমণীয় মৃত্যু থেকে বার বার রক্ষা করেছে। কিন্তু আমরা যে আজ তারই বিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর; বিশেষতঃ তার মা যশোদা তারই শোকে মরণাপন্ন; তাকেও কি রক্ষা করতে সে একবার আসবে না? আত্মীয়-স্বজনের মরণাপন্ন ব্যাধি হলে লোকে তো তাকে দেখতে যায়; কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের ব্যাধি ব্রজবাসীদের এতই তীব্র যে, তারা বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচবে না।

এই অবস্থায়ও কি কৃষ্ণের একবার এখানে এসে আমাদের দেখে যাওয়া কর্তব্য নয়? সে কি আমাদের অবস্থা কিছুই বুঝতে পারছে না? কিন্তু না —তাও সম্ভব নয়; দয়া প্রেম প্রীতি প্রভৃতির জন্যই তো কৃষ্ণ মহাত্মা-শ্রেষ্ঠ! সে বার বার ব্রজবাসীদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে; আর আজ যখন আমরা যথার্থই মরণাপন্ন তখন যে সে আমাদের ভুলে থাকবে—এ তো ভাবাও যায় না; তার 'সুমহাত্মনা' কারুণ্য স্বভাবের জন্যও কি সে আসবে না?

স্মরতাং কৃষ্ণবীর্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্।
হসিতং ভাষিতং চাঙ্গ সর্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ১০-৪৬-২১॥

হে উদ্ধব! কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণাদি বীর্যবত্তা, খেলার ছলে তার অপাঙ্গ দৃষ্টি, তার হাসি এবং কথা চিন্তা করতে করতে আমরা অবশ হয়ে পড়ি; আমাদের সমস্ত দৈহিক কর্ম স্তব্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণের চিন্তায়, তার বিচ্ছেদ-শোকে আমরা আহারাদি প্রভৃতি দেহ রক্ষার কাজও করতে পারি না এবং করার সামর্থ্যও থাকে না। ভগবানের ইচ্ছায় শরীর রক্ষার জন্য ভোজন ক্রিয়াদি যে কেমন করে সম্পন্ন হয় তা আমরা জানতেও পারি না। উদ্ধব! কৃষ্ণের সাথে সাথে আমাদের ধর্মকর্ম সব শেষ হয়ে গেছে; কেবলমাত্র শূন্য প্রাণ পড়ে রয়েছে।

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্।
আক্রীড়ানীক্ষ্যমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্ ॥ ১০-৪৬-২২ ॥

মুকুন্দের পদচিহ্নে ভূষিত যমুনার তীর, গোবর্ধন পর্বত, বনভূমি এবং তার খেলার জায়গাগুলি দেখতে দেখতে এবং তার কথা চিন্তা করতে করতে আমরা কৃষ্ণভাবে তন্ময় হয়ে যাই, আমাদের আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ঘরের মধ্যে থাকলে কৃষ্ণের স্মৃতি বেশি করে মনে পড়ে; তাই তাকে ভোলবার জন্য একটু বাইরে যাই; কিন্তু বাইরে গিয়েও তো তাকে ভোলবার উপায় নেই; বৃন্দাবনে এমন কোন্ স্থান রয়েছে যেখানে কৃষ্ণ কোনরকম লীলাদি করে নি? সুতরাং যেখানেই যাই, সেখানেই কৃষ্ণচিন্তায় 'মনো যাতি তদাত্মতাম্'—আমরা একেবারে তন্ময় হয়ে যাই; চেষ্টা করেও যে তাকে ভুলতে পারি না !

উদ্ধব অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে নন্দরাজকে দেখছেন এবং তাঁর কথা শুনছেন; কিন্তু ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না। কৃষ্ণকে উদ্ধবও মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন; কিন্তু কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁর কথা চিন্তা করে গোপরাজের মতো তিনি তো কৃষ্ণময় হতে পারেন না। উদ্ধব ভাবছেন, বাৎসল্য-প্রেমের এইরকম তীব্র আকর্ষণের কথা তো আমার আগে জানা ছিল না !

নন্দরাজ কৃষ্ণের মাধুর্যময় বাল্যলীলার কথা বলতে বলতে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর এই বিহ্বলতার কারণ হলো তাঁর পুত্রস্নেহ। পাছে উদ্ধব ভাবে যে পুত্রস্নেহে গোপরাজ এত বিহ্বল হচ্ছেন কেন? তাই নন্দরাজ এবার কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করে দেখাতে চাইলেন যে, কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নয়।

মন্যে কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ।
সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা ॥ ১০-৪৬-২৩ ॥

নন্দরাজ বললেন—গর্গাচার্যের কথা থেকেই আমি জেনেছি যে, রাম এবং কৃষ্ণ—এরা দুই জনেই দেবশ্রেষ্ঠ; দেবতাদের বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্য তারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের বাল্যলীলা থেকেও তাদের ঈশ্বরীয় মহিমা বোঝা যায়। যে কংস এত শক্তিশালী ছিল, কৃষ্ণ তাকে অবলীলাক্রমে বধ করেছে; এক সপ্তাহ ধরে কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে ছিল; শুধু কি তাই? কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজে থাকার সময় প্রলম্ব, ধেনুক, তৃণাবর্ত, বকাসুর প্রভৃতি দেববিজয়ী মহাসুরদের যেন খেলতে খেলতেই বধ করেছিল। উদ্ধবকে কৃষ্ণের মহিমা এবং বলবীর্যের কথা বলতে বলতে নন্দরাজের মনে হলো, এমন যে দেবের দুর্লভ পুত্র, সেই পুত্ররত্নকে পেয়েও আজ আমরা তার কাছ থেকে দূরে রয়েছি; এর চেয়ে দুঃখ আর কি হতে পারে!

নন্দ-যশোদার ছিল শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাব—কৃষ্ণ আমার শিশুমাত্র। এই বাৎসল্য-ভাবের মধ্যে ঐশ্বর্যের নাম গন্ধও ছিল না—যদিও তাঁদের চোখের সামনেই কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ, কালীয় দমন প্রভৃতি ঐশ্বরিক লীলাসকল সংঘটিত হয়েছিল, তবুও কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের পুত্রস্নেহের কিছুমাত্র

কমতি হয় নি; তাঁদের পুত্রস্নেহে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য কিংবা মহিমার কোন স্থান ছিল না। তবে যে নন্দরাজ এখানে নিজেই কৃষ্ণের মহিমার কথা বলছেন? গোস্বামী প্রভুপাদেরা বলেছেন যে, শুদ্ধ বাৎসল্যভাবই নন্দ-যশোদার স্থায়ী ভাব; কিন্তু কখনো কখনো কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের দারুণ দুঃখে শুদ্ধ বাৎসল্যভাবের মধ্যে ঐশ্বর্য-ভাবের ক্ষণিক উদয় হয়—কিন্তু এই ভাব বেশিক্ষণ থাকে না।

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ।
অত্যুৎকণ্ঠোঽভবৎ তূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ ॥

১০-৪৬-২৭ ॥

শুকদেব বললেন—কৃষ্ণানুরক্ত নন্দরাজ কৃষ্ণকথা চিন্তা করতে করতে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং বাৎসল্য-স্নেহের আবেগে তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না; তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ১০-৪৬-২৮ ॥

নন্দরাজের মুখ থেকে কৃষ্ণের চরিত্র কথা শুনতে শুনতে যশোদা অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন এবং পুত্রস্নেহে তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল। ভাবাবেগে তিনি কোন কথাই বলতে পারলেন না।

কৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার অতুলনীয় পুত্রস্নেহ দেখে উদ্ধব অত্যন্ত আশ্চর্য ও মুগ্ধ হলেন। উদ্ধবও কৃষ্ণের ভক্ত, তবে তার ভক্তির মধ্যে জ্ঞানের মিশ্রণ ছিল; উদ্ধবের কৃষ্ণ-ভক্তি ছিল কৃষ্ণের ভগবত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু নন্দ-যশোদার ছিল শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাব; এর মধ্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য অথবা মহিমার কোন স্থানই ছিল না। উদ্ধব তার নিজের ভাব অনুযায়ী নন্দ-যশোদার কৃষ্ণপ্রীতি ও বাৎসল্যানুরাগ দেখে চমৎকৃত হলেন; কিন্তু উদ্ধব যেটি অনুভব করতে পারলেন না, সেটি হচ্ছে নন্দ-যশোদার কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের দারুণ ব্যথা। উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, আর নন্দ যশোদার কাছে কৃষ্ণ হচ্ছে শুধুই মাত্র তাদের শিশুপুত্র। উদ্ধব তার ভাব নিয়ে এবার নন্দ-যশোদাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন :

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥ ১০-৪৬-৩০ ॥

হে মানদ! আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, জগতে দেহধারীদের মধ্যে আপনারা দুই জনেই শ্রেষ্ঠ, অতিশয় প্রশংসার যোগ্য; কারণ জগৎগুরু শ্রীনারায়ণের উপর আপনাদের এইরকম ভাব, বুদ্ধি, অনুরাগ স্থাপিত হয়েছে।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের একান্ত-সচিব এবং প্রিয়সখা হলেও মুখ্যত তিনি কৃষ্ণের জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত; কৃষ্ণকে তিনি ভগবান বলেই জানেন। তিনি জানেন কৃষ্ণ লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে জগতের সব কিছু ত্যাগ করে কেবল তাঁকেই ভালবাসতে হবে; যাঁরা তা করতে পারেন, জগতে তাঁরাই ধন্য। নন্দ-যশোদা জগতের সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র কৃষ্ণ-ভাবনাতেই তন্ময় হয়ে আছেন; তাই উদ্ধব তাঁদের প্রশংসা করলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে পুত্রভাবে ভালবেসে তাঁর অদর্শনে নন্দ-যশোদার যে তীব্র উৎকণ্ঠা—পরম ব্যাকুলতা সেইটি উদ্ধব অনুভব করতে পারলেন না; উদ্ধবের পক্ষে তা অনুভব করা সম্ভবও নয়; কারণ উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ভগবান। সর্বশক্তিমান ভগবান এবং পরমস্নেহাস্পদ একান্ত নির্ভরশীল শিশুপুত্র—এই দুইটি ভাব এক সঙ্গে থাকতে পারে না। উদ্ধব ভাবলেন ভগবান কৃষ্ণে পুত্রবুদ্ধির অভিনিবেশ হওয়াতেই কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের দুঃখে নন্দ-যশোদা এত কষ্ট পাচ্ছেন; তাঁদের যদি কোনরকমে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বৈশ্বর্যময় ভগবান, তাহলে নন্দ-যশোদার বাৎসল্যভাবের লাঘব হবে; আর বাৎসল্য-ভাবের লাঘব হলেই তাদের কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ জনিত দুঃখেরও লাঘব হবে। এই ভেবে কৃষ্ণের স্বরূপ এবং ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে উদ্ধব একটা ভাষণ দিলেন; বললেন—কৃষ্ণ-বলরাম, এঁরা বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ; আবার কৃষ্ণ এবং বলরাম আলাদা নন, এঁরা এক-ই। যাঁরা মৃত্যুর সময় ক্ষণকালের জন্যও কৃষ্ণে মন স্থির করে দেহত্যাগ করেন, তাঁরা সর্ব কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জ্যোতির্ময়, অপ্রাকৃত মূর্তি ধারণ করে পরমগতি লাভ করেন। বিশ্বাত্মা এবং বিশ্বের কারণ নারায়ণ, যিনি জীবের কল্যাণের জন্য দেহ-ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই কৃষ্ণে আপনাদের এমন প্রীতি! সুতরাং আপনাদের সুকৃতির আর বাকি কি আছে? আপনারা কৃতকৃত্য হয়েছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় বলেছেন যে, কৃষ্ণের সম্বন্ধে উদ্ধবের এই তত্ত্বপূর্ণ কথা শুনে নন্দরাজ যেন বললেন—ওহে উদ্ধব! শুনেছি তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী; কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি বড় বড় কথা শিখেছ বটে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে কিছু অনুভব করতে পার নি; তারই জন্য তুমি আমাদের মতো হতভাগ্য, যারা প্রিয় পুত্রের বিচ্ছেদে মৃত্যুদশায় উপনীত হয়েছে, তাদের বলছ—মহাভাগ্যবান! মেনে নিলাম, তোমার কথানুযায়ী কৃষ্ণ হচ্ছে অতুল মহিমান্বিত সর্বশক্তিমান ভগবান; সুতরাং এমন অনন্ত গুণসম্পন্ন পুত্র যার গৃহ থেকে চলে যায়, তার মতো হতভাগ্য মহাদুঃখী জগতে আর কে থাকতে পারে? সে তো সকলের অবজ্ঞার পাত্র; সেই তাকেই তুমি মহাভাগ্যবান বলে প্রশংসা করছ!

নন্দরাজের ভাব বুঝে উদ্ধবের মনে হলো যে, কৃষ্ণের ভগবত্তা এবং মহিমার কথা শুনে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অপত্যভাব এবং কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের দুঃখ তো কম হলই না, বরং আরও বেড়েই গেল। উদ্ধব বুঝলেন, এঁদের অতল অপত্য-স্নেহের মধ্যে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কোন স্থান-ই নেই। উদ্ধব ভাবতে লাগলেন—ভগবানকে পাবার জন্য যারা কাঁদতে পারেন তারাই ধন্য। সুতরাং তার বলা উচিত, আপনারা কৃষ্ণের জন্য আরও বেশি করে কাঁদুন; কিন্তু সান্ত্বনা দিতে এসে, এটা-ই বা কেমন সান্ত্বনার কথা! কৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার পুত্র-বুদ্ধি যে কত গভীর তার হদিস করতে না পেরে উদ্ধব হতভম্ব হয়ে পড়লেন। লৌকিক জগতে পুত্রশোকাতুর ব্যক্তিকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করা হয়—মিথ্যা অনিত্য সংসারে স্ত্রী-পুত্রের উপর আসক্তি-ই দুঃখের মূল কারণ; সুতরাং এই আসক্তি ত্যাগ করে নিত্য বস্তু শ্রীভগবানে মন দাও; তাহলেই তোমার সকল দুঃখ দূর হবে। কিন্তু এখানে ভগবান কৃষ্ণকেই নিজের পুত্র বলে ভেবে নন্দ-যশোদা তাঁর বিচ্ছেদে মরণাধিক কষ্ট পাচ্ছেন; সুতরাং এঁদের কি বলে সান্ত্বনা দেব? কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও মহিমা দেখে এবং শুনে বসুদেব-দেবকীর বাৎসল্যভাব শিথিল হয়েছিল—কংস বধের পর কৃষ্ণ যখন কারাগারে বসুদেব-দেবকীর কাছে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা পুত্র কৃষ্ণের প্রণাম গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু নন্দ-যশোদার বাৎসল্যভাব এতই প্রগাঢ় যে, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মহিমাদির

বর্ণনায় তাঁদের পুত্রস্নেহ আরও বেড়ে গেল। বাৎসল্যস্নেহ-সাগরে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও মহিমার জ্ঞান ডুবে গেল।

উদ্ধব ভাবছেন—কৃষ্ণের ভগবত্ত্বা এবং স্বরূপের কথা বলে এঁদের বাৎসল্যভাবকে শিথিল করা যাবে না; একমাত্র কৃষ্ণের প্রত্যাগমনের কথা বললে নন্দ-যশোদার দুঃখ হয়ত একটু লাঘব হতে পারে। এই ভেবে উদ্ধব বললেন ঃ

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে ॥

১০-৪৬-৩৬ (পূর্বার্ধ) ॥

আপনারা আর দুঃখ করবেন না; আপনাদের অসীম বাৎসল্যস্নেহ-ই কৃষ্ণকে ব্রজে নিয়ে আসবে; আপনারা তাঁকে নিকটেই দেখতে পাবেন।

এইটুকু বলতেই উদ্ধব তাঁদের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে, নন্দ-যশোদা যেন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইছেন—কবে কখন আমরা কৃষ্ণকে এখানে দেখতে পাব? উদ্ধব ভাবলেন, আর এক মহা বিপদে পড়া গেল; এখন এঁদের কি উত্তর দেব? যদি বলি পাঁচ দিন পরে আসবেন, তবে কোনরকমে না হয় পাঁচ দিন সব দুঃখ সহ্য করে রইলেন; কিন্তু ষষ্ঠ দিনেও যদি কৃষ্ণ না আসেন, তাহলে নন্দ-যশোদা এবং অপর ব্রজবাসীরা নিশ্চিত কৃষ্ণের শোকে মারা যাবেন। আর যদি বলি তিনি পাঁচ বছর পরে আসবেন, তবে এই দীর্ঘ সময় কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করে বেঁচে থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং এখন আমি এঁদের কি বলে প্রবোধ দেব? উপায়ান্তর না দেখে উদ্ধব আবার কৃষ্ণের ভগবত্ত্বা সম্বন্ধে আর একটি ভাষণ দিলেন।

উদ্ধব বললেন—কৃষ্ণের স্বরূপের কথা আপনাদের তো কিছুটা বলেছি। তিনি সত্যসংকল্প; তাঁর কথা কখনো মিথ্যা হয় না। তিনি আসবেন বলেছেন ; কিন্তু আপনাদের যদি আর প্রতীক্ষা করা সম্ভব না হয়, তবে বলি শুনুন ঃ

অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥

১০-৪৬-৩৬ (উত্তরার্ধ) ॥

কৃষ্ণ আপনাদের অতি নিকটেই রয়েছেন। কাঠের মধ্যে যেমন আগুন থাকে, সেইরকম তিনি সকলের হৃদয়েই অবস্থান করেন; সুতরাং তিনি আপনাদের হৃদয়েও আছেন। আপনারা হয়ত ভাবছেন যে, কৃষ্ণ আপনাদের অত্যন্ত ভালবাসেন; আপনাদের ছেড়ে থাকতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে, কিংবা বসুদেব-দেবকীকে ছেড়ে তিনি আর ব্রজে আসবেন না। এই বিষয়ে বলছি যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত; তিনি অভিমান শূন্য এবং সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; তিনি সমদর্শী।

ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ ॥ ১০-৪৬-৩৮ ॥

কৃষ্ণের মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্রাদি, আত্মীয়-স্বজন বলে কেউ নেই; তাঁর পর বলে কেউ নেই; তাঁর জন্মও নেই এবং দেহও নেই। তবুও তিনি খেলা করার জন্য এবং সাধুদের পরিত্রাণের জন্য দেহ ধারণ করে থাকেন। আপনারা যে ভাবছেন তিনি আপনাদের পুত্র—এটা আপনাদের ভ্রান্ত বুদ্ধির জন্যই হচ্ছে; আসলে তিনি কারও পুত্র নন; তিনি সকলের নিয়ন্তা, ঈশ্বর এবং সকলেরই আত্মা; তিনিই সর্বাত্মা; জগতে তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। হে নন্দরাজ! ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনারা কৃষ্ণকে আপনাদের পুত্র বলে মনে করে তাঁর বিচ্ছেদে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি তো কারুর পুত্র নন। তাঁর স্বরূপ এবং মহিমার কথা যা বললাম, সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করে তাঁর বিচ্ছেদ-দুঃখ ত্যাগ করুন; তাহলেই দেখবেন, তিনি আপনাদের অতি কাছে, আপনাদের অন্তস্তলে সর্বদাই বিরাজ করছেন।

উদ্ধবের কথা শেষ হলো। নন্দ-যশোদার চোখ মুখ দেখে উদ্ধব বুঝলেন যে, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব এবং তাঁর মহিমার কথা তাঁদের হৃদয়ে একেবারেই প্রবেশ করে নি।

নন্দরাজ শ্রীভগবানে বিশ্বাসী এবং তাঁর গৃহে নিত্য নারায়ণের পূজা হয়। নন্দরাজ ভাবছেন—উদ্ধব বলছে কৃষ্ণ হচ্ছে স্বয়ং ভগবান! উদ্ধব আমাদের কি সব অদ্ভুত কথা বলছে! নারায়ণের কোন্ গুণটা কৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে? নারায়ণ হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ; আর কৃষ্ণ হচ্ছে আমাদের দুগ্ধপোষ্য শিশু। নারায়ণ হচ্ছেন নিখিল জগতের আশ্রয়স্থল; আর কৃষ্ণ

হচ্ছে সর্ব বিষয়ে আমাদের উপর নির্ভরশীল। নারায়ণ হচ্ছেন সত্যস্বরূপ শান্ত অপাপবিদ্ধ; আর কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলে অত্যন্ত চঞ্চল এবং চুরি করে খায়। নারায়ণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই; আর কৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর হয়, তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে ওঠে। সুতরাং নারায়ণের কোন গুণই তো কৃষ্ণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া উদ্ধবের কথামত, ভ্রান্তিবশেই যদি আমরা ভগবানকে পুত্র বলে মনে করে থাকি, তবে কৃষ্ণ কেন আমাদের সাথে পুত্রের মতোই ব্যবহার করল? আমাদের ভুল হতে পারে কিন্তু নারায়ণের তো ভুল হওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, নারায়ণের অশেষ কৃপায় আমরা এই পুত্ররত্ন লাভ করেছি বটে। নন্দ-যশোদার দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণ তাঁদের অতি স্নেহের পুত্র। কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে উদ্ধবের এমন সুন্দর ভাষণটা নন্দ-যশোদার উপর কোনই প্রভাব ফেলতে পারল না।

নন্দ-যশোদা যদিও উদ্ধবের কথা মেনে নিতে পারেন নি যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তবুও উদ্ধবের ব্রজে আসাতে নন্দ-যশোদা খুবই উপকৃত হয়েছিলেন। উদ্ধবের মুখে তাঁরা কৃষ্ণ-কথা শুনেছেন—শুনেছেন কৃষ্ণ ভাল আছে এবং সে নন্দ-যশোদা এবং ব্রজবাসীদের কথা ভোলে নি; শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ তাঁদের সংবাদ নেয় এবং ব্রজে এসে তাঁদের দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। নন্দ-যশোদার কাছে এই সংবাদ অত্যন্ত আনন্দদায়ক। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠিয়েছিলেন—আমাদের পিতামাতা নন্দ-যশোদার সন্তোষ বিধান কর—তা করতে উদ্ধব অনেকাংশে সক্ষম হয়েছেন।

অপর দিকে ব্রজে এসে উদ্ধবেরও মহালাভ হলো। কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বোধ হতে বসুদেব-দেবকীর অপত্যভাব শিথিল হয়েছিল; বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন হতভম্ব হয়েছিল—তার সখ্যভাব চলে গিয়েছিল; কিন্তু নন্দ-যশোদার বেলায় উদ্ধব দেখলেন যে, কৃষ্ণের প্রতি অপত্য-স্নেহ এবং মমত্ব বোধ তাঁদের এতই গভীর এবং তীব্র যে সেখানে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কিছুমাত্র দাগ কাটতে পারল না। এমন বাৎসল্যভাব উদ্ধব পূর্বে কোথায়ও দেখেন নি এবং শোনেনও নি। বাৎসল্য-ভাবের এই অপার মহিমা দেখে উদ্ধব মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়লেন; তার জ্ঞানের গরিমা দূর হলো। ভগবান যখন মানুষ হয়ে এসে মানুষী লীলা করেন, তখন অতি ভাগ্যবান কেউ কেউ সেই মানুষ-রূপী ভগবানের সাথে মানুষের মতোই বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতিভাবে ব্যবহার করে ভক্তির উচ্চতম স্তরে পৌঁছে যান; সেখানে ভক্তের মানুষী-ভাবের কাছে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বও তুচ্ছ হয়ে যায়।

নন্দরাজের সাথে কথা বলে উদ্ধব এইটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন; আর তারই ফলে উদ্ধবের পক্ষে কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীদের সামনে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্ বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥
১০-৪৬-৪৪॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দরাজ এবং কৃষ্ণানুচর উদ্ধবের এইরূপ কথা-বার্তাতেই সেই রাত্রি শেষ হয়ে গেল। তখন বিভিন্ন গৃহে গোপীরা দীপ জালিয়ে ঘর পরিষ্কার করে দধি-মন্থন করতে লেগেছেন।

উদগায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্মন্থন-শব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥
১০-৪৬-৪৬ ॥

ভোর হয়ে গেছে; গোপবালারা দধি-মন্থন করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে কমল-লোচন কৃষ্ণের গুণকীর্তন করতে থাকলে, দধি-মন্থনের শব্দের সাথে কৃষ্ণগুণ-গান একত্রিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল; ঐ শব্দে চতুর্দিকের অমঙ্গলসমূহ দূর হলো।

প্রশ্ন হতে পারে, কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পর ব্রজবাসীদের সকলেই তো কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে কাতর; তাঁদের তো আহারে বিহারে গৃহকর্মে মন থাকার কথা নয়। সুতরাং এখানে যে বলা হলো, গোপীরা আগের মতোই গৃহকার্যে রত থাকেন—তা কেমন করে সম্ভব? এর উত্তরে 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকায় বলা হয়েছে যে, গোপীদের মধ্যে ভাবের পার্থক্য ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন উৎকণ্ঠা-প্রধান এবং কেউ ছিলেন বিশ্রম্ভ-প্রধান। উৎকণ্ঠা-প্রধান ভক্ত হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁরা কৃষ্ণের জন্য সদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন; যেমন নন্দ-যশোদা এবং কৃষ্ণের প্রেয়সী গোপীরা। আর বিশ্রম্ভ-প্রধান ভক্ত হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সর্বদাই ভাবেন যে, কৃষ্ণ তাঁদের সাথেই রয়েছেন; সুতরাং তাঁদের কৃষ্ণ-বিরহ নেই। এঁরা হচ্ছেন কৃষ্ণের সখারা এবং কোন কোন গোপীরা। এই বিশ্রম্ভ-প্রধান গোপীরাই পূর্বের মতো সংসারের কাজকর্মাদি করতেন।

আগের দিন সন্ধ্যা হয়ে যাবার পর উদ্ধব ব্রজে এসে পৌছেছিলেন; তার উপর গোখুর-উত্থিত ধুলায় চারিদিক আচ্ছন্ন থাকায় উদ্ধবের রথ কেউ দেখতে

পায় নি। আজ ভোর হতেই ব্রজবাসিনীরা নন্দালয়ের সামনে সুবর্ণে অলঙ্কৃত রথ দেখে সবিস্ময়ে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলেন—এ রথ কার ?

অক্রূর আগতঃ কিংবা যঃ কংস্যস্যার্থসাধকঃ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥ ১০-৪৬-৪৮ ॥

গোপীদের মধ্যে একজন 'উৎকণ্ঠা-প্রধান' গোপী ক্রোধভরে বলতে লাগলেন—যে অক্রূর তার প্রভু, কংসের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমাদের কমললোচন কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিল, সেই অক্রূর-ই কি আবার এখানে এসেছে? তার আসার প্রয়োজন? আর একজন গোপী বললেন—রথ দেখে তো মনে হচ্ছে, অক্রূরেরই বটে। কংস তো মরেছে; মৃত ব্যক্তির জন্য পারলৌকিক কাজ করতে হয়। অক্রূর তো কৃষ্ণকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের মেরেই রেখে গেছে; এখন আমাদের মাংস দিয়ে পিণ্ড করে সে তার প্রভু কংসের পিণ্ডদান করবে; তাই সে আবার এসেছে। আর একজন গোপী বললেন—হায়! কে যে তার 'অক্রূর' নাম রেখেছিল জানি না; কিন্তু তার কাজ দেখে তো মনে হচ্ছে সে অত্যন্ত ক্রূর, নিষ্ঠুর; নইলে আমাদের হৃদয়-মণিকে সে আমাদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারত না। হায়! কবে যে আমাদের নয়নানন্দকে আবার দেখতে পাব!

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে ব্যথাতুরা গোপীরা যখন এই সব কথা বলাবলি করছিলেন সেই সময় উদ্ধব স্নান আহ্নিক সেরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। উদ্ধব দূর থেকেই তাঁদের কথা শুনতে পেয়েছেন; তাই কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের এই মর্মস্পর্শী আর্তি শুনে উদ্ধব বুঝলেন, এঁদের কৃষ্ণ-প্রেমের তুলনা নেই। উদ্ধব নিজেও কৃষ্ণের একান্ত ভক্ত এবং এই নিয়ে তার একটু অভিমানও ছিল; কিন্তু গোপীদের সামনে দাঁড়িয়ে আজ তার মনে হলো যে, তার নিজের কৃষ্ণভক্তি এঁদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ; তিনি মনে মনে এঁদের চরণে প্রণত হলেন।

৩০
উদ্ধবের ব্রজে গমন (খ)

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জ-লোচনম্।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসন্মুখারবিন্দং পরিমৃষ্ট-কুণ্ডলম্ ॥
১০-৪৭-১॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণের অনুচর উদ্ধবের আজানুলম্বিত বাহু, নব প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো চক্ষু, পীত বসন, গলায় পদ্মের মালা, অতি সুন্দর মুখ-কমল এবং উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় দেখে গোপীরা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—অচ্যুতের মতো বেশভূষায় সজ্জিত এই সুদর্শন পুরুষটি কে? কোথা থেকে এলেন এবং ইনি কার দূত? এই সব কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে করতে তাঁরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পবিত্রকীর্তি কৃষ্ণের পদাশ্রিত উদ্ধবকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলেন।

প্রশ্ন হতে পারে গোপীরা তো আগে কখনও উদ্ধবকে দেখেন নি; কিন্তু উদ্ধবকে প্রথম দেখেই, তার কোন পরিচয় না জেনেই তাঁরা কোন রকম সংকোচ না করেই তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন—এটা কি রকম হলো? উত্তর হলো এই যে, উদ্ধবের গায়ের রং, শরীরের গড়ন, বেশভূষা ইত্যাদি দেখেই গোপীরা মনে মনে বুঝেছিলেন যে, ইনি কৃষ্ণের নিজের লোক; সুতরাং তাঁদেরও আপনজন।

কৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাবার সময় বলেছিলেন—আমার প্রাণপ্রিয় গোপীরা দূর থেকে তোমাকে দেখে আমিই এসেছি মনে করে ছুটে এসে যখন তারা বিফল মনোরথ হবে, তখন তুমি নিজের পরিচয় দিয়ে তাদের বলবে—যমুনার তীরে যিনি সর্বদা বন-বিহার করতে উৎসুক, যার মুখখানি সর্বদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে মলিন হয়ে গেছে, অক্রূর যাকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে গেছে, সেই নন্দনন্দন কৃষ্ণের আমি প্রণয়সচিব; নাম আমার উদ্ধব, এসেছি দৌত্যকার্যে।

গোপীরা উদ্ধবকে কৃষ্ণদূত বলে জানতে পেরে, তাকে অতি সমাদরে বসতে আসন দিলেন; কিন্তু উদ্ধব তাঁদের দেওয়া আসনে বসলেন না; কারণ তিনি জানেন যে, গোপীরা হচ্ছেন তারই পরমপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রেয়সী; অতএব উদ্ধবের প্রণম্য। তাই তিনি তাদের দেওয়া আসনে না বসে আসনের পাশেই বসলেন। এতে গোপীদের প্রতি উদ্ধবের শ্রদ্ধা সূচিত হয়েছে।

জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্ ।
ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১০-৪৭-৪ ॥

গোপীরা উদ্ধবকে বললেন—ব্রজে আগত আপনাকে যদুপতির সেবক বলে জানতে পেরেছি। আপনার প্রভু যদুপতি পিতামাতার প্রিয়কাজ করবার জন্য আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

এখানে গোপীরা কৃষ্ণকে ব্রজনাথ গোপীনাথ না বলে বললেন 'যদুপতি'। এই 'যদুপতি' শব্দের মধ্য দিয়ে গোপী-হৃদয়ের মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে। তাদের ভাবখানা এই যে, কৃষ্ণ ছিলেন গোপ-জাতীয় এবং গোপগণের পতি ; আজ তিনি মথুরায় গিয়ে জাতে উন্নত হয়ে রাজবংশীয় যদুপতি হয়েছেন; সুতরাং এখন তাঁর এখানে আসার ইচ্ছা হবার কথা নয়; অতএব তাঁকে এখন ব্রজনাথ, ব্রজপতি, গোপীনাথ না বলে যদুনাথ, যদুপতি বলাই ভাল। এই ব্যঙ্গোক্তির মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদাতুর গোপীদের হৃদয়বেদনা উদ্ধব ঠিকই বুঝতে পেরেছেন।

গোপীরা বললেন—উদ্ধব যে নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছে, তা নয়; তার প্রভুই তাকে এখানে পাঠিয়েছেন—এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে; কিন্তু উদ্ধবের প্রভু কেন তাকে এখানে পাঠালেন? এখানে তাঁর আর কিসের প্রয়োজন? কিন্তু এমন দিন ছিল যখন তোমাদের যদুপতি এই গোয়ালিনী গোপীদেরই প্রেমের কাঙাল ছিলেন; তিনি আমাদের ছাড়া আর কিছুই জানতেন না; আমরাও তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানতাম না। কিন্তু হায়! সে দিন চলে গেছে। তাঁর কাছে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে; সুতরাং আমাদের কথা মনে করা কিংবা আমাদের সংবাদ দেবার তাঁর দরকার-ই বা কি? এখন তো মথুরার রূপবতী রমণীদের সেবাই তাঁর দরকার। তবে হ্যাঁ, একটা প্রয়োজন আছে বটে ; সেটা হচ্ছে পিতামাতা নন্দ-যশোদার সংবাদ নেওয়া এবং তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে মনঃকষ্ট দূর করা।

অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥ ১০-৪৭-৫ ॥

পিতামাতার প্রিয়কাজ করা ছাড়া, এই গোপ-পল্লীতে যদুপতির মনে রাখার মতো আর কিছু আছে বলে তো দেখতে পাচ্ছি না! আত্মীয়-স্বজনের স্নেহবন্ধন ত্যাগ করা মুনিঋষিদের পক্ষেও কঠিন।

গোপীরা বলছেন—পিতামাতার প্রীতির জন্য যদুপতি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন—তা বেশ ভাল; কিন্তু পিতামাতার প্রতি ভালবাসার জন্যই যে তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, তা মনে হয় না। ভালবাসাই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হতো তবে তিনি নিজেই আসতেন; দায়সারার মতো আপনাকে পাঠাতেন না। নন্দ-যশোদা কৃষ্ণের বিচ্ছেদে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে আর যদুপতি মথুরায় রাজত্ব করবেন—এই লোকনিন্দার ভয়েই বোধ হয় তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। পিতামাতার স্নেহের সম্বন্ধ মুনিঋষিরাও ভুলতে পারেন না। যে পিতামাতার আদর-যত্নে, তাঁদের বুক-ভরা স্নেহে পালিত হয়ে যদুপতি আজ এতটা বড় হয়েছেন, এতদিন পরেও তাঁদের সংবাদ নিতে তিনি নিজে আসতে পারলেন না—লোক পাঠিয়েছেন! নন্দ-যশোদার প্রাণে পুত্র-বিচ্ছেদের দুঃখ তো আছেই ; তার উপর পুত্রের কাছ থেকে আজ তাঁদের এই অপমানও সহ্য করতে হলো! আমরা ভাবছি—তোমাদের যদুপতির কি অপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠা!

উদ্ধব মহাবুদ্ধিমান; কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ব্যঙ্গোক্তির ছলে তাদের বুকভরা ভালবাসার কথা হৃদয়ঙ্গম করে উদ্ধব মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আবার গোপীদের অভিমানভরা ব্যঙ্গোক্তি শুনে তিনি যেন মরমে মরে গেলেন; নির্বাক বিস্ময়ে তিনি অধোবদনে বসে রইলেন।

গোপীরা বললেন—আচ্ছা উদ্ধব! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি রসিকশেখর কৃষ্ণের বন্ধু, তুমি হয়ত বলতে পারবে। জগতে দেখতে পাই যে, প্রীতির সম্বন্ধ যেন একটা ব্যবসাদারীর মতো, স্বার্থপ্রণোদিত ; স্বার্থ ফুরালেই প্রীতির সম্বন্ধও নষ্ট হয়ে যায়।

অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্।
পুম্ভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্‌পদৈঃ ॥ ১০-৪৭-৬ ॥

একে অপরের প্রতি যে মিত্রতা, তা কেবল প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছেন—দুশ্চরিত্র পুরুষের কুলটা নারীর প্রতি মিত্রতা এবং মৌমাছিদের ফুলের সাথে মিত্রতা, কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে। স্বার্থ যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে মিত্রতাও ততক্ষণ পর্যন্তই।

বারবনিতারা নির্ধন ব্যক্তিকে ত্যাগ করে, প্রজারা প্রজা পালনে অসমর্থ রাজাকে ত্যাগ করে, শিষ্যরা অধ্যয়ন শেষ হলে আচার্যকে ত্যাগ করে, পুরোহিতেরা দক্ষিণা পেলে যজমানদের ত্যাগ করে, অতিথিরা ভোজনান্তে গৃহস্থকে ত্যাগ করে, পশুরা দগ্ধ অরণ্য ত্যাগ করে, গাছের ফল শেষ হলে পাখিরা সেই গাছকে ত্যাগ করে। তাই বলছি জগতে প্রীতির সম্পর্ক বলে আমরা যা দেখি তা সবই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য; স্বার্থ শেষ হলেই প্রীতির সম্পর্কও ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু উদ্ধব! আমাদের যে কৃষ্ণপ্রীতি তার মধ্যে তো কোন স্বার্থ—কোন প্রয়োজন সিদ্ধির মতলব ছিল না; আর আমাদের ভালবেসে কৃষ্ণের যে কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে, এমন ভাবও তো তাঁর মধ্যে কখনও দেখি নি। তবে আমাদের এই বাসনা-কামনা শূন্য, শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক প্রেমে বিচ্ছেদ এল কেন? আজ কৃষ্ণের কত পরিবর্তন! আমরা তো তাঁর চরণে কোন দোষ করেছি বলে মনে হয় না; আমাদের শরীর মন সবই কৃষ্ণে সমর্পিত; তাঁকে ছাড়া আমরা আর কিছুই জানতাম না; সেই আমাদের তিনি কেন এমন নিষ্ঠুরের মতো ত্যাগ করে গেলেন?

ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্‌কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ ॥ ১০-৪৭-৯ ॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যাঁরা নিজের দেহ, মন, বাক্য—সর্বস্ব কৃষ্ণে অর্পণ করেছিলেন, সেই গোপীরা কৃষ্ণ-দূত উদ্ধবকে কাছে পেয়ে এই সব কথা বলতে বলতে লোক-ব্যবহার পর্যন্ত ভুলে গেলেন।

গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্মাণি রুদত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ ॥
১০-৪৭-১০ ॥

গোপীরা তখন উদ্ধবের সামনেই লজ্জাশূন্য হয়ে কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরের মনোমুগ্ধকর লীলাসমূহ উচ্চৈঃস্বরে গান করতে লাগলেন এবং সেই সব কথা বার বার স্মরণ করতে করতে তাঁরা বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। কৃষ্ণের ব্রজলীলার মধুর স্মৃতি গোপীদের মনে উদয় হতেই তাঁরা কৃষ্ণে এতই আত্মহারা হয়ে পড়লেন যে, তখন তাঁদের শরীর এবং পরিবেশের কোন জ্ঞানই রইল না। একজন অপরিচিত পুরুষ তাঁদের কাছেই রয়েছেন, এ কথাও ভুলে গিয়ে তাঁরা কৃষ্ণের জন্য কাঁদতে লাগলেন।

কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীদের প্রেমের গভীরতা, কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অভিমান, কৃষ্ণের জন্য তাঁদের আবেগ, উৎকণ্ঠা এবং লজ্জাশূন্যতা দেখে উদ্ধব অত্যন্ত বিস্মিত এবং অভিভূত হলেন। ভগবানকে পরম প্রেমাস্পদ ভেবে কেউ যে তাঁর জন্য এমন উৎকণ্ঠিত হতে পারে, তাতে এমন তন্ময়তা লাভ করতে পারে উদ্ধব তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তাই তিনি মনে মনে গোপীদের বার বার প্রণাম করে গোপীদের ভাব-তরঙ্গ দেখতে লাগলেন।

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্।
প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১০-৪৭-১১ ॥

শুকদেব বললেন—তখন কোন এক সদা কৃষ্ণভাবিতা কৃষ্ণময়ী গোপী একটি ভ্রমরকে দেখে, তাকে প্রিয়তমের দূত কল্পনা করে উদ্ধবের সামনেই বলতে লাগলেন ঃ

ইনি গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা। তিনি সর্বদাই কৃষ্ণের ভাবে তন্ময় হয়ে থাকেন; ভাবনেত্রে সদাই কৃষ্ণকে দেখেন এবং মনে মনে তাঁর সাথে কথাবার্তা, মান-অভিমান করেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে করতে ধ্যাননেত্রে দেখলেন যে, কৃষ্ণ কোন মথুরাবাসিনী রমণীর সাথে বিহার করছেন; কল্পনানেত্রে এই দেখে তিনি কৃষ্ণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমান করলেন। ঠিক এই সময় একটি ভ্রমর এসে তাঁর পায়ের কাছে গুঞ্জন করতে লাগল। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শ্রীরাধার মনে হলো, কৃষ্ণই তার মান-ভঞ্জনের জন্য ভ্রমরটিকে দূত করে পাঠিয়েছেন; এ সবই শ্রীরাধার কল্পনা; কিন্তু তীব্র বিরহ অবস্থায় এইগুলিকেই সত্য বলে মনে করে ভ্রমরকে বললেন ঃ

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুম-শ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥ ১০-৪৭-১২ ॥

শ্রীরাধা বললেন—ওহে মধুপ! 'কিতববন্ধো'—কপটের দূত! আমার সপত্নীদের বুকের কুঙ্কুমে কৃষ্ণের গলার মালা রঞ্জিত হয়েছিল; আর তুই সেই মালার উপর বসে তোর দাড়ি-গোঁফ রাঙিয়ে এখানে এসেছিস! এই অবস্থায় তুই আমাদের চরণস্পর্শের যোগ্য নোস। তোর আর আমাদের মানভঞ্জন করতে হবে না; তুই বরং মথুরায় চলে যা। তুই যার দূত সেই কৃষ্ণের সেখানে অনেক মানিনী রয়েছে ; তাদের মানভঞ্জন কর গিয়ে। এতে যদুপতির সভাসদেরা তোর প্রভুর কীর্তি দেখে তোর উপর খুশি-ই হবে।

কৃষ্ণকেই এখানে কপট ধূর্ত বলা হয়েছে ; কারণ তিনি মথুরায় যাবার সময় বলেছিলেন যে, শিগ্‌গিরই আবার ফিরে আসবেন; কিন্তু তিনি আসেন নি। তার উপর তিনি ব্রজের গোপীদের ভুলে মথুরা-নাগরীদের সাথে আনন্দে বিহার করছেন; সুতরাং তিনি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ধূর্ত—এতে আর সন্দেহ কোথায়? সেই ধূর্ত কৃষ্ণ এখন তোর বন্ধু, তোকে এখানে দূত করে পাঠিয়েছেন। ধূর্তের বন্ধু তো ধূর্তই হয়; সুতরাং এই ভ্রমরও ধূর্ত।

শ্রীরাধা ভ্রমরের পীতবর্ণ দাড়ি দেখে ভাবলেন—এ নিশ্চয়ই তার সপত্নী মথুরাবাসিনীদের বুকের কুঙ্কুমে, যা আলিঙ্গন করার সময় কৃষ্ণের গলার মালায় লেগেছিল, সেই কুঙ্কুমে নিজের দাড়ি রাঙিয়ে তার মানভঞ্জন করতে এসেছে! ধৃষ্টতা আর কাকে বলে! এতে যে তাঁর ক্রোধ এবং মান আরও বেড়ে যাবে, এটাও কৃষ্ণদূত বুঝতে পারে না? শ্রীরাধা নিজেই মনে মনে ভাবছেন—বুঝতে পারবে কেমন করে? এ যে মদ খেয়ে এসেছে। মধুপ মানে মৌমাছিও হয়, আবার মদ্যপও হয়; সেইরকম মধুপতির অর্থ মথুরাপতি কৃষ্ণও হয়, আবার মদের আড়তদারও হয়। শ্রীরাধা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করে ভাবছেন—কৃষ্ণ যেমন মদের আড়তদার, তার বন্ধু এই ভ্রমরও তেমনি মদ্যপায়ী; সুতরাং এদের দুই জনেরই বিবেক বিচার বলে কিছু নেই; নইলে সপত্নীর বুকের কুঙ্কুমে মুখ রাঙিয়ে এই ভ্রমর এসেছে মানিনীর মান

ভাঙতে ! আহাম্মক আর কাকে বলে? ভ্রমর যখন মদ খেয়েছে, তখন সে অপবিত্র; এই অপবিত্র অবস্থায় সে কিনা পরম পবিত্র কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধার পদস্পর্শ করতে চায়! আস্পর্ধা তো কম নয়! তাই শ্রীরাধা ভ্রমরকে বললেন— তুই এখান থেকে সরে যা—আমার চরণ স্পর্শ করিস না। তুই তো মথুরা-নাগরীদের বক্ষলিপ্ত কুঙ্কুমে মুখ রাঙিয়েছিস; এখন এই মুখ নিয়ে তুই মথুরা-নাগরীদের কাছেই গিয়ে তাদের মান ভাঙা; আর তোর এই মুখ দেখে কৃষ্ণের কীর্তি-কলাপ সব প্রকাশ হয়ে পড়বে; যদুবংশীয়েরা তাঁকে ছি ছি করবে।

শ্রীরাধা দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণের প্রতি এইরকম অযথা দোষারোপ করতে থাকলে শ্রীরাধা যেন শুনতে পেলেন, ভ্রমর বলছে—আমি ভ্রমর জাতি; প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী-ই আমার দাড়ি পীতাভ; কোন রমণীর বক্ষ-কুঙ্কুমে দাড়ি রাঙিয়ে আসি নি; সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমার প্রভুর কোন দোষ নেই ; তিনি একমাত্র আপনাতেই আসক্ত ; অতএব তাঁর উপর অভিমান করা আপনার উচিত নয়। ভ্রমরের এই কথা ভাবকর্ণে শুনতে পেয়ে শ্রীরাধা বললেন—তুই বলছিস তোর প্রভুর কোন দোষ নেই? তবে বলি শোন্ তোর প্রভুর দোষের কথা ঃ

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ॥ ১০-৪৭-১৩ ॥

শ্রীরাধা বলছেন—তুই যেমন দুর্মতি, ফুলের মধু পান করে ফুলকে পরিত্যাগ করিস, সেইরকম মধুপতি কৃষ্ণও তাঁর মোহকারী অধরসুধা আমাদের একবার পান করিয়েই আমাদের পরিত্যাগ করেছেন; তাই ভাবছি এমন কৃষ্ণের পদসেবা কেমন করে লক্ষ্মীদেবী করেন! মনে হয় পুণ্যকীর্তি কৃষ্ণের পরম ভক্ত নারদাদি ঋষিদের স্তুতিকথায় মোহিত হয়েই লক্ষ্মীদেবী না বুঝেই তাঁর পদসেবা করছেন।

তুই একটা ফুলের মধু পান করে সেই ফুলকে ত্যাগ করে অন্য ফুলের কাছে যাস; ফুলের মধু পান করেই তোকে বাঁচতে হয়; সুতরাং এটা তোর

জীবিকা; সেইজন্য মধুশূন্য ফুল ত্যাগের মধ্যে তোর বিশেষ দোষ নেই; কিন্তু তোর প্রভুর স্বভাবটা একবার দেখ। তিনি তো মধুপতি—জগতের সমস্ত মধু, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত মাধুর্যের তিনি আশ্রয়স্থল; তিনি নিজেই মাধুর্যস্বরূপ; সুতরাং অন্য কোন মধুর তাঁর দরকার নেই; তবুও এমনই তাঁর কুটিল স্বভাব যে, তিনি আমাদের মতো সরল এবং শুদ্ধমনা গোপীদের তাঁর অধর-সুধা পান করতে প্রলোভিত করেন। তাঁর পরম সুন্দর অধর যেন জোর করে আমাদের আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণ আমাদের মোহগ্রস্ত করে জোর করে তাঁর অধরসুধা পান করায়।

লক্ষ্মীদেবী অনন্তগুণসম্পন্না হলে কি হয়? তিনি অত্যন্ত সরলমনা; কৃষ্ণের ছল-চাতুরী, নিষ্ঠুরতা বোঝেন না; তাই তিনি কৃষ্ণের পদসেবা করছেন।

এখানে শ্রীরাধা অভিমান ভরে শ্রীকৃষ্ণের শঠতা, নির্দয়তা এবং চপলতার উল্লেখ করে নিজের বিচক্ষণতার কথাও প্রকাশ করলেন।

কৃষ্ণের সম্বন্ধে এত দোষারোপ করলেও, ভ্রমর শ্রীরাধার পায়ের কাছেই গুন্‌গুন্ করছে দেখে শ্রীরাধা ভাব-কর্ণে যেন শুনতে পেলেন, ভ্রমর কৃষ্ণের গুণগান করছে। এতে শ্রীরাধার অভিমান আরও বেড়ে গেল; ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রমরকে বললেন ঃ

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥ ১০-৪৭-১৪ ॥

ওরে ভ্রমর! কৃষ্ণকে আমরা বহুদিন থেকেই জানি; সে তো আমাদের কাছে নূতন নয়—সে যে বহু পুরাতন; সুতরাং তাঁর গুণের কথা আমাদের কাছে যারা তাঁরই জন্য গৃহ ছেড়ে বনবাসী হয়েছে তাদের কাছে আর বলতে হবে না। যারা কৃষ্ণের আধুনিক সখী, সেই মথুরার নাগরীদের কাছে গিয়ে তাঁর গুণগান কর; কৃষ্ণের আলিঙ্গনে যাদের বক্ষ-সন্তাপ এখন দূর হচ্ছে, সেই কৃষ্ণ-প্রিয়ারাই তোকে পারিতোষিক দেবে।

মূলে 'ষড়ঙ্ঘ্রে'—ছয়-পা-বিশিষ্ট ভ্রমর কথাটি রয়েছে। ষড়ঙ্ঘ্রে বলে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হলো এই যে, যাদের যত বেশি পা, তাদের বুদ্ধি তত কম। চতুষ্পদ প্রাণী থেকে দ্বিপদ মানুষের বুদ্ধি বেশি। তোর ছয় পা; সুতরাং তোর বুদ্ধি চতুষ্পদ প্রাণী থেকেও কম; তারই জন্য কোথায় কি গান করা উচিত, তুই বুঝতেও পারিস না। তাই তোকে বলছি—অর্জুনসখা কৃষ্ণের নূতন সখী, মথুরা-নাগরীদের কাছে গিয়ে তোর কপট কৃষ্ণের কপট গুণকীর্তন কর; তাহলে তারা নিজেদের সৌভাগ্যবতী বলে মনে করে তোকেও কিছু দান করবে। এখানে তো আমরা সেই কপট কৃষ্ণের জন্য সর্বহারা বনবাসিনী; তোকে এক মুঠো চাল দেবারও আমাদের সামর্থ্য নেই। তাই বলছি, এখানে কৃষ্ণগুণ গান না করে মথুরার মানিনীদের কাছে গিয়ে কর—তাতে তোরও লাভ হবে।

মথুরাবাসিনীদের জড়িয়ে কৃষ্ণের প্রতি এমন কটাক্ষ এবং অপমানকর কথা শুনে উদ্ধব ভাবছেন যে, শ্রীরাধার এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না; কৃষ্ণ সর্বদাই শ্রীরাধার কথা ভাবেন এবং গোপীদের সান্ত্বনা দেবার জন্যই আমাকে দূত করে পাঠিয়েছেন। উদ্ধবের এই চিন্তাধারা শ্রীরাধা ভ্রমরের গুঞ্জনের মধ্যে শুনতে পেয়ে ভ্রমরকে বললেন ঃ

> **দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ**
> **কপটরুচিরহাস-ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।**
> **চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা**
> **অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥ ১০-৪৭-১৫ ॥**

ওহে কপট! বল দেখি স্বর্গ, মর্ত, পাতালে, এমন কোন্ রমণী আছে যে কৃষ্ণের সুন্দর হাসি এবং ভ্রূবিলাস দেখে মোহিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে না? বেশি কথা কি, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত যাঁর চরণধূলির সেবিকা, তাঁর কাছে আমরা আর কি? আমরা আজ সর্ব প্রকারেই দীন এবং তাঁর উপেক্ষিতা; তাই পুণ্যকীর্তি কৃষ্ণের সংবাদও আজ আমাদের দুষ্প্রাপ্য।

কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিরহে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ভাবছেন যে, ভ্রমর তার পায়ের কাছে গুন্‌গুন্ করে মিনতি করে বলছে—হে দেবি! আমার প্রভু কৃষ্ণ আপনার অতি প্রিয় এবং তিনিও আপনার কাছে কোন অপরাধ

করেন নি; সুতরাং তাঁর উপর কি আপনার রাগ করা সাজে? আর অজান্তে যদি কোন অপরাধ হয়েও থাকে, তবে আপনি তা ক্ষমা করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করুন। শ্রীরাধার মনে এইসব কথার উদয় হতেই তিনি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রমরকে বললেন ঃ

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ১০-৪৭-১৬ ॥

ওরে ভ্রমর! তুই যে আমার চরণে মাথা রেখেছিস, তা তুই সরিয়ে নে। মুকুন্দের কাছ থেকে দূতকর্ম এবং তোষামোদ করা তুই ভালই শিখেছিস; তোর অভিসন্ধিও আমি বুঝেছি। কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞ; তাঁরই জন্য আমরা পতি পুত্র, এমন কি স্বর্গপ্রাপ্তির আশা পর্যন্ত ত্যাগ করে তাঁকেই চিত্ত সমর্পণ করেছিলাম; আর তিনি কি করলেন? আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেলেন! একবার চিন্তাও করলেন না, অসহায় আমাদের কি উপায় হবে! এমন যে নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, শঠ তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করা চলে না।

শ্রীরাধা দিব্যোন্মাদ অবস্থায় প্রণয়কোপে অধীর হয়ে কখনো কৃষ্ণের প্রতি অভিমান করছেন, কখনো তাঁর উদ্দেশ্যে গালাগালি দিচ্ছেন আবার কখনো ঈর্ষা প্রকাশ করছেন। ভ্রমরকে বলছেন—তুই বলছিলি না, তোর প্রভুর সঙ্গে সন্ধি করতে? শোন, তবে বলি, তোর প্রভুর আরও সব কীর্তি। তিনি যে কেবল এই জন্মেই অকৃতজ্ঞ প্রতারক নিষ্ঠুর—তা নয়; পূর্ব পূর্ব জন্মেও তিনি এইরকমই করেছেন।

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥ ১০-৪৭-১৭ ॥

তোর প্রভু এই কৃষ্ণ পূর্ব অবতারে শ্রীরামচন্দ্ররূপে ব্যাধের মতো লুকিয়ে নিরপরাধ বানররাজ বালীকে বধ করেছিলেন; তারপর তিনি স্ত্রীর

বশীভূত হয়ে, কামাতুরা শূর্পণখার নাক-কান কেটে তাকে চিরদিনের মতো বিরূপা করেছিলেন। কাক যেমন লোকের দেওয়া খাবার খেয়ে তাকেই চারিদিক থেকে ঘিরে অতিষ্ঠ করে তোলে, সেইরকম তোর প্রভু, বামন অবতারে বলি রাজের দেওয়া পাদ্য-অর্ঘ্য ইত্যাদি গ্রহণ করে, ছল করে বলির সর্বস্ব অপহরণ করে তাকে নাগপাশে বন্ধন করেছিলেন।

তোর প্রভু কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বামন—এঁরা সবাই কালো; সুতরাং কালোর সাথে আর মিত্রতা নয়; কিন্তু কি করি, তাঁর লীলাকথা পরিত্যাগ করা যে সম্ভব হচ্ছে না!

শ্রীরাধা ভ্রমরকে লক্ষ্য করে বলছেন—তোর প্রভু কৃষ্ণ পূর্ব অবতারে রামচন্দ্ররূপে ব্যাধের মতো লুকিয়ে বানররাজ বালীকে বধ করেছিলেন এবং এই অন্যায় কাজ তিনি করেছিলেন কেবল নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। স্বার্থ কি? না, সীতার অন্বেষণ এবং তাঁর উদ্ধার। সুতরাং সুগ্রীবের প্রীতির জন্য তার ভাই বালীকে লুকিয়ে বধ করা হলো; কি জঘন্য প্রবৃত্তি! ব্যাধ তবু মাংস খাবার জন্য পশুবধ করে; কিন্তু বানরের মাংস তো খাওয়া চলে না; তবুও রামচন্দ্র তাকে বধ করলেন! কেন? বালীকে বধ না করে, তার সাথে সুগ্রীবের ঝগড়া মিটিয়ে দিতে পারতেন; তাতে বালী এবং সুগ্রীবের মিলিত শক্তিতে সীতা-উদ্ধারের কাজ ত্বরান্বিতই হতো। কিন্তু এসব না করে বালীকে গুপ্তভাবে বধ করা হলো—কি নিষ্ঠুর! হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত! শুধু কি এই? রামচন্দ্র সীতার বশীভূত হয়ে শূর্পণখার নাক-কান কেটে চিরদিনের মতো তাকে বিরূপা করে দিলেন। শূর্পণখার দোষ কি ছিল ? শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে তাঁকে পতিত্বে বরণ করতে চেয়েছিল। রামচন্দ্র যদি ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসী হতেন, তবে না হয় শূর্পণখার প্রস্তাব দূষণীয় হতো ; কিন্তু তা তো নয়; তাঁর স্ত্রী যে তাঁর সঙ্গেই ছিলেন; আর তখন পুরুষের বহু বিবাহ নিন্দনীয়ও ছিল না। সুতরাং বুঝলি ভ্রমর, তোর প্রভু কৃষ্ণ কেমন নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন! আরও বলি শোন্, রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, সুতরাং তাঁর মধ্যে একটু নিষ্ঠুরতা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তোর প্রভু, আরও পূর্বে, ব্রাহ্মণের পুত্র হয়ে বামনরূপে এসেছিলেন বলির যজ্ঞশালায়; সেখানে বলির প্রদত্ত পাদ্য, অর্ঘ্য, ভোজনাদি গ্রহণ করলেন; আর প্রতিদানে সেই বামন, বলির দেওয়া ত্রিপাদভূমি গ্রহণ করবার ছল করে, বিরাট মূর্তি পরিগ্রহ করে দুই পায়েই স্বর্গ, মর্ত, পাতাল—সব কিছুই অধিকার

করে নিলেন। এই রকম শঠতা অকৃতজ্ঞতা নিষ্ঠুরতার কি কোথাও কোন নজির আছে?

শ্রীরাধা একটু চুপ করতেই তিনি যেন শুনতে পেলেন ভ্রমর বলছে—আপনি তো কেবল আমার প্রভুর নিন্দাই করছেন; তিনি যদি এতই খারাপ তবে তাঁরই কথা বার বার বলছেন কেন? উত্তরে শ্রীরাধা বললেন—কি করি বল্! তাঁর কথা শোনা এবং বলা থেকে যে আমরা বিরত থাকতে পারি না; কারণ কৃষ্ণকথা যে 'হৃৎকর্ণরসায়নাঃ'—হৃদয় ও কর্ণের পুষ্টিকারী; কৃষ্ণকথা যে 'তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্'—উত্তপ্ত জীবনে তাঁর কথাই যে অমৃতস্বরূপ এবং 'কল্মষাপহম্'—কৃষ্ণকথা সর্ব পাপতাপ নিবারক; সুতরাং চেষ্টা করেও আমরা কৃষ্ণকথা ভুলতে পারছি না।

শ্রীরাধা একদিকে কৃষ্ণকথার মহিমা কীর্তন করছেন এবং অপর দিকে প্রণয়কোপে কৃষ্ণকে গালাগালি দিচ্ছেন। শ্রীরাধার প্রেমে এই এক অদ্ভুত ভাববৈচিত্র্য ! উদ্ধব অবাক হয়ে শ্রীরাধার এই ভাব-তরঙ্গ দেখছেন। উদ্ধবের মনে, শ্রীরাধার এই সব প্রলাপের মধ্যে কেবল একটি কথাই সূচিত হচ্ছে—কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার কি অগাধ, অচিন্তনীয় প্রেমাকর্ষণ!

শ্রীরাধা কৃষ্ণের মিত্রতা ত্যাগ করে কৃষ্ণনামের মহিমার কথা বলছিলেন; কিন্তু ভাবের আর একটি তরঙ্গ উঠতেই শ্রীরাধা কৃষ্ণকথারও দোষ বলতে লাগলেন; আসলে দোষের ছলে তিনি কৃষ্ণকথার মহিমাই কীর্তন করতে লাগলেন।

> যদনুচরিত-লীলা-কর্ণ-পীযূষ-বিপ্রুট্-
> সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্মা বিনষ্টাঃ।
> সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
> বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥ ১০-৪৭-১৮ ॥

শ্রীরাধা বলছেন—কৃষ্ণের চরিত্রকথা কানের পক্ষে অমৃত-স্বরূপ; এই কর্ণামৃতের এক কণিকা একবার কানে গেলে 'দ্বন্দ্বধর্মা বিনষ্টাঃ'—লোকের ইহলোক এবং পরলোকের সুখস্বপ্ন এবং তাদের রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি-সমূহ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়; তখন সেই সমস্ত বিবেকী ব্যক্তিরা, বিয়োগ-দুঃখে কাতর আত্মীয় স্বজনদের তখনই পরিত্যাগ করেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে পাখির মতো জীবন ধারণ করেন।

কৃষ্ণের কথা আপাত সুখকর বটে, কিন্তু যে সেই কথা একবার শোনে তার মহা অনিষ্ট হয়। অনিষ্টটা কি? বলছেন—তার দ্বন্দ্বধর্ম নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ পতি যদি কৃষ্ণকথা শোনে তবে তার স্ত্রীর প্রতি আসক্তি কমে যায়; স্ত্রী শুনলে তার পতিপ্রেম শিথিল হয়। সন্তান যদি কৃষ্ণকথা শোনে তবে তার পিতামাতার প্রতি ভালবাসা কমে যায়; মা বাবা যদি কৃষ্ণকথা শোনে তবে সন্তানের প্রতি তাদের আর মমতা থাকে না। যারা তাঁর কথা শোনে, তারা নির্দয় হয়ে আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে পাখির মতো ভিক্ষায় জীবন যাপন করে অর্থাৎ তারা সন্ন্যাস অবলম্বন করে। পাখির মতো, পরমহংসের মতো, জীবন অতিবাহিত করেন; কৃষ্ণকথা শোনার ফল হলো এই যে, তারা আত্মীয়-স্বজনদের কাঁদায় এবং তারা নিজেরাও সুখ ভোগ করতে পারে না। কৃষ্ণের কথা শুনে যারা এইরকম দুঃখ ভোগ করছে, এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়—অনেক। শ্রীরাধা এইভাবে কৃষ্ণের ব্যাজস্তুতি করলেন—বাইরে নিন্দার মতো মনে হলেও ভেতরের অর্থ হলো কৃষ্ণের মহিমাকীর্তন।

ভাবোন্মাদিনী অবস্থায় শ্রীরাধা শুনছেন—ভ্রমর যেন বলছেন—কৃষ্ণ যখন এত দোষেই দোষী, তখন আপনি জেনে শুনে তাঁর সাথে প্রণয় করলেন কেন? এই কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাধা বলছেন ঃ

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্তা ॥ ১০-৪৭-১৯ ॥

হে উপমন্ত্রি, কৃষ্ণদূত ভ্রমর! অনভিজ্ঞা হরিণ-পত্নীরা যেমন ব্যাধের বাঁশী শুনে বিশ্বাস করে জালে আবদ্ধ হয়, সেইরকম আমরাও কৃষ্ণের কুটিল বচন শুনে, বিশ্বাস করে, তাঁর নখস্পর্শজনিত তীব্র কামপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছি। সুতরাং তুমি দুঃখপ্রদ কৃষ্ণকথা না বলে অন্য কথা বল।

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শ্রীরাধা বিলাপ করে কৃষ্ণের প্রতি নানা কটূক্তি করছেন, এমন সময় তিনি ভ্রমরটিকে আর দেখতে পেলেন না; তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ভাবলেন—হায়! হায়! আমার কঠোর তিরস্কারে ভ্রমর-

দূত মথুরায় ফিরে গেল ? কেন আমি অভিমান করে কৃষ্ণের সম্বন্ধে এত সব কঠোর কথা বললাম ? আমার তিরস্কারে যদি কৃষ্ণ দুঃখ পায়, তবে তো আমারই অপরাধ হবে। এই চিন্তায় শ্রীরাধা অত্যন্ত সন্তপ্ত হলেন এবং তাঁর প্রণয়কোপজনিত অভিমান একেবারে দূর হয়ে গেল। ঠিক এই সময় শ্রীরাধা আবার ভ্রমরটিকে দেখতে পেয়ে বললেন ঃ

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥ ১০-৪৭-২০ ॥

হে প্রিয়সখা ভ্রমর! প্রিয়তম কৃষ্ণই কি আবার তোমায় পাঠিয়েছেন ? যদি তাই হয়, তবে তুমি আমার মাননীয়; আমার কাছে তুমি বর প্রার্থনা কর। কৃষ্ণ যদি আমাদের নিয়ে যাবার জন্য তোমায় পাঠিয়ে থাকেন, তবে বলি— কৃষ্ণের নারীর সাহচর্য দুর্নিবার। তিনি মথুরায় অন্য নারীর সাথে রয়েছেন; তুমি কেমন করে আমাদের সেখানে কৃষ্ণের পাশে নিয়ে যাবে? হে সৌম্য মধুকর! লক্ষ্মীদেবী যে সর্বদাই তাঁর বক্ষঃস্থল অধিকার করে রয়েছেন।

শ্রীরাধা ভ্রমরকে আদর করে বলছেন—হে ভ্রমর! তুমি আমার প্রিয়তমের সখা; সুতরাং তুমি আমারও প্রিয়-সখা। তুমি যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমার তিরস্কার সহ্য করে আমার অপরাধ না নিয়ে আবার এসেছ, এতেই তোমার সদ্‌গুণের পরিচয় পাচ্ছি ; বুঝতে পারছি কৃষ্ণই পরম প্রেমে তোমাকে আবার আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তোমার এই সদাচরণের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না; তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।

তুমি যদি আমাদের মথুরায় নিয়ে যেতে চাও, তাহলে স্বভাবতই মনে একটু ইতস্তত ভাব আসবে। সেখানে গিয়ে যখন দেখব যে, কৃষ্ণ মথুরা-বাসিনীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন, তখন তাদের যেমন দুঃখ হবে, আমাদেরও তেমনি দুঃখ হবে। নিজের কান্তকে সপত্নী পরিবৃত দেখলে কে সুখী হতে পারে, বল! ভ্রমর তুমি বলছ বটে কৃষ্ণ কোন মথুরা-রমণীতে আসক্ত নন; যদি তাও হয়, তবুও লক্ষ্মীদেবী যে তাঁর সারাটা বুক জুড়ে, স্বর্ণরেখা রূপে রয়েছেন। ব্রজে কিন্তু এমনটি হতে পারে নি; সেখানে আমরাই

ছিলাম সর্বেসর্বা; লক্ষ্মীদেবীও সেখানে সঙ্কুচিত হয়ে ক্ষীণ স্বর্ণরেখারূপে তাঁর বুকের এক পাশে থাকতেন। তাই বলছি—আমাদের মথুরায় নিয়ে গেলে কৃষ্ণ সুখী হবেন না, মথুরাবাসিনীরা দুঃখিত হবেন আর আমাদের কষ্ট আরও বাড়বে। সুতরাং হে ভ্রমর! তুমি বরং তোমার প্রভু কৃষ্ণকেই এখানে নিয়ে এস।

অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগৃহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ১০-৪৭-২১ ॥

হে শোভন-দর্শন মধুকর! প্রিয়তম কৃষ্ণ এখন কি মথুরাতেই আছেন? তিনি কি তাঁর পিতামাতা, গৃহ এবং অপর গোপদের কথা স্মরণ করেন? কখনও কি তিনি তাঁর কিঙ্করী, আমাদের কথাও বলেন? হায়! তিনি কবে আবার তাঁর অগুরুগন্ধযুক্ত শ্রীহস্ত আমাদের মাথায় রাখবেন?

শ্রীরাধার বাম্যভাব দূর হয়েছে; তিনি এবার কৃষ্ণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন—কৃষ্ণ এখন মথুরায় ভাল আছেন তো? তিনি কি তাঁর পিতামাতা নন্দ-যশোদার কথা স্মরণ করেন? নন্দ-যশোদা তাঁদের বুক-ভরা স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাঁকে মানুষ করেছেন; আজ কৃষ্ণ-বিহনে তাঁদের কি অবস্থা! কৃষ্ণ-সখারা, যাদের সাথে তিনি কত মনোমুগ্ধকর গোষ্ঠলীলা করেছেন, যারা তাঁর অদর্শনে তাঁরই ভাবে সর্বদা তন্ময় হয়ে আছে, সেই সখাদের কথা কি তাঁর মনে হয়? হে কৃষ্ণদূত! তুমি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং আমাদেরও প্রিয়; তাই আমাদের প্রাণের একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—কৃষ্ণের পছন্দমত কোন কাজ যদি মথুরার কোন রমণী ঠিকমত করতে না পারে, তখন কি তিনি আমাদের কথা স্মরণ করে একবারও বলেন—আমার ব্রজের সখীরা এই কাজ কত সুন্দরভাবে করত! কখনও কি তাঁর মনে পড়ে না আমাদের প্রাণমন ঢালা সেবার কথা? কখনও কি কোন দাসীকে ডাকতে গিয়ে ভুল করে আমাদের নাম উচ্চারণ করেন না? হায়! কবে আবার তাঁকে দেখতে পাব? কবে তিনি আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আমাদের দুঃখ দূর করবেন?

শ্রীরাধার প্রলাপোক্তি, যাকে ভ্রমরগীতা বলে, তা এখানেই শেষ হলো। এতক্ষণ পর্যন্ত উদ্ধব নির্বাক বিস্ময়ে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অভিমানে প্রলাপ বলা এবং নিদারুণ বিচ্ছেদ-দুঃখের অবস্থা শুনছিলেন এবং দেখছিলেন। প্রেমে আত্মহারা হয়ে এমন যে অবস্থা কারুর হতে পারে, তা উদ্ধব স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি; গোপীদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে উদ্ধবের মনে হলো যে, এঁদের চরণধূলিরও যোগ্য তিনি নন; কৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির গরিমা দূর হলো। উদ্ধব ভাবলেন ব্রজে এসে এঁদের দেখে তার জীবন ধন্য হলো। তিনি মনে মনে গোপীদের প্রণাম করলেন।

কেউ কেউ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁর প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি, চিত্রজল্প আস্বাদন করবার জন্য ভ্রমর হয়ে এসেছিলেন। (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—সারার্থদর্শিনী)

অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।
সান্ত্বয়ন্ প্রিয়সন্দেশৈর্গোপীরিদমভাষত ॥ ১০-৪৭-২২ ॥

শুকদেব বললেন—উদ্ধব তখন গোপীপ্রেমের মহিমা স্বচক্ষে দর্শন করে কৃষ্ণ-দর্শন লালসাযুক্তা গোপীদের সান্ত্বনা দেবার জন্য পরমপ্রিয় কৃষ্ণের বার্তা নিবেদন করবার আগে বললেন ঃ

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ ॥ ১০-৪৭-২৩ ॥

উদ্ধব গোপীদের বললেন—আহা! আপনাদের মন ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীকৃষ্ণে এমনভাবে সমর্পিত হয়েছে, আশ্চর্য! আপনারাই কৃতকৃত্য হয়েছেন; আপনারা সকলের পূজ্য; জগতে আপনাদের তুলনা নেই। আপনারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধাভক্তি যা মুনিদেরও দুর্লভ, সেই উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করেছেন এবং জগতে তা প্রচার করছেন। বহু সৌভাগ্যের ফলেই আপনারা পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, গৃহ পরিত্যাগ করে পরমপুরুষ কৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করেছেন; ত্রিজগতে এমনটি কেউ কোথাও দেখেনি। আপনাদের এই কৃষ্ণ-বিরহ, এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা, মনে হয় আমাকে অনুগ্রহ করবার জন্যই হয়েছে ; কারণ কৃষ্ণ-প্রেয়সী আপনাদের এই তুলনারহিত প্রেমভাব দর্শন করে আজ আমি ধন্য হয়েছি। আপনারা মহাভাবের মূর্ত বিগ্রহ; সুতরাং আপনারা কৃষ্ণময়ী, সর্বদাই কৃষ্ণের সাথে যুক্ত।

উদ্ধব যখন এইসব কথা বলছিলেন তখন গোপীদের মুখ দেখে তিনি বুঝলেন, তার কথা শুনে গোপীরা সুখী হতে পারছেন না; তাঁরা যেন বলছেন—আপনি কেমন লোক? আমরা কৃষ্ণবিরহে মরছি, আর আপনি আমাদের এই কৃষ্ণবিরহের মরণাধিক যন্ত্রণার প্রশংসা করছেন?

তাই উদ্ধব এবার গোপীদের বললেন—আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের যে বার্তা আমি এনেছি, আপনাদের সুখের জন্য সেই বার্তা আমি হুবহু তাঁরই ভাষায় বলছি—আপনারা শ্রবণ করুন।

উদ্ধব জানেন যে, কৃষ্ণমুখ নিঃসৃত যে বার্তা তিনি এনেছেন, তার বহু অর্থ হতে পারে। উদ্ধব নিজে জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত; সুতরাং গোপীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বার্তার অর্থ তিনি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই বুঝেছেন। কিন্তু গোপীরা তো জ্ঞানের ধারও ধারেন না; সুতরাং মহাভাবময়ী গোপীরা কৃষ্ণ-সন্দেশের অর্থ গূঢ় রহস্যময় বলেই গ্রহণ করেছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ, যিনি জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্মের মূর্ত বিগ্রহ, তিনি নিজে সামগ্রিকভাবেই ঐ বার্তার অর্থ করেছেন বলে মনে হয়।

ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী
তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ ॥ ১০-৪৭-২৯ ॥

গোপীদের জন্য আনীত কৃষ্ণের বার্তা উদ্ধব এখন কৃষ্ণের ভাষায় হুবহু গোপীদের বলছেন—হে গোপীগণ! আমিই সকলের মূল উপাদান কারণ এবং সকলের অন্তর্যামী; সুতরাং আমার সাথে তোমাদের কখনও সর্বাত্মক বিচ্ছেদ নেই। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চভূত যেমন সর্ব বস্তুতে অনুস্যূত থাকে, সেইরকম আমিও পরম-কারণরূপে মন, প্রাণ, ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহের আশ্রয়রূপে অনুস্যূত রয়েছি। আমি সকলেরই উপাদান কারণ এবং অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যে বর্তমান; সুতরাং তোমাদের উপাদান কারণও আমি এবং তোমাদের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে আমিই অবস্থান করছি; অতএব তোমাদের সাথে আমার বিচ্ছেদ কোথায়? এই তত্ত্বের বিষয় চিন্তা করলে তোমরা জানতে পারবে যে, তোমাদের সাথে আমার সর্বাত্মক বিচ্ছেদ নেই এবং হতেও পারে না। তোমাদের যে এই বিরহ-কষ্ট, এটা অজ্ঞান থেকে

হচ্ছে; সুতরাং অজ্ঞান দূর হলেই তোমাদের এই কষ্টও দূর হবে। তত্ত্বজ্ঞানীদের ভগবৎ-বিরহ থাকে না। উদ্ধব নিজে এই অর্থই বুঝেছেন।

গোপীরা এই শ্লোকের অর্থ অন্যরকম বুঝেছেন—তোমাদের সাথে আমার সর্বাত্মক বিয়োগ নেই; এর অর্থ গোপীরা বুঝলেন—কৃষ্ণের সাথে তাদের বিয়োগ নেই বটে, কিন্তু প্রকট লীলায় আংশিক মাত্র বিয়োগ আছে। কৃষ্ণ বলছেন, আমার মন, প্রাণ সবই তোমাদের মধ্যে রয়েছে; কেবলমাত্র আমার দেহটাই মথুরায় আছে। আবার তোমাদের মন, প্রাণ আমাতেই নিত্যযুক্ত; কেবল তোমাদের দেহ-ই ব্রজে রয়েছে। তোমরা সর্বদা আমার ধ্যানে—আমার চিন্তায় তন্ময় হয়ে আছ। তোমরা যখন অন্তর্মনা হয়ে থাক, তখন অন্তরেই আমাকে দর্শন করে পরম আনন্দ লাভ কর। কিন্তু মন যখন বহির্মুখী হয়, তখন আমাকে কাছে না পেয়ে তোমরা অত্যন্ত কষ্ট অনুভব কর; কিন্তু জানবে বিরহেই মিলনানন্দের পুষ্টি হয়।

এই শ্লোকের বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব এই যে, গোপীরা হচ্ছেন তাঁর হ্লাদিনী শক্তি; শক্তি এবং শক্তিমান যেমন অভেদ, সেইরকম গোপীরা এবং শ্রীকৃষ্ণ অভেদ। নিত্য গোলোকে অপ্রকট লীলায় ভগবান সর্বদাই তাঁর শক্তিরূপিণী গোপীদের সাথে বিহার করেন; সুতরাং সেখানে বিচ্ছেদ নেই; কিন্তু প্রকট লীলায়—অবতার লীলায় বিচ্ছেদ রয়েছে বটে কিন্তু ঐ বিচ্ছেদ কেবল রসাস্বাদন এবং জগতের লোকের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্য।

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥ ১০-৪৭-৩০ ॥

কৃষ্ণ বলছেন—আমিই সকলের অধিষ্ঠান; আমি নিজের মধ্যেই নিজের মায়া-শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করে তা পালন করি এবং অন্তকালে নিজেই বিনাশ করি; আমিই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ; অর্থাৎ আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নেই; সুতরাং আমা থেকে কারও বিচ্ছেদ হতেই পারে না।

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥ ১০-৪৭-৩৪ ॥

তোমাদের পরম প্রিয়, আমি যে তোমাদের থেকে দূরে রয়েছি, তার কারণ হলো এই যে, দূরে থাকার জন্য তোমরা নিরন্তর আমার ধ্যান করে নিজেদের মনের মধ্যেই আমার সান্নিধ্য অনুভব করবে। একটি উপমা দিয়েছেন; প্রিয়তম দূরদেশে থাকলে প্রিয়ার মন যেমন প্রিয়তমের প্রতি আবিষ্ট থাকে, প্রিয়তম কাছে থাকলে মন তার প্রতি সেইরকম আবিষ্ট থাকে না। সেইরকম তোমাদের মনকে আমার ধ্যানে আরও গভীরে নিয়ে যাবার জন্যই আমি দেহের দিক থেকে দূরে রয়েছি।

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ ১০-৪৭-৩৬ ॥

তোমাদের মনের সংকল্প-বিকল্পাত্মক যে সমস্ত বৃত্তি রয়েছে, সেইসব দূর হলে, তোমাদের ঐ বৃত্তিশূন্য মন আমাতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করে সর্বদা আমার ধ্যান করতে করতে আমাকেই লাভ করবে।

সাধক জীবনের চরম কথা বলে দিলেন। কৃষ্ণ গোপীদের বলছেন—তোমরা সদা সর্বদা আমাকে কাছে পেতে চাও; কিন্তু কাছে পেতে হলে আমাকে পাবার আগ্রহ তোমাদের আরও বাড়াতে হবে। তার উপায় হচ্ছে মন থেকে সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা দূর করে মনকে স্থির করে একমাত্র আমাতেই নিবিষ্ট করতে হবে এবং আমার ধ্যানে একেবারে তন্ময় হতে হবে—তখন খুব শিগ্‌গিরই আমাকে লাভ করবে। এখানে যোগের প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলা হলো। কৃষ্ণ বলছেন—তোমাদের ধ্যানের সুবিধার জন্যই তোমাদের মন যাতে আমার প্রতি আরও বেশি আবিষ্ট হয়, তারই জন্য আমি দূরে রয়েছি। আসল কথা হলো ভগবানে তন্ময়তা; এই তন্ময়তা গভীর হলেই তাঁকে লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ একটি উপমা দিচ্ছেন :

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্‌বীর্যচিন্তয়া ॥ ১০-৪৭-৩৭ ॥

হে কল্যাণীগণ! তোমরা ভেবে দেখ, আমি এই বৃন্দাবনে রাত্রিকালে রাসক্রীড়া আরম্ভ করলে, যেসব গোপী, পতি এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতিবন্ধে রাসে যোগ দিতে পারে নি, তারা নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ থেকেই আমার গুণাবলী তীব্রভাবে চিন্তা করে, এই গুণময় দেহ পরিত্যাগান্তে আমাকেই

লাভ করেছিল। তোমাদের কিন্তু গুণময় দেহ, এই শরীর ত্যাগ করতে হবে না; এমনিতেই তোমরা আমাকে লাভ করবে।

কৃষ্ণ উদ্ধব মারফত গোপীদের জন্য যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তার আসল কথাই হলো—তোমাদের সাথে আমার বিচ্ছেদ নেই। আমিই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ; আমি ছাড়া জগতে অন্য কোন কিছুই নেই। সবই আমাতে বিধৃত। সুতরাং তোমরাও সর্বদাই আমাতে অবস্থিত। তাছাড়া তোমরা হচ্ছ আমার হ্লাদিনী শক্তি; শক্তি এবং শক্তিমান কি কখনও আলাদা থাকতে পারে? অতএব আমার সাথে তোমাদের বিচ্ছেদ নেই। সর্বোপরি নিত্য, অপ্রকট লীলায় তোমরা নিত্যই আমার সঙ্গে থাক; সেখানে কোন বিচ্ছেদ নেই। কেবলমাত্র প্রকট লীলায় লোকশিক্ষার জন্য এবং তোমাদের মিলনানন্দকে গাঢ় করবার জন্য সামান্য একটু বিচ্ছেদ আছে বটে; কিন্তু সেই বিচ্ছেদও থাকে না, যখন তোমরা অন্তর্মনা হয়ে আমার চিন্তায় তন্ময় থাক। তোমরা যখন বাহ্যদশায় থাক, তখনই যা বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদটুকুও যদি তোমরা না চাও, তবে সদাসর্বদা আমারই চিন্তায় একেবারে ডুবে থাক। তখন 'যত্র যত্র দৃষ্টি পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে'—যেদিকে তাকাবে, সেই দিকেই আমাকে দেখতে পাবে। জগৎ তখন তোমাদের কাছে কৃষ্ণময় হয়ে যাবে; এমন কি তোমরা তখন নিজেদেরও কৃষ্ণ বলে মনে করবে।

গোপীদের কাছে এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কি হতে পারে? তাই তখন গোপীদের কৃষ্ণবিরহ জনিত সকল সন্তাপ দূর হলো। কৃষ্ণবার্তা এখানেই শেষ হলো।

এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ।
তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীঃ ॥ ১০-৪৭-৩৮ ॥

শুকদেব বললেন—গোপীরা প্রিয়তম কৃষ্ণের আদেশ শ্রবণ করে এবং কৃষ্ণের প্রেরিত বার্তার জন্য কৃষ্ণের পূর্ব কথা সব মনে পড়াতে, তাঁরা আনন্দিত হয়ে উদ্ধবকে বললেন—বহু ভাগ্যের ফলে যদুগণের শত্রু কংস অনুচরদের সাথে নিহত হয়েছে; বহু সৌভাগ্যের ফলেই যদুবংশীয়দের মনোরথ পূর্ণ হয়েছে, তারা কৃষ্ণের সাথেই রয়েছে—কি আনন্দ!

গোপীরা বলছেন—কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে আমাদের নিজেদের সুখ হলো কিনা

সেটা বড় কথা নয়; কৃষ্ণসুখই আমাদের কাম্য। আমরা এইটি জেনেই সুখী হয়েছি যে, তিনি এখন সুখে আছেন।

একজন গোপী বললেন—হে উদ্ধব! কৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন তখন তিনি আমাদের সাথে যে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন, এখন কি তিনি মথুরা-বাসিনীদের সাথেও সেইরকম প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন?

আর একজন গোপী বললেন—উদ্ধব! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। কৃষ্ণ তো আমাদের ত্যাগ করেই গেছেন; সেইজন্য এতদিন পরেও তাঁর একবার ব্রজে আসবার সময় হলো না; তা না-ই হোক; তিনি কি আমাদের স্মৃতিটুকুও তাঁর মন থেকে মুছে ফেলেছেন? তিনি কি ভুলেও কখনও আমাদের নাম উচ্চারণ করেন?

অপর একজন গোপী বললেন ঃ

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্বৃন্দাবনে কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্ক-রম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণ-নূপুর-রাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িত-মনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ॥ ১০-৪৭-৪৩ ॥

হে সৌম্যদর্শন উদ্ধব! কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন যেসব রাত্রি কুমুদ এবং কুন্দ ফুলে সুশোভিত হয়ে চন্দ্রের কিরণে পরম রমণীয় আকার ধারণ করত, তখন বৃন্দাবনে আমরা তাঁর মনোমুগ্ধকর কথা কীর্তন করতাম এবং তিনি নিজে, প্রিয়তমা আমাদের সাথে চরণের নূপুর-ধ্বনিতে মুখরিত রাসমণ্ডলে বিহার করতেন; সেইসব মনোহর রাত্রির কথা, সেই অতুলনীয় স্বর্গীয় আনন্দের কথা কি আমাদের রাসবিহারীর মনে একবারও উদয় হয় না?

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন গ্রীষ্মে ম্রিয়মান বনকে মেঘবারির দ্বারা সঞ্জীবিত করেন, সেইরকম কৃষ্ণ নিজে যে বিরহাগ্নি সৃষ্টি করে আমাদের সন্তপ্ত করছেন, তার থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর করস্পর্শের দরকার; তার জন্যও কি তিনি ব্রজে আসবেন না?

অপর একজন গোপী বললেন—হে সখীরা! তোমরা আসল কথা জান না। মহাত্মা কৃষ্ণ পূর্ণকাম, স্বয়ং পূর্ণস্বরূপ এবং তিনি লক্ষ্মীপতি। সুতরাং বনবাসিনী আমাদের দ্বারা অথবা অন্য রমণীদের দ্বারা তাঁর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?

এইসব কৃষ্ণকথা বলতে বলতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে গোপীদের মধ্যে একটু দৈন্যভাবের উদয় হলো। তাঁরা ভাবলেন—উদ্ধব হচ্ছে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা; সুতরাং উদ্ধবের কথা কৃষ্ণ নিশ্চয়ই শুনবেন; তাই উদ্ধবকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করে বললেন—হে প্রভু উদ্ধব! আপনি বহুবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে আমাদের বলেছেন, যাতে কৃষ্ণের মহিমা এবং তত্ত্বজ্ঞানে আমাদের বিরহশোক দূর হয়; কিন্তু কৃষ্ণকে যে আমরা কিছুতেই ঈশ্বর বলে ভাবতে পারি না; সে যে আমাদের নন্দনন্দন, ব্রজনাথ, গোপীনাথ। এ ছাড়া আর কোন ভাবেই আমরা তাঁকে ভাবতে পারি না; জোর করে যে তাঁর বিষয়ে অন্য চিন্তা করব, তারও উপায় নেই।

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো ॥ ১০-৪৭-৪৯ ॥

হে প্রভু উদ্ধব! কৃষ্ণ বলরামের সাথে ব্রজের এইসব নদী, পর্বত এবং বনদেশে বংশীধ্বনি করতে করতে বিহার করতেন। বৃন্দাবনের প্রত্যেকটি স্থান আমাদের প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; তাঁকে কি ভোলা যায়? কৃষ্ণের মনোহর গতি, উদার হাস্য, সুমধুর কথা আমাদের চিত্তকে হরণ করেছে ; সুতরাং 'কথং তদ্ বিস্মরাম' বল তো হে উদ্ধব!—কেমন করে আমরা তাঁকে ভুলতে পারি?

এইসব কথা বলতে বলতে গোপীরা কৃষ্ণ-বিরহে আত্মহারা হয়ে, উদ্ধবের সামনেই মথুরার দিকে মুখ করে দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলে প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে সম্বোধন করে অতি করুণভাবে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন—

হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ ॥ ১০-৪৭-৫২ ॥

হে নাথ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! হে আর্তিহারী! হে গোবিন্দ! গোকুল আজ তোমা বিহনে বিষাদ-সিন্ধুর অতলে ডুবে যাচ্ছে; তুমি এসে উদ্ধার কর।

উদ্ধব অবাক হয়ে গোপীদের এই মর্মভেদী আর্তনাদ, কৃষ্ণের জন্য অজস্র ধারায় অশ্রুপাত দেখতে লাগলেন; শোক যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে গোপীদের ঘিরে ধরেছে। বিরহ-শোকের যে এমন একটা অবস্থা হতে পারে, তা উদ্ধব কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের অজান্তেই চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। এই দাবাগ্নিসদৃশ বিরহাগ্নিকে কিভাবে শান্ত করবেন ভেবে উদ্ধব দিশেহারা হয়ে পড়লেন। মনে হলো তার কৃষ্ণসন্দেশের কথা; ভাবলেন এই কৃষ্ণবার্তারূপ অমৃতবারি সিঞ্চনেই হয়ত এই বিরহানল নিভতে পারে। তাই তিনি বার বার উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণসন্দেশ আবৃত্তি করতে লাগলেন—'ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ'—আমার সাথে তোমাদের বিচ্ছেদ নেই।

ধীরে ধীরে গোপীদের বিরহাগ্নির উপশম হলো।

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ।
উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্ ॥ ১০-৪৭-৫৩ ॥

শুকদেব বললেন—কৃষ্ণের বার্তা বার বার শোনবার পর গোপীরা অন্তরে অন্তরে বুঝতে পারলেন যে, নিত্যলীলায় তাঁরা কৃষ্ণের সাথে সদাই যুক্ত থাকেন; কেবলমাত্র প্রকট লীলাতেই এই বিরহ এবং এই বিরহও গভীর কৃষ্ণচিন্তার দ্বারা দূর হতে পারে। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার পর গোপীদের সমস্ত বিরহ-বেদনা দূর হলো; প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁরা তখন উদ্ধবকে কৃষ্ণের মতোই সমাদর করলেন।

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ।
কৃষ্ণলীলাকথা গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্ ॥ ১০-৪৭-৫৪ ॥

উদ্ধব গোপীদের কৃষ্ণ-বিরহ জনিত দুঃখ দূর করে কয়েক মাস গোকুলে বাস করেন এবং কৃষ্ণের লীলা-কীর্তন করে ব্রজবাসীদের আনন্দ দান করলেন। উদ্ধব যতদিন ব্রজে ছিলেন ততদিন তিনি কৃষ্ণকথা এবং কৃষ্ণগানে ব্রজবাসীদের এমনই তন্ময় করে রাখতেন যে, উদ্ধবের ব্রজবাস তাদের কাছে ক্ষণিকের মতো অতি অল্প সময়ের মতো মনে হয়েছিল।

সরিদ্-বন-গিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্ ॥ ১০-৪৭-৫৬ ॥

কৃষ্ণভক্ত উদ্ধব ব্রজধামের নদী, বন, পর্বত, গুহা এবং ফুলে ভরা বৃক্ষ সকল দর্শন করে প্রত্যেক জায়গায় কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করে ব্রজবাসীদের কৃষ্ণকথা মনে করিয়ে দিয়ে, নিজেও আনন্দ অনুভব করতেন।

ব্রজধামে উদ্ধবের কাজ হৃদয়ঙ্গম করে ভাগবতকার উদ্ধবকে 'হরিদাস' পদবীতে ভূষিত করেছেন; অতি দুর্লভ এই পদবী ভাগবতে সম্ভবত আর একটি মাত্র জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। 'হরিদাসবর্যো'—(১০-২১-১৮) গোবর্ধন পর্বতকে সেখানে হরির সেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যারা 'হরিদাস' তাদের প্রধান কাজই হলো অপরের মনকে ভগবৎভাবে উদ্বুদ্ধ করা; তারা ভগবৎ-বিষয়ে প্রশ্নাদি করে হরি-কীর্তন করে ভক্তদের আনন্দ দান করে থাকেন। উদ্ধব এখন ব্রজে এই কাজই করছেন; তিনি কৃষ্ণের প্রিয়জনদের কৃষ্ণকথা মনে করিয়ে দিয়ে, কৃষ্ণগান শুনিয়ে তাদের আনন্দ দিচ্ছেন। উদ্ধবের 'হরিদাস' নাম সার্থক হলো।

কয়েক মাস ব্রজে বাস করে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের গভীর অনুরাগ, ভালবাসা, যা আর কোথাও দেখা যায় না, তাই দেখে উদ্ধব চমৎকৃত হয়েছেন। কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে গোপীদের বিহ্বলতা, কৃষ্ণে আবেশ, দিব্যোন্মাদের অবস্থা যা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না, উদ্ধব এইসব প্রত্যক্ষ করে নিজেকে মহাভাগ্যবান বলে মনে করলেন।

সচ্চিদানন্দ ভগবানে গোপীরা তাঁদের হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ, প্রেম অর্পণ করেছেন; এ-রকম দৃষ্টান্ত আর একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। উদ্ধব তাই বুঝেছেন যে, দেহধারী জীবের মধ্যে গোপীরাই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তিনি গোপীদের প্রণাম করতে ইচ্ছা করলেন; কিন্তু গোপীরা তো কৃষ্ণসখা উদ্ধবের প্রণাম নেবেন না; তাই উদ্ধব অকুণ্ঠচিত্তে গোপীদের স্তুতি করে তাঁদের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ ১০-৪৭-৫৮ ॥

উদ্ধব বলছেন—দেহধারী জীবের মধ্যে গোপীদের দেহধারণই সার্থক হয়েছে; কারণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মস্বরূপ ভগবান গোবিন্দের প্রতি এঁরা 'রূঢ়ভাবাঃ' মহাভাব, পরম প্রেম প্রাপ্ত হয়েছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা, মুনি, ঋষিরা এবং আমাদের মতো ভক্তেরাও এই প্রেম লাভের জন্য লালায়িত। ভগবানে যার অনুরাগ হয়েছে, তার পক্ষে চতুর্মুখ ব্রহ্মা হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করাও তুচ্ছ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ভগবৎ-প্রেমই জগতে শ্রেষ্ঠ। গোপীরা এই ভগবৎ-প্রেম পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেছিলেন; সুতরাং তাঁরাই সকলের প্রণম্য।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদ্গাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্ ॥ ১০-৪৭-৬০ ॥

রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাহু দিয়ে গোপীদের গলা জড়িয়ে ধরায় গোপীদের মনোরথ পূর্ণ হয়েছিল। সেই ব্রজসুন্দরীদের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অনুগ্রহ করেছিলেন, সেইরকম অনুগ্রহ কৃষ্ণবক্ষস্থিতা লক্ষ্মীদেবী যিনি ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেমযুক্তা, তিনিও লাভ করেন নি; তাছাড়া পদ্মগন্ধ এবং কান্তিবিশিষ্টা স্বর্গের দেবীদের প্রতিও ভগবানের এইরকম অনুগ্রহ হয় নি; সুতরাং অন্যের আর কি কথা!

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, গোপীদের এই অধিরূঢ় মহাভাব, যা লক্ষ্মী অথবা স্বর্গের দেবীদেরও অপ্রাপ্য, সেই মহাপ্রেমের দ্বারা গোপীরা কৃষ্ণকে বশ করেছিলেন; সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর থেকেও গোপীদের মহিমা অধিক সূচিত হয়েছে।

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ১০-৪৭-৬১ ॥

আহা! বৃন্দাবনের এইসব গোপীরা দুরতিক্রমণীয় সংসারবন্ধনছিন্ন করে, আত্মীয়-স্বজন, পতি-পুত্রাদির সেবা প্রভৃতি আর্যপথ অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত পথ

পরিত্যাগ করে বেদ যাঁকে অন্বেষণ করে সেই মুক্তিদাতা মুকুন্দের ভজনা করেছিলেন। গোপীদের পদধূলি বৃন্দাবনের গুল্মলতারা লাভ করে কৃতার্থ হয়; তাই উদ্ধব ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন—পরজন্মে যেন আমি বৃন্দাবনের গুল্মলতা হয়েই জন্মগ্রহণ করি; তাহলে রাস্তার পাশে অবস্থিত সেই গুল্মলতায় গোপীদের চরণধূলি পড়বে—আমার জীবন সার্থক হবে।

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্নশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১০-৪৭-৬৩ ॥

যাঁদের কৃষ্ণবিষয়ক গানে ত্রিভুবন পবিত্র হয়েছে, আমি সেই নন্দব্রজের গোপীদের পদরেণু বার বার বন্দনা করি।

উদ্ধব ভাবছেন—কোথায় মহাভাবময়ী কৃষ্ণময়ী ব্রজদেবীরা, আর কোথায় ভক্তিহীন অতি নগণ্য আমি উদ্ধব। এঁরা এতই মহিমান্বিত যে, এঁদের চরণে প্রণত হবারও আমার যোগ্যতা নেই; সুতরাং এঁদের পদরজই আমি বার বার শিরে ধারণ করি।

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্ ॥ ১০-৪৭-৬৪ ॥

শুকদেব বললেন—যদুবংশীয় উদ্ধব গোপীদের এবং মা যশোদা ও নন্দবাবার অনুমতি নিয়ে অপর গোপদের যথাযথ সম্ভাষণ করে মথুরায় যাবার জন্য রথে আরোহণ করলেন।

তখন নন্দ প্রভৃতি গোপেরা নানা উপহার এনে মথুরায় কৃষ্ণ, বসুদেব প্রভৃতিকে দেবার জন্য উদ্ধবের হাতে দিয়ে অত্যন্ত অনুরাগের সঙ্গে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন—হে উদ্ধব! মথুরায় গিয়ে তোমাদের ভগবান কৃষ্ণকে বলো—তিনি ভগবানই হোন অথবা যা-ই হোন—আমাদের মনের বৃত্তিসকল যেন তাকেই আশ্রয় করে থাকে, আমাদের বাক্য যেন তারই লীলাকীর্তনে সদাই রত থাকে, আর আমাদের দেহ যেন তারই সেবায় সদা ব্যাপৃত থাকে।

কর্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ১০-৪৭-৬৭ ॥

কর্মবশে যেখানেই আমাদের জন্ম হোক না কেন, তোমাদের ভগবান কৃষ্ণ যেন আমাদের দিয়ে শুভকর্ম করায় এবং কৃষ্ণেই যেন আমাদের রতিমতি থাকে।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে। নন্দ এবং ব্রজবাসীদের যে এই প্রার্থনা— এটা তো দাস্যভাবের প্রার্থনা; কিন্তু ব্রজে তো দাস্য-ভক্ত কেউ ছিল না; সকলেই নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী সখ্য, বাৎসল্য অথবা মধুরভাবে সিদ্ধ; অতএব নন্দ এবং অপর ব্রজবাসীদের মুখে এই প্রার্থনা কেন? এর উত্তর হলো এই যে, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধক-সাধিকারা যখন কৃষ্ণ বিরহে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন, তখন অল্প সময়ের জন্য তাদের মনে একটা সঞ্চারী ভাব, দৈন্যভাবের উদয় হয়। তখন তাদের মনে হয় যে, আমরা কৃষ্ণসেবার উপযুক্ত নই; তাই সে আমাদের অবহেলা করছে, আমাদের প্রতি উদাসীন হয়েছে। তখন তাদের মনে হয়, পিতামাতার মতো আমরা কৃষ্ণের লালন-পালন করেছি বটে কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি আমাদের কিছুমাত্র স্নেহ-ভালবাসা নেই। ছিল বটে পুত্রস্নেহ রাজা দশরথের; তাই রামচন্দ্র বনে গেছেন শুনেই তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ মথুরায় যাবার পরেও তো আমাদের জীবনান্ত হয় নি। তাই মনে হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের স্নেহ-ভালবাসার নামগন্ধও নেই ; সেইজন্যই কৃষ্ণ আমাদের ছেড়ে মথুরায় বসুদেব-দেবকীর কাছে গেছে; সুতরাং আমাদের মতো হতভাগ্য জগতে কেউ নেই। এ জীবনে তো আমাদের কৃষ্ণপ্রীতি হলো না; তাই প্রার্থনা করি, পর জীবনে যেন কৃষ্ণের প্রতি আমাদের রতিমতি হয়।

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ১০-৪৭-৬৮ ॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দাদি গোপগণ কর্তৃক এই ভাবে কৃষ্ণভক্তি প্রদর্শনের দ্বারা সম্মানিত হয়ে উদ্ধব আবার কৃষ্ণ-পালিত মথুরায় ফিরে এলেন।

উদ্ধব ব্রজবাসীদের বিশেষ করে গোপীদের সঙ্গ লাভ করে বৃন্দাবনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করে বৃন্দাবনের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন; এমন কি তিনি মহাতীর্থ বৃন্দাবনে গোপীদের চরণরেণুর স্পর্শের আশায় সেখানে

গুল্মলতা হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করতেও আগ্রহান্বিত; বৃন্দাবনের প্রতি উদ্ধবের এতই আকর্ষণ! তবুও তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যাচ্ছেন; কারণ শ্রীকৃষ্ণ এখন মথুরাতে রয়েছেন। সুতরাং কৃষ্ণের একান্ত সেবকরূপে উদ্ধবকে প্রভুর কাছেই থাকতে হবে। তাই উদ্ধব ব্রজ-ভাবিত মন নিয়ে কৃষ্ণ-পালিত মথুরায় যেতে যেতে ভাবছেন—কৃষ্ণ-পালিত মথুরার লোক সুখে থাকবে, আর কৃষ্ণ-ভক্ত ব্রজবাসীরা কেঁদে কেঁদে মরবে, এ আমি আর হতে দেব না। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ব্রজবাসীদের যে নিদারুণ কষ্ট তা তো স্বচক্ষেই দেখে গেলাম; এখন মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে বলব—আপনার পালিত মথুরাবাসীরা সুখে রয়েছে; তবে ব্রজবাসীদের প্রতি আপনি এত বিরূপ কেন? আপনার বিচ্ছেদে তাঁরা যে কি কষ্ট পাচ্ছেন তা মুখে বলা যায় না; আপনি ছাড়া তাঁদের এই মরণাধিক যন্ত্রণা দূর হবার নয়; সুতরাং একবার অন্তত ব্রজে গিয়ে তাঁদের এই প্রজ্বলিত বিরহাগ্নির উপশম করুন।

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্।
বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ ॥ ১০-৪৭-৬৯ ॥

মথুরায় ফিরে এসে উদ্ধব কৃষ্ণকে প্রণাম করে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের ঐকান্তিক ভাব-ভক্তির কথা নিবেদন করলেন এবং বসুদেব, বলরাম ও রাজা উগ্রসেনের জন্য আনীত উপহারসমূহ প্রদান করলেন।

৩১

জরাসন্ধ ও শিশুপাল বধ

কংসের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ রাজ্য পালনের সমস্ত সুব্যবস্থা করলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা, যারা কংসের অত্যাচারে মথুরা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করছিলেন তাদের সকলকে আবার মথুরায় এনে তাদের হৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন। এদিকে কংসের দুই পত্নী কংসের মৃত্যুতে কাতর হয়ে পিতা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে কৃষ্ণের সম্বন্ধে অনেক উলটো-পালটা বললেন। জরাসন্ধ তখন জামাতার মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত এবং ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবী যাদবশূন্য করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। জরাসন্ধ ২৩ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে যাদবদের রাজধানী মথুরা আক্রমণ করলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই পক্ষে মোট ১৮ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে কি বিরাট সৈন্য নিয়ে জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেছিলেন। এই বিশাল শত্রুসৈন্য দেখে কৃষ্ণ ভাবলেন, সাধুদের রক্ষা এবং ধরণীর ভারস্বরূপ দুরাত্মাদের বিনাশের জন্যই তাঁর অবতরণ। জরাসন্ধ নিজে পাপাত্মা এবং তার যারা সহচর তারাও পাপাত্মা। সুতরাং জরাসন্ধের এই বিরাট সৈন্যদলকে ধ্বংস করলে ধরণীর ভার কিছুটা লাঘব হবে। এই ভেবে কৃষ্ণ ও বলরাম অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে জরাসন্ধের সম্মুখীন হলেন। কৃষ্ণকে দেখে জরাসন্ধ বললেন ঃ

ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জয়া।
গুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্ ॥ ১০-৫০-১৭ ॥

হে পুরুষাধম কৃষ্ণ! তুই বালক মাত্র; তোর সাথে যুদ্ধ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। তুই মন্দমতি, লুকিয়ে থাকিস; তার ওপর তোর মাতুলকে তুই বধ করেছিস; সুতরাং তোর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না; আমার সামনে থেকে তুই দূর হ।

জরাসন্ধ কৃষ্ণকে গালি দিয়েছেন; কিন্তু টীকাকারেরা জরাসন্ধের কথার দ্বিতীয় অর্থ বের করে দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ণের সম্বন্ধে জরাসন্ধ যা যা বলেছেন, তা সবই সত্য। জরাসন্ধ কৃষ্ণকে 'পুরুষাধম' বলেছেন; 'পুরুষাধম' শব্দের

অর্থ হলো যার থেকে সকলেই অধম, যিনি কারও থেকেই নিকৃষ্ট নন, তিনিই পুরুষাধম অর্থাৎ পুরুষোত্তম। জরাসন্ধ কৃষ্ণকে বলেছেন—'বন্ধুহন্', মাতুল-হন্তা—যে বন্ধন করে সে বন্ধু। অবিদ্যা মানুষকে বন্ধন করে; সুতরাং অবিদ্যাকে যিনি বধ করেন, তিনিই 'বন্ধুহন্' অর্থাৎ অবিদ্যা-নিরসনকারী। জরাসন্ধ কৃষ্ণকে 'মন্দ' বলেছেন। এইটিকে 'অমন্দ'ও পাঠ করা যায়; তখন অর্থ হবে উত্তম। জরাসন্ধ আরও বললেন—তুই লুকিয়ে থাকিস। অন্য অর্থে তুমি অন্তর্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে গুপ্তভাবে রয়েছ। সুতরাং তোর সাথে যুদ্ধ করব না।

জরাসন্ধ তখন বলরামকে সম্বোধন করে বললেন—হে বলরাম! তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর; দেখো, ভয়ে পালিয়ে যেও না। আমার বাণে তোমার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হলে তুমি মৃত্যু বরণ করবে; অথবা তোমারই হাতে আমার মৃত্যু হবে। দুই দলে তখন ভীষণ যুদ্ধ হলো; কৃষ্ণ-বলরাম অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই জরাসন্ধের বিরাট সৈন্য-বাহিনী ধ্বংস করে ফেললেন। বলরাম যখন জরাসন্ধকে পরাজিত করে বাঁধতে যাচ্ছেন, তখন কৃষ্ণ বলরামকে বারণ করলেন; উদ্দেশ্য এই যে, জরাসন্ধ বেঁচে থাকলে পরাজয়ের অপমান দূর করার জন্য সে আবার সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করতে আসবে এবং তিনিও অনায়াসেই তাদের বধ করতে পারবেন। এইভাবে জরাসন্ধের দ্বারাই তাঁর ভূভার হরণের কাজ ত্বরান্বিত হবে।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জরাসন্ধ অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার সৈন্য সংগ্রহ করে মথুরা আক্রমণ করলেন। এইভাবে জরাসন্ধ ১৭ বার মথুরা আক্রমণ করেছেন এবং প্রতিবারই পরাজিত হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

১৮ বারের যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই কালযবন তিন কোটি সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করলেন। কালযবন নিজেকে অজেয় বলে মনে করতেন। নারদ মুনির কাছে কৃষ্ণ এবং যাদব সৈন্যের শক্তিমত্তার কথা শুনে কাল-যবন মথুরা আক্রমণ করেছিলেন। কালযবনের বিরাট যুদ্ধ-সজ্জা দেখে কৃষ্ণ ভাবলেন—আজ কালযবন মথুরা অবরোধ করেছে; জরাসন্ধও কয়েক দিনের মধ্যেই মথুরা আক্রমণ করতে পারে। তখন এই দুই প্রবল শত্রুর সাথে একই

সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। দাদা বলরাম এবং আমি যখন কালযবনের সাথে যুদ্ধ করতে যাব, তখন জরাসন্ধ অনায়াসে মথুরা-বাসীদের বধ করে রাজ্য ছারখার করে দেবে।

তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমম্।
তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে ॥ ১০-৫০-৪৮॥

সুতরাং মানুষের পক্ষে অতি দুর্গম এক দুর্গ তৈরি করে, আজই আত্মীয়-স্বজনদের সেখানে রেখে এসে কালযবনকে বধ করব।

এইভাবে চিন্তা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐশী শক্তির সাহায্যে সমুদ্রমধ্যে বিরাট দুর্গ নির্মাণ করে সেই দুর্গের মধ্যে অতি আশ্চর্য নগর তৈরি করলেন এবং অপরের অলক্ষিতে মথুরাবাসীদের সেই নব-নির্মিত নগরে রেখে এসে বলরামকে বললেন—আপনি এখানে থেকে অবশিষ্ট প্রজাদের রক্ষা করুন। আমি কালযবনকে বধ করার জন্য একাকী অস্ত্র শস্ত্র ছাড়াই নগর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে কালযবন দেখলেন যে, একজন অতি সুন্দর পুরুষ মথুরাপুরী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ভাগবতকার এখানে শ্রীকৃষ্ণের অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্।
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ১০-৫১-১ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥ ১০-৫১-২ ॥

সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ একাকী মথুরাপুরী থেকে বের হলেন। তিনি শ্যামবর্ণ; পীত কৌশেয় বসন পরিহিত; তাঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন এবং গলদেশে কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে। তাঁর চারটি বাহু স্থূল এবং দীর্ঘ; অরুণাভাযুক্ত তাঁর নয়নদ্বয় নব-প্রস্ফুটিত পদ্মের মতোই সুন্দর।

দূর থেকে এই অপরূপ রূপধারী পুরুষকে দেখে কালযবন ভাবলেন—দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের যে বর্ণনা করেছিলেন, তা থেকে মনে হচ্ছে ইনিই সেই

বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ। ইনি যখন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই একাকী যাচ্ছেন, তখন আমিও বিনা অস্ত্রেই একাকী এর সাথে যুদ্ধ করব। এইভাবে চিন্তা করে যিনি যোগীদেরও দুষ্প্রাপ্য, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধরার জন্য কালযবন তাঁর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলেন। প্রতি পদক্ষেপেই যেন কালযবনের কবলিত হলেন এইরকম অভিনয় করতে করতে কৃষ্ণ তাঁকে দূরবর্তী এক পর্বত গুহায় নিয়ে গেলেন। কালযবন পেছন থেকে কৃষ্ণকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন—তুমি যদুকুলে জন্মেছ; তোমার তো এভাবে পালানো উচিত নয়। কৃষ্ণ তাঁর কথায় কোন উত্তর না দিয়ে সেই পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন; কালযবনও তাঁর পেছনে পেছনে সেই গুহার মধ্যে ঢুকে দেখলেন যে, অন্ধকারে একজন সেখানে শুয়ে রয়েছে। কালযবন ভাবলেন যে, তাঁরই ভয়ে কৃষ্ণই ছদ্মবেশ ধারণ করে এখানে শুয়ে রয়েছে। সুতরাং কৃষ্ণ মনে করে কালযবন সেই শায়িত পুরুষকে পদাঘাত করলেন। সেই পদাঘাতে সুপ্ত পুরুষ জেগে উঠে কালযবনকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্ম হয়ে গেলেন।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বললেন যে, ঐ নিদ্রিত পুরুষের নাম মুচুকুন্দ; তিনি দেবতাদের হয়ে বহু বৎসর ধরে অসুরদের সাথে যুদ্ধ করে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন। দেবতারা খুশি হয়ে মুচুকুন্দকে বর দিতে চাইলে তিনি বললেন, আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, এখন আমি ঘুমাতে চাই। আমাকে এই বর দিন যদি কেউ আমার নিদ্রা ভঙ্গ করে, তবে তখনই সে ভস্মীভূত হবে। দেবতাদের বর লাভ করে মুচুকুন্দ নিশ্চিন্তে এই নির্জন গুহায় নিদ্রিত ছিলেন। কৃষ্ণ কৌশল করে কালযবনকে ঐ গুহার মধ্যে এনে, মুচুকুন্দকে দিয়ে কালযবনের মৃত্যু ঘটালেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন চতুর্হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে এবং বনমালায় শোভিত হয়ে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে মুচুকুন্দের সামনে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিতে সমস্ত গুহা উদ্ভাসিত হয়েছে দেখে, ভয়ে এবং বিস্ময়ে মুচুকুন্দ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহ্বরে।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরস্যুরুকণ্টকে ॥ ১০-৫১-২৭ ॥

আপনি কে? কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এই পর্বত গুহায়

উপস্থিত হয়ে আপনার সুকোমল চরণকমলের দ্বারা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আপনি কি তেজস্বিগণের তেজ? কিংবা অগ্নিদেবতা? অথবা আপনি কি চন্দ্র, সূর্য, মহেন্দ্র কিংবা অন্য কোন লোকপাল?

মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্ষভম্।
যদ্বাধসে গুহাধ্বান্তং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা ॥ ১০-৫১-২৯ ॥

প্রদীপের মতো আপনি নিজের প্রভায় এই গুহার অন্ধকার দূর করেছেন; সেইজন্য আমি মনে করি যে, দেবদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে আপনি পুরুষোত্তম বিষ্ণু। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার জন্ম, কর্ম ইত্যাদি শুনতে ইচ্ছা করি। কৃপা করে আপনি নিজের বিষয়ে আমায় সবিশেষ বলুন।

মুচুকুন্দের কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন—আমার অনন্ত জন্ম, অনন্ত কর্ম এবং অনন্ত নাম; কেউ সেই সব গণনা করতে সক্ষম নয়। আমার এই জন্মের কথাই তোমায় বলছি। পূর্বে ধর্মের রক্ষা এবং পৃথিবীর ভার-স্বরূপ অসুরদের বিনাশের জন্য ব্রহ্মা আমার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তার প্রার্থনা পূরণের জন্য আমি বসুদেবের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছি। সাধু-বিদ্বেষী কংস, প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরদের আমিই বিনাশ করেছি এবং তোমার অগ্নিদৃষ্টিকে অবলম্বন করে সম্প্রতি এই কালযবনকে বধ করেছি। পূর্বে তুমি আমার ভক্ত ছিলে এবং আমার দর্শনের জন্য প্রার্থনা করেছিলে; তোমাকে কৃপা করবার জন্যই এখন তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে মুচুকুন্দ তাঁকে স্বয়ং ভগবান বলে বুঝতে পেরে প্রণাম করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন ঃ

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥
১০-৫১-৪৫॥

মুচুকুন্দ বললেন—হে ঈশ! হে পরমেশ্বর! স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেই আপনার মায়ায় বিমোহিত; তাই তারা অনর্থের মূল যে সংসার, সেই সংসারের প্রতিই নিবদ্ধদৃষ্টি। 'দেহ গেহ' এবং 'আমি আমার' এই নিয়েই

তো সংসার। সুতরাং যারা সংসারে আবদ্ধ, অনর্থদর্শী তারা পরমার্থস্বরূপ আপনাকে জানতে না পেরে আপনার ভজনা করে না; তারা একে অপরের দ্বারা বঞ্চিত হয়েও সুখের আশায় দুঃখের উৎপত্তি-স্থান গৃহেতেই আসক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং আমি মনে করি যে, আপনার শ্রীচরণে ভক্তি লাভই পরম পুরুষার্থ; সংসারের ভোগ-সুখ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

লব্ধ্বা জনো দুর্লভমত্র মানুষং কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতির্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥
১০-৫১-৪৬॥

পশুজন্মেও ভোগ সুখ লাভ হয়; কিন্তু ভগবৎ-ভজন একমাত্র মনুষ্য জন্ম ছাড়া হয় না। হে অনঘ! জীবেরা বিনা যত্নেই এই দুর্লভ অবিকলাঙ্গ সুস্থ দেহ লাভ করেও অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হয়ে আপনার পাদপদ্মের ভজনা করে না; ফলে পশুরা যেমন তৃণের লোভে কূপে পতিত হয়, সেইরকম বিষয় ভোগে লুব্ধ লোকেরা গৃহরূপ অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়, কিন্তু আপনাকে লাভ করতে পারে না। দুর্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করেও যারা ভগবৎ-ভজন করে না, তারা আত্মঘাতী।

মুচুকুন্দ আরও বললেন—শুধু অপরেই যে অনাত্ম বস্তুতে আসক্ত হয়ে, আত্মস্বরূপ আপনাকে প্রীতি করে না তা নয়; এই আমার অবস্থাই দেখুন না; আমি রাজা ছিলাম; রাজ-ঐশ্বর্যে মত্ত হয়ে অনিত্য দেহকে আত্মা বলে মনে করে স্ত্রী পুত্র রাজ্য প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে এতকাল নিষ্ফলে জীবন কাটিয়েছি; কখনও আপনার পাদপদ্মের ভজনা করি নি।

পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন্ মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ।
স এব কালেন দুরত্যয়েন তে কলেবরো বিট্‌কৃমিভস্ম-সংজ্ঞিতঃ॥
১০-৫১-৫০॥

যে দেহ সুবর্ণময় রথে অথবা হস্তিপৃষ্ঠে আসীন হয়ে নরপতি নামে অভিহিত হয়, সেই দেহই দূরতিক্রমণীয় কালের প্রভাবে শৃগাল কুকুরের দ্বারা ভক্ষিত হলে 'বিষ্ঠা', ভক্ষিত না হলে 'কৃমি' এবং দগ্ধ হলে 'ভস্ম' নামে অভিহিত হয়; অর্থাৎ দেহের পরিণতি হচ্ছে বিষ্ঠা, কৃমি অথবা ভস্ম। যে

দেহের পরিণতি এতই শোচনীয়, সেই দেহে আসক্ত হয়ে আমি আপনার ভজনা করি নি—কি দুর্দৈব!

কিন্তু এই অনাত্ম 'দেহ গেহে'র প্রতি আসক্তি দূর হওয়াও তো একরকম অসম্ভব বলেই মনে হয়; আর আসক্তি দূর না হলে হে পরমেশ্বর! আপনাকে ভজনা করার মতিও হয় না। ঐশ্বর্য এবং সম্মানের উচ্চতম শিখরে উঠেও মানুষ আপনার ভজনা করে না; তারা জাগতিক ভোগ সুখেই জীবন অতিবাহিত করে এবং যথাসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংসারের প্রতি আসক্তি দূর না হলে আপনাতে প্রীতি, চিরশান্তি লাভ হয় না। কিন্তু আসক্তি কেমন করে দূর হবে?

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥
১০-৫১-৫৩॥

হে অচ্যুত! জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহে চলতে চলতে জীব যখন সাধু-সঙ্গ লাভ করে, তখনই তার আপনার প্রতি ভক্তির স্ফুরণ হয় এবং তার সংসার-নিবৃত্তি হয়। প্রথমে সাধু-সঙ্গ, তার ফলে ভগবানে ভক্তিলাভ এবং ভক্তিলাভ হলেই সংসার-নিবৃত্তি হয়।

হে প্রভু! বিবেকী রাজারা কামনা ত্যাগ করার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। আমার কিন্তু আপনার কৃপায় রাজ্য-তৃষ্ণা এমনিতেই শিথিল হয়ে গেছে; এইটি আমার প্রতি আপনার অপার করুণা বলেই আমি মনে করি। আপনি আমাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন; কিন্তু জগতে এমন মূর্খ কে আছে, যে আপনার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেও আপনার কাছে ভোগ্য-বস্তু যা মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে, সেই ভোগ্য-বস্তু প্রার্থনা করবে!

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনা-
দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ১০-৫১-৫৫ ॥

হে প্রভু! বাসনা-রহিত সাধুদের একান্ত প্রার্থনীয় যে আপনার শ্রীচরণ-

সেবা, সেই চরণসেবা ছাড়া অন্য কোন বরই আমি চাই না। আপনি মুক্তিদাতা; সুতরাং আপনার আরাধনা করে কোন্ বিবেকী পুরুষ যাতে বন্ধন হয় এমন বর প্রার্থনা করবে? সুতরাং হে পরমেশ্বর! সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের অনুষঙ্গী—ধর্ম-সঞ্চয়, ঐশ্বর্য লাভ এবং শত্রু-মারণরূপ কাম্য বিষয়সমূহ ত্যাগ করে, আমি নিরঞ্জন, সর্বদোষশূন্য, ত্রিগুণাতীত, অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং জ্ঞানময় আপনার শরণাপন্ন হলাম। হে শরণদ! আশ্রয়দাতা! এই সংসারে আমি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপে সর্বদা কষ্ট পাচ্ছি; তাছাড়া আমার মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এইগুলির ভোগাকাঙ্ক্ষা এখনও দূর হয় নি। সুতরাং কেমন করে আমার শান্তি লাভ হবে? বহু ভাগ্যে কোন প্রকারে আপনার শোকশূন্য, অমৃততুল্য শ্রীপাদপদ্ম সমীপে উপনীত হয়েছি। সুতরাং হে পরমেশ্বর! আপনি আমায় রক্ষা করুন।

মুচুকুন্দের প্রার্থনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ

সার্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জিতা।
বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ ॥ ১০-৫১-৫৮ ॥

হে সার্বভৌম মহারাজ মুচুকুন্দ! তোমার বুদ্ধি নির্মল এবং স্থির হয়েছে; কারণ আমি তোমায় বর দেব বলে প্রলোভিত করলেও তোমার বুদ্ধি বিষয়-লালসায় চঞ্চল হলো না।

প্রশ্ন হতে পারে—ভগবান কি তবে ভক্তদের বিপদে ফেলবার জন্য—সংসারে বদ্ধ করার জন্যই বর দিতে চান? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মুচুকুন্দকে বলছেন—আমি জানি তুমি কোন ভোগ্য বস্তুই চাইবে না; তবুও যে আমি তোমায় বর দেব বলে প্রলোভিত করেছি, তার কারণ এই যে, আমি দেখাতে চাই যে আমার একান্ত ভক্তেরা কখনও বিষয়-বাসনায় লালায়িত হয় না। আমার ভক্তের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যই তোমায় প্রলোভিত করেছি।

হে মুচুকুন্দ! যারা আমার ভক্ত নয়, তারা যোগাভ্যাসের দ্বারা—প্রাণায়ামাদির দ্বারা মনকে নিরোধ করলেও মন থেকে তাদের বাসনার বীজ সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না। ফলে আবার কখনও তাদের মনে বাসনার উদয়

হতে পারে। তুমি আমার ভক্ত; আমাতে মন স্থির রেখে তুমি স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর; আমাতে তোমার নিশ্চলা ভক্তি হোক; পরজন্মে তুমি একান্তভাবে আমাকেই লাভ করবে।

এইভাবে কালযবনের মৃত্যু ঘটিয়ে এবং মুচুকুন্দকে কৃপা করে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় ফিরে এলেন। কালযবনের মৃত্যুতে যবন-সৈন্য বিশৃঙ্খল এবং ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ তাদের সহজেই নিঃশেষ করে ফেললেন এবং তাদের ধনরত্নাদি মথুরায় নিয়ে গেলেন।

ঠিক এই সময় মগধরাজ জরাসন্ধ আবার এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মথুরা আক্রমণ করলেন। কৃষ্ণ ভাবলেন যে, সব সময়েই যদি যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়, তবে দেশের উন্নতি এবং দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভবপর হবে না। তাই তিনি আগেই দ্বারকায় রাজ্য স্থানান্তরিত করেছিলেন। এখন তিনি বলরামকে সঙ্গে নিয়ে মথুরা ছেড়ে যেন জরাসন্ধের ভয়েই পালিয়ে যাচ্ছেন, এইরকম ভান করে পদব্রজেই ছুটে চললেন। কৃষ্ণ পালাচ্ছেন দেখে জরাসন্ধ উচ্চহাস্য করতে করতে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কৃষ্ণের অনুসরণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম বহু দূরে এসে এক অতি উচ্চ পর্বতে উঠে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এদিকে জরাসন্ধ তাদের খুঁজে না পেয়ে ঐ পর্বতের চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম তখন ঐশী শক্তির প্রভাবে সকলের অলক্ষিতে ঐ পর্বত থেকে দ্বারকায় গিয়ে পৌঁছালেন। এদিকে কৃষ্ণ ও বলরাম আগুনে পুড়ে মারা গেছে ভেবে জরাসন্ধ সৈন্যসামন্ত নিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজ্য স্থাপন করে উগ্রসেনকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজসভা গৃহে যদুবীর এবং অপরাপর মন্ত্রী সভাসদদের নিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-প্রার্থী হয়ে একজন দূত সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সেই দূত শ্রীকৃষ্ণকে বললে—জরাসন্ধ দিগ্বিজয় করবার সময় বিশ হাজার রাজাকে গিরিদুর্গে বন্দী করে রেখেছে। (এখানে রাজা মানে জমিদার বলেই মনে হয়।) সেই বন্দী রাজাদের হয়ে দূত এসেছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করতে। রাজাদের বার্তা দূত নিবেদন করল ঃ

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ প্রপন্নভয়ভঞ্জন।
বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথগ্ধিয়ঃ ॥ ১০-৭০-২৫ ॥

হে কৃষ্ণ! হে অপরিমেয় পরমাত্মন্ শ্রীকৃষ্ণ! হে শরণাগতের ভয়হারি! আমরা ভেদদর্শী, সমত্ব-বোধ আমাদের নেই। যারা সত্যস্বরূপ একমাত্র আপনাকে না দেখে জগতের বিষয়ে মনোনিবেশ করে, তারাই বার বার জন্ম-মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। সুতরাং সংসার-ভয়ে ভীত হয়ে আমরা আপনার শরণাপন্ন হলাম। যতদিন পর্যন্ত জীব কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম করতে থাকে কিন্তু আপনার ভজনা করে না, ততদিন পর্যন্ত তারা বার বার সংসার-চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। হে পরমেশ্বর! আপনিই জগতের কর্তা; সাধুদের রক্ষা এবং দুষ্কৃতকারিদের বিনাশের জন্য আপনি বলরামের সাথে অবতীর্ণ হয়েছেন। তবুও দেখতে পাচ্ছি যে, জরাসন্ধ প্রভৃতিরা অন্যায় করেও শাস্তি পাচ্ছে না; আবার যারা ন্যায়নিষ্ঠ, তারা আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়েও নিজেদের কর্মফলের জন্য দুঃখ ভোগ করছেন; এর কারণ আমরা বুঝতে পারি না। হে প্রভু, জরাসন্ধ আমাদের কারারুদ্ধ করে রেখেছে; ফলে আমরা অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করছি; কিন্তু তবুও জানি যে, এই কষ্টভোগ আমাদেরই পূর্ব কর্মের ফল। রাজারা যে রাজ্যসুখ ভোগ করে তা ক্ষণস্থায়ী; সুতরাং আমরা রাজ্যসুখ চাই না। আপনার নিষ্কাম ভক্তেরা আপনার কাছে যা প্রার্থনা করেন, আমরাও আপনার কাছে সেই ভক্তিধনই প্রার্থনা করি। আপনার শ্রীচরণ প্রণত-জনের দুঃখ দূর করে; আমরা আপনার ভক্ত, আপনার শরণাগত। আপনি আমাদের এই জরাসন্ধ-রূপী কর্মপাশ থেকে মুক্ত করুন।

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ।
প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্ ॥ ১০-৭০-৩১ ॥

এইভাবে রাজাদের আর্তি জানিয়ে দূত বললে—হে প্রভু কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজারা আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে আপনার শ্রীপদে শরণ নিয়েছেন; আপনি তাদের মঙ্গল বিধান করুন।

দূত যখন রাজসভায় এই সব কথা বলছিল, সেই সময় দেবর্ষি নারদ এসে সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন—হে সর্বব্যাপিন্ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি বিশ্বের

সৃষ্টিকর্তা; আপনি ব্রহ্মারও নিয়ন্তা। মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে অর্চনা করার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছা করেছেন। সেই যজ্ঞে আপনাকে দর্শন করার আশায় দেবতারা এবং মহাপরাক্রমী রাজারা সব আসবেন।

শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ।
তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ ॥ ১০-৭০-৪৩ ॥

হে পরমেশ্বর! ব্রহ্মময় পুরুষের নামগুণ-কীর্তন, শ্রবণ এবং ধ্যানের ফলে চণ্ডালেরাও পবিত্র হয়ে যায়। আপনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম; সুতরাং আপনার দর্শন স্পর্শনে যে দেবতারাও পবিত্র হবেন, এতে আর বলার কি আছে? আপনাকে দর্শন করে রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত এবং অংশগ্রহণকারী সকলেই পবিত্র হবে। সুতরাং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই রাজসূয় যজ্ঞ আপনি অনুমোদন করুন।

নারদের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে উদ্ধবকে বললেন—হে উদ্ধব! তুমি আমাদের বন্ধু এবং মহামন্ত্রী; মন্ত্রণা বিষয়ে তুমি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ। উপস্থিত এই দুইটি বিষয়—জরাসন্ধ কর্তৃক নিগৃহীত রাজাদের মুক্তি প্রদান এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত থাকা—এই দুইটি কর্তব্য কিভাবে সম্পন্ন করা উচিত তা আমাদের বল।

উদ্ধব বললেন—হে দেব! মহামুনি নারদ বললেন, আপনার পিসী কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছা করে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন; আপনার এতে সাহায্য করা উচিত। আর কারারুদ্ধ রাজাদের কথা দূত যা বললে, সেই শরণাগত রাজাদের রক্ষা করাও আপনার কর্তব্য। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ের জন্য জরাসন্ধকে বধ করলে আর্ত রাজাদেরও প্রার্থনা পূর্ণ হবে। সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে জরাসন্ধকে পরাজিত করা সম্ভব নয়; কারণ তার শত অক্ষৌহিণী সৈন্য রয়েছে। সুতরাং জরাসন্ধকে বধ করতে হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এবং একমাত্র ভীমই তার সমকক্ষ। আমি জানি ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা জরাসন্ধ কখনও প্রত্যাখ্যান করে না। অতএব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভীমসেন জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রার্থনা করুক। মহাশক্তিধর ভীম আপনার সান্নিধ্যে, আপনার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জরাসন্ধকে বধ করবে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

হে প্রভু! আপনার এই শরীর আমাদের মতো প্রাকৃত নয়! আপনি কালাত্মা এবং পরম ঈশ্বর; আপনি জগতের সৃষ্টি এবং সংহারের কর্তা; ব্রহ্মা এবং রুদ্র কেবল নিমিত্ত মাত্র; সেইরকম নিমিত্ত-মাত্র হয়েই ভীমসেন আপনার সামনে, আপনার তেজে শক্তিমান হয়ে জরাসন্ধকে বধ করবে; আপনিই প্রকৃত জরাসন্ধ-হন্তা।

উদ্ধব আরও বললেন—কত লোকই না আপনার গুণকীর্তন করছেন। গোপীরা শঙ্খচূড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে,গজেন্দ্র কুম্ভীর থেকে পরিত্রাণ পেয়ে, সীতাদেবী রাবণ থেকে রক্ষা পেয়ে এবং আপনার পিতামাতা বসুদেব-দেবকী কংসের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে আপনার গুণগান করেছেন। এখন জরাসন্ধকে বধ করে রাজাদের কারামুক্ত করলে আপনার শরণাগত রাজারা এবং রাজমহিষীরাও আপনার যশোগান করবে।

এখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, তাঁর টীকায় উদ্ধবের মনের আর একটি ভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, উদ্ধবের মনে এই ইচ্ছাটিও ছিল যে, জরাসন্ধকে বধ করে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হবার পর দ্বারকায় ফেরার পথে যদি শ্রীকৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য ব্রজধামে গিয়ে নন্দ-যশোদা এবং গোপ-গোপীদের দর্শন দিয়ে তাঁদের জীবন রক্ষা করেন, তাহলে আমরাও শ্রীকৃষ্ণের বিমল মহিমা কীর্তন করব।

উদ্ধব নিজের চোখে কৃষ্ণের বিরহে ব্রজবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে এসেছেন; তাই তিনি সবর্দাই ভাবতেন কখন কোন্ সুযোগে শ্রীকৃষ্ণকে একবার সেখানে পাঠানো যায়। জরাসন্ধ এবং শিশুপাল বধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সকল রাজারাই যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করবে। এইভাবে ধর্মরাজ্য স্থাপিত হলে, শ্রীকৃষ্ণের কিছুটা অবসর হবে। সেই সুযোগে শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজবাসীদের দেখা দিয়ে আসুন—এইটিই উদ্ধবের মনের ইচ্ছা। উদ্ধব বললেন—হে কৃষ্ণ ! মনে হয় পাণ্ডবদের এই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান আপনারও অভিপ্রেত; কারণ এই যজ্ঞকে উপলক্ষ করে জরাসন্ধ বধ, রাজাদের কারামুক্তি, শিশুপাল বধ প্রভৃতি অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

শিশুপাল বধের পর শ্রীকৃষ্ণ একে একে শল্ব, দন্তবক্র, বিদূরথ প্রভৃতিকে বিনাশ করেন। দন্তবক্র যেখানে নিহত হয়, সেই স্থানের নাম 'দতিহা'। এই

জায়গাটি মথুরার কাছে। ভাগবতে রয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র ও তার ভাই বিদূরথকে বধ করে পুরীতে প্রবেশ করলেন। (ভাঃ ১০-৭৮-১৫) এইটি কোন্ পুরী, ব্রজপুরী অথবা দ্বারকাপুরী—তা ভাগবতে উল্লেখ নেই। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড ২৫২- ২৫, ২৬, ২৭, ২৮) উল্লেখ করে বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পার হয়ে ব্রজপুরীতে প্রবেশ করলেন। সেখানে ব্রজবাসীদের বিরহ-দুঃখ দূর করে, তাদের সঙ্গে দুই মাস বিহার করেছিলেন। পরে তিনি ব্রজবাসীদের নিত্যধামে পাঠিয়ে, নিজে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

উদ্ধবের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে সবাই তার প্রশংসা করতে লাগলেন। দেবর্ষি নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব জেনে, তাঁকে প্রণাম করে এবং হৃদয়ে তাঁরই ধ্যান করতে করতে আকাশ পথে চলে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন রাজাদের দূতকে বললেন—তোমরা ভয় পেয়ো না; আমি জরাসন্ধকে বধ করে রাজাদের মুক্ত করব। দূত ফিরে গিয়ে রাজাদের শ্রীকৃষ্ণের কথা নিবেদন করলে রাজারা অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বসুদেব, উগ্রসেন প্রভৃতি গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে স্বসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থে* যাবার জন্য রওনা হলেন। এদিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের আগমন সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পুরবাসীদের সাথে নগরের বাইরে এলেন এবং পরম স্নেহে বার বার শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। বহুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কি অবস্থা হলো তা শুকদেব যুধিষ্ঠিরের পৌত্র পরীক্ষিৎকে বলছেন ঃ

দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য রমামলালয়ং মুকুন্দগাত্রং নৃপতির্হতাশুভঃ।
লেভে পরাং নির্বৃতিমশ্রুলোচনো হৃষ্যত্তনুর্বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ ॥
১০-৭১-২৬ ॥

লক্ষ্মীদেবীর আলয়স্বরূপ ভগবান মুকুন্দকে দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করাতে যুধিষ্ঠিরের সকল অকল্যাণ দূর হলো এবং আনন্দের আতিশয্যে

* ইন্দ্রপ্রস্থ—দিল্লীর নিকটবর্তী স্থান

তিনি লোক-ব্যবহার পর্যন্ত ভুলে গিয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন; তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগল এবং তিনি পরম সুখ অনুভব করলেন। তারপর ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব একে একে প্রেমাশ্রু ধারায় সিক্ত হয়ে সুহৃত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন।

অতি যত্নে এবং আদরে শ্রীকৃষ্ণকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে রাজমাতা কুন্তীদেবী নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দেখে পরম আনন্দে পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সাথে তাঁর সমাদর করলেন। এইভাবে পরম আদরে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সাথে কয়েক মাস বাস করলেন।

একদিন সভামধ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে গোবিন্দ! যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে রাজসূয় যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের দ্বারা আমি তোমারই পবিত্র বিভূতি দেবতাদের অর্চনা করব; অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞে তোমারই অর্চনা করা হবে; তুমি আমাদের সেই যজ্ঞ সম্পাদন কর। তোমার শ্রীচরণ যাঁরা সেবা করেন, মনে মনে তোমার ধ্যান করেন, তোমার পবিত্র কীর্তিসকল কীর্তন করেন তারা সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। আর যারা তোমার কাছে কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে, তারা সেই সব কাম্যবস্তুও লাভ করে থাকে; কিন্তু তোমার প্রতি যাদের ভক্তি নেই, তারা মুক্তি লাভ তো দূরের কথা, কাম্য বস্তুও পায় না। এই রাজসূয় যজ্ঞে সর্বসাধারণ দেখবে, তোমার শ্রীচরণ সেবার কি মহিমা! তাই এই রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প করেছি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! তোমার সংকল্প অতি উত্তম। রাজসূয় যজ্ঞ করতে হলে প্রথমেই সকল রাজাদের পরাজিত করে তাদের বশে আনতে হবে। সুতরাং দেববলে বলীয়ান তোমার ভাইদের দিগ্বিজয়ের কাজে নিযুক্ত কর।

শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাসন্ধকে বধ করার জন্য উদ্ধবের কথামত ভীম এবং অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অতিথি সৎকারের সময় অর্থাৎ দুপুর বেলায় তারা জরাসন্ধকে বললেন—হে রাজন্! দূর থেকে আগত, যাচক অতিথি বলেই আমাদের জানবেন; আপনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

কিং দুর্মর্ষং তিতিক্ষূণাং কিমকার্যমসাধুভিঃ।
কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্ ॥১০-৭২-১৯॥

তিতিক্ষু, যারা সহিষ্ণু, তাদের কাছে দুঃসহ কি থাকতে পারে? যারা অসাধু, তাদের কাছে কুকার্য বলে কি কিছু হতে পারে? যারা দানশীল তাদের কাছে অদেয় কি থাকতে পারে? যারা সমদর্শী, তাদের আবার পর কে হতে পারে? আপনি দানশীল, আপনার অদেয় কিছু নেই; সুতরাং আপনি আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুনের আকৃতি এবং কথা বলার ধরন দেখে জরাসন্ধ তাদের ক্ষত্রিয় বলে বুঝতে পারলেন; কিন্তু কোথায় যে তাদের দেখেছেন, তা মনে করতে পারলেন না। জরাসন্ধ ভাবলেন, এরা যেই হোক ব্রাহ্মণের বেশে যখন আমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছে তখন এদের প্রার্থনা আমি অবশ্যই পূর্ণ করব। এই ভেবে উদারমতি জরাসন্ধ বললেন—হে বিপ্রগণ! আপনাদের অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করুন; আপনারা যদি আমার মস্তকও প্রার্থনা করেন, জানবেন তাও আমি আপনাদের দান করব।

যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দ্বন্দ্বশো যদি মন্যসে।
যুদ্ধার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্যকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১০-৭২-২৮॥

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজেন্দ্র! আমরা ক্ষত্রিয়; যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হয়ে এখানে এসেছি; আপনি আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করুন—এই আমাদের প্রার্থনা; অন্য কোন কামনা আমাদের নেই।

অসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতার্জুনো হ্যয়ম্।
অনয়োর্মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্ ॥ ১০-৭২-২৯॥

শ্রীকৃষ্ণ এবার নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলছেন—ইনি কুন্তীপুত্র ভীমসেন; আর এঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা হচ্ছেন এই অর্জুন; আমাকে এঁদের মাতুলপুত্র এবং আপনার শত্রু কৃষ্ণ বলে জানবেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে জরাসন্ধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন বটে, কিন্তু উচ্চহাস্য করে বললেন—তোমরা অত্যন্ত মূঢ়; নইলে যাচক হয়ে এসে আমার সাথে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রার্থনা কর! বেশ তোমাদের সাথে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধই করব।

হে কৃষ্ণ! তোমায় এখন আমি চিনেছি; তুমি ভীরু; যুদ্ধে বিহ্বল হয়ে পড়; আমার ভয়ে তুমি মথুরা ছেড়ে সাগর পারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছ;

সুতরাং তোমার সাথে আমি যুদ্ধ করতে চাই না। আর এই অর্জুন তো দেখছি ছেলেমানুষ, তেমন বলবানও নয়; সুতরাং আমার সাথে যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়। দেখতে পাচ্ছি একমাত্র ভীমই আমার সমান বলবান; সুতরাং ভীমের সাথেই আমি যুদ্ধ করব।

জরাসন্ধ তখন ভীমকে এক বিশাল গদা দিয়ে নিজে আর একটি গদা নিয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। দুই জনেই সমান বলবান এবং গদা-যুদ্ধে দুই জনেই ওস্তাদ; সুতরাং কেউ কাউকে হারাতে পারছেন না; দিনের বেলায় দুইজনে যুদ্ধ করেন এবং রাত্রিতে তারা বন্ধুভাবে অবস্থান করেন। এইভাবে ২৭ দিন কেটে গেল। একদিন ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে মাধব! যুদ্ধে তো আমি জরাসন্ধকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারছি না, এখন কি উপায় হবে? শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের তেজে ভীমসেনকে শক্তিশালী করে, একটি বৃক্ষশাখা বিদারণ করে, জরাসন্ধকে বধ করবার উপায় দেখিয়ে দিলেন। ভীম তখন শ্রীকৃষ্ণের সংকেত বুঝতে পেরে, জরাসন্ধকে মাটিতে ফেলে, তার এক পা নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে দুই হাতে জরাসন্ধের অপর পা ধরে, তার দেহকে দুই ভাগে চিরে ফেললেন।

জরাসন্ধের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ তার পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের মুক্ত করলেন। রাজারা দীর্ঘদিন ধরে গিরিদুর্গে বন্দী ছিলেন; ফলে তাদের পোশাকাদি অত্যন্ত মলিন হয়েছিল এবং তারা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন। এই অবস্থায় কারামুক্ত হয়েই তারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী-বনমালায় ভূষিত পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারা তখন যেন দুই চোখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করতে লাগলেন।

কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্লাদ-ধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ।
প্রশশংসুর্হৃষীকেশং গীর্ভিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ ॥ ১০-৭৩-৭ ॥

কৃষ্ণ দর্শনের আনন্দে রাজাদের অবরোধজনিত দুঃখের নিরসন হলো এবং তারা সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে করজোড়ে হৃষীকেশের স্তব করতে লাগলেন ঃ

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাব্যয়।
প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিণ্ণান্ ঘোরসংসৃতেঃ ॥ ১০-৭৩-৮ ॥

হে পরমেশ্বর! হে শরণাগতের দুঃখহারি! হে অবিনাশি! আমরা আপনাকে প্রণাম করি। হে কৃষ্ণ! আমরা আপনার শরণাগত ; ঐহিক এবং পারলৌকিক বিষয়ে আমাদের বিরাগ জন্মেছে; আপনি এই ঘোর সংসার থেকে আমাদের মুক্ত করুন।

রাজারা রাজ্য এবং ঐশ্বর্য-মদে মত্ত হয়ে অনিত্য ভোগসুখেই জীবন অতিবাহিত করে; তারা নিত্যবস্তু আপনার খোঁজও করে না। জরাসন্ধ আমাদের রাজ্যচ্যুত করে বন্দী করে রেখেছিল; তারই ফলে আমরা আপনার শরণাগত হতে পেরেছি। সুতরাং জরাসন্ধ আমাদের পরম উপকারই করেছে। হে বিভো! সতত-ক্ষীয়মাণ এবং বহু রোগের উৎপত্তি-স্থান এই দেহের দ্বারা আমরা আর ক্ষণস্থায়ী রাজ্যসুখ ভোগ করতে চাই না; বরং এই দেহ দ্বারা আপনার আরাধনা করাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গলোকও কামনা করি না। জন্মান্তরে আমরা যাতে আপনার স্মরণ মনন করতে পারি এবং আপনাকে লাভ করতে পারি, এখন তারই উপায় করুন।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১০-৭৩-১৬ ॥

প্রণত জনের দুঃখহারী হে কৃষ্ণ! যাঁকে বাসুদেব, শ্রীহরি, পরমাত্মা, গোবিন্দ বলে অভিহিত করা হয়, সেই অনন্ত নামধারী আপনাকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

শ্রীকৃষ্ণের এই বিখ্যাত প্রণাম মন্ত্রটি মহাদুর্দশাগ্রস্ত রাজাদের মুখ থেকে প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। রাজাদের প্রার্থনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর বাক্যে তাদের বললেন—তোমরা স্মরণ-মনন করে পরজন্মে আমাকে লাভ করতে ইচ্ছা করেছ। তোমাদের এই ইচ্ছা অত্যন্ত শুভকরী। আমার অনুগ্রহে তোমরা অন্তকালে বিষয়-বাসনা রহিত হয়ে, আমাতে মন সমাহিত করে পরব্রহ্ম-স্বরূপ আমাকেই লাভ করবে।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে দিয়ে জরাসন্ধকে বধ করিয়ে এবং কারারুদ্ধ রাজাদের মুক্ত করে ভীমার্জুনকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন। জরাসন্ধবধের বিবরণ শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। কৃষ্ণের প্রতি উচ্ছ্বসিত স্নেহে তিনি কোন কথাই বলতে পারলেন না।

জরাসন্ধ-বধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আর কোন বাধাই রইল না। কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। রাজসূয় যজ্ঞে ভীমসেন পাকশালার অধ্যক্ষপদে, দুর্যোধন ধনাধ্যক্ষপদে, সহদেব পূজনকার্যে, নকুল নানাবিধ দ্রব্যসংগ্রহে, অর্জুন সজ্জনের শুশ্রূষায়, কৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালনে, দ্রৌপদী পরিবেশনে, কর্ণ দানে নিযুক্ত ছিলেন।

যজ্ঞশেষে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য কাকে দেওয়া হবে—এই নিয়ে আলোচনা হলো। সহদেব বললেন—যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাবার যোগ্যতম ব্যক্তি; তিনিই সকলের পূজনীয়; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয়, তাঁর চেয়ে বড় কিংবা তাঁর সমানও কেউ নেই। তিনি জন্ম-রহিত ; তিনিই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করছেন; সুতরাং উপস্থিত হে সভাসদগণ! আপনারা সর্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকেই এই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করুন। সহদেবের কথা শুনে ধর্মনিষ্ঠ রাজারা এবং মহাত্মারা সকলেই 'সাধু সাধু' বলে অনুমোদন করলেন। যুধিষ্ঠির তখন পরম আনন্দে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপূজা করে সেই অর্ঘ্য তাঁকে প্রদান করলেন। যজ্ঞে উপস্থিত লোকেরা প্রায় সকলেই তখন শ্রীকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করতে লাগলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগান এবং তাঁর জয়ধ্বনি শুনে শিশুপাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সভার মধ্যেই দুই হাত তুলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটূক্তি করতে লাগলেন। শিশুপালের কটূক্তি এবং অসদাচরণের মাত্রা যখন ছাড়িয়ে গেল, তখন যাদবেরা শিশুপালকে শাস্তি দেবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদের নিবৃত্ত করে নিজেই সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালকে বধ করলেন। সভাস্থ সকলেই দেখলেন যে, শিশুপালের শরীর থেকে একটা জ্যোতি বের হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করল।

এই শিশুপাল ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর দ্বারী; ঋষিদের অভিশাপে তিন বার অসুর-দেহ ধারণ করে, ভগবৎ-বিদ্বেষী হয়ে, তিন বারই ভগবানের হাতে নিহত হয়েছেন। এইটি-ই ছিল তাঁর তৃতীয় জন্ম; শিশুপালের মৃত্যুতে সেই বিষ্ণুর দ্বারী আবার তাঁর প্রভু বিষ্ণুর কাছেই ফিরে গেলেন।

৩২

সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাদব ও গোপগণের মিলন

ভাগবতে রয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বছর পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথম ১১বছর তিনি বৃন্দাবন লীলায় মেতে ছিলেন। তার পরের ১১ বছর কাটিয়েছেন মথুরায়। বাকি প্রায় ১০৩ বছর তিনি দ্বারকায় অবস্থান করে পৃথিবীতে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ভবিষ্যৎ মানবের জন্য তাঁর জীবনরূপী ছাঁচটি রেখে গিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভের সহজ উপায় করে গেছেন।

অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কৃষ্ণের আশু বিচ্ছেদের চিন্তায় কাতর হয়ে গোপীরা রথের চাকা ধরে ছিলেন; উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে মথুরায় যেতে দেবেন না; কিন্তু কালের অমোঘ বিধানে কৃষ্ণকে মথুরায় যেতে হয়েছিল। সেইসময় তিনি গোপীদের কথা দিয়েছিলেন যে, শিগ্‌গিরই আবার আসবেন। কংস বধের পর নন্দবাবা যখন কৃষ্ণকে ছেড়ে একাই অতিদুঃখে বৃন্দাবনে ফিরছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ নন্দবাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে, জ্ঞাতিদের একটা সুব্যবস্থা করে তিনি তাদের দেখতে বৃন্দাবনে যাবেন। বহু বছর কেটে গেছে কিন্তু তাঁর আর বৃন্দাবনে যাওয়া হয় নি। মাঝে একবার উদ্ধবকে পাঠিয়ে ব্রজবাসীর খবর নিয়েছিলেন মাত্র। তারপর ব্রজবাসীরা খবর পেয়েছিলেন যে, কৃষ্ণ বহু দূরে দ্বারকায় গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেছেন; সুতরাং কৃষ্ণের পক্ষে বৃন্দাবনে আসা সুদূর-পরাহত। তবুও একদিন না একদিন কৃষ্ণের দর্শন পাবেন—এই আশায় বুক বেঁধে অতি কষ্টে ব্রজবাসীরা দিন যাপন করছিলেন।

অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রামকৃষ্ণয়োঃ।
সূর্যোপরাগঃ সুমহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা ॥ ১০-৮২-১॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যখন দ্বারকায় বাস করছিলেন, সেই সময় একবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে জানতে পারলেন। সাধারণত সূর্যের পূর্ণগ্রাস হয় না;

পূর্ণগ্রাস হলে দিনের বেলাতেই এমন অন্ধকার হয় যে, মনে হবে যেন কল্পাবসানে মহাপ্রলয়ের অন্ধকার পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

প্রচলিত আছে যে, সূর্যগ্রহণের সময় মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্র হ্রদে স্নান করলে মহাপুণ্য হয়; সেইজন্য ভারতের সমস্ত প্রদেশের পুণ্যার্থীরা এই উপলক্ষে দলে দলে কুরুক্ষেত্রে আসতে লাগলেন। কিছু সংখ্যক যাদবদের দ্বারকায় রাজকার্যে নিযুক্ত রেখে, বাকি সকলে নিজ নিজ পত্নীর সাথে পুণ্য লাভের আশায় কুরুক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। তখনকার দিনে তো হোটেল, অতিথিভবন প্রভৃতি ছিল না; সুতরাং ঐ দিগন্ত-বিস্তৃত কুরুক্ষেত্র ময়দানে যে যেখানে পারলেন সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন।

তত্র স্নাত্বা মহাভাগা উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধেনূর্বাসঃ স্রগ্রুক্মমালিনীঃ ॥ ১০-৮২-৯॥

মহাভাগ্যবান যাদবেরা তখন সমাহিত চিত্তে কুরুক্ষেত্রের হ্রদে স্নান করলেন এবং উপবাস করে ব্রাহ্মণদের বস্ত্র, মাল্য এবং স্বর্ণমালায় সজ্জিত গাভী সকল দান করলেন।

কুরুক্ষেত্র তীর্থে সবাই এসেছেন পুণ্যলোভাতুর হয়ে; কিন্তু যাদবেরা এসেছেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে; তাদের একমাত্র প্রার্থনা 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের ভক্তি হোক'। যথারীতি স্নান, দান এবং তীর্থকৃত্যাদি শেষ করে যাদবেরা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে নিজেরাও ভোজন করে গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

এই মহাতীর্থে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে যাদবদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি বহু দূর দূর দেশ থেকে পুণ্যলাভের আশায় এসেছেন। কেউ তো কাউকে জানিয়ে আসেন নি; তাই তীর্থের কাজ শেষ করে অনেকে ঘুরতে বেরিয়েছেন যদি কোন আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত জনের সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। এই ভাবে যাদবদের সাথে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, সপুত্র গান্ধারী, কুন্তী, সস্ত্রীক পঞ্চপাণ্ডব, বিদুর, কৃপাচার্য, কুন্তীভোজ, বিরাট প্রভৃতি মুখ্য কুরুবংশীয় এবং অন্যান্যদের সাথে দেখা হলো।

গোপরাজ নন্দও গোপ এবং গোপীদের সঙ্গে নিয়ে এই উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে এসেছেন। তাঁরা কিন্তু পুণ্যলাভের আশায় অথবা 'কৃষ্ণের প্রতি আমাদের ভক্তি হোক'—এই সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসেন নি। তাঁরা শুনেছেন

যে, যাদবদের নিয়ে কৃষ্ণ সস্ত্রীক এই মহাতীর্থে আসবেন। গ্রাম্য পরিবেশে অভ্যস্ত গোপ-গোপীদের পক্ষে তো সুদূর দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণকে দর্শন করা সম্ভব নয়। তাঁরা ভাবছেন, দিগন্ত বিস্তৃত কুরুক্ষেত্রের মাঠে কোন-রকমে দূর থেকে হলেও একবার যদি প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে তাঁরা দেখতে পান—এই আশাই তাঁদের বৃন্দাবন থেকে কুরুক্ষেত্রে টেনে এনেছে—শুধুই একবার কৃষ্ণকে দেখবেন। কৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজবাসীদের স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, জীবনে তাঁদের কোন উৎসাহ নেই, কিছু করবারও উদ্যম নেই। তাঁরা কোনরকমে বেঁচে আছেন কেবল একটি মাত্র আশা নিয়ে—একদিন তাঁরা অবশ্যই কৃষ্ণকে পাবেন। এই বুক-ভরা আশা নিয়েই তাঁরা বহু কষ্টে কুরুক্ষেত্রে এসেছেন; কৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁদের দীর্ঘ দিনের হৃদয়-সন্তাপ দূর হবে, তাঁদের বিরহ-বেদনা অপহিত হবে—এই একমাত্র আশা। ব্রজবাসীদের তীর্থস্নান কিম্বা তীর্থকৃত্যে তেমন আগ্রহ নেই; তাঁরা খুঁজছেন এই বিশাল জনতার মধ্যে—কোথায় আমাদের কৃষ্ণ।

হঠাৎ নন্দরাজ দেখলেন একটু দূরে যাদবগণ পরিবৃত হয়ে উগ্রসেন, বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য রাজাদের সাথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং আলাপাদি করছেন। নন্দরাজ এবং ব্রজবাসীরা নিশ্চল হয়ে সেখান থেকেই অপলক নয়নে কৃষ্ণকে দেখতে এবং তাঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন।

ব্রজবাসীরা দেখলেন যে, যাদবেরা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা বহু-দিন পরে একে অপরকে দর্শন করে উৎফুল্ল হৃদয়ে এবং সহাস্য মুখে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন; তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগল; আনন্দের আতিশয্যে তারা কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। স্ত্রীলোকেরাও পরস্পরকে দেখে সখীভাবে হাসতে হাসতে প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন। তখন যাদব এবং কুরুবংশীয়েরা বৃদ্ধদের প্রণাম এবং ছোটদের অভিবাদন গ্রহণ করে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা বলতে লাগলেন।

তখন কুন্তীদেবী অভিমান করে তার ভাই বসুদেবকে বললেন ঃ

আর্য ভ্রাতরহং মন্যে আত্মানমকৃতাশিষম্।
যদ্বা আপৎসু মদ্বার্তাং নানুস্মরথ সত্তমাঃ ॥ ১০-৮২-১৮॥

হে ভ্রাত বসুদেব! আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যহীনা বলে মনে করি; কারণ তোমরা অত্যন্ত সজ্জন হয়েও বিপদের সময় আমার কোন সংবাদ নিচ্ছ না। যার দৈব প্রতিকূল, তার সংবাদ আত্মীয়, বন্ধু, পুত্র, ভ্রাতা, এমন কি পিতা-মাতাও নেয় না; দৈবই আমার প্রতি বিরূপ; তোমাদের আর কি দোষ!

বসুদেব বললেন—হে আমার স্নেহের বোন কুন্তি! আমরা তো সামান্য মানুষ, দৈবের ক্রীড়ার পুতুল; আমাদের প্রতি দোষারোপ করো না; জান তো মানুষ ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কাজ করে এবং করতে বাধ্য হয়।

কংস প্রতাপিতাঃ সর্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্।
এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ ॥ ১০-৮২-২১ ॥

হে ভগিনি! আমরা কংসের অত্যাচারে নানা দিকে চলে গিয়েছিলাম। এখন দৈবের অনুগ্রহে আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছি; সুতরাং তখন তোমার সংবাদ নেওয়ার কিংবা তোমাকে কোন প্রকার সাহায্য করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না; অতএব আমাদের প্রতি দোষারোপ করা তোমার উচিত নয়।

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যুধিষ্ঠিরের অনুগত যেসব রাজারা পত্নীদের সাথে কুরুক্ষেত্র তীর্থে এসেছিলেন, তারা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ

অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ।
যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥ ১০-৮২-২৮ ॥

হে ভোজপতি! আহা! এই জগতে আপনাদেরই জন্ম সার্থক হয়েছে; কারণ আপনারা যোগীদেরও দুর্লভ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা দর্শন করছেন।

যাঁর কীর্তি বেদে বিঘোষিত, যাঁর পাদবিধৌত গঙ্গাবারি এবং বাক্য-রূপ বেদশাস্ত্র জগৎকে পবিত্র করেছে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে আপনারা সর্বদা কথাবার্তা বলছেন, একত্রে ভোজন, উপবেশন, শয়নাদি করছেন; সুতরাং আপনাদের মতো ভাগ্যবান জগতে আর কে আছে?

শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলছেন—রাজারা যখন যাদবদের কাছে এইভাবে কৃষ্ণের গুণকীর্তন করছিলেন, সেই সময় যাদবেরা হঠাৎ দূরে নন্দরাজকে দেখতে পেলেন।

তং দৃষ্ট্বা বৃষ্ণয়ো হৃষ্টাস্তন্বঃ প্রাণমিবোত্থিতাঃ।
পরিষস্বজিরে গাঢ়ং চিরদর্শনকাতরাঃ ॥ ১০-৮২-৩২ ॥

নন্দরাজ এবং ব্রজবাসীদের দর্শনের জন্য যাদবেরা বহুদিন থেকেই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। মথুরায় কংস বধের সময় সেই কবে নন্দাদি গোপদের সাথে তাদের দেখা হয়েছিল; তারপর আর তাঁদের সাথে দেখা হয় নি। এই অদ্ভুত পরিবেশে অকস্মাৎ তাঁদের দেখে যাদবেরা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো আনন্দে লাফিয়ে উঠে তাদের আলিঙ্গন করলেন।

বসুদেবঃ পরিষ্বজ্য সংপ্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
স্মরন্ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ পুত্রন্যাসঞ্চ গোকুলে॥ ১০-৮২-৩৩ ॥

অতীত দিনের সকল দুঃখ-কষ্টের কথাই বসুদেবের মনে উদিত হলো; কংসের অত্যাচার এবং নবজাত শিশুপুত্রকে রেখে আসার স্মৃতি স্মরণ করে বসুদেব একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন; সেদিনের কথা কি ভোলা যায়! তাই বসুদেব পরমপ্রেমে নন্দরাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন।

কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ।
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ ॥ ১০-৮২-৩৪ ॥

শুকদেব বললেন—হে কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ! তখন বলরাম ও কৃষ্ণ পিতামাতা নন্দ-যশোদাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করলেন। যাদের বুক-ভরা ভালবাসায় রাম ও কৃষ্ণ শৈশবে কত আনন্দেই না লালিত-পালিত হয়েছেন, সেই তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে এই দীর্ঘ সময় কোনরকম সংবাদ আদান-প্রদান না করেই কাটিয়েছেন; আজ অকস্মাৎ তাঁদের দেখা মাত্র রাম ও কৃষ্ণ ব্রজের ভাবে ভাবিত হয়ে প্রেমাবেশে মা মা, বাবা বাবা বলতে বলতে তাঁদের জড়িয়ে ধরলেন। দুই চোখ দিয়ে রাম-কৃষ্ণের আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল; যুগপৎ আনন্দ এবং বিষাদে তাঁদের বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেল;

নন্দ-যশোদাকে তারা কোন কথাই বলতে পারলেন না। নন্দ-যশোদা অতি স্নেহে দুই পুত্রকে নিজেদের কোলে বসিয়ে দুই হাত দিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে বহুদিনের বিরহ-সন্তাপ দূর করলেন।

রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য ব্রজেশ্বরীম্।
স্মরন্তৌঃ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠৌ সমূচতুঃ ॥
১০-৮২-৩৬ ॥

বসুদেব পত্নী রোহিণী এবং দেবকী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁদের অতি দুঃখের সময় যশোদার সাহায্যে তাঁদের দুই শিশুপুত্রের লালন-পালনের কথা স্মরণ করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ

কা বিস্মরেত বাং মৈত্রীমনিবৃত্তাং ব্রজেশ্বরি।
অবাপ্যাপ্যৈন্দ্রমৈশ্বর্যং যস্যা নেহ প্রতিক্রিয়া ॥ ১০-৮২-৩৭ ॥

রোহিণী বললেন—হে ব্রজেশ্বরী যশোদা! তোমাদের এই 'অনিবৃত্তাং মৈত্রী' বিনা কারণেও যে বন্ধুত্ব বজায় থাকে, তোমাদের সেই অহৈতুকী বন্ধুত্ব কোন্ রমণী ভুলতে পারে? ইন্দ্রের ঐশ্বর্য দান করলেও তোমাদের এই বন্ধুত্বের প্রতিদান করা সম্ভব নয়।

বন্ধুত্ব দুই রকমের হয়; এক 'হেতুজ' অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণের উপর বন্ধুত্ব নির্ভরশীল। যেমন, যে গাছে ফল রয়েছে সেই গাছের সাথে পাখিদের বন্ধুত্ব হয়; গাছের ফল শেষ হলেই পাখিদের বন্ধুত্বও শেষ হয়ে যায় এবং পাখিরা সেই গাছকে ত্যাগ করে; এইটি হচ্ছে 'হেতুজ' বন্ধুত্ব। আর এক রকমের বন্ধুত্ব আছে; তা হচ্ছে 'হেতুহীন' বন্ধুত্ব। কোন কারণ না থাকলেও বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না; এমন কি বন্ধুত্ব নষ্ট হবার অনেক কারণ থাকলেও কিন্তু বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না; এইটি হচ্ছে 'হেতুহীন' বন্ধুত্বের নিদর্শন। এই হেতুহীন বন্ধুত্ব জগতে একান্ত দুর্লভ। হে যশোদা! তোমাদের মধ্যে এই হেতুহীন বন্ধুত্ব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। মাতাপিতার সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত রাম ও কৃষ্ণকে তোমরা মাতাপিতার স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছ; তারপর তারা ব্রজ ছেড়ে চলে গেলেও কিন্তু তোমাদের এবং আমাদের বন্ধুত্বের কোন অভাব হয় নি। তাই বলছি, দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য দিলেও তোমাদের এই হেতুহীন বন্ধুত্বের প্রতিদান করা যাবে

না। রোহিণী আরও বললেন—এই বলরাম ও কৃষ্ণ, এরা তো প্রথমে তাদের মাতাপিতাকে দেখতেই পায় নি; জন্মের পরেই তোমাদের কাছে এদের রাখা হয়েছিল এবং তোমরাও অতি আদরে এদের পালন-পোষণ করেছ; কখনও এদের মাতাপিতার অভাব বুঝতে দাও নি। তোমরা যে এইভাবে পরমস্নেহে এদের লালন-পালন করেছ, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ; কারণ তোমরা যথার্থই মহামনা অভেদদর্শী; তোমাদের কাছে আপন-পর বলে তো কিছু নেই।

রোহিণী যখন ব্রজেশ্বরী যশোদাকে উদ্দেশ্য করে এই সব কথা বলছিলেন, তখন যশোদার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে রোহিণী দেখলেন যে, যশোদা রাম ও কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে মাতৃভাবের রস-সমুদ্রে এমন ভাবে ডুবে রয়েছেন যে, বাইরের কোন কথা কিংবা কোন দৃশ্যই তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারছে না; সুতরাং উত্তর কে দেবে? রোহিণী আরও দেখলেন যে রাম এবং কৃষ্ণ, এরাও বহু বছর পরে মা-বাবা নন্দ-যশোদাকে পেয়ে তাদের বাৎসল্য-প্রেমে এমনভাবে ডুবে গেছে যে, তাদেরও বাইরের জগতের কোন হুঁশ নেই; রাম ও কৃষ্ণ অপার আনন্দে অশ্রুসিক্ত নয়নে মা বাবার কোলে কেমন প্রশান্তভাবে শুয়ে আছে !

রোহিণী বুঝলেন—নন্দ-যশোদা এবং রাম-কৃষ্ণ এরা সকলেই এমন এক অদ্ভুত বাৎসল্যভাবে আত্মহারা হয়ে আছে যে, তাদের পক্ষে কোন কথা বলাই সম্ভবপর নয়। তাই রোহিণী দেবকীকে বললেন—সখি দেবকি! যশোদা তো দেখছি রাম-কৃষ্ণকে পেয়ে পুত্রস্নেহ-সমুদ্রে একেবারে তলিয়ে গেছে; এখন তার সাথে কথা বলা গাছের সাথে কথা বলার মতোই নিরর্থক ; আমাদের কথা যশোদার কানেও প্রবেশ করছে না আর সে কোন উত্তরও দিতে পারবে না; সুতরাং চল আমরা কুরু-মহিলা—গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির সাথে গিয়ে দেখা করি; তারা সবাই আমাদের সাথে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

রোহিণী ও দেবকী চলে যাবার পর গোপীরা যাঁরা কৃষ্ণের সাথে মিলিত হবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা দূর থেকে অনিমেষ নয়নে কৃষ্ণকে দেখছিলেন এবং চোখের পলক সৃজনকারী ব্রহ্মার নিন্দা করছিলেন, কারণ সৃষ্টি কার্যে ব্রহ্মার অপটুতার জন্যই তাঁরা কৃষ্ণকে

অপলক নয়নে দেখতে পারছেন না! গোপীরা বহুকাল পরে কৃষ্ণকে দর্শন করে চোখের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণকে নিজের নিজের হৃদয়মধ্যে নিয়ে গিয়ে বার বার আলিঙ্গন করে পরাভক্তি লাভ করলেন—যে-ভক্তি যোগীদের পক্ষেও লাভ করা অতি দুর্লভ।

গোপীদের মনের ভাব বুঝতে পেরে মহামতি বলরাম ধীরে ধীরে যশোদার কোল থেকে উঠে চলে গেলেন। কৃষ্ণ তখন গোপীদের দেখে অতি সন্তর্পণে মায়ের কোল থেকে উঠে এক নির্জন স্থানে গিয়ে গোপীদের সাথে মিলিত হলেন।

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১০-৮২-৪০ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন মহাভক্তিময়ী গোপীদের সাথে নির্জনে গিয়ে মিলিত হয়ে তাদের আলিঙ্গন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করে হাসতে হাসতে বললেন ঃ

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতান্‌-শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ ॥ ১০-৮২-৪১ ॥

হে সখিরা! আমরা নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদের সুখ বিধান এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য তোমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। তারপর শত্রুদের ধ্বংস করবার জন্য আমরা অনন্য-মনা হয়ে ছিলাম; ফলে তোমাদের সাথে দেখা করতে আমাদের বহু দেরি হয়ে গেল; এই অবস্থায় তোমরা এখনও কি আমাদের মনে রেখেছ?

ব্রজধাম ছেড়ে চলে যাবার কারণ হিসেবে বলছেন—নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধি এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ। নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধি মানে কংসাদির বিনাশ-সাধন। কংস আমার মাতাপিতা, দেবকী-বসুদেবকে কারা-রুদ্ধ করে রেখেছিল; তাছাড়া কংসের অত্যাচারে যাদবেরা অনেকেই মথুরা ছেড়ে দূর দেশে গিয়ে অতিকষ্টে জীবন-যাপন করছিলেন। সুতরাং মাতা-পিতার মুক্তি-সাধন এবং আত্মীয়-স্বজনদের মথুরায় ফিরিয়ে আনা ছিল আমার প্রথম কর্তব্য; তাছাড়া দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্যই তো আমার অবতরণ।

গোপীরা বলতে পারেন—তোমার কথানুযায়ী কংস-বধেই তোমার মাতাপিতার কারামুক্তি এবং আত্মীয়-স্বজনদের মথুরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং কংস বধের পরেও আমাদের দেখা দিতে এত দেরি করলে কেন? এইরকম প্রশ্নের আশঙ্কা করে কৃষ্ণ বললেন—শত্রু কি কেবল একা কংস? কংসের দলে যে আরও বহু অসুর ছিল এবং এখনও তারা অনেকেই জীবিত রয়েছে। জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতিরা মহান ব্যক্তিদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে; এদের সমূলে বিনাশ করতে না পারলে আমার অবতরণের উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কৃষ্ণ গোপীদের বললেন—নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি এবং শত্রুদের বিনাশের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম; তারই জন্য তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এত দেরি হয়ে গেল। এই অবস্থায় তোমরা কি এখনও আমাকে মনে রেখেছ? আমি অবশ্য আমার হৃদয়ের মণি-কোঠায় সর্বদাই তোমাদের সযত্নে রেখেছি।

কৃষ্ণের কথা শুনে গোপীরা এমন এক শ্লেষাত্মক ভঙ্গি করলেন, যাতে মনে হবে যে, গোপীরা যেন কৃষ্ণকে বলছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বদাই আমাদের কথা চিন্তা করেছ; কারণ তুমি মহাপ্রেমিক! কিন্তু আমরা তো অতি সাধারণ মানুষ; আমাদের প্রেম বলে কিছু নেই; সুতরাং তোমাকে আমরা কখনও ভাবিনি এবং তোমাকে ছেড়ে আমরা একেবারে আনন্দের সাগরে ডুবে ছিলাম; সুতরাং আমাদের জন্য তোমার মাথা ব্যথা হবার কিছু নেই। গোপীদের অভিমান ভরা মনের ভাব বুঝে কৃষ্ণ বললেন ঃ

নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ ॥ ১০-৮২-৪২ ॥

তোমরা হয়ত আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করে অবজ্ঞা করছ; কিন্তু আমাকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে করা তোমাদের উচিত নয়; কারণ ভগবানই জীবদের মধ্যে মিলন এবং বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকেন; আমাদের মিলন এবং বিচ্ছেদও ভগবৎ ইচ্ছাতেই হয়েছে। একটি উপমা দিচ্ছেন—বায়ু যেমন মেঘ-সমূহ কিংবা তৃণরাশিকে একত্র মিলিয়ে কিছুক্ষণ পরেই আবার তাদের পৃথক্ করে দেয়, সেইরকম ভগবানই মানুষদের এক সঙ্গে মিলিয়ে আবার তাদের পৃথক্ করে দেন। সুতরাং আমাদের মিলন এবং বিচ্ছেদের জন্য আমরা কেউই দায়ী নই।

ভাগবতে কৃষ্ণ এবং গোপীদের কথোপকথন অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। কিন্তু টীকাকারেরা তাঁদের ধ্যানলব্ধ সেই কথোপকথনের বিষয় তাঁদের টীকাতে অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণ এবং গোপীদের এই কথাবার্তা মনোমুগ্ধকরভাবে এবং ছন্দে ব্যক্ত করেছেন।

কৃষ্ণের কথা শুনে গোপীরা যেন বলছেন—আমরা জানি তুমি বাক্‌পটু ; তোমার যুক্তিও শুনলাম। মানুষের সংযোগ-বিয়োগের জন্য ভগবানকে দায়ী করেছ। কিন্তু আমরা তো জানি, তুমিই সেই ভগবান ; সুতরাং আমাদের সংযোগ-বিয়োগের জন্য তুমিই দায়ী।

কৃষ্ণ বললেন—মেনে নিলাম আমি ভগবান; ভগবান তো সম্পূর্ণ স্বাধীন; কিন্তু আমি যে তোমাদের অধীন—তোমাদের স্নেহাধীন।

> ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
> দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২০-৮২-৪৪ ॥

আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভে—মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়। আমার প্রতি তোমাদের যে ভক্তিভাব জন্মেছে তা 'মৎপ্রাপক', আমাকেই লাভ করায়। সুতরাং অতি ভাগ্যে এই ভক্তিধন তোমাদের লাভ হয়েছে।

কৃষ্ণ আরও বললেন—আমি যদি ভগবান হই, তাহলে আমার প্রতি ভক্তিই জীবের মোক্ষ লাভের হেতু ; কিন্তু আমার বিরহ-বেদনা সহ্য করে তোমরা সেই ভক্তি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছ। এই বর্ধিত ভক্তির ফলে তোমরা আমাকেই লাভ করবে; সুতরাং আমার বিরহ তোমাদের মঙ্গলই করেছে। আমাকে লাভ করবার একমাত্র উপায় যে মহাভাব, সেই মহাভাব তোমরা লাভ করেছ। এতে আমিও নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি, কারণ এই মহাভাব জগতে অতি দুর্লভ এবং তোমাদের দ্বারা এই মহাভাব জগতে প্রচারিত হবে।

তোমরা যদি যথার্থই জেনে থাক যে, আমি ভগবান, তাহলে আমার সাথে তো তোমাদের কখনই বিচ্ছেদ হতে পারে না; কারণ ভগবান হচ্ছেন সর্বময়; আমিই সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত; আমিই সকলের মধ্যে এবং বাইরে অবস্থান করি; সুতরাং আমার সাথে তো কারো কখনও বিচ্ছেদ

হতে পারে না; কিন্তু তবুও যে তোমরা আমার বিচ্ছেদে কষ্ট পাচ্ছ, তার কারণ হচ্ছে অজ্ঞান—তোমাদের স্বরূপের জ্ঞানের অভাব; সুতরাং স্বরূপের জ্ঞান হলেই তোমাদের বিরহজনিত দুঃখও দূর হবে।

কৃষ্ণ এইভাবে গোপীদের জ্ঞানের উপদেশ দিলেন, যদিও তিনি ভালভাবেই জানেন যে, এই জ্ঞানের উপদেশে গোপীদের বিচ্ছেদ-দুঃখ দূর হবে না। আগেও তিনি উদ্ধব মারফত গোপীদের জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন। জ্ঞান-লাভে মানুষের জাগতিক জিনিসের উপর আকর্ষণ নষ্ট হয়; সুতরাং জাগতিক বিষয়-জনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়; কিন্তু জ্ঞান লাভের পর যখন সে জানতে পারে যে, একমাত্র ভগবানই নিত্য-প্রিয়, তিনি আমার অন্তরে এবং বাইরে সদাই বিরাজ করছেন, তখন সর্বদা তাঁকে কাছে পাবার জন্য সে পাগলের মতো হয়ে যায়।

কৃষ্ণের কাছে জ্ঞানের উপদেশ শুনে গোপীরা বললেন—আমাদের জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া তো তোমার উচিত নয়; আমরা জ্ঞানী না যোগী, যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করে সুখ পাব? আমরা সদাসর্বদা তোমাকেই পেতে চাই পরম প্রেমাস্পদরূপে; এ ছাড়া আমাদের সুখ লাভের আর কোন বিকল্প নেই। আমরা আত্মীয়-স্বজন, দেহ-গেহ সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করেছি, একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছি। আমাদের মনকে তোমার কাছ থেকে—তোমার চিন্তা থেকে সরিয়ে বিষয়-কাজে নিয়োগ করতে চাই; কিন্তু আমাদের অবুঝ মন কিছুতেই তোমার চিন্তা ছাড়তে পারে না; এখন এর উপায় কি বল? তোমার চিন্তায় আমাদের দেহ-জ্ঞান দূর হয়েছে। যার দেহ-বোধ নেই, তার আবার সংসার কোথায়? সুতরাং সংসার-মুক্তি আমাদের কাম্য নয়; তোমাকে লাভই আমাদের সর্বরোগহর।

দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার
তাহা হইতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র জলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার॥ চৈ.চ. ২-১৩ ॥

আমরা যে তোমার বিরহ-রূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত এবং তোমাকে পাবার সুতীব্র কামনা-রূপ তিমিঙ্গিল আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। এখন

আমাদের বাঁচবার উপায় কি, তা-ই বল। তোমার ঐ জ্ঞানের উপদেশ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

গোপীরা বললেন—তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি তোমার বাল্য- লীলাভূমি ব্রজধামকে কেমন করে একেবারে ভুলে গেলে? সেই বৃন্দাবন, সেই গোবর্ধন, সেই যমুনা-পুলিন, আমাদের সেই রাসাদি লীলা, সেই ব্রজজন, সেই নন্দ-যশোদা—এ সবই কি তুমি ভুলে গেলে? তোমায় আমরা দোষ দিচ্ছি না; কারণ তোমাতে কোন দোষ থাকতে পারে না; এ সবই আমাদের দুর্দৈব !

কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জিয়াও ব্রজে আসি
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ॥ চৈ.চ. ২-১৩॥

তোমার অদর্শনে আমরা বেঁচে থাকতে চাই না; তুমি ব্রজবাসী আমাদের সবাইকে বধ কর অথবা ব্রজে এসে ব্রজবাসী সবাইকে বাঁচাও; এই দুয়ের যা হয় একটা কর; কেবল দুঃখ ভোগ করার জন্য আমাদের বাঁচিয়ে রাখছ কেন?

কৃষ্ণ বললেন—তোমরা এত উতলা হচ্ছ কেন? এই যে কুরুক্ষেত্র প্রান্তে আমার সাথে তোমাদের মিলন হলো, এতে কি তোমরা সুখী হতে পারছ না? তোমাদের বিরহ-সন্তাপ দূর হচ্ছে না?

এর উত্তরে শ্রীরাধার ভাব অবলম্বন করে রূপ গোস্বামী লিখেছেন ঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

শ্রীরাধা তার সখীকে বলছেন—হে সখি! আমরা কুরুক্ষেত্রে এসে যাঁর দেখা পেলাম, তিনিই তো আমার সেই প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ। আমিও সেই রাধা; তাঁর সাথে মিলনে আমাদের আনন্দও সেইরকমই আছে। তথাপি যমুনার তীরে, সেই বৃন্দারণ্যে বাঁশীর যে পঞ্চম সুর বেজে উঠত, তারই জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

গোপীরা বলছেন—বৃন্দাবন এবং গোপবেশ, এ ছাড়া আমাদের যে আর কিছুই ভাল লাগে না। এখানে এই বিদেশে তুমি রাজবেশে যদুকুলের আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত হয়ে আছ; এসব আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে না। ধন্য সেই মাধুর্যপূর্ণ ব্রজধাম যার বনভূমি তোমারই লীলা স্মরণ করিয়ে দেয়; সেখানে আবার তুমি আনন্দে বেণু বাজিয়ে বিহার কর, আর আমরা প্রেমময়ী গোপীরা তোমার সাথে মিলিত হই; এই আমাদের অন্তরের একমাত্র কামনা। তুমি দূরে রয়েছ এবং আমরাও ব্রজভূমি ছাড়তে পারি না; আর তোমাকে না দেখলেও আমাদের প্রাণ বাঁচে না; বল তো আমাদের উপায় কি হবে?

তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥ চৈ.চ-২-১৩॥

হে করুণাসিন্ধু, হে ব্রজজীবন! তুমি ব্রজে এসে আমাদের জীবন রক্ষা কর।

গোপীদের হৃদয়-নিংড়ানো কৃষ্ণপ্রেমের কথা শুনে কৃষ্ণ নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। ব্যাকুল হয়ে গোপীদের বললেন—হে আমার প্রাণপ্রিয় গোপীরা! তোমাদের যথার্থ-ই বলছি—তোমাদের কথা স্মরণ করে আমি রাত দিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদি। আমার কষ্ট কেউ জানতে পারে না। ব্রজবাসীরা সবাই আমার অত্যন্ত প্রিয়; তার মধ্যে আবার তোমরাই আমার জীবনের জীবন। তোমাদের অকৈতব প্রেম আমাকে বশীভূত করেছে। আমি হচ্ছি 'অজিত'— কেউ আমাকে জয় করতে পারে না; সেই আমাকে তোমরা প্রেমের দ্বারা বশ করেছ। তোমাদের ছেড়ে যে আমি দূর দেশে রয়েছি, জানবে সেটা আমার দুর্দৈব, আমার ইচ্ছাকৃত নয়। তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি নিত্য নারায়ণের পূজা করি। নারায়ণের কৃপায় আমি মনে মনে নিত্য তোমাদের কাছে যাই; সেই সময় তোমরাও মনে মনে আমার দর্শন পেয়ে আনন্দ লাভ করে থাক। এই ভাবে তোমাদের বিচ্ছেদ-জ্বালা কিছুটা প্রশমিত হয়; কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে তোমরা তা বুঝতে পার না। মনোজগতে তো আমি তোমাদের কাছেই রয়েছি; জানবে, বাস্তবেও শিগ্‌গিরই আমি তোমাদের কাছে আবার বৃন্দাবনে এসে মিলিত হব।

যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুই চারিজন, তাহা মারি বৃন্দাবন
আইলাঙ জানিহ নিশ্চয়॥ চৈ. চ-২-১৩ ॥

কৃষ্ণ বললেন—শত্রুদের বিনাশ করে শিগ্‌গিরই আমি বৃন্দাবনে গিয়ে তোমাদের সাথে আবার মিলিত হব। গোপীদের কাছে এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কি হতে পারে !

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ১০-৮২-৪৮ ॥

গোপীরা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন—হে পদ্মনাভ! অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগীরা হৃদয়ে যাঁকে ধ্যান করেন এবং সংসার-কূপে পতিত জনের পার হবার একমাত্র অবলম্বন, হে কৃষ্ণ ! তোমার সেই শ্রীচরণকমল গৃহবাসী হলেও আমাদের মনে যেন সর্বদা উদয় হয়—সর্বদা যেন তোমার শ্রীচরণে আমাদের রতি মতি থাকে।

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! গোপীদের গুরু এবং পরম-গতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মনোরথ পূর্ণ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং অপরাপর বন্ধুদের কাছে গিয়ে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শনে যাদের সমস্ত পাপ দূর হয়েছিল, সেই যুধিষ্ঠিরাদি আত্মীয়-স্বজনেরা অতি আনন্দের সাথে প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ

কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো দেহং ভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্॥
১০-৮৩-৩ ॥

হে প্রভু ! তোমার চরণকমলের মাধুর্য, যা সাধু-মহাত্মারা কীর্তন করে থাকেন, সেই চরণ-কমলের কথারূপ অমৃত যারা কর্ণপুটে বার বার পান করেন, সেই দেহধারী জীবের দেহ-জনিত অজ্ঞান পর্যন্ত দূর হয়ে যায়; সুতরাং তাদের অমঙ্গল কেমন করে হতে পারে?

যুধিষ্ঠির বলছেন—তোমার কথামৃত বড় বড় মুনিঋষিরা কীর্তন করেন এবং তোমার সেই কথা শুনে দেহধারী জীবেরা জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমার কুশল-প্রশ্ন শোনবার পর, আর কি কারও অমঙ্গল থাকতে পারে?

এইভাবে যুধিষ্ঠিরাদি বান্ধবেরা যখন কৃষ্ণস্তুতি করে তাঁর সাথে আলাপাদি করছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করবার জন্য সেখানে নারদ, ব্যাসদেব, অসিত, দেবল প্রভৃতি মুনিঋষিরা এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, আসন প্রভৃতি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। মুনিঋষিদের আগমনে সেখানে যথারীতি নানা ধর্ম-প্রসঙ্গ হবার পর ঋষিরা বসুদেবকে কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থে যজ্ঞ করবার উপদেশ দিলেন। সকল যজ্ঞের যিনি প্রাণপুরুষ, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকায় অতি সুন্দরভাবে যজ্ঞাদি সম্পন্ন হলো। যজ্ঞ-শেষে বসুদেব কুরুবংশীয় এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনদের বহুবিধ উপহার প্রদান করলেন; তারা তখন বসুদেব, কৃষ্ণ প্রভৃতির অনুমতি নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

একদিন বসুদেব নন্দরাজকে অতি বিনয়ের সাথে বললেন—হে নন্দরাজ! আপনারা সজ্জন-শ্রেষ্ঠ; তাই কোনরকম প্রতিদানের আশা না করেই বিপদের সময় আপনারা আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমরা অকৃতজ্ঞ; আপনাদের সেই উপকারের কথা আমরা আর চিন্তাও করি না। আমরা যখন কংসের অধীন ছিলাম, তখন না হয় আপনাদের কোন উপকার করতে পারি নি; কিন্তু এখন তো কংসের অত্যাচার নেই; আমরাও স্বাধীন; তবুও আমরা আপনাদের কোন উপকার করি না। এর কারণ হলো এই যে, আমরা ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে আছি। এইসব কথা বলতে বলতে বসুদেবের পূর্ব স্মৃতিসকল জেগে উঠল এবং তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে নন্দরাজের দুই হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন।

বসুদেবের একান্ত আগ্রহে যাদবদের ঐকান্তিক ভালবাসায় এবং কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি স্নেহের আতিশয্যে নন্দ মহারাজও তাঁদের ছেড়ে যেতে পারছিলেন না। এইভাবে যদুবংশীয়দের দ্বারা বহুমানিত হয়ে নন্দরাজ এবং ব্রজবাসীরা তিন মাস অতি আনন্দে কুরুক্ষেত্র-তীর্থে অবস্থান করলেন।

অবশেষে বিদায়ের দিনে বসুদেব, উগ্রসেন, কৃষ্ণ, বলরাম, উদ্ধব এবং অপরাপর যাদবদের কাছ থেকে সকলে বহুবিধ প্রীতি-উপহার গ্রহণ করে নন্দরাজ ব্রজবাসীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্র থেকে রওনা হলেন।

এখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর টীকাতে লিখেছেন—নন্দবাবা এবং গোপ-গোপীদের কৃষ্ণকে ছেড়ে যেতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ নিজেই নন্দবাবাকে সম্বোধন করে বললেন—হে পিতঃ! আমি যদি এখন এদের ছেড়ে তোমাদের কাছে ব্রজে চলে যাই, তাহলে আমার বিচ্ছেদে এদের মরণ-দশা উপস্থিত হবে এবং মহাশক্তিশালী শত্রুরা এসে এদের সকলকে বিনাশ করবে। সুতরাং তোমরা আর দুঃখ করো না। এর পর যা যা ঘটবে, তা সবই আমি জানি। তোমাদের বলছি—এখান থেকে আমি দ্বারকায় যাব; সেখান থেকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে শিশুপালকে বধ করব। পরে শল্ব ও দন্তবক্রকে বধ করে ব্রজে গিয়ে তোমাদের সাথে আনন্দে বিহার করব। এই হচ্ছে আমার বিধিলিপি; তোমাদের কপালেও লেখা রয়েছে যে, তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত আমার বিরহ-দুঃখ ভোগ করবে। বিধি-লিপি তো কেউ খণ্ডন করতে পারে না; সুতরাং তোমরা এখন সমাহিত চিত্তে ব্রজে ফিরে যাও।

নন্দো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে।
মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তুমনীশা মথুরাং যযুঃ ॥ ১০-৮৪-৬৯ ॥

নন্দরাজ এবং গোপ-গোপীদের মন কৃষ্ণেই সমর্পিত হয়েছিল। যাবার সময় তাঁরা নিজেদের মনকে কৃষ্ণচরণ থেকে ফিরিয়ে নিতে না পেরে শূন্য মনে দেহমাত্র নিয়েই মথুরায় ফিরে গেলেন।

বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
বীক্ষ্য প্রাবৃষমাসন্নাং যযুর্দ্বারবতীং পুনঃ ॥ ১০-৮৪-৭০ ॥

নন্দরাজ এবং অপর সব বান্ধবেরা চলে গেলে শ্রীকৃষ্ণই যাদের পরম দেবতা সেই যাদবেরা বর্ষাকাল সমাগত দেখে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

৩৩
নবযোগীন্দ্র-নিমি সংলাপ

কোন এক সময় দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় বসুদেবের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নারদকে দেখে বসুদেব নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করে, নারদের যথাবিধি অভ্যর্থনাদি করে বললেন—হে দেবর্ষি নারদ! আপনার পুণ্যদর্শন লাভ করে আমি কৃতকৃতার্থ হয়েছি; কিন্তু যারা আপনাকে দর্শন করে নি, তারাও যাতে আপনার কথা শুনে কৃতকৃতার্থ হতে পারে সেইজন্য আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি ঃ

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ॥ ১১-২-৭॥

বসুদেব জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রহ্মন্! শ্রদ্ধার সাথে যে-কথা শ্রবণ করলে মানুষ সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হয় সেই ভাগবতধর্ম আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছা করি।

আপনি হয়ত বলবেন যে, আমি তো কৃতকৃতার্থ হয়েই রয়েছি; কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার এই কথা যথার্থ; তবুও বলছি আমি শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে পাবার জন্যই তপস্যা করেছিলাম; মুক্তিলাভের জন্য তাঁর উপাসনা করিনি। এখন যাতে আমার সংসার-ভয় দূর হয় আপনি আমায় সেইরকম উপদেশ প্রদান করুন। বসুদেবের প্রশ্ন শুনে মহামুনি নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥ ১১-২-১৩ ॥

হে বসুদেব! আজ তুমি আমার বড় উপকার করলে। যাঁর নাম-শ্রবণ এবং কীর্তনে মানুষ পবিত্র হয়, আজ তুমি আমায় সেই পরমকল্যাণকারী ভগবান নারায়ণকে মনে করিয়ে দিয়েছ। ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুমি

করেছ, তা তোমার পক্ষেই উপযুক্ত; কারণ তোমার বুদ্ধি সম্যক্‌রূপে শ্রীভগবানে স্থির হয়েছে। তোমার এই ভাগবতধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন যে কত মহান, তা বোঝাবার জন্য বলছি যে, এইরকম প্রশ্ন মহাত্মা নিমিও তাঁর যজ্ঞে সমাগত নয়জন মুনিকে করেছিলেন। ঐরকম মহাযজ্ঞে জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের কাছে তো কেউ সাধারণ প্রশ্ন করে না; সকল জীবের পক্ষে যা চির-মঙ্গলপ্রদ, এমন প্রশ্নই করে থাকে। তাই বলছি তোমার এই প্রশ্ন তোমার মতো মহামানবের পক্ষেই সম্ভব। যে প্রশ্নের উত্তর পূর্বে অতি সুন্দরভাবে তত্ত্বদর্শী মুনিরা দিয়েছিলেন, সেই কথাই আমি এখন তোমায় বলব।

যে নয়জন মুনির কথা বললাম, তাঁরা সকলেই পরমার্থ বিষয়ে পারঙ্গম, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং পাঁচ বছরের শিশুর মতো দিগম্বর হয়ে লোকের কল্যাণের জন্য যদৃচ্ছা ভ্রমণ করে থাকেন। কোন এক সময় এই নয়জন মুনি ভ্রমণ করতে করতে নিমি রাজার বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সূর্যের মতো প্রভাবশালী মহাভাগবত মুনিদের দেখে রাজা নিমি এবং উপস্থিত পুরোহিতেরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনাদি করে বললেন ঃ

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি ॥ ১১-২-২৮॥

নিমি বললেন—আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, আপনারা সাক্ষাৎ মধুরিপু ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদ; কারণ বিষ্ণুভক্তেরা জগৎবাসীর উদ্ধারের জন্যই সর্বত্র বিচরণ করে থাকেন।

আপনাদের দর্শনেই মানুষের মুক্তি হয়; শুধু তাই নয়, মুক্তির চেয়েও বড় যে ভগবৎ-ভক্তি, তাও আপনাদের দর্শনে মানুষ লাভ করে থাকে। আপনারা আপ্তকাম, আপনাদের চাইবার কিছু নেই; আপনারা সর্বদা নিজের আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। সুতরাং পৃথিবী পর্যটনে আপনাদের কোন প্রয়োজন না থাকলেও, আপনাদের দর্শনে এবং উপদেশ শ্রবণে মানুষের পরম কল্যাণ সাধিত হবে—তারই জন্য আপনারা যথেচ্ছ ভ্রমণ করে থাকেন। এই মনুষ্য-দেহ দুর্লভ হলেও ক্ষণভঙ্গুর; তার উপর বিষ্ণু-ভক্তের দর্শন অতি দুর্লভ। আমাদের ভাগ্যে আজ সেই সুদুর্লভ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। জানি না, আমাদের

কৃপা করার জন্য আপনারা কতক্ষণ এখানে থাকবেন; সুতরাং সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আপনাদের কুশল প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করতে চাই না; কারণ আপনারা সদানন্দময়; আপনাদের কোনরকম অমঙ্গল হতেই পারে না। তাই জীবের সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ, ভাগবতধর্ম বিষয়ে আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাদের কাছে পেয়ে আমাদের আর তর সইছে না।

ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥ ১১-২-৩১ ॥

রাজা নিমি বললেন—আমাদের যদি শ্রবণের উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে যে ধর্মে প্রসন্ন হলে ভগবান ভক্তদের নিজেকে পর্যন্ত দান করেন, সেই ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে আমাদের বলুন।

নিমি মুনিদের প্রশ্ন করেছিলেন—ভাগবতধর্ম কি, ভগবৎভক্ত কেমন এবং তাদের আচরণই বা কিরূপ, ভগবানের মায়া কি, ঐ মায়া কিরূপে অতিক্রম করা যায়, অবতার লীলা কি, যুগধর্ম কাকে বলে ইত্যাদি।

নিমির প্রশ্ন শুনে মুনিরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে একে একে বলতে লাগলেন। প্রথম মুনি, যার নাম কবি, তিনি মানুষের আত্যন্তিক মঙ্গল কি ভাবে হবে, তাই বললেন ঃ

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ ॥
১১-২-৩৩ ॥

কবি বললেন—এই সংসারে ভগবান অচ্যুতের পাদপদ্মের উপাসনার দ্বারা অকুতোভয়, সম্পূর্ণ নির্ভীক হওয়া যায়। দেহকেই যারা আত্মা বলে মনে করে, এমন চঞ্চলমতি লোকের পক্ষেও ভগবৎ উপাসনাই সর্বভয় নিরসনকারী বলে আমি মনে করি।

প্রথম মুনি প্রথমেই শ্রীভগবানের উপাসনার কথা বললেন। এই ভগবৎ উপাসনার দ্বারাই মানুষ সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে। ভয় হচ্ছে মনের ধর্ম; সুতরাং মনোনাশ হলেই ভয়শূন্য হতে পারে। জগতে দেখতে পাই যে, সব কিছুর সঙ্গেই ভয় জড়িত হয়ে আছে; এমন কাউকে দেখি না যে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য। বৈরাগ্য শতকে রয়েছে ঃ

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাৎ ভয়ম্।
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্ ॥
বৈরাগ্যশতকম্ ৩১ ॥

ভোগী ব্যক্তির রোগ থেকে ভয়, এই বুঝি অসুখ হলো; কুলাভিমানীর কুল-নষ্টের ভয়; ধনী ব্যক্তির রাজার কাছ থেকে ভয়, এই বুঝি রাজা তার ধনরত্ন কেড়ে নিল; মানী ব্যক্তির অপমানের ভয়; বলশালীর কাম-ক্রোধাদির ভয়; সুন্দরী স্ত্রীলোকের বার্ধক্যাবস্থা থেকে ভয়।

শাস্ত্রাভিমানীর অপর পণ্ডিত থেকে ভয়; গুণী ব্যক্তির নিন্দুকের থেকে ভয়; আর শরীরের ভয় হচ্ছে মৃত্যু থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জগতে সবাই কোন না কোন ভয়ে ভীত; একমাত্র বৈরাগ্যবান পুরুষই অভয় পদবাচ্য—তার কিছু হারাবার ভয় নেই।

বৈরাগ্য কাকে বলে? বৈরাগ্য হচ্ছে বিষয়ের প্রতি বিরাগ; এবং ভগবানের প্রতি অনুরাগ। ভগবানের প্রতি অনুরাগ হলেই মানুষ শুদ্ধাভক্তি লাভ করে যথার্থ অভী হতে পারে, আর এই অনুরাগ আসে ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ভগবানের উপাসনার দ্বারাই মনুষ্য-জীবনের চরম অবস্থা লাভ করা যায়। তাই মুনিরা প্রথমেই শ্রীভগবানের চরণোপাসনার কথাই বললেন—এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভাগবতধর্ম।

জগতে আমরা যে-কোন কাজই করি না কেন, সবের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ থেকেই যায়। ধর্মাদির অনুষ্ঠানেও কিছু বৈগুণ্য থাকে; সুতরাং দোষযুক্ত ধর্মানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ কেমন করে সম্ভব হতে পারে? মানুষ নিজের দেহ, স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়িতে আসক্ত হয়ে এইগুলিকেই নিজের বলে মনে করে; ফলে এই সবই একদিন ছেড়ে যেতে হবে ভেবে মৃত্যু চিন্তায় সে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। একমাত্র ভাগবতধর্মের আচরণে, ভগবৎ উপাসনায় মানুষের দেহ-গেহাদির প্রতি আসক্তি দূর হয় এবং তখন সে সর্বভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ভগবান বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সময়ে আত্মজ্ঞান লাভের যেসব উপায় বলেছেন, সেই সবকে ভাগবতধর্ম বলে জানবে।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥
১১-২-৩৬॥

স্বভাবের বশে শরীর দ্বারা যা করবে, বাক্যদ্বারা যা কিছু বলবে, মন দিয়ে যা কিছু চিন্তা করবে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু কাজ করবে, বুদ্ধির দ্বারা যা কিছু নিশ্চয় করবে—সেই সবই ভগবান নারায়ণে সমর্পণ করবে। ভগবানে সর্ব-সমর্পণই ভাগবতধর্ম বলে জানবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ গীতা ৯-২৭ ॥

যা কিছু কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর, যা তপস্যা কর—সব কিছুই আমাকে সমর্পণ করবে।

প্রশ্ন ছিল, ভাগবতধর্ম কি? উত্তরে বলা হলো আমরা যা কিছুই করি না কেন, সে সবই যদি শ্রীভগবানে অর্পণ করা যায় তা হলে সেই সমস্ত কর্মকেই ভাগবতধর্ম বলে।

ভগবানে সর্ব-সমর্পণ রূপ যে আরাধনা, সেই ভগবৎ আরাধনার দ্বারা মানুষ মৃত্যুভয়কে পর্যন্ত অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা যাকে ভয় বলি তা তো অজ্ঞান-কল্পিত ; স্বরূপের জ্ঞান নেই বলেই দ্বৈতভাবের জন্য ভয়ের উৎপত্তি হয়; সুতরাং স্বরূপের জ্ঞান হলেই সমস্ত ভয়ও দূর হবে; সুতরাং অভী হবার জন্য জ্ঞানের সাধনই প্রয়োজন; ভগবৎ-ভজনের সার্থকতা কোথায়?

উত্তরে বলা হয়েছে যে ভগবৎবিমুখ ব্যক্তি মায়ার বশে স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে এই দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। ভগবানের মায়ার দ্বারাই দেহাত্মবুদ্ধি জন্মে এবং 'আমিই এই শরীর', এইরকম ভাবনা থেকেই ভয়ের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ভক্তির দ্বারা, ভগবানের সেবার দ্বারা এই মায়া তিরোহিত হলেই মানুষ দেহাত্মবুদ্ধি বিরহিত হয়ে অভয়পদ প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কিরূপ সেবার দ্বারা মানুষ এই মায়াকে অতিক্রম করে দেহাত্মবুদ্ধি ঝেড়ে ফেলে অভী হতে পারে? মুনি বলছেন ঃ

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥

 ১১-২-৩৯॥

চক্রপাণি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মঙ্গলময় জন্মবৃত্তান্ত এবং তাঁর অলৌকিক কার্যসমূহ—যা লোকে কীর্তন করে থাকে, সেইসব শ্রবণ এবং কীর্তন করলে 'লোকে কি ভাববে' এইরকম চিন্তা না করে নিষ্কাম ভক্ত লজ্জাশূন্য হয়ে শ্রীভগবানের নাম ও লীলাকীর্তন করতে করতে জগতে বিচরণ করবে।

একদিন কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে খুব ভজন হচ্ছে; সকলে মাস্টারমশায়কে গান গাইতে অনুরোধ করলেন; মাস্টারমশায় একটু লাজুক বলে গান গাইলেন না। এতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন—ও স্কুলে দাঁত বার করবে; গান গাইতেই যত লজ্জা! অর্থাৎ ভগবানের নামে লজ্জা ত্যাগ করে উচ্চৈঃস্বরে ভজন-কীর্তন করবে।

এইভাবে ভগবানের নাম কীর্তন করতে করতে ভক্তের হৃদয়ে যখন প্রেমাভক্তি শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়, তখন সে জাগতিক বিষয়ের বাইরে চলে যায়।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
১১-২-৪০॥

প্রিয়তম শ্রীহরির নাম কীর্তনে হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হলে ভক্তের চিত্ত আনন্দে দ্রবীভূত হয়; তখন সে উন্মাদের মতো বিবশ হয়ে কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও উচ্চশব্দ করে গান করে এবং কখনও বা নৃত্য করতে থাকে। ভক্ত তখন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতি, বৃক্ষ, সরোবর, সমুদ্র প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই শ্রীভগবানের শরীর মনে করে, তাদের প্রণাম করতে থাকে। এই হচ্ছে যথার্থ শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ।

প্রশ্ন হতে পারে, ভগবানের নামে এই যে বাহ্যশূন্যতা, কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও কীর্তন এবং সকলের মধ্যে ইষ্ট দর্শন—এ তো শেষের কথা; এক জন্মে কি এইরকম ভগবৎ-প্রেম হতে পারে? উত্তরে বলা হয়েছে ঃ

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥
১১-২-৪২ ॥

খাবার সময় যেমন প্রতি গ্রাসেই শরীরের তুষ্টি, পুষ্টি এবং ক্ষুধার নিবৃত্তি সাধিত হতে থাকে, সেইরকম ভগবৎ-ভজনে একই সঙ্গে ভক্তি, ঈশ্বরানুভব এবং সংসারের প্রতি বিরক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একটু পার্থক্য আছে; পেট ভরে গেলে আর খাবার ইচ্ছা থাকে না; এমন কি আর খেতেও পারে না; কিন্তু ভগবৎ-ভজনকারী কখনও ভজনে নিবৃত্ত হয় না; বরং তার ভজন-সামর্থ্য ক্রমে ক্রমে বাড়তেই থাকে এবং শেষে সে কেবল ভজন নিয়েই বিভোর থাকে ; এতেই সে পরম আনন্দ পরম শান্তি অনুভব করে।

রাজা নিমি মুনিদের বললেন—এইবার আপনারা আমাদের ভগবৎ-ভক্তের লক্ষণ বলুন; তারা কোন্ আচরণের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রিয় হন, সে কথাও বলুন। রাজার প্রশ্ন শুনে অপর একজন মুনি যার নাম হরি, তিনি বললেন ঃ

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১-২-৪৫ ॥

সর্বভূতে যিনি ভগবদ্ভাব অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করেন এবং পরমাত্মা ভগবানে অধিষ্ঠিত সর্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি উত্তম ভক্ত। সকলের মধ্যেই তিনি ভগবানকে দর্শন করেন এবং ভগবানের মধ্যেই সকলকে দর্শন করেন। গীতাতেও এই কথাই রয়েছে ঃ

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ গীতা ৬-২৯ ॥

যিনি সর্বভূতে নিজের আত্মাকে এবং নিজের আত্মাকে সর্বভূতে দর্শন করেন, তিনিই সমাহিতচিত্ত পুরুষ।

এইরকম যে উত্তম ভক্ত তার আপন-পর বোধ থাকে না, সকলের প্রতিই তার সমান ভাব, তিনি ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পেলেও বিচলিত হন না এবং শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম থেকে ক্ষণকালের জন্যও তার মন বিচ্যুত হয় না।

উত্তম ভক্তের কথা বলা হলো; ভগবদ্ভক্তের লক্ষণের সার কথা এই বার বলছেন ঃ

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্‌ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

১১-২-৫৫ ॥

যাঁর নাম অবশে উচ্চারণ করলেও সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হয় সেই ভগবান শ্রীহরি যার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, যে ভক্তের প্রণয়-রজ্জুতে বদ্ধপদ হয়ে হৃদয়ে সদা অবস্থান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত বলে অভিহিত হন।

উত্তম ভক্তের কথা বলা হলো। এইবার মধ্যম ও অধম ভক্তের লক্ষণ বলা হচ্ছে।

যিনি ঈশ্বরে প্রেমভাব পোষণ করেন, ভক্তের সাথে মিত্রতা করেন, মূর্খের প্রতি কৃপা করেন এবং ভগবৎ-বিমুখের প্রতি উপেক্ষা করেন—তিনিই মধ্যম থাকের ভক্ত; কারণ তার মধ্যে ভেদ-দৃষ্টি থাকে, তিনি সর্বত্র ভগবৎ দর্শন করেন না।

মনে রাখতে হবে, এইটি সাধারণ নিয়ম; কিন্তু নারদাদি ভাগবতোত্তমেরা জগতের কল্যাণের জন্য ভগবৎ-ভাব প্রচার করে থাকেন; সুতরাং প্রচারের জন্য তাদের ভেদ-দৃষ্টি রাখতেই হয়। অতএব উত্তম ভক্ত হলেও ঈশ্বরপ্রেম, ভক্তে মিত্রতা, মূর্খে কৃপা এবং হরি-বিমুখে অবজ্ঞা—এই চারটি গুণ তাদের মধ্যেও দেখা যায়।

এইবার অধম ভক্তের কথা বলছেন ঃ

যিনি শ্রদ্ধার সাথে প্রতিমাদিতে ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু ভক্ত অথবা অপর কারও পূজা করেন না, তিনি অধম ভক্ত। এই অধম ভক্ত যদি দীর্ঘকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিমাদিতে ভগবানের আরাধনা করেন, তবে তিনিও ক্রমে ক্রমে ভক্তিভাবের উচ্চতর সোপানে উন্নীত হতে পারবেন।

রাজা নিমি বললেন—আমরা যে বার বার আপনাদের প্রশ্ন করছি, তার কারণ হলো এই যে, আমরা সংসার-তাপে অত্যন্ত ক্লিষ্ট; এই তাপক্লিষ্ট জনের মহৌষধ, হরিকথামৃত আপনাদের মুখ থেকে শুনেও আমরা তৃপ্ত হতে পারছি না; তাই হরিকথা বিশদভাবে শোনবার জন্য আপনাদের বার বার প্রশ্ন করছি।

হে ঋষিগণ! ভগবান বিষ্ণু যে মায়ার দ্বারা জীবগণকে মোহিত করেন, এখন আপনারা সেই মায়ার বিষয় আমাদের বলুন।

মুনিদের মধ্যে অন্তরিক্ষ বললেন—সর্বভূতাত্মা ভগবান যে শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে জীবদের দিয়ে বিষয় ভোগ করান এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন, ভগবানের সেই শক্তিকেই মায়া বলে। মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। ভগবান পঞ্চ মহাভূত দ্বারা জীবদেহ সৃষ্টি করে অন্তর্যামিরূপে তাতেই প্রবেশ করেন। ফলে জীবেরা বিষয় ভোগে সমর্থ হয়ে বিষয় ভোগ করে থাকে। ভগবান অন্তর্যামিরূপে জীবদেহে রয়েছেন বলেই যে জীবেরা বিষয় ভোগের শক্তি লাভ করে, একথা ভুলে গিয়ে জীবেরা এই রক্ত-মাংসের শরীরকেই ভোক্তা, কর্তা, আত্মা বলে মনে করে শরীরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে ; শরীরের প্রতি এই আসক্তির জন্য জীবেরা সুখ-দুঃখাত্মক কর্ম করে এবং সেই কর্মফল ভোগ করতে করতে এই সংসারে বার বার যাতায়াত করতে থাকে—এই হচ্ছে মায়া।

রাজা নিমি বললেন—হে মহর্ষিগণ! অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এই ভাগবতী-মায়া পার হওয়া দুষ্কর; কিন্তু ইন্দ্রিয় যাদের বশে নেই, এইরকম স্থূল-বুদ্ধি লোকের সংখ্যাই তো বেশি; সুতরাং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এই মায়া কিভাবে অনায়াসে পার হওয়া সম্ভব—সেই কথা আমাদের বলুন।

এবার যোগীন্দ্র প্রবুদ্ধ বললেন—আমরা দেখতে পাই যে, কর্মের দ্বারা মায়ার নিরসন হয় না। মানুষ কর্মের দ্বারা ধন উপার্জন, গৃহনির্মাণ, স্বজন-পালন ইত্যাদি করে থাকে ; কিন্তু এ সবই ক্ষয়শীল; সুতরাং এ সবের দ্বারা চির আনন্দ লাভ করা যায় না। বিষয়ীরা সুখের আশায় কর্ম করে কিন্তু পরিণামে দুঃখই পেয়ে থাকে।

ভক্তিই সংসার থেকে মুক্ত হবার—মায়ার পারে যাবার একমাত্র উপায়। যে নিজে মায়ামুক্ত হয় নি, সে কখনও অপরকে মায়ামুক্ত করতে পারে না। সুতরাং যে মায়া থেকে মুক্ত হতে চায় সে সদ্‌গুরুর নিকট অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছ থেকে ভক্তির উপদেশ, ভাগবতধর্ম সাধনের উপদেশ লাভ করবে।

ভাগবতধর্ম সাধনের উপায় কি? বলছেন—গুরুকে আত্মা এবং দেবতা

বলে মনে করে নিষ্কাম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, আত্মজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীহরি যাতে পরিতুষ্ট হন, সেই ভাগবতধর্ম শিক্ষা করবে।

প্রথমেই মনকে সর্ব বিষয় থেকে আসক্তিশূন্য করে, সাধুদের অর্থাৎ ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ করবে। নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি দয়া, সমপর্যায়ের ব্যক্তির সাথে মিত্রতা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি নম্রভাব প্রকাশ করবে। মন থেকে অহংভাব, দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি দূর হলে তবেই অপরের প্রতি দয়া, মিত্রতা, নম্রভাব প্রকাশ পাবে।

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥ ১১-৩-২৪ ॥

বাহ্য এবং আন্তর শুচি, তপস্যা, তিতিক্ষা, বৃথা বাক্যালাপ না করা, শাস্ত্রপাঠ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা এবং সুখে দুঃখে সমভাব অভ্যাস করবে। সর্বদা ইষ্টদেবতার দর্শনের জন্য মনকে উন্মুখ করে রাখবে; তার জন্য মনকে বাইরের বিষয় থেকে গুটিয়ে এনে ইষ্টের চিন্তায় সদা যত্নপর হতে হবে। সুতরাং নির্জনবাস, বৃথা কথা না বলা, অনায়াসলব্ধ আহারে শরীর ধারণ ইত্যাদির দ্বারা মনকে বশে রাখতে চেষ্টা করবে। মন যদি বাইরের জিনিসের প্রতি আসক্ত থাকে, তবে ভগবানে মনঃসংযোগ সম্ভব হয় না। তাই সর্বদা মনকে ভগবন্মুখী করতে হবে। তার উপায় বলা হচ্ছেঃ

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
জন্মকর্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥ ১১-৩-২৭ ॥

অসাধারণ কর্মকারী শ্রীহরির জন্ম, কর্ম এবং গুণাবলীর শ্রবণ, কীর্তন এবং ধ্যান করে তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করবে।

সর্বপাপ-বিমোচক শ্রীহরির কথা নিজে স্মরণ করে এবং অপরকে স্মরণ করিয়ে ভগবানে ভক্তিলাভ করবে এবং অপার আনন্দে পুলকিত শরীর ধারণ করবে।

হে রাজন্ ! এই ভাগবতধর্মের শিক্ষা এবং সাধন করতে করতে সাধক প্রেমানন্দ লাভ করে এই দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করে থাকে।

মুনিদের কাছে ভক্তি এবং তার সাধনের কথা শুনে রাজা নিমি বললেন—আমরা জানি, যিনিই নারায়ণ, তিনিই পরমাত্মা এবং তিনিই পরব্রহ্ম। আপনাদের কাছ থেকে আমরা পরব্রহ্মের স্বরূপের কথা জানতে ইচ্ছা করি।

মুনি পিপ্পলায়ন বললেন—যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং নিজে কারণরহিত, তিনিই নারায়ণ নামক পরমতত্ত্ব; তিনিই আবার স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি এবং সমাধি অবস্থায় সৎ রূপে বিদ্যমান থাকেন এবং দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ তাঁরই দ্বারা সঞ্জীবিত থেকে স্ব স্ব কাজ করে যাচ্ছে; সেই তাঁকেই পরমাত্মা—পরমতত্ত্ব—নারায়ণ বলে জানবে।

মুক্তিকামী ব্যক্তি ভগবানে প্রগাঢ় ভক্তির দ্বারা অহং রূপ মনের ময়লা দূর করতে সমর্থ হয়; তখন সেই বিশুদ্ধ চিত্তে পরমাত্মার প্রকাশ, আত্মতত্ত্বের অনুভব হয়।

রাজা নিমি আবার প্রশ্ন করলেন—যে কর্মযোগের দ্বারা মানুষ বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে শিগ্‌গিরই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং নৈষ্কর্ম্য লাভ করে, সেই কর্মযোগের কথা আমাদের বলুন। ভক্তি এবং জ্ঞানের দ্বারা নিষ্কাম হওয়া যায়; কিন্তু কর্মের দ্বারা কিভাবে নৈষ্কর্ম্য লাভ হতে পারে, তা জানার জন্যই রাজা নিমির এই প্রশ্ন।

উত্তরে মুনি আবির্হোত্র বললেন ঃ

বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ১১-৩-৪৬ ॥

যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য হয়ে বেদোক্ত কর্মই করে এবং তার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে, সে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়। বেদে যে ফলশ্রুতি রয়েছে, যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে স্বর্গলাভ হয় ইত্যাদি, তা কেবল ভোগের লোভ দেখিয়ে মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করাবার জন্য। ক্রমে স্বর্গাদি ভোগে নিস্পৃহ হয়ে মানুষ ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে কর্ম করতে করতে, কর্মজনিত সুখ-দুঃখ অতিক্রম করে নৈষ্কর্ম্য লাভ করে এবং ভগবৎ-বিষয়ক জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়।

রাজা নিমি প্রশ্ন করলেন—ভগবান শ্রীহরি স্বেচ্ছায় দেহধারণ করে পৃথিবীতে যেসব কর্ম করেছেন, তা আমাদের বলুন; অর্থাৎ অবতার লীলার কথা কীর্তন করুন।

রাজার কথা শুনে মুনি দ্রুমিল বললেন—অসীম ভগবানের অনন্ত গুণের ইয়ত্তা করা যায় না; কেউ যদি পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণা গণনা করতে সক্ষমও হয় তবুও সর্বশক্তির আধার শ্রীভগবানের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আদিদেব নারায়ণ যখন আত্মসৃষ্ট পঞ্চমহাভূতের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করে, অংশ রূপে তাতেই প্রবেশ করেন তখন সেই আদিদেব নারায়ণ পুরুষ আখ্যা লাভ করেন। তখন তিনি পুরুষাবতার রূপে খ্যাত হন।

ভগবান বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য নিজেই অংশরূপে দত্তাত্রেয়, সনৎকুমার, আমাদের (অর্থাৎ নব মুনির) পিতা ঋষভ ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং মধু নামক দৈত্যকে বধ করে বেদ উদ্ধার করেছিলেন; তখন তাঁকে অংশাবতার বলা হয়।

তিনিই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারে পৃথিবী এবং সজ্জনদের রক্ষা করেছিলেন।

ভগবান স্বয়ং জন্মরহিত হয়েও, ধরার ভার দূর করার জন্য যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে দেবতাদেরও অসাধ্য কর্ম করেছেন। জগৎপতি বিষ্ণুর এই রকম অসংখ্য জন্ম এবং কর্মের কথা বলা হয়েছে।

রাজা নিমি এবার প্রশ্ন করলেন—যারা ভগবান শ্রীহরির ভজনা করে না, সেইরকম অস্থিরচিত্ত, অপূর্ণকাম ব্যক্তির গতি কি হবে?

মুনি চমস বললেন—যারা খল স্বভাবের, তারা ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, আভিজাত্য, বিদ্যা, দান, রূপ, বল এবং কর্মে আবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত গর্বিত হয় এবং ভগবান শ্রীহরি এবং হরি-প্রিয় সাধুদের অবজ্ঞা ও অপমান করে থাকে।

যারা অপরকে দ্বেষ করে, তারা সর্বদেহে অবস্থানকারী আত্মরূপী ভগবান শ্রীহরিকেই দ্বেষ করে; তারা নিজের দেহ এবং স্ত্রী পুত্রে আসক্ত হয়ে অধঃপতিত হয়।

ভগবান বাসুদেবে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের কষ্টোপার্জিত গৃহ, পুত্র, সুহৃদ এবং সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করে জন্মমৃত্যুর প্রবাহে বার বার ভ্রমণ করে কষ্ট পেতে থাকে।

বিদেহরাজ নিমি আবার প্রশ্ন করলেন—হে মুনিগণ! শ্রীভগবান কোন্ যুগে কি বর্ণ এবং কিরূপ আকার ধারণ করেন? ভক্তরাই বা তাঁকে কি নামে কোন্ বিধানে পূজা করে থাকে?

ঋষি করভাজন বললেন—হে মহারাজ! ভগবান শ্রীহরি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চার যুগে নানা বর্ণ, নানা নাম এবং নানা ভাবে পূজিত হন।

সত্য যুগে শ্রীভগবান শুক্লবর্ণ, চতুর্বাহু মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়ে হংস, সুপর্ণ, যোগেশ্বর, পরমাত্মা ইত্যাদি নামে কীর্তিত হন। তখন মানুষেরা শান্ত, নির্বৈর, সমদর্শী হয়ে শম, দমাদি সাধনের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন।

ত্রেতাযুগে শ্রীভগবান রক্তবর্ণ, চতুর্বাহু; স্রুক্, স্রুব ইত্যাদি যজ্ঞ-পাত্রধারী রূপে অবতীর্ণ হয়ে বিষ্ণু, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম প্রভৃতি নামে পূজিত হন। সেই সময় ধর্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী লোকেরা বেদোক্ত বিধানে তাঁর পূজা করেন।

দ্বাপরে শ্রীভগবান শ্যামবর্ণ, পীতবসন পরিহিত, চক্রাদি আয়ুধধারী, শ্রীবৎসচিহ্ন যুক্ত এবং কৌস্তুভ মণি ভূষিত হয়ে অবতীর্ণ হন। তিনি তখন বেদ ও তন্ত্রোক্ত বিধানে পূজিত হন।

কলিযুগে শ্রীভগবান কৃষ্ণ এবং ইন্দ্রনীল-জ্যোতিবিশিষ্ট; বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সংকীর্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন। কলি-মানবের পক্ষে কৃষ্ণ এবং রামের ধ্যান ও স্তুতি বিশেষ ফলদায়ী। এখানে দুইটি শ্লোকে কৃষ্ণ ও রামের স্তুতি করা হয়েছে।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ১১-৫-৩৩ ॥

হে প্রণতজন-পালক! সর্বদা ধ্যানের যোগ্য এবং ইন্দ্রিয়াদির নির্জিতকারী, অভীষ্টপ্রদ, গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়, শিব এবং ব্রহ্মার দ্বারা স্তুত, শরণাগত ভৃত্যের দুঃখনাশক এবং ভবসমুদ্রের তরণীস্বরূপ হে মহাপুরুষ! আপনার পাদপদ্মের আমরা বন্দনা করি।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ১১-৫-৩৪ ॥

হে ধর্মনিষ্ঠ! আপনি রাম অবতারে পিতার আদেশে দেবতাদেরও বাঞ্ছিত, সুতরাং অপরের পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব, এমন রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করে বনগমন করেছিলেন এবং সেখানে প্রিয়তমা পত্নী সীতার অভিলষিত মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; হে মহাপুরুষ! আমরা আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করি।

ঋষি বললেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ নিমি! এইভাবে বিভিন্ন যুগে মানুষেরা বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্নরূপে ভগবান শ্রীহরির পূজা করে থাকেন। ঋষি শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করে এইভাবে তার বক্তব্য শেষ করলেন ঃ

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎ-পতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥
১১-৫-৪২ ॥

পরমেশ্বর শ্রীহরির পদসেবনকারী, অন্যভাবরহিত প্রিয়ভক্তের যদি কখনও প্রমাদবশত বিহিত কর্মত্যাগের অপরাধ হয়, তাহলে ভক্তের হৃদয়স্থিত শ্রীভগবান তা ক্ষমা করেন।

রাজা নিমি এবং নবযোগীন্দ্রের কথোপকথন এইখানে শেষ হলো।

নারদ তখন বসুদেবকে বললেন—হে বসুদেব! নবঋষির কাছ থেকে এই ভাগবতধর্ম শ্রবণ করে, রাজা নিমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁদের পূজা করলেন। ঋষিরা চলে গেলে রাজা নিমি এই ভাগবতধর্মের অনুষ্ঠান করে পরমগতি লাভ করেছিলেন।

নারদ আরও বললেন—হে বসুদেব! তুমিও সঙ্গ-রহিত হয়ে শ্রদ্ধার সাথে এই ভাগবতধর্মের আচরণ করলে পরমপদ লাভ করতে পারবে। ভগবান শ্রীহরি তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন; এতেই তোমাদের যশে জগৎ পূর্ণ হয়েছে। ভগবান শ্রীহরির প্রতি তোমাদের বাৎসল্য-

স্নেহ; তাতেই তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়েছে। শিশুপাল প্রভৃতি রাজারাই যখন শত্রুভাবে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন, তখন তোমাদের মতো অনুরক্ত ভক্তের কথা আর কি বলব!

মায়ার জন্যই মানুষ শ্রীভগবানের স্বরূপ জানতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরব্রহ্ম, অব্যয়, সর্বাত্মা, ঈশ্বর; তিনি কখনো কারও পুত্র নন; সুতরাং তোমরাও এখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমাদের পুত্রভাব ত্যাগ কর।

শুকদেব বললেন—মহাভাগ্যবান বসুদেব এবং মহাভাগ্যবতী দেবকী, নারদের কথা শুনে নিজের নিজের মোহ ত্যাগ করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করে কৃতকৃত্য হলেন।

৩৪

কৃষ্ণের স্বধাম-গমনের সংকল্প এবং অবধূত-কথা

কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ।
ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্ ॥ ১১-১-১ ॥

বাদরায়ণ-পুত্র শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং যাদবদের সাহায্যে কলহ্ সৃষ্টি করিয়ে, দৈত্য বধ করে পৃথিবীর ভার হরণ করলেন। দুর্যোধন প্রভৃতিরা অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল; তারই ফল-স্বরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে, উভয় পক্ষের সম্মিলিত রাজাদের বধ করে ভূভার হরণ এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ একদিন ভাবলেন—এই যাদবেরা আমার রক্ষিত; সুতরাং কেউ এদের নির্জিত করতে পারবে না। যাদবেরা আমারই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যে রকম উদ্ধত হয়ে উঠেছে তাতে এরা বেঁচে থাকতে পৃথিবীর ভার দূর হবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ঠিক করলেন যে, ব্রহ্মশাপ অবলম্বন করে যাদবদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে, একে অপরকে দিয়ে এই যদুবংশের বিনাশ করতে হবে। তারপর তিনি নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বধামে প্রস্থান করবেন।

একদিন অত্যন্ত দুর্বিনীত যাদব-কুমারেরা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে স্ত্রী-লোকের বেশে সাজিয়ে, উপস্থিত ঋষিদের কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের অনুকরণ করে জিজ্ঞাসা করল—এই স্ত্রীলোকটি আসন্ন প্রসবা; আপনারা দয়া করে বলুন, এর ছেলে হবে না মেয়ে হবে।

অন্তর্দ্রষ্টা ঋষিরা এতে অত্যন্ত কুপিত হয়ে বললেন ঃ

জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্ ॥ ১১-১-১৬ ॥

এ তোমাদের কুলনাশক মুষল প্রসব করবে।

ঋষিদের অভিশাপ শুনে যাদবকুমারেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে সাম্বের পেটের উপরকার কাপড়-চোপড় সরিয়ে একটি লোহার মুষল দেখতে পেল। তারা তখন সেই মুষলটি নিয়ে রাজসভায় গিয়ে সকলের সামনে রাজা উগ্রসেনকে সমস্ত ঘটনা বললে। উপস্থিত যাদবেরা সকলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং উগ্রসেনের নির্দেশে সেই মুষলটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হলো; মুষলের একটু অংশ আর চূর্ণ করা গেল না; তখন তারা চূর্ণিকৃত এবং মুষলের অবশিষ্ট অংশটুকু সমুদ্রে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এদিকে সমুদ্রের একটি মাছ সেই মুষলাংশ খেয়ে ফেলে; জেলেরা পরে সেই মাছটিকে ধরলে একজন ব্যাধ সেই লৌহাংশ নিয়ে তার বাণের অগ্রভাগে ফলক-রূপে জুড়ে রাখল। বাকি মুষলচূর্ণ সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে পারের বালিতে গিয়ে মিশে গেল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপের কথা জানলেন; সমর্থ হয়েও কিন্তু তিনি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করলেন না, বরং যাদবদের ধ্বংসই অনুমোদন করলেন।

দেবতারা যখন জানলেন যে, যদুকুল ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়েছে, তখন নিশ্চিত হলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবার তাঁর নরদেহ ত্যাগ করে স্বধামে প্রস্থান করবেন। তাই তাঁরা শেষ বারের মতো শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব রূপ দর্শন এবং তাঁর স্তব করার জন্য দ্বারকায় এসে উপস্থিত হলেন।

ব্রহ্মাদি দেবতারা শ্রীকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন—হে পরমপূজ্য! আপনার পবিত্র যশোকথা শ্রবণে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, সেই শ্রদ্ধার দ্বারা মুমুক্ষু, সাত্ত্বিক লোকেরা শুদ্ধতা লাভ করে। সেই শুদ্ধতা বিষয়াসক্ত মানুষ বিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা দ্বারা লাভ করতে পারে না।

শ্রদ্ধাই হচ্ছে আত্মশুদ্ধির উপায়। ভগবানের গুণকীর্তন শ্রবণে মানুষের মনে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তা-ই ক্রমে ভগবৎ-ভক্তিতে পরিণত হয়; তখন আর মানুষের কোন কামনা-বাসনা থাকে না; সে তখন ভগবানের নাম-কীর্তন এবং শ্রবণ-মনন করে, সর্বদা তন্ময় হয়ে শুদ্ধাভক্তির অধিকারি হয়। কিন্তু বিষয়াসক্ত লোকেরা বেদপাঠ, দান, তপস্যাদি করে গর্বিত-ই হয়ে ওঠে; এইসবের মধ্যেই একটা অহং-ভাব থাকে; সুতরাং বেদপাঠ, দান, তপস্যার দ্বারা মানুষ নিষ্কাম হতে পারে না; আর কামনাহীন না হলে শুদ্ধাভক্তি লাভ করা সুদূরপরাহত।

হে প্রভু! পূর্বে আমরা পৃথিবীর ভার দূর করার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম; আপনি আমাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করে যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে ভূভার হরণ এবং সকলের মঙ্গলের জন্য অনন্যকীর্তি স্থাপন করেছেন; আপনার সেইসব কাজ এবং গুণের কীর্তন করে মানুষ পবিত্র হয়ে যাবে।

হে বিভো! আপনার যদুবংশে অবতীর্ণ হবার পর ১২৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে আপনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন—ভূভার হরণ, শিষ্টের পালন, ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা—এ সবই সম্পন্ন হয়েছে; তাছাড়া শিগ্‌গিরই ব্রহ্মশাপে যদুকুলও বিনষ্ট হবে; সুতরাং আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনার স্বধামে এবার প্রস্থান করতে পারেন।

দেবতাদের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আপনারা যা বললেন, আমিও মনে মনে তা-ই ঠিক করেছি; এই উদ্ধত যদুকুল বিনাশ করে আমি স্বধামে প্রস্থান করব।

শুকদেব বললেন—এর পরই দ্বারকাতে মহা উৎপাত সকল হতে লাগল। বৃদ্ধ যাদবেরা এইসব উৎপাতের নিরসনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলে তিনি বললেন—আমাদের বংশে দূরতিক্রমণীয় ব্রহ্মশাপ রয়েছে; তাই দ্বারকাতে এই সব মহোৎপাত হচ্ছে; সুতরাং এখানে আর থাকা উচিত নয়। চলুন, আজই আমরা মহাতীর্থ প্রভাসে গিয়ে, তীর্থ-স্নান, দান এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে এই ব্রহ্মশাপ ক্ষালনের চেষ্টা করি। শ্রীকৃষ্ণের কথায় যাদবেরা তখনই প্রভাসে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

এই সুযোগে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সহচর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে বললেন—হে দেবদেবেশ! আপনার নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে পুণ্য হয়; তবুও এখানকার পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে আপনি যদুকুল সংহার করে মর্তধাম ত্যাগ করবেন; কারণ আপনি বিপ্রশাপ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েও কিছু করছেন না।

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥ ১১-৬-৪৩ ॥

হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম ছেড়ে আমি ক্ষণার্ধ সময়ও থাকতে চাই না; সুতরাং আমাকেও আপনার ধামে নিয়ে চলুন।

আমরা আপনার ভক্ত; সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেও শয়নে, চলাফেরায়, উপবেশনে, স্নানে, ভোজনে আমাদের প্রিয় আত্মা আপনাকে কি করে ছেড়ে থাকবে?

ত্বয়োপভুক্ত-স্রগ্-গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ১১-৬-৪৬॥

উদ্ধব বলছেন—আপনার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, বসন এবং অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে আপনার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস, আমরা আপনার মায়াকে জয় করব। আপনার বিরহে আমি এক মুহূর্তও পৃথিবীতে থাকতে চাই না। কৃষ্ণ বিহনে উদ্ধব মায়ার কবলিত হবেন, এইজন্যই যে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সাথে যেতে চাইছেন, তা নয়। ভক্তেরা নিত্য ইষ্ট-দর্শন, পূজা-সেবাদি করে যে সুখ পায়, তার তুলনা হয় না; ভক্তের একমাত্র কাম্য ভগবানের কাছে কাছে থেকে তাঁর সেবা করবে।

উদ্ধব বললেন—আপনার বিশ্বমোহিনী মায়া আপনার আত্মীয়-স্বজনদেরও মোহিত করেছে; কিন্তু আপনার দাস আমাকে আপনার মায়া মোহিত করতে পারবে না। আপনার গৌরবে আপনার দাস আমিও গৌরবান্বিত বোধ করছি। সুতরাং আপনার অনন্য-শরণ দাস উদ্ধবকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

দ্বারকাবাসীরা সকলে প্রভাসে যাবার জন্য তোড়জোড় করছেন; চারিদিকে হৈ হট্টগোল চলছে; তারই মধ্যে এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের সামনে নতজানু হয়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, তার হৃদয়ের আকুতি জানিয়ে ভক্ত-হৃদয়ের গর্বের কথা বললেন—কৃষ্ণদাসেরা কৃষ্ণের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াকে পর্যন্ত পরাভূত করে থাকেন।

উদ্ধব আরও বললেন—হে মহাযোগিন্! এই সংসার পথে চলতে চলতে আমরা মনুষ্যের অননুকরণীয় আপনার গতি, হাস্য-পরিহাস প্রভৃতি স্মরণ এবং কীর্তন করে এবং আপনার ভক্তদের সাথে আপনার বিষয়ে আলোচনা করে এই দুস্তর সংসার-সাগর পার হয়ে যাব।

উদ্ধবের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তখন তাকে বললেন—হে উদ্ধব! আমার পৃথিবী ত্যাগের সম্বন্ধে তুমি যা অনুমান করেছ, তা যথার্থ। পৃথিবীতে আমার কাজ শেষ হয়েছে; বিপ্রশাপে যদুকুল ধ্বংস হবে; আজ থেকে সপ্তম দিবসে

সমুদ্র এই দ্বারকাপুরী প্লাবিত করে নষ্ট করবে। আমি পৃথিবী ত্যাগ করলে মানুষের সমস্ত মঙ্গল নষ্ট হবে এবং কলি এই পৃথিবীকে আক্রমণ করবে। কলিকালে অধর্মেই মানুষের রুচি হবে।

ত্বন্তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্‌বিচরস্ব গাম্ ॥ ১১-৭-৬ ॥

তুমি সর্বস্ব পরিত্যাগ করে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহ-মমতারহিত হয়ে এবং আমাতে মন স্থির করে সমদর্শী হয়ে পৃথিবী পর্যটন কর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কতকগুলি কথা বললেন—প্রথম, তুমি সর্বস্ব পরিত্যাগ কর; দ্বিতীয়, তুমি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহ-মমতারহিত হও; তৃতীয়, আমাতে মন স্থির কর; চতুর্থ, সমদর্শী হয়ে পৃথিবী পর্যটন কর। এইগুলি সবই সন্ন্যাসীর আদর্শ। তাই উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে সর্বব্যাপিন্! আপনি আমার মঙ্গলের জন্য বিষয়-বাসনা ত্যাগের যে সুন্দর উপদেশ দিলেন, তা আমার মতো বিষয়াসক্ত অভক্তের পক্ষে পালন করা একান্তই অসম্ভব বলে মনে হয়; আমি 'অহং'-ভাবের তাড়নায় এই 'দেহ গেহ'-কেই 'আমি আমার' বলে মনে করে আপনারই এই মায়া-রচিত সংসারে নিমগ্ন রয়েছি। সুতরাং *নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে (১১-৭-১৮)*—হে নরসখা নারায়ণ! আমি আপনার শরণাগত। সংসার-বাসনা ত্যাগের সহজ উপায় আমায় বলুন।

উদ্ধবের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—জগতে বহু প্রকার জীবের সৃষ্টি হয়েছে; তার মধ্যে মনুষ্যদেহই আমার সবচেয়ে প্রিয়; কারণ আমি ইন্দ্রিয়ের অতীত হলেও মানুষ শান্তভাবে অনুমানের সাহায্যে আমাকে ঈশ্বর-রূপে অনুসন্ধান করে থাকে। মনুষ্য শরীরে আত্মার উদ্ধার বিষয়ে পণ্ডিতেরা মহাত্মা যদু এবং অবধূতের কথা বলে থাকেন। আমি এখন তোমাকে যদু-অবধূতের কথা বলছি।

ধর্মজ্ঞ যদু একদিন নির্ভয়ে বিচরণকারী এক অবধূতকে দেখে বললেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান হয়েও নিষ্কর্মা বালকের মতো অভিমান-শূন্য হয়ে বিচরণ করছেন! আপনি সমর্থ, মেধাবী, কর্মদক্ষ, সুন্দর এবং মধুরভাষী। যেসব গুণ থাকলে মানুষ সংসারে সাফল্য লাভ করতে পারে,

আপনার মধ্যে সেইসব গুণ থাকলেও আপনি জড়, উন্মাদ, বালক এবং পিশাচের মতো ব্যবহার করেন এবং কোন কিছুতেই আপনার অভিলাষ নেই! সংসারে লোকেরা যেখানে কাম এবং লোভ-রূপ বাসনার আগুনে সদাই জ্বলছে, সেখানে আপনি নির্বাসনা হয়ে কেমন করে সদা আনন্দে নিমগ্ন রয়েছেন?

মহাত্মা যদুর প্রশ্ন শুনে অবধূত বলেন—এই সংসারে আমার বহু গুরু আছেন; এদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে আমি মুক্ত হয়েছি এবং আনন্দে পৃথিবী পর্যটন করে বেড়াচ্ছি। আমার ২৪ জন জ্ঞান-গুরু রয়েছেন; তাদের প্রত্যেকের বৃত্তি থেকে আমি যা যা শিখেছি, সেইসব তোমাকে এখন বলছি ঃ

(১) পৃথিবীর কাছ থেকে আমি ক্ষমা শিক্ষা করেছি। বহুভাবে উৎপীড়িতা হয়েও পৃথিবী মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। প্রারব্ধের বশেই মানুষ কষ্ট পায়—এইটি জেনে ধৈর্যশীল ব্যক্তি নানাভাবে উৎপীড়িত হলেও পৃথিবীর মতো অবিচল থেকে অপরকে ক্ষমা করবে।

(২) বায়ু যেমন জঙ্গলে লোকালয়ে সর্বত্র প্রবাহিত হয়েও সুগন্ধ, দুর্গন্ধ প্রভৃতিতে লিপ্ত হয় না এবং আগুন লেগে বন এবং লোকালয় পুড়ে গেলেও বায়ু ক্ষুব্ধ হয় না, সেইরকম আমিও শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির কারণ বিষয়ের সংস্পর্শে এসেও বায়ুর মতোই নির্লিপ্ত থাকতে শিখেছি।

(৩) আকাশ যেমন সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ নয়) এবং অসঙ্গ, পরমাত্মাও তেমনি সর্বজীবে ব্যাপ্ত হয়েও সীমাবদ্ধ নয় এবং কোন কিছুতেই জড়িয়ে পড়ে না; আকাশের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পার্থিব দেহকে আশ্রয় করলেও দেহের ধর্ম বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকবে।

(৪) জলের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি যে, জলের মতোই মানুষের স্বভাবও নির্মল, স্নিগ্ধ ও মধুর হওয়া উচিত।

(৫) অগ্নি যেমন সব কিছুকেই গ্রহণ করে, সেইরকম জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রদীপ্ত অগ্নির মতো শ্রদ্ধায় অথবা অশ্রদ্ধায় প্রদত্ত আহার্য সমভাবে গ্রহণ করেও মনের মলিনতা প্রাপ্ত হবে না।

(৬) চন্দ্রের কাছে আমি এই শিখেছি যে, চন্দ্রের কলা-সমূহের হ্রাস বৃদ্ধি হলেও যেমন চন্দ্রের কোন পরিবর্তন হয় না, সেইরকম কালের প্রভাবে মানুষের জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ—এইসব পরিবর্তন হলেও আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না।

(৭) সূর্য যেমন সমুদ্রের জলরাশিকে আকর্ষণ করে যথাসময়ে বর্ষণ করলেও, সূর্য নিজে এসবে আসক্ত হয় না, সেইরকম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও অবস্থা বিশেষে, বিষয় গ্রহণ এবং বিষয় ত্যাগ করেও নিজে বিষয়ে আসক্ত হয় না।

(৮) কপোত তার নিজের সন্তানদের মায়ায় মোহিত হয়ে নিজেও ব্যাধের কবলিত হয় এবং মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে। এই দেখে কপোতের কাছে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, সংসারের প্রবল আসক্তি পরিণামে দুঃখপ্রদ হয়। একমাত্র মনুষ্য-দেহেই মুক্তিলাভ সম্ভব; সেই মনুষ্য-দেহ লাভ করেও যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত হয়, সে কপোত পক্ষীর মতোই মুক্তিপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়।

(৯) অজগর সাপ শরীর রক্ষার জন্য কোনরকম যত্ন করে না; বিনা চেষ্টায় সামনে যা আসে, ভাল হোক, মন্দ হোক তা-ই খেয়ে দেহ রক্ষা করে। অজগরের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, জ্ঞানী পুরুষও বিনা চেষ্টায় যা পাওয়া যায়, তা-ই খেয়ে জীবন ধারণ করবে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কর্মক্ষম হয়েও কোন কাজ করেন না; শুয়ে থেকেও নিদ্রাজয়ী এবং সর্বদা উদ্যমহীনভাবে থাকেন। জগতে দুঃখ কেউ চায় না, তবুও দুঃখ আপনিই আসে; আবার সংসারে সকলেই সুখ চায়, কিন্তু সুখ পাওয়া যায় না; প্রারব্ধ কর্মই জীবকে সুখ-দুঃখ ভোগ করায়। সুতরাং অজগরের মতো জ্ঞানী ব্যক্তিও সুখে-দুঃখে নিস্পৃহ হয়ে স্বরূপ-চিন্তায় নিশ্চেষ্ট থাকবে।

(১০) সমুদ্র যেমন প্রশান্ত এবং গম্ভীর, সেইরকম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও শান্ত স্বভাব এবং গম্ভীর; তার ভিতরে কি বিভূতি, ঐশ্বর্য রয়েছে, তা কেউ জানে না। সমুদ্র যেমন বর্ষার জলে বেলাভূমি অতিক্রম করে না এবং গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে শুকিয়েও যায় না, সেইরকম ধীর ব্যক্তি সুখে উৎফুল্ল এবং দুঃখে উদ্বেগরহিত হয়ে অবস্থান করেন। সমুদ্রের কাছে আমি প্রশান্ত, গম্ভীর এবং সুখে-দুঃখে সমভাব শিক্ষা করেছি।

(১১) পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণ করে, সেই-রকম অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রূপের আসক্তি যে কি ভয়ঙ্কর, তা আমি পতঙ্গের কাছ থেকে শিখেছি।

(১২) মৌমাছি অতিরিক্ত মধু মৌচাকে সঞ্চয় করে রাখে, কিন্তু অপরে সেই মৌচাক ভেঙে মধু নিয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি সঞ্চয় করবে না; এই শিক্ষা আমি মৌমাছির কাছ থেকে পেয়েছি। মৌমাছি যেমন বিভিন্ন ফুল থেকে একটু একটু করে মধু আহরণ করে, সেইরকম জ্ঞানী ব্যক্তিও গৃহস্থের অসুবিধা না হয় সেইভাবে অল্প অল্প করে কয়েক গৃহস্থের বাড়ি থেকে মাধুকরী করে জীবন ধারণ করবে।

(১৩) হস্তী যেমন হস্তিনীর স্পর্শ-সুখের জন্য দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ফাঁদে পড়ে মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়, সেইরকম স্ত্রীলোকের দ্বারা মোহিত হয়ে মানুষও ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। হস্তীর কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, নারী-সংস্পর্শের আসক্তি মানুষের বন্ধন ও মৃত্যুর কারণ হয়।

(১৪) মধুহরণকারী ব্যাধ যেমন মৌমাছির সঞ্চিত মধু হরণ করে, সেইরকম দান এবং উপভোগ বর্জিত, কষ্টার্জিত কৃপণের ধনও অপরে ভোগ করে থাকে। মধুহরণকারী ব্যাধের কাছে আমি এই শিখেছি যে, কেবল সঞ্চয় করার জন্য অর্থ জমাবে না। অর্থের সদ্ব্যবহার করবে।

(১৫) হরিণ ব্যাধের বাঁশির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। হরিণের কাছে আমি এই শিখেছি যে, সন্ন্যাসী বিষয়ভোগ উদ্দীপনকারী গ্রাম্য গীত কখনও শ্রবণ করবে না। নৃত্যগীতে আকৃষ্ট হয়েই অতি সরল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি রমণীর বশীভূত হয়েছিলেন।

(১৬) মাছ বড়সি-সংযুক্ত খাদ্য খেতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে। মাছের কাছে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, জিহ্বার লালসা ত্যাগ করতে হবে। ভোজন-লোভী মানুষ নিজের মৃত্যুকেই ডেকে আনে।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েৎ রসনং যাবৎ জিতং সর্বং জিতে রসে ॥ ১১-৮-২১ ॥

অপর সকল ইন্দ্রিয় জয় করেও যদি রসনেন্দ্রিয়কে জয় করা না যায়, তবে তাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যায় না; রসনাকে জয় করলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়।

(১৭) পিঙ্গলা নামে এক বারবনিতা একদিন খুব সেজে-গুজে ধনবান যুবকদের জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে; কিন্তু কেউ এল না। এইভাবে নিদ্রাশূন্য হয়ে অত্যন্ত অস্বস্তিতে তার অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হলো। তখন পিঙ্গলা ভাবলে—হাড়ের দ্বারা নির্মিত পুরুষদেহ-রূপ ঘর, যার মেরুদণ্ড বাঁশের খোঁটার মতোই বাঁকা এবং চামড়া, লোম, নখ প্রভৃতির দ্বারা আবৃত, সেই পুরুষদেহ-রূপ ঘরে নয়টি দ্বার দিয়ে অনবরত মল, মূত্র, কফ প্রভৃতি বের হচ্ছে; এমন অপরিষ্কার দুর্গন্ধযুক্ত পুরুষদেহ, আমি ছাড়া আর কোন্ রমণী সুন্দর বলে মনে করে সেবা করবে? ধিক্ আমাকে, আমি অত্যন্ত মূঢ়; তাই আমার স্বরূপ, অচ্যুতকে ত্যাগ করে অন্য কান্ত কামনা করছি। এইভাবে চিন্তা করে পিঙ্গলার নির্বেদ উপস্থিত হলো এবং সে তখন ভগবান বিষ্ণুর শরণ নিয়ে সুখে নিদ্রিত হলো। পিঙ্গলার কাছে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই পরম সুখপ্রদ।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥ ১১-৮-৪৪ ॥

আশাই পরম দুঃখ; নৈরাশ্যই পরম সুখের কারণ। এর দৃষ্টান্ত—পিঙ্গলা কান্তের আশা ত্যাগ করেই সুখে ঘুমাতে পেরেছিল।

(১৮) কোন এক দুর্বল কুরর পক্ষীকে (সাদা চিল) এক খণ্ড মাংস নিয়ে যেতে দেখে অপর এক বলবান কুরর পক্ষী তাকে বধ করে মাংস খণ্ড নিয়ে যায়; দুর্বল কুরর যদি মাংস খণ্ড ত্যাগ করত, তাহলে সে সুখে বাঁচতে পারত। কুররের কাছে আমি এই শিখেছি যে, মানুষের প্রিয় বস্তুর প্রতি আসক্তিই তার দুঃখের কারণ; আসক্তি ত্যাগ করলেই অনন্ত সুখ লাভ করা যায়।

(১৯) বালকের মান অপমান বোধ নেই, থাকা-খাওয়ার বিষয়েও চিন্তা নেই। বালককে দেখে আমি অভিমানশূন্য হয়ে থাকা-খাওয়ার বিষয়ে গৃহস্থের মতো চিন্তা না করে, বালকের মতো আনন্দে সংসারে বিচরণ করি।

(২০) কুমারীর হাতের বালার শব্দ শুনে আমি বুঝেছি যে, হাতে অনেক বালা থাকলেই শব্দ হয়; একটি বালাতে কোন শব্দ হয় না। কুমারীর কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, একসঙ্গে অনেক লোক থাকলেই বৃথা বাক্যালাপে এবং ঝগড়া করে সময় নষ্ট হয়। সুতরাং যোগী ব্যক্তি একাকী বাস করবে।

(২১) বাণ (তীর) যারা তৈরি করে, তাদের কাছে আমি মনের একাগ্রতা শিক্ষা করেছি। বাণ নির্মাতা এমন একাগ্র হয়ে কাজ করে যে, পাশের রাস্তা দিয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রাজা চলে গেলেও সে তা জানতে পারে না।

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১-৯-১১ ॥

প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু সংযম করে স্থির আসনে বসে অনলসভাবে বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের দ্বারা মনকে এক বস্তুতে অর্থাৎ শ্রীভগবানে যুক্ত রাখবে। এই হচ্ছে যোগের কথা।

(২২) সাপ একাকী বিচরণ করে; নিজের গৃহ নির্মাণ না করে অপরের গর্তে থাকে এবং সর্বদা সাবধানে অবস্থান করে। সাপের কাছে আমি এই শিখেছি যে, নশ্বর দেহের জন্য গৃহ নির্মাণ করা সাধুদের পক্ষে নিষ্ফল এবং দুঃখপ্রদ; যেখানে আশ্রয় পাওয়া যায়, সাধু সেখানেই সাবধানে ভগবানের চিন্তায় তন্ময় থাকবে।

(২৩) মাকড়সা নিজের লালা দিয়ে জাল বিস্তার করে তার মধ্যেই থাকে এবং সেই জাল আবার নিজেই গ্রাস করে। সেইরকম, শ্রীভগবান নিজের শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে, অন্তরাত্মারূপে তাতেই প্রবিষ্ট হন এবং পরিশেষে সবই আবার শ্রীভগবানে লীন হয়ে যায়। ভগবান কেমন করে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, তা আমি মাকড়সার কাছ থেকে শিখেছি। শ্রীভগবান এই বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এবং তিনিই এর উপাদান কারণ; এই বিশ্ব তাঁতেই অবস্থিত এবং অন্তে শ্রীভগবানেই লীন হয়ে যায়।

(২৪) কাঁচপোকা যখন আরশোলাকে ধরে, তখন কাঁচপোকার কথা চিন্তা করতে করতে ভয়ে আরশোলা কাঁচপোকার মতো রূপ ধারণ করে।

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ সরূপতাম্ ॥ ১১-৯-২২ ॥

দেহী স্নেহ, দ্বেষ অথবা ভয়বশত যে যে বস্তুতে সমস্ত মনকে সংনিয়োজিত করে, দেহী তখন সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। কংস ভয়ে, শিশুপাল দ্বেষ করে কৃষ্ণের সারূপ্য লাভ করেছিল। কাঁচপোকার কাছে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, একান্তভাবে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ চিন্তা করে মানুষ তদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে, তদাকারাকারিত হয়ে যায়।

এইভাবে অবধূত নিজের ২৪ জন শিক্ষা-গুরুর কথা বলে উপসংহারে মহামনা যদুকে বললেন ঃ

শ্রীভগবান তাঁর নিজ শক্তি, প্রকৃতির দ্বারা বহুবিধ জীব সৃষ্টি করেও সুখী হতে না পেরে বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করে আনন্দিত হলেন; কারণ এই মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর হলেও পরম পুরুষার্থপ্রদ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ—মুক্তিলাভ একমাত্র এই মনুষ্যদেহেই সম্ভব। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে পর্যন্ত এই শরীরের পতন না হয়, সেই পর্যন্ত মুক্তি লাভের জন্য যত্ন করবে।

মহামনা যদু অবধূতকে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি সুস্থ, সবল, বুদ্ধিমান এবং কর্মক্ষম হয়েও কিছু না করে বালকের মতো, জড়ের মতো অথবা উন্মাদের মতো ব্যবহার করেন কেন ? উত্তরে অবধূত বললেন ঃ

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ ॥ ১১-৯-৩০ ॥

আমার পূর্বোক্ত গুরুদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে আমি বৈরাগ্য এবং আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একাকী অহঙ্কারশূন্য হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! পরমজ্ঞানী অবধূত এইসকল কথা বললে যদুবংশের প্রবর্তক মহামনা যদু সমস্ত বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে শ্রীভগবানে সমাহিত-চিত্ত হয়েছিলেন।

৩৫

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ

এই যে অবধূতের ২৪ জন গুরুর কাছ থেকে ক্ষমা, নির্লিপ্ততা, আসক্তি-ত্যাগ, সুখে স্পৃহাহীনতা এবং দুঃখে উদ্বেগরাহিত্য, সঞ্চয় না করা, ইন্দ্রিয়ের লালসা ত্যাগ করা, কোন কিছুর আশা না করা, একাকী বাস করা, মনের একাগ্রতা, ভগবৎ-স্বরূপতা ইত্যাদির কথা বলা হলো, এই সব সৎগুণ লাভের উপায় কি? এই তো হচ্ছে সর্বকালের সাধকের প্রশ্ন। ভগবান লাভ—আত্মোপলব্ধি হলে এই সব গুণ আপনা আপনিই এসে যায়। শ্রীকৃষ্ণ এইবার উদ্ধবকে আত্মোপলব্ধির বিষয়ে বলছেন যে, আমার আশ্রিত নিষ্কাম ভক্ত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম পালন করবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বললেন নিষ্কাম ভক্ত। এখন নিষ্কাম কেমন করে হওয়া যায়? মানুষ যা কামনা করে অর্থাৎ বিষয়সুখ, তার পরিণতি কি—এইটি হৃদয়ঙ্গম করলেই নিষ্কাম হওয়া যায়। মানুষ আরামে থাকার জন্য ঘর তৈরি করে, কিন্তু সেই ঘর আগুনে, বন্যায় কিংবা অন্য কোন দৈবদুর্বিপাকে ধ্বংস হয়ে যায়। সুখের আশায় সংসার করে, কিন্তু সংসারে স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন সকলেই মরণাধীন; বিষয় চিরস্থায়ী নয়। এই সব বার বার চিন্তা করতে করতে ক্রমে নিষ্কাম হওয়া যায়।

মানুষ দুরকম কর্ম করে থাকে—সৎকর্ম এবং অসৎকর্ম। অসৎকর্ম করলে নরকে গিয়ে কষ্ট ভোগ করতে হয়; সৎকর্মে স্বর্গবাস। স্বর্গে চূড়ান্ত সুখ ভোগ করা যায় বটে, কিন্তু পুণ্যফল শেষ হলেই তাকে আবার মর্তধামে ফিরে কর্ম-প্রবাহে পড়তে হয়। এই অবস্থায় স্বভাবতই মনে প্রশ্ন ওঠে—জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে একেবারে মুক্ত হবার উপায় কি?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, জীব হচ্ছে মায়াধীন আর মায়া হচ্ছে সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণাত্মক। এই সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের জন্যই জীব বদ্ধ হয় এবং শ্রীভগবানের কৃপায় মুক্ত হয়। জীব নিজের চেষ্টায় মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবান হচ্ছেন মায়াধীশ; সুতরাং শ্রীভগবান সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অতীত; ফলে

শ্রীভগবানের বন্ধনও নেই, মুক্তিও নেই। যদি কেউ শ্রীভগবানে মন স্থির রাখতে সমর্থ হয়, তবে তার মুক্তি অবধারিত। কিন্তু শ্রীভগবানে মন স্থির রাখা তো অত্যন্ত কঠিন। অতএব কর্ম-ফলের আশা না করে সৎকর্মের অনুষ্ঠান এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন করতে করতে ভক্তিলাভ হবে। ভক্তিলাভ হলে তবে সাধুসঙ্গ লাভ হয়; সাধুসঙ্গ থেকে শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়। শুদ্ধাভক্তি ছাড়া ভগবানকে পাবার আর কোন উপায় নেই।

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥ ১১-১১-৪৮॥

হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গ থেকে উদ্ভূত ভক্তি ছাড়া, আমাকে লাভ করবার, সংসার থেকে মুক্ত হবার আর কোন উপায় নেই; কারণ আমিই সাধুদের আশ্রয়; সুতরাং সৎসঙ্গই হলো প্রকৃষ্ট সাধন।

সৎসঙ্গ হচ্ছে ভগবৎ-কথার আলাপন। দুরকমভাবে সৎসঙ্গ হতে পারে; এক হচ্ছে সকলের প্রতি শুভ চিন্তা এবং ভগবৎ-ভক্তের সাক্ষাৎ সেবা; দ্বিতীয় হচ্ছে, ভগবৎ-কথার আলোচনা; সাধুদের সকলের প্রতি শুভ চিন্তা এবং ভগবৎ আলোচনা ছাড়া অন্য কোন কথা এবং কাজ থাকতেই পারে না; শ্রীভগবানের সাথে সম্পর্ক নেই, এমন কথা সাধুরা আলোচনা করেন না; তাই সাধুরা হচ্ছেন ভগবানময়। সেইজন্যই শাস্ত্রে সাধুদের এত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—সর্বপ্রকার আসক্তি-নিবারক সৎসঙ্গ আমাকে যে-রকম বশ করে, সেইরকম বশীভূত আমি যজ্ঞ, ব্রত, দান, নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা হই না। উপমা দিয়ে বলেছেন—ব্রজের গোপীরা বেদ পাঠ করে নি, মহতের সেবা করে নি ; তপস্যাদিও করে নি ; তবুও একমাত্র আমার এবং আমার ভক্তের সঙ্গ করে তারা পরমাত্মা আমাকে লাভ করেছিল। গোপীদের পরম প্রিয় আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন আমার সাথে বৃন্দাবনের সেই সুখ-রাত্রি তাদের কাছে ক্ষণার্ধ, অতি অল্প সময় বলে মনে হয়েছিল। আর আজ আমার বিরহে তাদের দিনরাত্রি যেন কল্পতুল্য সুদীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে। ব্রজবাসীরা জ্ঞান, কর্ম অথবা যোগের সাধন না করেও কেবলমাত্র

আমার প্রতি নিষ্কাম ভালবাসার দ্বারা শুদ্ধাভক্তি লাভ করে, পরমাত্মা আমাকেই লাভ করেছে। সুতরাং হে উদ্ধব! সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র আমারই আশ্রয় লও।

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥ ১১-১২-১৫ ॥

সর্বদেহধারী জীবের আত্মস্বরূপ একমাত্র আমারই শরণ লও; তাহলে আমাকে পেয়ে তোমার সকল ভয় দূর হবে—তুমি অকুতোভয় হবে। মানুষ তখনই অকুতোভয় হতে পারে যখন তার দ্বৈতবোধ থাকে না। জ্ঞানী ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করে সব কিছুই ব্রহ্মময় দেখে; সুতরাং সে অভী হয়; আবার ভক্ত সর্ব বিষয়ে শ্রীভগবানের শরণ নিয়ে জগৎকে বিষ্ণুময় দেখে; সুতরাং সেও তখন অকুতোভয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কথায় বলেছিলেন—গোপীরা সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করে আমাকে লাভ করেছিল। হে উদ্ধব! তুমিও সেইরকম জ্ঞান, কর্ম, যোগ, শ্রুতি, স্মৃতি ইত্যাদি ত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ লও; তাহলে তুমিও পরমাত্মস্বরূপ আমাকে লাভ করবে।

ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—বেদে শ্রেয়োলাভের বহুবিধ উপায়ের কথা বলা হয়েছে; তার মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ বলে জানবে; কারণ একমাত্র ভক্তি ছাড়া আমাকে লাভ করা যায় না।

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥ ১১-১৪-১২ ॥

হে উদ্ধব! যারা আমাকে আত্মসমর্পণ করে সর্বভাবে নিরপেক্ষ হয়েছে, তারা মদাত্মা অর্থাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ আমি সর্বদা তাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হই; সুতরাং তাদের যে সুখ, সেই সুখ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কোথায় পাবে ?

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১১-১৪-১৩ ॥

যে অকিঞ্চন, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, সমাহিত এবং আমাকে পেয়েই সন্তুষ্ট, তার সব দিক সুখময় বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন ঃ

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা মষ্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ॥
১১-১৪-১৪॥

যে আমাকে আত্মসমর্পণ করেছে, সে আমাকে ছেড়ে ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রত্ব, পৃথিবীর আধিপত্য, পাতালের অধীশ্বরত্ব, যোগ-বিভূতি, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত কামনা করে না।

হে উদ্ধব! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে, সেইরকম মদ্বিষয়া ভক্তি অর্থাৎ আমার নাম শ্রবণ-কীর্তন-মনন দ্বারা জাত ভক্তি সমস্ত পাপরাশি নষ্ট করে দেয়।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপ-স্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ ১১-১৪-২০॥

হে উদ্ধব! ঊর্জিতা ভক্তি অর্থাৎ তীব্র ভক্তি যেমনভাবে আমাকে লাভ করিয়ে দিতে পারে, সেইরকমভাবে অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, বেদপাঠ, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা আমি লভ্য নই।

সোনা যেমন আগুনের তাপে ময়লামুক্ত হয়ে অধিকতর উজ্জ্বল হয়, সেইরকম ভক্তির সাহায্যে জীবাত্মা কর্মবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উপনিষদে তো রয়েছে, 'তমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি'—তাঁকে জানলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়; কিম্বা 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্'—ব্রহ্মবিদ পরব্রহ্মকেই লাভ করেন। তাহলে উপনিষদ্ যেখানে বলছেন—জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূর হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অবিদ্যা দূর করার কোন কথা না বলে কেন বললেন—ভক্তির দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—চোখের অসুখ হলে যেমন ঔষধ প্রয়োগে চোখ ভাল হয় এবং আগের মতো সব জিনিস ভালভাবে দেখা যায়, সেইরকম, আমার গুণগান শ্রবণ এবং কীর্তন করলে যেমন যেমন চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকে, ঠিক সেই পরিমাণে দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্বও অনুভূত হতে থাকে।

আসলে জ্ঞান এবং ভক্তি আলাদা নয়। চিত্তের ভগবৎ-স্বরূপতা লাভকে জ্ঞান বলে। শ্রীভগবানের লীলাকীর্তনে এবং শ্রবণে সেই জ্ঞান সহজেই লাভ হয়।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ১১-১৪-২৭ ॥

বিষয়-চিন্তায় নিরত ব্যক্তির চিত্ত যেমন বিষয়ে নিমজ্জিত হয়, সেইরকম আমার স্মরণ-মননে নিযুক্ত ব্যক্তির চিত্ত আমাতেই বিলীন হয়ে যায়। বিষয়-চিন্তায় মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়; আর ভগবানের চিন্তায় মানুষ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং হে উদ্ধব! বিষয় চিন্তা ত্যাগ করে আমার স্মরণ-মননে মনকে আমাতেই নিবিষ্ট কর।

এর পর কি করে ধ্যান করতে হয় তা বলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন —যারা জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, প্রাণায়াম দ্বারা যাদের প্রাণবায়ু সংযত হয়েছে এবং আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করেছে, তাদের কাছে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-সমূহ এমনিতেই এসে উপস্থিত হয়; কিন্তু আমাকে পেতে ইচ্ছুক ভক্তের কাছে এইসব বাধা-স্বরূপ বলে জানবে; কারণ এইসব সিদ্ধি সাধককে বিপথে নিয়ে যায়।

উদ্ধব জানেন যে, শ্রীভগবান সর্বদেহীর অন্তরে ও বাহিরে সদা বিদ্যমান; জগতে যা কিছু আছে, সবই শ্রীভগবানের অংশ। এই অংশকেই শ্রীভগবানের বিভূতি বলা হয়। ভগবৎ-বিভূতি সর্বত্র বিরাজিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিভূতির তারতম্য হয়। যেখানে সত্ত্বগুণ বেশি, সেখানে তাঁর অংশের বেশি প্রকাশ ; সুতরাং ভগবানের বিভূতিও সেখানে বেশি। যেমন একটা পাথর থেকে হিমালয় পর্বতের বিভূতি বেশি। সমস্ত পদার্থেই যখন ভগবানের বিভূতি বর্তমান, তখন ভগবান-বোধে সকলকেই সম্মান এবং প্রণাম করা উচিত।

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥ ১১-১৬-৪২ ॥

হে উদ্ধব! তুমি বাক্য, মন, প্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং বিশুদ্ধ মনের দ্বারা বুদ্ধির সংযম কর। তাহলে তোমাকে আর এই সংসার-প্রবাহে পড়তে হবে না; কারণ এই সংযমের ফলে তোমার সর্বত্র ভগবৎ দর্শন হবে এবং ভগবৎ দর্শনের আনন্দের ফলে ভববন্ধনের যে মূল কারণ 'বিষয় তৃষ্ণা', তা একেবারে দূর হয়ে যাবে।

এর পর উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রম ধর্ম অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে বললেন, যাতে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্তব্য পালন করে শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ করতে পারে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের কয়েক জায়গায় ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছেন—ভগবান লাভ করতে হলে আমাদের কি সংসার ত্যাগ করতে হবে? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—না, তোমাদের সংসার ত্যাগ করতে হবে না; সংসারে থেকেই হতে পারে; তবে মাঝে মাঝে সংসার থেকে দূরে, কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে ভগবানের স্মরণ-মনন-প্রার্থনাদি করে ভক্তি লাভ করার পর সংসারে এসে থাকলে আর কোন দোষ হয় না। সংসারে বড় লোকের বাড়ির দাসীর মতো থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—বিভিন্ন দূর দেশ থেকে আগত পথিকেরা কিছু সময়ের জন্য পান্থ-নিবাসে আশ্রয় নেয়; তাদের মিলন যেমন ক্ষণস্থায়ী, সেইরকম স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজনের মিলনও ক্ষণস্থায়ী বলে জানবে। স্বপ্নদৃষ্ট মিলন যেমন স্বপ্ন ভেঙে গেলেই মিথ্যা হয়ে যায়, সেইরকম স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজনের দেহ-নাশ হলেই, জীবিতাবস্থার সেই মিলন মিথ্যা হয়ে যায়। সুতরাং গৃহস্থেরা আসক্তিহীন হয়ে অতিথির মতো উদাসীনভাবে গৃহধর্ম করলে, অহঙ্কারশূন্য হয়ে কাজ করলে সংসারে থেকেও সংসারে বদ্ধ হয় না।

ইন্দ্রিয়সকলের বিক্ষোভই বদ্ধভাব আনে এবং ইন্দ্রিয়ের সংযমই মোক্ষ। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ থেকেই বন্ধন; আর সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পারলেই মুক্তি।

সন্ন্যাসীরা ষড়রিপু সংযত করে বাসনা-রহিত হয়ে আত্মাতেই মহাসুখ অনুভব করবে এবং আমার ভাবে বিভোর হয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করবে। সন্ন্যাসী বৃথা তর্ক বিচারে লিপ্ত হবে না; অপরের দুর্ব্যবহার সহ্য করবে, কিন্তু নিজে

দুর্ব্যবহার করে অপরের মনে কষ্ট দেবে না; ভাববে একই পরমাত্মা যেমন সর্বভূতে বিরাজিত, সেইরকম তিনিই আমার হৃদয়েও অবস্থিত। আত্মদৃষ্টিতে পরস্পরের সাথে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। সন্ন্যাসী আহার পেলেও আনন্দিত হবে না, আবার না পেলেও দুঃখিত হবে না। জীবনধারণের জন্য ভোজ্যবস্তুর প্রয়োজন, আর আত্মতত্ত্ব চিন্তার জন্য জীবনধারণের প্রয়োজন। সুতরাং সন্ন্যাসী জীবনধারণের জন্য ভিক্ষা করবে।

ভিক্ষোর্ধর্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্যসেবনম্ ॥ ১১-১৮-৪২ ॥

শম ও অহিংসা হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম; বানপ্রস্থীর ধর্ম হচ্ছে তপস্যা এবং তত্ত্ববিচার; গৃহীর ধর্ম হচ্ছে প্রাণিগণের রক্ষা বিধান এবং যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান; ব্রহ্মচারীর ধর্ম হচ্ছে আচার্যের সেবা করা।

অতি সংক্ষেপে চার আশ্রমবাসীর বিভিন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে বলে শ্রীকৃষ্ণ সারকথা বললেন—*'সর্বেষাং মদুপাসনম্'* আমার উপাসনা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য—ভগবানের উপাসনাই পরম ধর্ম।

ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্ ॥ ১১-১৮-৪৪ ॥

এইভাবে যারা স্বধর্ম পালন করে নিত্য অনন্যভাবে আমার ভজনা করে, তারা সর্বভূতে আমাকে দর্শন করে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তি লাভ করে থাকে।

উদ্ধব বললেন—হে প্রভু! এই সংসারে মানুষ সদাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপে জ্বলছে। এর থেকে নিস্তার পেতে হলে একমাত্র আপনার পাদপদ্ম এবং আনন্দামৃত-রূপ জ্ঞানের আশ্রয় ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সুতরাং আপনি আমাকে জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বলুন, যাতে সর্ববাসনা মুক্ত হয়ে আমি উদ্ধার পেতে পারি।

উদ্ধবের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পূর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বজনবধ-জনিত দুঃখে কাতর হয়ে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে এই প্রশ্নই করেছিলেন; সেই সময় আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ভীষ্মের মুখে

জ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তির কথা যা শুনেছি, তা-ই এখন আমি তোমায় বলছি। যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে একই আত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়, তাকেই জ্ঞান বলে জানবে।

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥ ১১-১৯-২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, সর্বদা আমার গুণানু-কীর্তন করা, আমার পূজাতে নিষ্ঠা এবং আমার স্তব-স্তুতি করে আত্ম-নিবেদনকারী ব্যক্তি আমাতে ভক্তিলাভ করে। এইরকম ভক্তের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

মানুষের মঙ্গলের জন্যই আমি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের কথা বলেছি; এ ছাড়া মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণ সম্ভব নয়।

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥ ১১-২০-৭ ॥

কর্মফলে স্পৃহাহীন হয়ে যারা কর্মত্যাগ করে, তাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ অভীষ্টপ্রদ; যাদের কর্মে বিরক্তি হয় নি এবং বাসনা-কামনাও আছে, তাদের পক্ষে কর্মযোগই শ্রেয়।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ১১-২০-৮ ॥

আমার কথাদিতে যাদের শ্রদ্ধা হয়েছে অথচ কর্মফলে অতি বিরক্ত বা অতি আসক্ত নয়, তাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদান করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্মফলে নির্বেদ উপস্থিত হয় এবং আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্ম করতে হবে।

জ্ঞানীর কাছে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে যিনি পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে যিনি ভগবান, তাঁরা সবাই একই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ভক্তি—এরা বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন অধিকারির জন্য; লক্ষ্য সেই একই পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবান।

স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান যুগের মানুষের জন্য বলেছেন যে, জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ভক্তির সমন্বয়ই সহজ সাধন পথ। জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ভক্তি—এরা কেউ একেবারে আলাদা নয়; জ্ঞান বলতে জ্ঞানের প্রাধান্য বোঝায়; তবে তার মধ্যে কিছুটা কর্ম, কিছুটা যোগ, কিছুটা ভক্তি এসেই যায়। কর্ম, যোগ, ভক্তির সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—দিনরাত্রি অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে নিজের আয়ুও ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে; এইটি জেনে বিচারশীল মানুষ বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে, পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে শান্তি লাভ করে।

শান্তি লাভ করতে হলে প্রথমেই মনকে সংযত করতে হবে। সদা-চঞ্চল মনকে কেমন করে শান্ত করা সম্ভব? গীতাতে বলা হয়েছে—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সংযত করা যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন—মনকে যখন একাগ্র করার চেষ্টা করবে, তখন যদি মন স্বভাববশত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তখন মনকে নিজের মতো এদিক-ওদিক যেতে না দিয়ে মনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে ; এইভাবে ধীরে ধীরে মনকে নিজের বশে আনতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা তত্ত্ববিচার অর্থাৎ জগতের সব কিছুই বিনাশশীল—এইটি চিন্তা করতে করতে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসবে; বিষয়ে বৈরাগ্য হলেই শ্রীভগবানে অনুরাগ হবে; আর ভগবানে অনুরাগ হলেই তাঁকে লাভ করা সম্ভব হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ১১-২০-৩০ ॥

সকলের আত্মস্বরূপ আমাকে সাক্ষাৎ করলে—ভগবৎ সাক্ষাৎকার হলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ সকল অহঙ্কার দূর হয়; তার সকল সংশয় তিরোহিত হয় এবং সমস্ত কর্ম ক্ষয় হয়ে যায়।

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন—যারা একান্তভাবে আপনার শ্রীচরণকেই আশ্রয় করেছে তারা রাগদ্বেষ বিরহিত হয়ে সুখ-দুঃখে, মান-অপমানে সমচিত্ত হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে অপমান সহ্য করে অন্যায়ের প্রতিকার না করে থাকা সম্ভব হয় না। অতএব আপনি আমায় বলুন—কি করে দুর্জনের অত্যাচার সহ্য করে কোনরকম প্রতিকারের চেষ্টা না করে থাকা সম্ভব?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সদসৎ বিচারের দ্বারা মনকে স্থির রেখে, অন্যায় অবিচার সহ্য করার উপায় বলেছেন। এই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ একটি গল্প বললেন ঃ

কোন এক দেশে এক কৃপণ, লোভী এবং ক্রোধী ব্রাহ্মণ বাস করত। কৃপণতার জন্য সে নিজের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনদের যথাযথ খাবার এবং বস্ত্রাদি দিত না; নিজেও ভাল না খেয়ে ভাল না পরে কষ্টে জীবন কাটাত। তার গৃহে অতিথিসৎকার এবং ধর্মকর্মের কোন বালাই ছিল না। ফলে আত্মীয়-স্বজনেরা এবং অপর সকলে তার উপর রেগে ছিল। এক সময় কোন দৈব দুর্বিপাকে জ্ঞাতিরা তার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিল; বাকি যা ছিল, তাও চোর ডাকাতেরা লুট করে নিল। তখন একেবারে নিঃস্ব হয়ে, আত্মীয় পরিজন কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই কৃপণ অত্যন্ত কষ্টে এবং চিন্তায় একেবারে জর্জরিত হয়ে পড়ল। এইভাবে দুঃখ ভোগ করার পর তার মনে তীব্র বৈরাগ্য এল। ভাবলে—প্রাণান্তকর কষ্ট করে যে অর্থ আমি উপার্জন করেছি, তা আমার ভোগেও লাগে নি আর কোন ধর্ম কার্যেও ব্যয়িত হয় নি। এই জীবনে আমার কোন সুখই হলো না এবং ধর্ম সঞ্চয় করিনি বলে মৃত্যুর পরেও আমার নরক বাস অবধারিত। লোভ মানুষের সকল গুণকেই নষ্ট করে দেয়। বহু কষ্ট করে মানুষ ধন উপার্জন করে; সেই ধন রক্ষা করতে অনেক রকম চিন্তা এবং ভয় এসে উপস্থিত হয়। ধনের জন্য আত্মীয়-স্বজনেরাও শত্রু হয়ে যায়। তার উপর অর্থ থাকলে নানা বদ্ অভ্যাস—মদ্যপান, জুয়া খেলা ইত্যাদি আপনিই এসে জোটে।

এই মনুষ্যদেহের দ্বারা স্বর্গ এমন কি মোক্ষও লাভ করা সম্ভব। কৃপণ ভাবলে—এমন মনুষ্য দেহ লাভ করে, কোন্ মূর্খ অনর্থের মূল, অর্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়? মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন কোনরকম বাসনা কিংবা কোন ব্যক্তি থেকেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে শ্রীভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন; তাই আমি আজ এই অবস্থায় উপনীত হয়ে নির্বেদ লাভ করেছি। এখন থেকে আমি বৈরাগ্য অবলম্বন করে নিজের মধ্যেই নিজে সন্তুষ্ট থাকব এবং ধর্মাদির সাধন করে দেহাভিমান ত্যাগ করে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করব। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমার এই সংকল্প সিদ্ধ করুন।

সেই ব্যক্তি তখন 'আমি আমার' ভাব ত্যাগ করে এবং মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করে বিচরণ করতে লাগল। এদিকে তাকে দেখে লোকেরা নানাভাবে তাকে গালাগালি এবং অপমান করত; কেউ কেউ তাকে ভণ্ড, চোর বলে অযথা মারধরও করত। নদীর তীরে বসে সে যখন ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করত, তখন কোন পাপিষ্ঠ তার অন্নের উপর মূত্র ত্যাগ করত এবং তার মাথায় থুথু ফেলত।

এইসব দুঃখ, কষ্ট, অপমানকে সে নিজেরই প্রারব্ধ মনে করে নির্বিবাদে সহ্য করত। সে মনে মনে বিচার করত—আত্মা ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই, যা দেখছি সবই মিথ্যা; সুতরাং সুখ দুঃখও মিথ্যা। এ আমার নিজের লোক, এ আমার শত্রু—এই ভাবও মিথ্যা। যে অনুভব করে, আত্মা সবার মধ্যেই বিদ্যমান, আত্মা নির্বিকার—সে কারও কাছ থেকেই ভয় পায় না। এইভাবে সেই কৃপণ, বৈরাগ্য লাভ এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করে পৃথিবী বিচরণ করত; দুষ্ট লোকের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েও সে নিজের ভাবে অবিচল থেকে গান করে বেড়াত ঃ

> এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
> অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥
>
> ১১-২৩-৫৭॥

পুরাকালে মহর্ষিরা যে ভাবে পরাত্মনিষ্ঠ হতেন, আমিও সেইভাবে পরাত্ম-নিষ্ঠ হয়ে শ্রীভগবানের চরণ সেবার দ্বারা এই দুরন্ত সংসার-সাগর পার হয়ে যাব।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর এই শ্লোকটি আবৃত্তি করতে করতে ভাবাবেশে বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়েছিলেন। সেবার অবশ্য তাঁর বৃন্দাবনে যাওয়া হয় নি।

কৃপণের আখ্যায়িকাটি শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—হে উদ্ধব! অতি সাবধানে সর্বপ্রকারে আমাতে নিবিষ্ট-চিত্ত হয়ে মনকে বশীভূত করবে। এই হচ্ছে যোগের সার কথা।

হে উদ্ধব! একমাত্র নরদেহেই আমার স্বরূপকে উপলব্ধি করা যায়। এই নরদেহ লাভ করে সাধক ভক্তিভাব অবলম্বন করে আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে—আমাকে লাভ করে থাকে।

যারা কাম এবং উদরের তৃপ্তি সাধনেই ব্যাপৃত থাকে, সাধক কখনও তাদের সঙ্গ করবে না; এদের সান্নিধ্য সাধককে ভ্রষ্ট করে।

সার্বভৌম নরপতি পুরুরবা উর্বশীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে বহু বছর ভোগে মত্ত হয়ে তার সাথে কাটিয়েছিলেন। পরে যখন উর্বশী তাকে ত্যাগ করে চলে গেল, তখন পুরুরবা উর্বশীর বিরহে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। পরে শোকের উপশম হলে পুরুরবা বৈরাগ্য লাভ করে বলেছিলেন—হায়! আমার কি মোহ ! যে আমি নৃপতি মণ্ডলের চূড়ামণি, সেই আমি কি না রমণীর অনুগত হয়ে ছিলাম!

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ।। ১১-২৬-১২ ।।

যে ব্যক্তি রমণীতে আসক্ত, তার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ, নির্জনবাস, বাক্‌সংযম—এ সবই বৃথা।

আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষদেরও যিনি ঈশ্বর, সেই ভগবান শ্রীহরি ছাড়া আমার অপহৃত মনকে কে মুক্ত করতে সমর্থ হবে?

ত্বক-মাংস-রক্ত-স্নায়ু-মজ্জা এবং অস্থির দ্বারা গঠিত নারীদেহে যারা আনন্দ উপভোগ করে, তাদের সাথে বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজে বিচরণকারী কৃমিদের পার্থক্য কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এইভাবে চিন্তা করে এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করে পুরুরবা নিজের মধ্যেই অন্তর্যামী আমাকে উপলব্ধি করে জ্ঞানের দ্বারা মোহ-মুক্ত হয়েছিল। সেইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে সাধুদের সঙ্গ করবে। সাধুদের উপদেশে বিষয়ীর মনের আসক্তি দূর হয়।

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ।। ১১-২৬-২৭ ।।

সাধু ব্যক্তির কোন জিনিস বা কোন লোকের দরকার হয় না; তারা সর্বদা মচ্চিত্ত, কিছুতেই তাদের মনের শান্তি নষ্ট হয় না, তারা সমদর্শী। তাদের 'আমি আমার' বলে বোধ থাকে না এবং তারা অহংকার শূন্য। শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ তারা সমভাবে সহ্য করে এবং দেহধারণের জন্য যা একান্ত

প্রয়োজন, তার বেশি কিছুই গ্রহণ করে না। হে উদ্ধব! এইরকম মহা-পুরুষের কাছে সর্বদাই আমার কথা কীর্তিত হয়; সেইসব কথা যারা শোনে, তারা সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়।

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ১১-২৬-৩০ ॥

যে সাধু, অনন্ত গুণসম্পন্ন আমাতে আনন্দ-অনুভবাত্মক ব্রহ্মে ভক্তিলাভ করে, তার আর পাওয়ার কি থাকতে পারে? অর্থাৎ সে পূর্ণকাম হয়ে যায়।

উদ্ধব বললেন—হে যাদবশ্রেষ্ঠ! আপনার ভক্তেরা কিভাবে আপনার পূজা করে, সেই বিষয়ে আমায় বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! কর্মকাণ্ডের অন্ত নেই; সংক্ষেপে, বৈদিক, তান্ত্রিক এবং মিশ্র—এই তিন প্রকারে আমার পূজা হয়ে থাকে। বৈদিক মন্ত্র এবং বেদ-বিহিত উপায়ে যে পূজা হয়, তা বৈদিক পূজা; আর বৈদিক যুগের পর যে-রকম পূজার প্রচলন হয়েছে তাকে তান্ত্রিক পূজা বলে।

প্রতিমায়, বেদীতে, অগ্নিতে, সূর্যে, জলে, নিজের হৃদয়ে অথবা ব্রাহ্মণে ভক্তিভাবে, নিজের গুরু-জ্ঞানে আমার অর্চনা করবে।

প্রথমে স্নানাদির দ্বারা দেহ শুদ্ধ করবে।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ ১১-২৭-১২ ॥

শিলাময়ী, কাষ্ঠ নির্মিত, ধাতু নির্মিত, চন্দনাদির দ্বারা অঙ্কিত, চিত্রাঙ্কিত (পট), বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত—এই আট প্রকার প্রতিমায় পূজা হয়ে থাকে।

বর্তমানে যেভাবে পূজা হয় তাতে আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ইত্যাদি করে পূজক নিজের আত্মভূত শ্রীমূর্তির জ্যোতিতে তার নিজের শরীর ব্যাপ্ত হয়েছে চিন্তা করে মানসোপচারে—মনে মনে নানা উপচার দিয়ে পূজা করে। প্রতিমাদিতে দেবতার আবাহন করে নানাবিধ উপচারে—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, চন্দন, অলঙ্কার প্রভৃতি জিনিস দিয়ে পূজা করার বিধি আছে। হোম, প্রার্থনা, স্তবপাঠ ইত্যাদিও করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এইভাবে, বেদ-বিহিত এবং তন্ত্র-নির্দিষ্ট উপায়ে সকলের মধ্যে অবস্থিত আমার পূজা করলে, আমারই কৃপায় সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

এর পর শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানযোগের বিষয়ে যা যা বলেছিলেন, সেইসব আবার উদ্ধবকে সংক্ষেপে বললেন। এখানে তিনি বিশেষ করে দ্বৈতভাব-বর্জিত অদ্বৈতভাবের কথাই বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে; এই বিশ্বকে যিনি ব্রহ্মময়রূপে দর্শন করেন, তিনি কারও প্রশংসা কিংবা নিন্দা করেন না; কারণ যেখানে দ্বৈতভাব বর্জিত সেখানে 'দুই' নেই; সেখানে ভালও নেই মন্দও নেই; সুতরাং নিন্দা-স্তুতির কথাই উঠতে পারে না। সৃষ্টির আদিতে, সৃষ্ট জগতে এবং সৃষ্টির অন্তে, যা সমভাবে থাকে, একমাত্র তা-ই সত্য। তিনকালেই যা বর্তমান থাকে, তাকেই অদ্বয় ব্রহ্ম বলে। নামরূপাত্মক জগৎ স্বরূপত নেই—সুতরাং মিথ্যা। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতি প্রমাণ এবং নিজের অনুভূতির সাহায্যে সব কিছুই উৎপত্তি-বিনাশশীল, সুতরাং মিথ্যা—এইটি জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হয়ে জগতে বিচরণ করবে।

উদ্ধব বললেন—হে অচ্যুত! এই যে জ্ঞানযোগ এবং তার সাধনের কথা বললেন, সাধারণ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে তা একেবারেই দুঃসাধ্য; সুতরাং যে সাধনের দ্বারা সহজে আপনাকে লাভ করা যায়, সেই সাধনার কথাই আমায় বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমাকে পাবার সহজ উপায় তোমায় বলছি ঃ

> **কুর্য্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।**
> **ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ॥ ১১-২৯-৯ ॥**

আমাতে মন এবং চিত্ত সমর্পণ করলে আমার প্রীতি-জনক কর্মে অর্থাৎ ভাগবত-ধর্মে অনুরাগ আসবে; তখন আমার স্মরণের সাথে সাথে সমস্ত কর্ম আমারই উদ্দেশ্যে করবে।

আমার ভক্ত এবং সাধু ব্যক্তি যেখানে থাকে সেইসব জায়গায় তুমি বাস করবে এবং তাদের উপদেশ অনুযায়ী চলবে।

মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে নিমিত্ত করে জগতের সাধারণ মানুষকেই এইসব উপদেশ দিয়েছেন; নইলে সারাটা জীবন যে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত, তাকে এইসব উপদেশ দেওয়ার কোন মানেই হয় না। উদ্ধব সাধারণ মানুষের হয়ে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য প্রশ্ন করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে সাধারণ মানুষের জন্যই উদ্ধবকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—আকাশ যেমন সকল জিনিসের ভিতরে এবং বাইরে বর্তমান থেকেও কোন কিছুর দ্বারা আবৃত এবং সংশ্লিষ্ট হয় না, সেই রকম নির্মল-চিত্ত ব্যক্তি পরমাত্মা আমাকেও সকলের ভিতরে, বাইরে এবং নিজের আত্মাতে বিরাজিত দেখবে। হে উদ্ধব! এই জ্ঞান-দৃষ্টির দ্বারা সবই, আমারই বিভিন্ন রূপ জেনে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল প্রভৃতি সকলকে সমানভাবে দেখবে এবং তাদের সাথে সেইভাবে ব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা সকলের মধ্যে আমাকে দর্শন করতে চেষ্টা করে, তার অহঙ্কার, স্পর্ধা, হিংসা এবং অপরের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব নষ্ট হয়ে যায়। সর্বভূতে ব্রহ্ম-দর্শন, আমাকে দর্শন-রূপ সাধনায় নিরত ব্যক্তি, সকলের মধ্যেই ব্রহ্মকে, আমাকে দেখে সকল সংশয় থেকে মুক্ত হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের এই হচ্ছে শেষ কথা, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন—সর্বত্র কৃষ্ণ দর্শন।

উপদেশ দেওয়া শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—হে আমার অতি প্রিয় উদ্ধব! এই যে জ্ঞানের উপদেশ তোমায় দিলাম, তা তুমি সম্যক্-রূপে উপলব্ধি করেছ তো? এই উপদেশের দ্বারা তোমার মনের মালিন্য শোক মোহ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে তো?

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে উদ্ধব পরম আনন্দে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর শ্রীচরণে মাথা রেখে বললেন—হে কৃষ্ণ! যে মোহান্ধকার এতদিন আমাকে আশ্রয় করেছিল, আপনার কৃপায় আজ তা দূর হয়েছে।

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ ১১-২৯-৪০ ॥

হে মহাযোগিন্! আপনাকে আমি প্রণাম করি; শরণাগত আমাকে আপনি এই শিক্ষা দিন যাতে আপনার পাদপদ্মে আমার অবিনাশী চিরন্তনী সুদৃঢ় ভক্তি হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন—হে উদ্ধব! আমি বলছি, তুমি এখন আমার প্রিয় বদরিকাশ্রমে চলে যাও।

মহাভক্ত উদ্ধব তখন অনন্যশরণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন করে বদরিকাশ্রমে চলে গেলেন এবং সেখানে তপস্যার দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেই লাভ করলেন।

৩৬

শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংবরণ ও পরীক্ষিতের দেহত্যাগ

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গার তীরে বসে ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের কাছে ভাগবত-কথা শুনছেন। পরীক্ষিতের উপর ব্রাহ্মণ-বালকের অভিশাপ ছিল যে, সাত দিনের মধ্যে পরীক্ষিতের দেহান্ত হবে। তাই পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলেছিলেন যে, আপনি আমায় বলুন, কি করে আমি সর্ব বাসনা মুক্ত হয়ে শ্রীভগবানে তন্ময় হয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারব। পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে শুকদেব ভাগবত-কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন।

পূর্বাধ্যায়ে শুকদেব বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসহচর এবং একান্ত ভক্ত উদ্ধবকে আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্তৃত এবং চরম উপদেশ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বদরিকাশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন।

ততো মহাভাগবত উদ্ধবে নির্গতে বনম্।
দ্বারবত্যাং কিমকরোদ্ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ১১-৩০-১ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—পরমভক্ত উদ্ধব বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে চলে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায় কি করলেন?

পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে শুকদেব বললেন—স্বর্গ, মর্ত এবং অন্তরীক্ষে তখন প্রবল উৎপাত হতে আরম্ভ হয়েছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ যাদবদের সম্বোধন করে বললেন—হে যাদব প্রধানেরা! মৃত্যুচিহ্ন-সূচক এইসব ভয়ঙ্কর উৎপাত দ্বারকায় হতে আরম্ভ করেছে; সুতরাং আমাদের আর এখানে এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। প্রথমে স্ত্রীলোক, বালক এবং বৃদ্ধদের শঙ্খোদ্ধার নামক স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন; পরে আমরা সকলে প্রভাস তীর্থে গিয়ে সরস্বতী নদীতে স্নান করে দেবতাদের পূজা করব; তারপর ব্রাহ্মণদের দিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়ে, তাদের যথারীতি স্বর্ণ, বস্ত্র প্রভৃতি দান করে এবং ভোজন করিয়ে তাদের সন্তুষ্টি বিধান করব। শাস্ত্রে অরিষ্ট—অমঙ্গল নাশের এইরকম ব্যবস্থাই রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে যাদবেরা তখন প্রভাস তীর্থে গিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, দান এবং অপর সকলকে ভোজন করিয়ে নিজেরাও আহারাদি করলেন। এর পরই যাদবেরা কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করলেন এবং হিতাহিত জ্ঞান-রহিত হয়ে নিজেদের মধ্যেই কথা কাটাকাটি এবং ঝগড়া করতে লাগলেন। ক্রমে তারা ক্রোধান্ধ হয়ে একে অপরকে বধ করার জন্য নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মারামারি করতে আরম্ভ করলেন। প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অক্রূর, ভোজ, অনিরুদ্ধ, সাত্যকী প্রভৃতি সকলেই একে অপরকে বধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তারা সকলেই কৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ; তাই তারা বিমুগ্ধ চিত্তে পিতা-পুত্রে, ভায়ে-ভায়ে, মামা-ভাগ্নে, বন্ধুতে বন্ধুতে একে অপরকে আঘাত করতে লাগলেন। এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে যখন তাদের অস্ত্রশস্ত্র সব বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন তারা সমুদ্রের তীরে জাত এরকা-গাছ (নল-খাগড়া জাতীয় গাছ) তুলে নিয়ে একে অপরকে মারতে লাগলেন। যাদবদের সংস্পর্শে এসে সেই এরকা গাছ যা মুষল চূর্ণ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, তা এখন বজ্রের মতো কঠিন এবং অমোঘ হয়ে উঠল।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তখন যাদবদের এই মরণান্তকর যুদ্ধ থামাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু উন্মত্ত যাদবেরা কৃষ্ণ-বলরামকেও শত্রু মনে করে তাঁদেরও আঘাত করতে লাগলেন। কৃষ্ণ-বলরামও তখন ক্রোধান্বিত হয়ে এরকা-রূপ অস্ত্র দিয়ে যাদবদের মারতে লাগলেন। এইভাবে—

ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাম্।
স্পর্দ্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈণবোঽগ্নির্যথা বনম্ ॥
১১-৩০-২৪ ॥

একটি বাঁশের সাথে আর একটি বাঁশের ঘর্ষণের ফলে যে অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেই আগুনই যেমন সমস্ত বনকে দগ্ধ করে দেয়, সেইরকম ব্রহ্মশাপগ্রস্ত এবং কৃষ্ণমায়ায় মোহিত যাদবদের স্পর্ধা-জনিত ক্রোধ সমস্ত যদুকুলকে ধ্বংস করল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন সমস্ত যদুকুল বিনষ্ট হয়েছে তখন তিনি ভাবলেন যে, পৃথিবীর ভার এবার যথার্থই দূর হলো।

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ॥ ১১-৩০-২৬ ॥

বলরাম তখন সমুদ্রের তীরে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যোগস্থ হলেন এবং আত্মাতে আত্মসংযোগ করে মানুষী দেহ ত্যাগ করলেন।

বলরামের পরিনির্বাণ দেখে শ্রীকৃষ্ণ শোকাভিভূত হলেন; তিনি তখন চতুর্ভুজ মূর্তিতে নিজের প্রভায় সমস্ত দিক আলোকিত করে একটি অশ্বত্থ গাছের নিচে গিয়ে বসলেন। এখানে ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের অতি সুন্দর অপার্থিব রূপ শেষ বারের মতো বর্ণনা করেছেন ঃ

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চসম্।
কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্ ॥ ১১-৩০-২৯ ॥
সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্।
পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১১-৩০-৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বুকে শ্রীবৎস-চিহ্ন শোভা পাচ্ছে; তাঁর গায়ের রং ঘন মেঘের মতো নীল; তপ্ত কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্রে তাঁর মঙ্গলময় দেহ আবৃত। ঈষৎ সহাস্যযুক্ত মুখকমল অতি মনোহর এবং মস্তকে নীল কুন্তল শোভমান; নয়ন যুগল পদ্মের মতোই মনোহারী এবং কর্ণযুগল অতি উজ্জ্বল মকর-কুণ্ডলে অলঙ্কৃত। বনমালায় শোভিত শ্রীকৃষ্ণ চতুর্হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করে নিজের দক্ষিণ উরুর উপর তাঁর ঈষৎ রক্তিমাভ বাম পদ স্থাপন করে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট হলেন।

দ্বারকায় থাকবার সময় যাদবেরা মুষলের অবশিষ্ট অংশ যা আর চূর্ণ করা যায় নি, তা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন। একটি মাছ সেই মুষলের অংশটি খেয়ে ফেলে; জেলেরা পরে সেই মাছটিকে ধরলে একজন ব্যাধ সেই লৌহাংশ নিয়ে তার বাণের অগ্রভাগে ফলকরূপে জুড়ে রেখেছিল। সেই ব্যাধ তখন অশ্বত্থ গাছের নিচে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে তাঁর রক্তিমাভ শ্রীচরণকেই হরিণের মুখ মনে করে বাণবিদ্ধ করল। ব্যাধ যখন কাছে এসে দেখলে যে, না-জেনে সে শ্রীকৃষ্ণকেই বাণের দ্বারা আঘাত করেছে, তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে মাথা রেখে ভূপতিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল ঃ

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেঽনঘ ॥ ১১-৩০-৩৫ ॥

হে মধুসূদন! আমি না জেনে এই পাপ কাজ করে ফেলেছি। হে অনঘ, হে উত্তমশ্লোক! আমার এই পাপ আপনি ক্ষমা করুন। যাঁকে স্মরণ করলেই মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়, আমি কিনা তাঁকেই আঘাত করেছি! হে বৈকুণ্ঠপতি! মৃগলুব্ধ পাপী আমাকে আপনি এখনই বধ করুন, যাতে আমি আর কখনও সজ্জনদের হিংসা করতে না পারি।

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥ ১১-৩০-৩৯ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে জরা! তুমি ভয় পেয়ো না ওঠ; তুমি আমার ইচ্ছানুসারেই এই কাজ করেছ। এখন তুমি আমার আজ্ঞায় সুকৃতকারীদের প্রাপ্য স্বর্গলোকে গমন কর।

এদিকে কৃষ্ণ-সারথি দারুক, শ্রীকৃষ্ণের খোঁজে, কৃষ্ণের গলার তুলসী মালার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী প্রদীপ্তকান্তি শ্রীকৃষ্ণকে অশ্বত্থমূলে উপবিষ্ট দেখে সাশ্রুনয়নে দারুক বললেন—হে প্রভু! আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে না পেরে আমি চারিদিক অন্ধকার দেখছিলাম; আমার মনের শান্তিও বিঘ্নিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ তখন দারুককে বললেন ঃ

গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ।
সঙ্কর্ষণস্য নির্যাণং বন্ধুভ্যো ব্রূহি মদ্দশাম্ ॥ ১১-৩০-৪৬ ॥

হে দারুক! তুমি দ্বারকায় গিয়ে, পরস্পর যুদ্ধ করে জ্ঞাতিগণের নিধন, বলরামের মহাপ্রস্থান এবং আমার অবস্থার কথা আত্মীয়-বন্ধুদের বল। তাদের আরও বলবে যে, তারা যেন আর দ্বারকায় না থাকে; কারণ আমার পরিত্যক্ত যদুপুরী সমুদ্র গ্রাস করবে; সুতরাং তারা সকলে যেন অর্জুনের দ্বারা রক্ষিত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যায়।

ত্বন্তু মদ্ধর্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥ ১১-৩০-৪৯ ॥

আর তুমি, হে দারুক! আমার ভক্তিধর্ম আশ্রয় করে, জ্ঞাননিষ্ঠ এবং উদাসীন হয়ে, এই সংসার আমারই মায়ার দ্বারা রচিত জেনে, শোক পরিহার করে শান্তি লাভ কর।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সংবরণের কথা বলে শুকদেব পরীক্ষিৎকে বললেন— হে রাজন্! পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণের এই যে যদুবংশে আবির্ভাব এবং তিরোধান লীলা, এ কেবল নটের অভিনয় মাত্র বলে জানবে। তিনি আত্মা থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করে, অন্তর্যামিরূপে তাতেই প্রবিষ্ট হন এবং প্রলয়ের সময় এই সৃষ্ট জগৎ আবার সংহার করে তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত হন—ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে লীন হন।

এদিকে কৃষ্ণের আদেশে দারুক দ্বারকায় গিয়ে বসুদেব এবং উগ্রসেনের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে যাদবদের নিধন-বার্তা নিবেদন করলেন।

দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব, কৃষ্ণ-বলরামের শোকে তখনই প্রাণত্যাগ করলেন; অপরাপর স্ত্রীলোকেরা অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

কৃষ্ণসখা অর্জুন, শোকে অত্যন্ত কাতর হলেও কৃষ্ণগুণকীর্তন করে নিজের এবং অপরের দুঃখ লাঘব করে বন্ধুবান্ধবদের পারলৌকিক কাজ যথা-রীতি সম্পন্ন করলেন। অর্জুন তখন অবশিষ্ট স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে (শ্রীকৃষ্ণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ-বজ্রনাভ) মথুরার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ কৃষ্ণের তিনটি মূর্তি তৈরি করিয়ে তাঁর মা ঊষাকে দেখিয়েছিলেন। মদনমোহন মূর্তি দেখে ঊষা বললেন—এঁর পা দুখানি অবিকল শ্রীকৃষ্ণের পায়ের মতোই হয়েছে; গোপীনাথের মূর্তি দেখে বললেন—এঁর বুক ঠিক ঠিক শ্রীকৃষ্ণের বুকের মতোই হয়েছে; গোবিন্দের মূর্তি দেখে ঊষা লজ্জায় তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে নিলেন—অবিকল শ্রীকৃষ্ণের মুখ!

যাক এসব কথা। শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! তোমার পিতামহ

পাণ্ডবেরা অর্জুনের কাছে সুহৃদ্‌-বধের বৃত্তান্ত শুনে তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে সর্বপ্রথম তাঁর মহাকরুণার পরিচয় দিয়ে পূতনা রাক্ষসীকে ধাত্রীগতি দান করেছিলেন—যে ধাত্রীগতি লাভ করা মহা মহা ভক্তের পক্ষেও সুদুর্লভ ; আর এই পূতনা রাক্ষসী এসেছিল কিনা শ্রীকৃষ্ণকেই বধ করতে ! আবার মর্তলোক ছেড়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি জরা ব্যাধকে, যে তাঁরই প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করেছিল, তাকে স্বর্গধামে অধিষ্ঠিত করে গেলেন! এ ছাড়াও যারা যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমল দর্শন করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তারাও সকলেই পরমধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শত্রু মিত্রে এমন অপার্থিব করুণা আর কখনও দেখা যায়নি। তাই তো উদ্ধব বদরিকাশ্রমে যাবার পথে বিদুরকে বলেছিলেন—এমন যে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ, তাঁকে ছেড়ে, বল তো বিদুর আমি আর কার কাছে যাব ?

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন—আমি যখন মর্তধাম ত্যাগ করব, তখন লোকেরা মঙ্গলহীন হবে এবং কলি পৃথিবীকে আক্রমণ করবে। শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে কলি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মানুষের অবস্থার কথা এইবার শুকদেব বলছেন ঃ

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ।
ধর্মন্যায়-ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি ॥ ১২-২-২ ॥

কলিকালে ধনের উপরই মানুষের জন্ম, গুণ এবং আচারের উৎকর্ষ নির্ভর করবে; বাহুবলই ধর্ম, ন্যায় নীতির নিয়ন্তা হবে।

স্ত্রী পুরুষের আকর্ষণেই বিবাহ হবে—এতে কুল, শীল, শিক্ষা, ব্যবহারের কোন প্রভাব থাকবে না। ব্যবসাতে প্রবঞ্চনা প্রাধান্য লাভ করবে। কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্র থাকলেই লোক ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে। বেশি কথা বলতে পারলেই লোক পণ্ডিত বলে গণ্য হবে। দম্ভ প্রকাশেই সাধুত্বের লক্ষণ প্রমাণিত হবে। নাম-যশের জন্য ধর্মের আচরণ করা হবে।

শুকদেব আরও বললেন—হে পরীক্ষিৎ! কলিযুগ সর্বদোষের আকর সন্দেহ নেই; কিন্তু কলিযুগের একটি অতি মহান গুণ রয়েছে ঃ

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ (১২-৩-৫১)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনেই মানুষ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করবে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ১২-৩-৫২ ॥

সত্য যুগে বিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এবং দ্বাপরে ভগবানের সেবা পূজার দ্বারা যা কিছু লাভ হয়, সে সবই কলিকালে শ্রীভগবানের নাম-কীর্তনেই লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং ধন্য এই কলিযুগ!

ভাগবত-কথা বর্ণনা করে পরিশেষে শুকদেব বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ! সর্ব জীবের আশ্রয় শ্রীভগবানের লীলাকথা অতি সংক্ষেপে আমি বলেছি; জানবে তাঁর সমস্ত লীলা বর্ণনা করা ব্রহ্মারও অসাধ্য। নানা দুঃখ-কষ্টে প্রপীড়িত সাংসারিক জীব যখন এই দুস্তর সংসার-সমুদ্র পার হতে অভিলাষী হয়, তখন তার পক্ষে শ্রীভগবানের লীলাকথা আস্বাদন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পূর্বে নারায়ণ এই পুরাণ-সংহিতা নারদকে বলেছিলেন; নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে তা বর্ণনা করেন। ভগবান ব্যাসদেব আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এই বেদতুল্য ভাগবত-সংহিতা আমাকে শ্রবণ করিয়েছেন। আমিও এই সাত দিন ধরে তোমার কাছে সেই ভাগবতী কথাই কীর্তন করলাম। সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই জ্ঞান লাভ করেছ; অতএব তোমার তো আর মৃত্যু ভয় থাকা উচিত নয়।

ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি ॥ ১২-৫-২ ॥

হে রাজন্! মৃত্যুভয় পশুবুদ্ধি থেকে হয় অর্থাৎ অজ্ঞান থেকে হয়। এই দেহ পূর্বে ছিল না, এখন রয়েছে বটে কিন্তু পরে থাকবে না; কিন্তু আত্মস্বরূপ তুমি চিরদিনই ছিলে এবং চিরকাল থাকবে। তুমি এই শরীর নও, তুমি আত্মস্বরূপ—অজ, অমর; সুতরাং তুমি মৃত্যুভয় ত্যাগ কর। ঘট ভেঙে গেলে

ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ যেমন মহাকাশে মিশে যায়, সেই রকম দেহের নাশ হলে জীব আবার পরব্রহ্মেই মিশে যায়।

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে ॥ ১২-৫-১১॥

'আমিই পরমধাম ব্রহ্ম, আমিই পরমপদ ব্রহ্ম'—এইটি স্থির জেনে নিষ্কল পরব্রহ্মে জীবাত্মাকে যুক্ত কর। তা হলেই আত্মা থেকে বিশ্ব এবং তক্ষককে আর পৃথক দেখবে না; সবই তখন তোমার কাছে ব্রহ্মময় হয়ে যাবে।

শ্রীশুকদেবের কাছে ভাগবত-কথা শ্রবণ করে, মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন তাঁর চরণে মাথা রেখে বললেন ঃ

সিদ্ধোঽস্মি অনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদ্ অনাদিনিধনো হরিঃ ॥ ১২-৬-২ ॥

হে মহামুনি! আপনি করুণা করে উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত ভগবান শ্রীহরির যেসব লীলা আমায় শুনিয়েছেন তাতেই আমি সফলকাম এবং অনুগৃহীত হয়েছি। আপনি যে অভয়পদ আমায় দর্শন করিয়েছেন, আমি এখন সেই নির্বাণ, মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি; সুতরাং মৃত্যুরূপী তক্ষককে আমি আর ভয় করি না।

অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্ ॥ ১২-৬-৬ ॥

আমার মন কামনাশূন্য হয়েছে; আপনি আমায় এখন অনুমতি দিন—আমি অধোক্ষজে, শ্রীকৃষ্ণে বাক্য, ইন্দ্রিয় এবং মন সংলগ্ন করে প্রাণ ত্যাগ করি।

সাতদিন আগে শুকদেব যখন আপন মনে গঙ্গার তীর ধরে যাচ্ছিলেন, তখন পরীক্ষিৎ তাঁকে প্রণাম করে অতি দীন-হীনভাবে বলেছিলেন—সাত দিনের মধ্যে ব্রহ্মশাপে তক্ষকের দংশনে আমার প্রাণান্ত হবে; এই অবস্থায় আপনি আমায় কৃপা করে বলুন—এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি কেমন করে বিষয়-বাসনা রহিত হয়ে, মনকে শ্রীকৃষ্ণে স্থির করে দেহত্যাগ করতে পারব।

সেদিন এই ছিল পরীক্ষিতের আসল প্রশ্ন। সাতদিন ধরে শুকদেবের কাছে ভাগবত-কথা শুনে এখন পরীক্ষিৎ উল্লসিত হয়ে বললেন—হে ব্রহ্মর্ষি! আপনি এখন আমায় অনুমতি করুন—কামনাশূন্য মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করে প্রাণত্যাগ করি। পরীক্ষিতের ভাগবত-কথা শোনা সার্থক হয়েছে! যুগ যুগ ধরে যারাই শুকদেব-বর্ণিত এই ভাগবত-কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে কীর্তন এবং শ্রবণ করে আসছেন, তারাও কামনাশূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণে মন-প্রাণ সমর্পণ করে পরাগতি লাভ করছেন—সন্দেহ নেই।

পরীক্ষিৎ কর্তৃক যথাযথরূপে পূজিত হয়ে এবং পরীক্ষিৎকে মহাপ্রয়াণের জন্য শ্রীভগবানে মন নিবিষ্ট করতে অনুমতি দিয়ে শুকদেব তখন সেখান থেকে চলে গেলেন।

শুকদেব যখন পরীক্ষিৎকে এই ভাগবত-কথা শোনাচ্ছিলেন, তখন সেখানে সূত উগ্রশ্রবা এক কোণায় বসে এই ভাগবত-কথা শুনছিলেন। উগ্রশ্রবা ছিলেন শ্রুতিধর; একবার তিনি যা শুনতেন, তা হুবহু তাঁর মনে থাকত। পরে সূত উগ্রশ্রবা ভাবে বিভোর হয়ে যখন নৈমিষারণ্যের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেখানে ঋষিরা এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছিলেন। সূতকে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে যেতে দেখে ঋষিরা তাকে আদর করে ডেকে এনে যজ্ঞসভায় তার কাছ থেকে শুকদেবের মুখ-নিঃসৃত ঐ ভাগবত-কথা শুনেছিলেন। উগ্রশ্রবা ঋষিদের ভাগবত-কথা শুনিয়ে বলেছিলেন—শুকদেব পরীক্ষিতের ভাগবতী-সভা থেকে চলে যাবার পর পরীক্ষিৎ মনকে স্থির করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে, নিশ্চলভাবে পরমাত্মার ধ্যানে ডুবে গেলেন; তাঁর আর কোন বাহ্যজ্ঞান রইল না।

সেই সময় তক্ষক এসে পরীক্ষিৎকে দংশন করতেই তক্ষকের বিষাগ্নিতে ব্রহ্মভূত রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহ ভস্ম হয়ে গেল।

এর পর উগ্রশ্রবা ভাগবত-মাহাত্ম্য বললেন ঃ

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ১২-১৩-১৫ ॥

ভাগবতকেই সর্ববেদান্তের সার বলা হয়। এই ভাগবতামৃত রসে যারা মজেছে, তাদের আর অন্য কোন বিষয়েই তৃপ্তি হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥
১২-১৩-১৮॥

যে পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বৈষ্ণবদের অতি প্রিয়, যাতে পরমহংসদের অধিগম্য শুদ্ধ পরমজ্ঞান গীত হয়েছে, যেখানে জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই ভাগবত শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ, অধ্যয়ন এবং বিচারপূর্বক গ্রহণ করলে মানুষ মুক্তি লাভ করে থাকে। সুতরাং

তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি ॥
১২-১৩-১৯ (উত্তরাংশ) ॥

সেই শুদ্ধ পবিত্র শোকাপহ অমৃত-স্বরূপ পরম সত্য, শ্রীভগবানের আমরা ধ্যান করি।

ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের শেষ কথাই হচ্ছে '*সত্যং পরং ধীমহি*'—সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আমরা ধ্যান করি। আবার এই কথাই অন্তে রয়েছে— '*সত্যং পরং ধীমহি*'—আমরা পরম সত্য শ্রীভগবানের ধ্যান করি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ভাগবতের মূল সুর, যা এই মহাগ্রন্থের সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে আছে, তা হলো এই—সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের ধ্যান করতে হবে।

এর পর ভগবান বাসুদেব এবং গুরু শুকদেবকে প্রণাম করে সূত উগ্রশ্রবা ভাগবত-কথা শেষ করেছেন।

নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখ-শমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥ ১২-১৩-২১ ॥

এইটি-ই ভাগবতের সর্বশেষ শ্লোক।

যাঁর নাম কীর্তনে সর্বপাপ দূর হয়, যাঁকে প্রণাম করলে সর্ব দুঃখের নিবৃত্তি হয়, সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—
সকলের চরণে প্রণাম ।

সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থাবলী

নারদীয় ভক্তিসূত্র	২০.০০
অষ্টাবক্র-গীতা	২২.০০
ব্যাধ গীতা	২২.০০
মুক্তি এবং তাহার সাধন	২৫.০০
নারদীয় ভক্তিসূত্র (স্বামী ভূতেশানন্দ)	২৫.০০
মুণ্ডকোপনিষৎ (স্বামী ভূতেশানন্দ)	৩০.০০
শ্রীশ্রীগীতা (পুঁথি)	৩০.০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পুঁথি)	৩৫.০০
বিবেকচূড়ামণি	৩৫.০০
কঠোপনিষৎ (শাঙ্কর ভাষ্য)	৩৫.০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	৪০.০০
শ্রীমদ্‌ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত)	৪০.০০
সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ	৫০.০০
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা	৫০.০০
উদ্ধব গীতা	৫৫.০০
স্তবকুসুমাঞ্জলি	৬০.০০
শ্রীরামের অনুধ্যান	৭০.০০
কঠোপনিষৎ (স্বামী ভূতেশানন্দ)	৭৫.০০
সংক্ষেপ শারীরকম	৭৫.০০
ব্রহ্মসূত্র	৮০.০০
শ্রীমদ্ভগবদগীতা (সুবোধনী টিকা সমেত)	৯০.০০
উপনিষদের সন্দেশ	১০০.০০
ভাগবত-কথা	১০০.০০
পঞ্চদশী	১২০.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্ (প্রথম স্কন্ধ)	১৫০.০০
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তিন-খণ্ডে)	১৮০.০০
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (শাঙ্করভাষ্য সমেত)	২৫০.০০
বেদান্ত দর্শন (চার-খণ্ডে)	৫০০.০০

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

মূল্য ঃ ১০০.০০

ISBN 81-8040-231-2

Bhagavat-Katha : Rs. 100.00